ব্যাচেলর অব এডুকেশন

বাংলা শিক্ষণ

Teaching Bangla

EDBN 1411

রচনা

প্রফেসর এম. এম আমিনুল রশিদ
প্রফেসর ড. মোঃ জয়নাল আবেদীন খান
মো: ফেরদৌস হোসেন
মো: মিজানুর রহমান
মোহাম্মদ মহিববুল্লাহ
জেসমীন জাহান খানম

মূল্যায়ন

মোহাম্মদ আশরাফ সাদেক
প্রফেসর প্রীতিশ কুমার সরকার
স্বপন কুমার নাথ

সম্পাদনা

প্রফেসর ড. মো: জয়নাল আবেদীন খান

স্কুল অব এডুকেশন

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা শিক্ষণ
EDBN 1411
বিএড প্রোগ্রাম

প্রধান সমন্বয়ক
মোঃ জহির উদ্দিন বাবর
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
টিচিং কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট-২ (টিকিউআই-২) ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রজেক্ট

সমন্বয়ক
রায়হানা তসলিম, উপ-প্রকল্প পরিচালক (প্রশিক্ষণ), টিকিউআই-২ প্রকল্প
ড. রেহেনা খাতুন, সহকারী প্রকল্প পরিচালক (প্রশিক্ষণ), টিকিউআই-২ প্রকল্প
কাজী সাখাওয়াৎ হোসেন, প্রকল্প কর্মকর্তা (প্রশিক্ষণ), টিকিউআই-২ প্রকল্প
রিজওয়ানুল হক, প্রকল্প কর্মকর্তা (প্রশিক্ষণ), টিকিউআই-২ প্রকল্প

সহযোগিতায়
প্রফেসর মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, উপ-প্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), টিকিউআই-২ প্রকল্প
ড. সুধাংশু রঞ্জন রায়, সহকারী প্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), টিকিউআই-২ প্রকল্প
আবু সাঈদ মজুমদার, সহকারী প্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), টিকিউআই-২ প্রকল্প
রওশন আরা বেগম, সহকারী প্রকল্প পরিচালক (প্রশিক্ষণ), টিকিউআই-২ প্রকল্প
মাকসুদা বেগম, প্রকল্প কর্মকর্তা (প্রশাসন ও অর্থ), টিকিউআই-২ প্রকল্প
গাজী মোহাম্মদ নাজমুল হোসেন, হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, টিকিউআই-২ প্রকল্প

গ্রন্থস্বত্ব
শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের লিখিত অনুমতি ব্যতীত এ বইয়ের সম্পূর্ণ বা আংশিক মুদ্রণ, পুনঃমুদ্রণ সংশোধিত আকারে প্রকাশ ও বিক্রয় নিষিদ্ধ। এ ক্ষেত্রে কপিরাইট আইন প্রযোজ্য। তবে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণামূলক কার্যক্রমে এ বই ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্রথম মুদ্রন: ডিসেম্বর ২০১৮
পুন:মুদ্রন: মার্চ ২০২০

প্রচ্ছদ
কাজী সাইফদ্দীন আব্বাস

প্রকাশনায়
প্রকাশনা, মুদ্রণ ও বিতরণ বিভাগ
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর– ১৭০৫।

(স্মারক নম্বর: ৩৭.০০.০০০০.০৮২.১৪.০০৫.১৮.১০০ তারিখ: ৩১ জুলাই ২০১৯ ইংরেজি, ১৬ শ্রাবণ ১৪২৬ বাংলা অনুযায়ী অনুমোদনক্রমে TQI-II প্রকল্পের আওতায় প্রণীত জাতীয় বিএড প্রোগ্রামের পাঠ্যপুস্তক বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পুন:মুদ্রন করা হলো।)

ISBN: 978-984-34-0106-9

মুদ্রণে:

সূচিপত্র

ইউনিট ও পাঠ		পৃষ্ঠা
ইউনিট- ১ : মাধ্যমিক শিক্ষাক্রমে বাংলা		**১-২৯**
১.১:	মাধ্যমিক বাংলা শিক্ষাক্রমের অবস্থান, স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য	১
১.২:	মাধ্যমিক বাংলা শিক্ষাক্রমে শিখনফল ও বিষয়বস্তু	৬
১.৩:	মাধ্যমিক বাংলা শিক্ষাক্রমে পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক	১২
১.৪:	মাধ্যমিক বাংলা পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা: গদ্য	১৭
১.৫:	মাধ্যমিক বাংলা পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা: কবিতা	২০
১.৬:	মাধ্যমিক বাংলা পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা: সহপাঠ	২৪
১.৭:	মাধ্যমিক বাংলা পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা : ব্যাকরণ ও নির্মিতি (অনুরচন)	২৬
ইউনিট- ২ : বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিখনের বিবেচ্য দিকসমূহ		**৩০-৫৫**
২.১:	বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য ও অন্তর্নিহিত শৃঙ্খলা	৩০
২.২:	বাংলা উচ্চারণ: উচ্চারণ রীতি	৩৬
২.৩:	বাংলা উচ্চারণ: সংবৃত ও বিবৃতরীতি	৩৯
২.৪:	বাংলা ভাষারীতি ও বানান	৪৩
২.৫:	সাহিত্য শিক্ষণের বিষয় ও আঙ্গিকগত দিক	৫০
ইউনিট- ৩ : বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষণে পদ্ধতি, কৌশল ও শিক্ষকযোগ্যতা		**৫৬-১১৯**
৩.১:	বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি	৫৬
৩.২:	আলোচনা ও প্রদর্শন পদ্ধতি	৬০
৩.৩:	আরোহী, অবরোহী ও গাঠনিক পদ্ধতি	৬৩
৩.৪:	ভূমিকাভিনয় ও মাথা খাটানো পদ্ধতি	৬৭
৩.৫:	মনছবি ও সমস্যা সমাধান পদ্ধতি	৭০
৩.৬:	একক, জোড়ায় ও দলীয় কাজ	৭৪
৩.৭:	পোস্ট বক্স, জিগসো ও অন্যান্য পদ্ধতি	৭৭
৩.৮:	বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষাদানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার	৮২
৩.৯:	বাংলা বিষয়ের শিক্ষকের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা	৮৬
৩.১০:	বাংলা গদ্য (প্রবন্ধ ও নিবন্ধ): বৈশিষ্ট্য ও শিখন-শেখানো পদ্ধতি	৯১
৩.১১:	বাংলা কথাসাহিত্য (গল্প ও উপন্যাস): বৈশিষ্ট্য ও শিখন-শেখানো পদ্ধতি	৯৪
৩.১২:	বাংলা কবিতা: বৈশিষ্ট্য ও শিখন-শেখানো পদ্ধতি	১০২
৩.১৩:	বাংলা নাটক: বৈশিষ্ট্য ও শিখন-শেখানো পদ্ধতি	১০৮
৩.১৪:	বাংলা ব্যাকরণ: বৈশিষ্ট্য ও শিখন-শেখানো পদ্ধতি	১১২

ইউনিট- ৪ : বাংলা শিক্ষা উপকরণ **১২০-১৩২**

৪.১: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষণে বিভিন্ন উপকরণের ব্যবহার ১২০

৪.২: শিক্ষা উপকরণ উন্নয়ন: বিবেচ্য দিকসমূহ ১২৬

৪.৩: শিক্ষা উপকরণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার ১২৯

ইউনিট- ৫ : ভাষা দক্ষতা **১৩৩-১৪৯**

৫.১: শোনা ১৩৩

৫.২: বলা ১৩৬

৫.৩: পড়া ১৪১

৫.৪: লেখা ১৪৫

ইউনিট- ৬ : বাংলা পাঠ-পরিকল্পনা ও পাঠ উপস্থাপনা **১৫০-১৬৯**

৬.১: শিখনফলের ধারণা এবং পাঠ ও পাঠের ধারাবাহিক পরিকল্পনা ১৫০

৬.২: পাঠ-পরিকল্পনার ধারণা ও প্রণয়ন কৌশল ১৫৩

৬.৩: পাঠ-পরিকল্পনায় পাঠ্যপুস্তক এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার ১৬১

৬.৪: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য মূল্যায়ন কৌশল ১৬৫

ইউনিট- ৭ : শ্রেণিকক্ষ পরিচালনা ও শিক্ষকের আত্মোন্নয়ন **১৭০-১৮৪**

৭.১: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষণে অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা ১৭০

৭.২: অধিক শিক্ষার্থী সংবলিত বাংলা শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা ১৭৪

৭.৩: বাংলা শিক্ষকের আত্মোন্নয়ন কৌশল: শ্রেণিকক্ষের অভিজ্ঞতা, বিষয়ী অনুধ্যান ও পাঠাভ্যাস গঠন ১৭৯

গ্রন্থপঞ্জি **১৮৫-১৮৬**

ইউনিট ১ : মাধ্যমিক শিক্ষাক্রমে বাংলা

আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার সকল কর্মকাণ্ডের যাবতীয় পরিকল্পনার সামষ্টিক রূপই হলো শিক্ষাক্রম। শিক্ষাক্রমের আলোকেই আনুষ্ঠানিক শিক্ষার যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালিত হয়। শ্রেণিকক্ষে কী পড়াতে হবে, কীভাবে পড়াতে হবে, কেন পড়াতে হবে, কতক্ষণ ধরে পড়াতে হবে, কী দিয়ে পড়ানো হবে, পড়ানোর পর শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা ও মূল্যবোধগত কী কী পরিবর্তন সাধিত হবে– তার পূর্বপরিকল্পনাই হলো শিক্ষাক্রম। শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও পরিমার্জন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে সমাজে নতুন জ্ঞান, নতুন ধারণা, নতুন চাহিদার উদ্ভব ঘটে। এ চাহিদা যাচাই থেকে শুরু হয় শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও উন্নয়নের কাজ। চাহিদার ভিত্তিতে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ, শিখনক্ষেত্র ও বিষয়বস্তু নির্ধারণ, শিখন-শেখানো কার্যাবলি ও শিক্ষা উপকরণ নির্বাচন, শিক্ষাক্রম বিস্তরণ ও বাস্তবায়ন, অর্জন যাচাই ও মূল্যায়ন প্রভৃতি কাজ ধারাবাহিকভাবে করা হয়। শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও উন্নয়ন সম্পর্কিত এ ধারাবাহিক কাজগুলো জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে সম্পন্ন হয়ে থাকে। শিক্ষার বিভিন্ন স্তর, পর্যায় ও ধারা সম্পর্কিত নীতি নির্ধারণের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষা কীরূপ হবে তার একটি রূপরেখা জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ প্রতিফলিত হয়েছে। আর জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ প্রণীত হয়েছে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর আলোকেই। মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ ও জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান ও ধারণা উপস্থাপনের পাশাপাশি এই ইউনিটের ৭টি পাঠে নিম্নবর্ণিত বিষয়বস্তুর ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।

১.১: মাধ্যমিক বাংলা শিক্ষাক্রমের অবস্থান, স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য
১.২: মাধ্যমিক বাংলা শিক্ষাক্রমে শিখনফল ও বিষয়বস্তু
১.৩: মাধ্যমিক বাংলা শিক্ষাক্রমে পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক
১.৪: মাধ্যমিক বাংলা পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা: গদ্য
১.৫: মাধ্যমিক বাংলা পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা: কবিতা
১.৬: মাধ্যমিক বাংলা পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা: সহপাঠ
১.৭: মাধ্যমিক বাংলা পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা: ব্যাকরণ ও নির্মিতি (অনুরচন)

১.১ : মাধ্যমিক বাংলা শিক্ষাক্রমের অবস্থান, স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য

মাধ্যমিক বাংলা শিক্ষাক্রমের অবস্থান

সময়ের পরিবর্তন ও সমাজের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষাক্রমেরও পরিবর্তন করতে হয়। জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ এই কালিক চাহিদার নিরিখেই প্রবর্তিত হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি ও শিক্ষাক্রমের রূপরেখার ভিত্তিতে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কমিটিসমূহ নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও পারস্পরিক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার বিষয়ভিত্তিক সাধারণ উদ্দেশ্য, বিশেষ উদ্দেশ্য, প্রান্তিক শিখনফল, শ্রেণিভিত্তিক শিখনফল, অধ্যায় ও পিরিয়ড সংখ্যা, অধ্যায়ভিত্তিক বিষয়বস্তু, শিখন-শেখানো নির্দেশনা, মূল্যায়ন নির্দেশনা ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের কাজ এগিয়ে নিয়েছেন। ফলে জাতীয় শিক্ষাক্রমে বিষয় ও আন্তঃবিষয়ের সম্পর্কসূত্রটি সুশৃঙ্খল ও সুসংহত রূপ পেয়েছে।

এই শিক্ষাক্রম সাধারণ, মাদ্রাসা ও ইংরেজিসহ সকল শিক্ষাধারার জন্য অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত একমুখী ও অভিন্ন। তাই সকল ধারার বাংলা শিক্ষাক্রমও এই নীতির আলোকে উদ্দেশ্য, শিখনফল, বিষয়বস্তু, পাঠদান পদ্ধতি ও মূল্যায়ন কৌশলের দিক থেকে খুব কাছাকাছি অবস্থান করছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রমে ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনা বিকাশের মাধ্যমে দেশাত্মবোধ ও জাতীয় ঐক্য বিকাশের ওপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এতে দেশাত্মবোধ বিকাশের মাধ্যমে আন্তর্জাতিকতাবোধ সৃষ্টির প্রয়াসও গৃহীত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের এসব চেতনা বিকাশের দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি অর্পিত হয়েছে বাংলা শিক্ষাক্রমের ওপর। তাই ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ, ও অসাম্প্রদায়িক চেতনাভিত্তিক গল্প, কবিতা, নাটক, উপন্যাস ও প্রবন্ধে সমৃদ্ধ হয়েছে বাংলা পাঠ্যপুস্তক।

এই শিক্ষাক্রমে মাতৃভাষা বাংলা এবং আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজি শিক্ষায় বিষয়বস্তু মুখস্থ করার পরিবর্তে শোনা, বলা, পড়া ও লেখা- এ চারটি দক্ষতা শ্রেণিকক্ষে অনুশীলনের মাধ্যমে শেখার সুযোগ সৃষ্টি ও অর্জিত দক্ষতা মূল্যায়নের সুযোগ রাখা হয়েছে। এ সিদ্ধান্ত প্রকৃতপক্ষে বাংলা শিক্ষাক্রমকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদানেরই পরিচায়ক।

শিক্ষাকে জীবন ও বাস্তবমুখী করা, একীভূত শিক্ষায় গুরুত্বারোপ করা, শিক্ষায় সমতা বিধান করা, হাতে-কলমে শেখা, দলগত আলোচনার মাধ্যমে শেখা, শেখার মাধ্যমে উন্নত মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি গঠন প্রভৃতি যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা এ শিক্ষাক্রমে করা হয়েছে সেগুলো অর্জনের প্রধান দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ভাষা ও সাহিত্যভিত্তিক বাংলা শিক্ষাক্রমকে।

মানুষের চিন্তা, অনুভূতি, আবেগ ও ইচ্ছা প্রকাশের সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম মাতৃভাষা। তা সত্ত্বেও এদেশে মাতৃভাষার অবহেলা ঐতিহাসিক ও বিস্ময়কর। শিক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃভাষা অবহেলিত ছিল দীর্ঘকাল। বর্তমানেও ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক কেউই মাতৃভাষাকে যথাযথ গুরুত্ব দেন না। মাতৃভাষার এই অবহেলা শিক্ষার্থীর স্বাধীন শিক্ষা গ্রহণ, স্বাধীন চিন্তা বিকাশ ও ব্যক্তিত্ব বিকাশে বিরাট প্রতিবন্ধক। এসব সত্য শিক্ষাক্রম প্রণয়ণের কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞগণ বিবেচনায় রেখেছেন। তাই জাতীয় শিক্ষাক্রমে মাতৃভাষা বাংলাকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। কেননা ব্রিটিশ আমল ও পাকিস্তান আমলে আমাদের মাতৃভাষা শিক্ষাব্যবস্থায় যথোপযুক্ত মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হতে পারেনি। সেই ক্ষতি কাটিয়ে ওঠা এবং সময় ও যুগের চাহিদা মেটাবার জন্যই প্রচলিত শিক্ষাক্রমে মাতৃভাষা বাংলাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

নতুন জাতীয় শিক্ষাক্রমে প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করা হয়েছে। এই শ্রেণিসমূহের সকল পাঠ্যপুস্তক বাংলায় রচিত হবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। বাংলা ভাষার সঙ্গে ইংরেজি, আরবি, উর্দু, সংস্কৃত, ফারসি এবং পালি শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তবে বাংলা ও ইংরেজি আবশ্যিক এবং বাকিগুলো ঐচ্ছিক ভাষা হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে।

বিদ্যালয়ে মাতৃভাষার পঠনপাঠন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যমুখী। এ লক্ষ্যে পৌঁছানো এবং মাতৃভাষা শিক্ষাকে সহজ, উন্নত, পদ্ধতিগত ও উৎসাহব্যঞ্জক করার জন্য পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের নিম্নবর্ণিত নীতিসমূহ অনুসরণের কথা এই শিক্ষাক্রমে বলা হয়েছে। যেমন–

ভাষা ও শব্দচয়ন : শিক্ষা সব সময়ই সহজ থেকে কঠিনের দিকে, মূর্ত থেকে বিমূর্তের দিকে সঞ্চারমান। তাই পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে এ ব্যাপারটিকে বিবেচনায় রেখে শিক্ষার্থীর স্তর, যোগ্যতা ও সামর্থ্যের ভিত্তিতে শব্দচয়ন ও ভাষার বিন্যাস করা হয়েছে। প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকগুলোর ভাষা অপেক্ষাকৃত সরল। বাক্যগুলোও খুব দীর্ঘ নয়, আর শব্দগুলোও আহরিত হয়েছে শিক্ষার্থীর পরিচিত জগৎ থেকে। ভাষা ও শব্দচয়নে এ মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি আরোপ শিক্ষাক্রমে মাতৃভাষার সুদৃঢ় অবস্থানকেই মহিমান্বিত করেছে।

বিষয়-সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞের সাথে মাতৃভাষা বিশেষজ্ঞ : পাঠপুস্তকের বানানরীতি, বাক্য গঠন পদ্ধতি, এবং শিক্ষার্থীর শব্দভাণ্ডার সম্পর্কিত জ্ঞান সম্বন্ধে পরামর্শ গ্রহণের জন্য বিষয়সংশিষ্ট বিশেষজ্ঞ দলের সঙ্গে মাতৃভাষা বিশেষজ্ঞকে সংযুক্ত রাখার প্রস্তাব নীতিমালায় রয়েছে। পাঠ্যপুস্তকগুলোকে যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত রাখার জন্য মাতৃভাষা বিশেষজ্ঞের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। কারণ এতে প্রত্যেক বিষয়ে সুলিখিত পাঠ্যপুস্তকের শব্দসম্পদের প্রাচুর্যে মাতৃভাষা আরও শক্তিশালী এবং সার্বজনীন হয়ে ওঠবে।

আবশ্যিক পাঠ্যপুস্তকের সাথে সহপাঠ্যপুস্তক : মাতৃভাষাই শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতার উৎস। এই সৃজনশীলতাকে যথোপযুক্তভাবে বিকশিত করার জন্য শিক্ষাক্রমে আবশ্যিক পাঠ্যপুস্তকের সাথে শ্রেণিভিত্তিক সহপাঠ্যপুস্তক পাঠের প্রস্তাব রয়েছে। বাংলা সাহিত্যের মৌলিক গল্প, রম্যরচনা, নাটক, উপন্যাস প্রভৃতি সম্পর্কিত জ্ঞানকে সুসংহত করার উদ্দেশ্যে সহপাঠ্যপুস্তকে শিক্ষার্থীর স্তর ও যোগ্যতা অনুযায়ী এসব বিষয় সন্নিবেশ করা হয়েছে।

প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে বিশেষ দৃষ্টি : প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকগুলো শিশুদের উপযোগী করে রচিত হয়েছে। ছড়া ও ছবির মাধ্যমে বর্ণশিক্ষা পাঠক্রমে এক নতুন সংযোজন। এটা নিঃসন্দেহে মাতৃভাষা শেখার প্রতি শিশুদের অনুপ্রাণিত করবে। তাছাড়া বর্ণিত বিষয়বস্তুর সাথে সুসম্পর্কিত আকর্ষণীয় রঙিন ছবির ব্যবহার শিক্ষার্থীর অনুধাবন ক্ষমতাকে অবশ্যই সম্প্রসারিত করবে। নিম্নমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। সেখানেও শিক্ষার্থীর চিন্তা, কল্পনা ও সৃজনীশক্তির বিকাশ উপযোগী পাঠ্যসূচি নির্ধারণ করা হয়েছে।

ভাষা ও বানানরীতি : নব প্রবর্তিত শিক্ষাক্রমে ভাষা ও বানানরীতির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে বলা ও লেখার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য উচ্চারণ ও অর্থবোধকে সহজসাধ্য করা হয়েছে। সময় ও শ্রম লাঘব তথা ভাষা ব্যবহারে সার্বিক সৌকর্য আনয়নের লক্ষ্যে নব-প্রবর্তিত শিক্ষাক্রমে চলিত ভাষাকে সার্বিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট ও কর্মসূচি অনুযায়ী সকল বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক (অন্য ভাষা ব্যতীত) চলিত রীতিতে লিখিত হবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এতে সব স্তরের, সব বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক একই এবং অপেক্ষাকৃত সরল ভাষা ও বানানে লেখার কথা বলা হয়েছে।

বাংলা ভাষার শোষণ ক্ষমতা খুব বেশি। পূর্ববর্তী প্রভাবের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, সংস্কৃত, আরবি, ফারসি, ইংরেজি, উর্দু, চীনা, জাপানি, পর্তুগীজ প্রভৃতি ভাষার শব্দ অবলীলায় প্রবেশাধিকার পেয়ে, অবিকৃত অবস্থায় বাংলা ভাষার সঙ্গে মিশে গিয়ে এ ভাষার শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছে। এতে বাংলা ভাষার মহিমাই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই ইচ্ছা, আগ্রহ ও ঐকান্তিকতা থাকলে শুধু উচ্চ মাধ্যমিক স্তর কেন, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও এ ভাষাকে বাধ্যতামূলক করা যে অবাস্তব ও কঠিন ব্যাপার নয়– তা বলার অপেক্ষা রাখে না। জাতীয় শিক্ষাক্রম কমিটি এ বিষয়ে নীতি নির্ধারণের সুস্পষ্ট পদক্ষেপ নিয়ে বাংলা ভাষা ও বাংলা শিক্ষাক্রমের মর্যাদাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

বাংলা শিক্ষাক্রমের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর বাস্তবায়ন পর্যায়ে সরকার প্রথম থেকে পঞ্চম, ষষ্ঠ থেকে অষ্টম, নবম ও দশম এবং একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষাক্রম পরিমার্জন, নবায়ন এবং উন্নয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করে। এর আওতায় জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ (এনসিটিবি)-এর প্রাথমিক শিক্ষাক্রম উইং প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত প্রচলিত যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও নবায়ন করে। একই সঙ্গে শিক্ষাক্রম উইং শিক্ষানীতির নির্দেশনা, সমকালীন জীবনের চাহিদা এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার পূরণের লক্ষ্যে ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণির প্রচলিত শিক্ষাক্রমের আমূল সংস্কারের মাধ্যমে প্রতিটি শ্রেণির বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করে।

বাংলা বিষয়ের শিক্ষাক্রমে মূলত দুটি দিক অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এক, ভাষা দক্ষতা অর্জন ও তার ধারাবাহিক উন্নতি সাধন; দুই, ভাষায় রচিত সাহিত্যের রূপশ্রেণির সাথে পরিচিত হওয়া এবং তার অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তুর উপলব্ধি ও রস আস্বাদন করা। এই দুটি দিকের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে বিভিন্ন কালে রচিত সাহিত্যের ভাণ্ডার থেকে বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের প্রতিনিধিত্বমূলক রচনা মাধ্যমিক বাংলা পাঠ্যপুস্তকে সংকলন করা হয়েছে। অন্যদিকে বাংলা ভাষার অন্তর্নিহিত শৃঙ্খলা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদানের জন্য সুলিখিত ব্যাকরণ গ্রন্থ পাঠ্য করা হয়েছে। উভয় ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতার বিকাশ সাধনের ব্যাপারটিকে অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

শিক্ষার স্তরগত ভিন্নতা বিবেচনা করে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণির বাংলা বিষয়সহ বিভিন্ন বিষয়ের উন্নয়নকৃত শিক্ষাক্রমের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ :

১. শিক্ষার সাধারণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ: জাতীয় ও বৈশ্বিক পরিস্থিতি এবং সমকালীন চাহিদা বিবেচনা করে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণির শিক্ষার সাধারণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে।

২. যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম: শিক্ষার সাধারণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলোকে শিক্ষার্থীদের অর্জন উপযোগী যোগ্যতায় রূপ দিয়ে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির বাংলা শিক্ষাক্রমের প্রান্তিক যোগ্যতার তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে।

৩. শিখন ক্ষেত্রসমূহের ভারসাম্যপূর্ণ সমন্বয় সাধন : বাংলা শিক্ষাক্রমে বুদ্ধিবৃত্তীয়, আবেগীয় ও মনোপেশিজ দক্ষতার একটি ভারসাম্যপূর্ণ সমন্বয় সাধন করা হয়েছে।

৪. শিক্ষাক্রম উপস্থাপনায় বিশেষ ছাঁচ (MATRIX) ব্যবহার : প্রতিটি বিষয়ের মতো বাংলা শিক্ষাক্রমের উপাদানসমূহ একটি বিশেষ ছাঁচ (MATRIX)-এ সজ্জিত করে উপস্থাপন করা হয়েছে।

৫. সকল ধারার জন্য একই কোর বিষয় : সাধারণ, মাদ্রাসা ও ইংরেজি মাধ্যমে বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় আবশ্যিক বিষয় হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

৬. ধারাভিত্তিক আবশ্যিক বিষয়ের প্রচলন : সাধারণ শিক্ষা ধারায় ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণিতে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা, কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা, শারীরিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও খেলাধুলা এবং চারু ও কারুকলাকে আবশ্যিক বিষয় করা হয়েছে।

৭. ঐচ্ছিক বিষয়ের প্রচলন : শিক্ষার সাধারণ ধারায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি, কৃষিশিক্ষা, গার্হস্থ্যবিজ্ঞান, আরবি, সংস্কৃত, পালি এর যে কোনো বিষয় ঐচ্ছিক হিসেবে নেওয়ার সুযোগ রাখা হয়েছে।

৮. শিক্ষাক্রম উল্লম্বভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ: প্রতিটি বিষয়ের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির প্রান্তিক শিখনফল এবং প্রান্তিক শিখনফলের ভিত্তিতে শ্রেণিভিত্তিক শিখনফল বিন্যস্ত করায় বাংলা শিক্ষাক্রম উল্লম্বভাবে (Vertically) সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে।

৯. আনুভূমিকভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ : শিক্ষার শ্রেণিভিত্তিক সাধারণ উদ্দেশ্যাবলি অর্জনের বিষয়টি সুষ্ঠুভাবে বিচার বিবেচনা করে শিক্ষাক্রমের বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক শিখনফল বিন্যস্ত করা হয়। এক্ষেত্রে একই শ্রেণির সব কয়টি বিষয়ের শিক্ষাক্রম প্রস্তাবনা বিভিন্ন শিক্ষাক্রম কমিটির যৌথ কর্মশালায় উপস্থাপন করে, উপস্থিত সদস্যদের পর্যবেক্ষণ নিয়ে পরিশোধন করে, আনুভূমিকভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা হয়। অন্যান্য বিষয়ের মতো বাংলা শিক্ষাক্রমও এভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে।

১০. শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর পারস্পরিক অংশগ্রহণমূলক শিখন-শেখানো পদ্ধতি : বাংলা বিষয়ের কোনো নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু পাঠদানের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত শিখনফল অর্জনে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে।

১১. জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগ : প্রতি বিষয়ের নিয়ম, বিধি, সূত্র ও ধারণা বাস্তব পরিস্থিতি/ঘটনা/দৃষ্টান্ত দিয়ে শ্রেণিতে আলোচনা এবং অনুশীলনের সুপারিশ করা হয়েছে।

১২. সামষ্টিক মূল্যায়নের পাশাপাশি ধারাবাহিক মূল্যায়নের প্রতি গুরুত্বারোপ : বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যায়নের সামগ্রিক দিক, যেমন: শ্রেণির কাজ, বাড়ির কাজ, শ্রেণি অভীক্ষা, অনুসন্ধানমূলক কাজ ইত্যাদি বিবেচনায় রেখে মূল্যায়ন নির্দেশনা সন্নিবেশ করা হয়েছে।

১৩. সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি : শিক্ষার্থীর অর্জন উপযোগী দক্ষতা ও যোগ্যতা পরিমাপে সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতির উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

১৪. সহজলভ্য এবং স্বল্পব্যয়ী শিক্ষোপকরণ ব্যবহার : স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য এবং স্বল্পব্যয়ে ক্রয় করা যায়– এমন উপকরণ নির্বাচন ও তৈরি এবং ব্যবহারের সুপারিশ করা হয়েছে।

১৫ কার্যক্রমভিত্তিক (Activity Based) পাঠ্যপুস্তক রচনা : শিক্ষার্থীদের বয়স ও শ্রেণি উপযোগী প্রতিটি পাঠে শিক্ষার্থীদের কাজের সুযোগ সৃষ্টি করে বাংলা পাঠ্যপুস্তক রচনার নির্দেশনা শিক্ষাক্রমে সন্নিবেশিত হয়েছে।

১৬. 'জীবনব্যাপী শিক্ষা' নীতির প্রতিফলন : বাংলা শিক্ষাক্রমে শিক্ষার্থীর জানার পরিধি বৃদ্ধির পাশাপাশি নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি কাজে লাগানো এবং নিজেকে সমাজে মানিয়ে চলার উপযোগী বিষয়াদির সমন্বয় ঘটানো হয়েছে।

১৭. মহান ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও অসাম্প্রদায়িক মূল্যবোধের বিকাশ : শিক্ষার্থীদের মনে মহান ভাষা আন্দোলন ও গৌরবোজ্জ্বল মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং ধর্ম, বর্ণ ও শ্রেণি নির্বিশেষে সকল নাগরিকের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করার পাশাপাশি আচার-আচরণে এর প্রতিফলন এবং সংরক্ষণের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে বাংলা শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়েছে।

তবে, নবম ও দশম শ্রেণির বাংলা শিক্ষাক্রমের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- এই শিক্ষাক্রম শিখনফলভিত্তিক। অর্থাৎ মাধ্যমিক শিক্ষার সাধারণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহের ভিত্তিতে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এরপর বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্যসমূহ সরাসরি অর্জন উপযোগী শিখনফলে বিন্যস্ত করা হয়েছে। এখানে প্রান্তিক শিখনফল/প্রান্তিক যোগ্যতার দিকটি আলাদাভাবে বিন্যস্ত করে দেখানো হয়নি। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির একটি একক ধারার শিক্ষাক্রমকে নবম ও দশম শ্রেণিতে এসে বহুমুখী, যেমন– বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা ধারায় বিভাজন করে শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়েছে।

বাংলা শিক্ষাক্রমে মূল্যায়ন

ধারাবাহিক মূল্যায়ন

বাংলা শিক্ষাক্রমে উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ধারাবাহিক মূল্যায়ন নির্দেশনা প্রণয়ন করা হয়েছে। শিক্ষাক্রমে বর্ণিত শিক্ষার তিনটি ক্ষেত্রের শিখনফল অর্জনের লক্ষ্যে ধারাবাহিক মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালিত হবে। এগুলো হচ্ছে বুদ্ধিবৃত্তীয়, মনোপেশিজ এবং আবেগীয় ক্ষেত্রের শিখনফল। কেবল বাংলা নয়, ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণির সকল বিষয়ের জন্য ধারাবাহিক মূল্যায়ন কার্যক্রম চলবে। শিখনফলের মতো ধারাবাহিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রগুলোও তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন-

১. বুদ্ধিবৃত্তীয়
২. মনোপেশিজ
৩. আবেগীয়

বুদ্ধিবৃত্তীয় ও মনোপেশিজ ক্ষেত্রের শিখনফলের ধারাবাহিক মূল্যায়ন

ধারাবাহিক মূল্যায়নের বুদ্ধিবৃত্তীয় ও মনোপেশিজ ক্ষেত্রের জন্য প্রতিটি পঠিত বিষয়ের মোট নম্বরের ২০% নম্বর নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রতিটি বিষয়ের আওতাভুক্ত বিভিন্ন কার্যক্রমের জন্য এ নম্বরের মূল্যায়ন করা হবে। বাংলা বিষয়ের ক্ষেত্রেও নিম্নবর্ণিত কোর্সওয়ার্ক কার্যক্রমের সাহায্যে শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন করতে হবে।

- শ্রেণির কাজ
- শ্রেণি অভীক্ষা
- বাড়ির কাজ ও অনুসন্ধানমূলক কাজ

শ্রেণিকক্ষে সম্পাদিত সকল কাজই শ্রেণির কাজ। এ কাজের জন্য বরাদ্দকৃত নম্বর ১০। বাড়ির কাজ ও অনুসন্ধানমূলক কাজের জন্য নম্বর বরাদ্দ হচ্ছে ৫। আর শ্রেণি অভীক্ষার জন্য বরাদ্দকৃত নম্বর ৫।

শ্রেণির কাজ

শিখন-শেখানো কার্যক্রম চলাকালীন শিক্ষার্থীর সম্পাদিত সকল কাজ শ্রেণির কাজ হিসেবে বিবেচিত হয়। শ্রেণির কাজের উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর চিন্তন দক্ষতা ও সৃজনশীলতার বিকাশ সাধন এবং ব্যক্তিক আচরণ ও মূল্যবোধের উন্নয়ন ঘটানো। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থী একক বা দলগতভাবে শিক্ষকের নির্দেশনার আলোকে নানা ধরনের কাজ সম্পাদন করে। এ কাজসমূহ হতে পারে কোনো প্রশ্নের উত্তর বলা বা লেখা, কোনো কিছু আঁকা (চিত্র/ছবি, সারণি, মানচিত্র, লেখচিত্র), আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্তে আসা, বিতর্কে

অংশগ্রহণ, চরিত্রাভিনয়, কোনো কিছুর প্রদর্শন, কোনো কিছু তৈরি/প্রস্তুত করা, ব্যবহারিক কাজ করা প্রভৃতি। তবে বাংলা ও ইংরেজি বিষয়ে শোনা, বলা, পড়া শ্রেণির কাজ হিসেবে বিবেচিত (শিক্ষাক্রমের শিখন-শেখানো কার্যক্রম কলামে প্রদত্ত শ্রেণির কাজ নমুনা হিসেবে অনুসরণ করা যেতে পারে)। শোনা, বলা, পড়া, দক্ষতার ১টি করে মোট ৩টি শ্রেণির কাজের মূল্যায়নের রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। বাংলা ও ইংরেজি বিষয়ের জন্য শোনা, বলা, পড়া ও লেখা দক্ষতা মূল্যায়নের মানদণ্ডসমূহ নিম্নরূপ–

দক্ষতা	মূল্যায়নের মানদণ্ড
শোনা :	বোঝার ক্ষমতা
	কার্যকর যোগাযোগ
বলা :	ধ্বনি ও বর্ণের শুদ্ধ উচ্চারণ
	শব্দ ও বাক্যের শুদ্ধ/প্রমিত উচ্চারণ
	কার্যকর যোগাযোগ
পড়া :	শুদ্ধ ও প্রমিত উচ্চারণ
	রচনা (Text) বোঝার ক্ষমতা
	শ্বাসাঘাত, স্বরাঘাতসহ উচ্চারণ
লেখা :	শুদ্ধ ও প্রমিত বানানে লেখা
	নিজস্ব স্টাইলের প্রতিফলন
	বাক্য গঠনের বৈচিত্র্য

শ্রেণি অভীক্ষা

শ্রেণি অভীক্ষা শ্রেণিতে অনুষ্ঠিত স্বল্প সময়ের একটি পরীক্ষা। এটি শিক্ষার্থীর একক কাজ। বিষয়ের চাহিদা অনুযায়ী শ্রেণি অভীক্ষা লিখিত ও ব্যবহারিক হবে। তবে, বাংলা ও ইংরেজি বিষয়ে শোনা ও বলা দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য শ্রেণি অভীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। লিখিত অভীক্ষা সর্বোচ্চ ১ পিরিয়ডের মধ্যে শেষ হবে। বাংলা ও ইংরেজি বিষয়ের শোনা ও বলা দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য শ্রেণি অভীক্ষার সময় শিক্ষক নির্ধারণ করবেন। কোনো অধ্যায় বা অধ্যায়ের অংশ শেষে শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি যাচাই করার জন্য শ্রেণি অভীক্ষা নেওয়া হবে। শ্রেণি অভীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর চিন্তন দক্ষতা এবং সমস্যা সমাধান দক্ষতা পরিমাপ করা হবে। লিখিত অভীক্ষার প্রশ্ন এমন হওয়া প্রয়োজন যেন শিক্ষার্থী মেধা খাটিয়ে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে এবং শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতার বিকাশ ও প্রকাশের সুযোগ থাকে। সৃজনশীল প্রশ্নের সাহায্যে লিখিত অভীক্ষা নেওয়া যেতে পারে।

বাড়ির কাজ

শিক্ষার্থী বাড়িতে শিক্ষাক্রমভিত্তিক যে কাজগুলো সম্পন্ন করে তাই বাড়ির কাজ। বাড়ির কাজ শিক্ষার্থী একক‌ভাবে সম্পন্ন করবে এটা প্রত্যাশিত। শিক্ষক নিশ্চিত হবেন যে, শিক্ষার্থী একাই কাজটি সম্পন্ন করেছে। বাড়ির কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর চিন্তন দক্ষতা এবং ব্যক্তিক আচরণ ও মূল্যবোধ মূল্যায়ন করা হবে। বাড়ির কাজ মূল্যায়ন করে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় শিখন সহায়তা দিবেন।

আবেগীয় ক্ষেত্রের শিখনফলের ধারাবাহিক মূল্যায়ন

এক্ষেত্রে শিক্ষক সারা বছর বিদ্যালয়ে সংগঠিত বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর আচরণ ও সামাজিক মূল্যবোধ পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন করবেন। এর জন্য কোনো নম্বর বরাদ্দ নেই। প্রতি সাময়িক শেষে শিক্ষক সুনির্দিষ্ট মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন করবেন এবং মতামত দিবেন। শিক্ষার্থীর আচরণে নিয়মানুবর্তিতা, দেশপ্রেম, নেতৃত্ব, সততা, শৃঙ্খলা, সহযোগিতা, সক্রিয় অংশগ্রহণ, সহিষ্ণুতা, সচেতনতা ও সময়ানুবর্তিতার মানই আবেগীয় ক্ষেত্রের ধারাবাহিক মূল্যায়নে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এ ছাড়াও নব-প্রবর্তিত বাংলা শিক্ষাক্রমে সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন ও উত্তরপত্র মূল্যায়ন, সহপাঠক্রমিক কার্যক্রম, সামষ্টিক মূল্যায়ন, শিখনফল অর্জন উপযোগী অংশগ্রহণমূলক পাঠদান পদ্ধতি ও কৌশল, শিক্ষা উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, বিষয়ভিত্তিক পাঠ-পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণার দিকনির্দেশনা রয়েছে। তাই জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ এর বাংলা শিক্ষাক্রমে বর্ণিত গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনাসমূহ মাধ্যমিক বাংলা শিক্ষকের পেশাগত দক্ষতা অর্জনে পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়।

১.২ : মাধ্যমিক বাংলা শিক্ষাক্রমে শিখনফল ও বিষয়বস্তু

শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও উন্নয়নের ধারাবাহিক কাজগুলো পরস্পরের সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা করে সম্পন্ন হয়। যেমন রাষ্ট্রের মূলনীতির আলোকে শিক্ষানীতি, শিক্ষানীতির আলোকে শিক্ষাক্রম, শিক্ষার্থীর সামাজিক, দার্শনিক ও মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তির আলোকে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের আলোকে শিখনফল, শিখনফলের আলোকে ভাববস্তু, ভাববস্তুর আলোকে বিষয়বস্তু এবং বিষয়বস্তুর আলোকে পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। এই যোগসূত্রের কারণেই শিক্ষাক্রমের শিখনফল ও বিষয়বস্তুর মধ্যে গভীরতর সাজুয্য লক্ষ করা যায়। একটি পাঠ বা অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থীরা যা শিখবে এবং শেখার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের জ্ঞান, দক্ষতা ও মূল্যবোধগত যেসব আচরণিক পরিবর্তন সাধিত হবে তার সমষ্টি হচ্ছে শিখনফল। শিখনফল অনুমিত একটি বিষয়, তবে তা একেবারে কল্পনাপ্রসূত নয়। তার একটি কার্যকর ভিত্তি হচ্ছে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত বিষয়বস্তু। যেমন, 'শিক্ষার্থীরা পরিবেশ সংরক্ষণের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে'- এই শিখনফলের আলোকে বাংলা পাঠ্যবইয়ের নির্বাচিত বিষয়বস্তু হবে 'পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ক কবিতা বা প্রবন্ধ'। শিক্ষাক্রমে উল্লিখিত শিখনফলের আলোকে যে ভাববস্তু অথবা অধ্যায়ের শিরোনাম লেখা থাকে তাকেই বিষয়বস্তু হিসেবে ধরে নেওয়া হয়। প্রকৃতপক্ষে বিষয়বস্তুর পরিসর অনেক ব্যাপক। বিষয়বস্তুকে বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত করে পাঠ্যপুস্তকের সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ে ধারাবাহিকভাবে বিন্যস্ত করা হয়। আলোচ্য পাঠে মাধ্যমিক বাংলা শিক্ষাক্রমে বর্ণিত ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি এবং নবম-দশম শ্রেণির বাংলা বিষয়ের শিখনফল ও তার সমান্তরালে বিষয়বস্তুর তালিকা সন্নিবেশ করা হয়েছে। পরিসরের ব্যাপকতার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত কেবল প্রান্তিক শিখনফল এবং নবম-দশম শ্রেণির বিষয়গত শিখনফল এ পাঠে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে শিক্ষার্থী বাংলা ভাষায় যতটুকু দক্ষতা অর্জন করেছে– তাকে অগ্রসর করে নেওয়ার ক্ষেত্রে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির শিক্ষাস্তরটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ স্তরের শিক্ষাক্রমে সাহিত্যের মাধ্যমে জীবন ও জগতের বিচিত্র বিষয়ে শিক্ষার্থীকে আগ্রহী ও কৌতূহলী করে তোলা, দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন পরিবেশ-পরিস্থিতিতে স্বচ্ছন্দে ভাববিনিময় ও যোগাযোগের পারদর্শিতা অর্জন, ভাবপ্রকাশের উপযোগী শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধি, সাহিত্যের নানা রূপশ্রেণির সঙ্গে পরিচয় লাভের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মধ্যে কল্পনাশক্তি ও সৃজনশীলতার বিকাশ, বৈচিত্র্যময় পাঠের মাধ্যমে মানবিক মূল্যবোধ অর্জনকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বাংলা ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে পূর্বতন শিক্ষাক্রমে 'শোনা', 'পড়া', 'বলা' সম্পর্কিত ক্রিয়াকলাপকে যথাযথ গুরুত্ব না দিয়ে মূলত 'লেখা' দক্ষতার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। বর্তমান শিক্ষাক্রমে চারটি দক্ষতা অর্জনের জন্য অংশগ্রহণমূলক অনুশীলনসহ বিভিন্ন সুযোগ রাখা হয়েছে। পাশাপাশি স্কুলভিত্তিক মূল্যায়নের প্রতিও বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ভাষা শিক্ষার প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমে শিক্ষার্থী যেন অধিকতর পাঠে আগ্রহী হয় এবং পরবর্তীতে ভাষাভিত্তিক বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের উপযোগী হয়ে ওঠে সে-দিকটাও এ শিক্ষাক্রমে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। পাঠ্যসূচি যেন বোঝা না হয়ে দাঁড়ায় তা বিবেচনায় নিয়ে বাংলা শিক্ষাক্রমকে যথাসম্ভব আকর্ষণীয়, সক্রিয়তাভিত্তিক, অংশগ্রহণমূলক, প্রায়োগিক ও পরিমিত করার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তির এ যুগে শিখন শেখানোর নতুন নতুন পদ্ধতি ও কৌশল এ ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে।

নিম্ন-মাধ্যমিক (৬ষ্ঠ-৮ম) স্তরে বাংলা পঠন-পাঠনের উদ্দেশ্য

১. বাংলা ভাষার গুরুত্ব, তাৎপর্য ও মহিমা সম্পর্কে অবহিত হওয়া।
২. ভাষা শিক্ষার চারটি দক্ষতা (শোনা, বলা, পড়া, লেখা) অর্জন।
৩. বিভিন্ন বিষয়ে শোনার যোগ্যতা অর্জন।
৪. ভাষার মৌখিক প্রকাশভঙ্গি এবং বিভিন্ন প্রকার পাঠে ও প্রমিত উচ্চারণে দক্ষতা অর্জন।
৫. ভাষার লৈখিক প্রকাশভঙ্গির মানোন্নয়ন, লেখার বিন্যাস ও রীতি এবং প্রমিত বানানে দক্ষতা অর্জন।
৬. ভাষার বিভিন্ন উপাদান শনাক্ত করার যোগ্যতা অর্জন।
৭. ভাষার নিয়ম-শৃঙ্খলা শিখন ও এর অন্তর্নিহিত শক্তি ও সৌন্দর্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া।
৮. শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধিতে উৎসাহিত হওয়া এবং সুষ্ঠু বাক্য গঠন ও বিন্যাসের যোগ্যতা অর্জন।
৯. বাংলা ভাষার সাধু ও চলিত রীতি এবং বিভিন্ন ধরনের রচনাশৈলীর সঙ্গে পরিচিত হওয়া।
১০. যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে অধিকতর প্রায়োগিক ও কর্মমুখী ভাষা-দক্ষতা অর্জন।
১১. পাঠাভ্যাসে আগ্রহী হওয়া, পঠিত বিষয়ের মর্ম অনুধাবন এবং চিন্তনদক্ষতা ও রসগ্রহণের যোগ্যতা অর্জন।
১২. বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন রূপশ্রেণির সাথে পরিচয় লাভ এবং রস আস্বাদনে সমর্থ হওয়া।
১৩. বিভিন্ন পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীর জ্ঞানাত্মক ও আবেগিক অনুভূতি প্রকাশের যোগ্যতা অর্জন।

১৪. অনুসন্ধিৎসা, কল্পনাশক্তি ও সৃজনশীলতার বিকাশে অনুপ্রাণিত হওয়া।

১৫. নৈতিক, সামাজিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জন এবং জীবপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হওয়া।

১৬. দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ, ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং অসাম্প্রদায়িক মনোভাব, পরমতসহিষ্ণুতা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত হওয়া।

১৭. বাংলার সংস্কৃতি, লোকসংস্কৃতি ও শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে সাধারণ ধারণা এবং দেশ ও জাতির ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব অর্জন।

১৮. আর্থ-সামাজিক শ্রেণি-পেশা ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের প্রতি সংবেদনশীল ও সমমর্যাদার মনোভাব অর্জন।

১৯. শিশু ও নারীর প্রতি সংবেদনশীল হওয়া এবং নারীর কর্ম ও অবদানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া।

২০. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, বিশেষ শ্রেণি ও ক্ষুদ্র পেশাগোষ্ঠী সম্পর্কে আগ্রহী ও শ্রদ্ধাশীল হওয়া।

২১. বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষের প্রতি মমত্ব ও সহমর্মিতাবোধের জাগরণ।

২২. পরিবেশ-সচেতনতা অর্জন এবং বিজ্ঞানমনস্ক ও যুক্তিশীল হওয়া।

২৩. বিভিন্ন দেশ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে আগ্রহী ও শ্রদ্ধাশীল হওয়া।

বাংলা শিক্ষাক্রমে প্রান্তিক শিখনফল ও তার আলোকে নির্বাচিত বিষয়বস্তু (৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণি)

ক্রম	শিখনফল	বিষয়বস্তু
১	বাংলা ভাষার গুরুত্ব, তাৎপর্য ও মহিমা ব্যক্ত করতে পারবে।	বাংলা ভাষার তাৎপর্য ও মহিমা বিষয়ক কবিতা
২	শ্রুতিগ্রাহ্য বিভিন্ন বিষয় বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করতে পারবে।	অনুশীলন
৩	শিক্ষার্থী বিভিন্ন পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে শুনে ও পড়ে প্রমিত উচ্চারণে কথা বলতে পারবে।	পঠন অনুশীলন
৪	উচ্চারণবৈশিষ্ট্য অনুসারে বিভিন্ন প্রকার পাঠ অনুশীলন করতে পারবে।	পঠন ও আবৃত্তি
৫	শুদ্ধ, সুন্দর ও প্রমিত বানানে সাবলীলভাবে লিখতে পারবে।	বাংলা বানানরীতি ও বাক্যরীতি
৬	ভাষার বিভিন্ন উপাদান শনাক্ত করতে ও সেগুলোর পরিচয় দিতে পারবে।	ভাষার উপাদান
৭	ভাষার নিয়মশৃঙ্খলা উপস্থাপন করতে পারবে।	ভাষার বৈশিষ্ট্য
৮	নতুন নতুন শব্দ শুনে ও পড়ে প্রয়োগ করতে পারবে।	সাহিত্যপাঠ ও অনুশীলন
৯	শুদ্ধ বাক্য গঠন করতে ও যথাযথ বিন্যাসে প্রয়োগ করতে পারবে।	বাক্য প্রকরণ
১০	বাংলা ভাষার সাধু ও চলিত রীতির বৈশিষ্ট্য নিরূপণ এবং প্রমিত চলিত রীতি প্রয়োগ করতে পারবে।	সাধু ও চলিত ভাষারীতি
১১	বিভিন্ন ধরনের রচনাশৈলী ও বাচনশৈলীর বৈশিষ্ট্য উপস্থাপন করতে পারবে।	সাহিত্যপাঠ ও বাচনিক তৎপরতা
১২	যোগাযোগ-মাধ্যম হিসেবে বিভিন্ন পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে ভাষা ব্যবহার করতে পারবে।	যোগাযোগের বিভিন্ন মাধ্যমে ভাষা ব্যবহার
১৩	পাঠ্যপুস্তক-বহির্ভূত পাঠের বিষয় উপস্থাপন ও ধারণা ব্যক্ত করতে পারবে।	পাঠ ও অনুশীলন
১৪	পঠিত বিষয়ের মর্ম অনুধাবন করে স্বকীয় চিন্তার প্রকাশ ঘটাতে পারবে।	গদ্য ও কবিতা পাঠ
১৫	বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন রূপশ্রেণির পরিচয় তুলে ধরতে এবং রস উপলব্ধি করে সৌন্দর্য ব্যাখ্যা করতে পারবে।	সাহিত্যপাঠ ও অনুশীলন
১৬	বিভিন্ন পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থী জ্ঞানাত্মক ও আবেগিক অনুভূতি প্রকাশ করতে পারবে।	বাচনিক তৎপরতার অনুশীলন
১৭	অনুসন্ধিৎসা, কল্পনাশক্তি ও সৃজনশীলতার প্রকাশ ঘটাতে পারবে।	মৌলিক রচনার অনুশীলন
১৮	নৈতিক, সামাজিক ও মানবিক গুণাবলির পরিচয় দিতে পারবে।	গল্প ও কবিতা পাঠ
১৯	জীবজগতের প্রতি মমত্বের পরিচয় দিতে পারবে।	জীবজন্তু নিয়ে লেখা গল্প ও কবিতা

ক্রম	শিখনফল	বিষয়বস্তু
২০	দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ, ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং অসাম্প্রদায়িক মনোভাব, পরমতসহিষ্ণুতা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিচয় তুলে ধরতে পারবে।	বিষয়সংশ্লিষ্ট গল্প ও কবিতা
২১	বাংলার সংস্কৃতি, লোকসংস্কৃতি ও শিল্প-সাহিত্যের সাধারণ পরিচয় দিতে পারবে।	বিষয়সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধ
২২	দেশ ও জাতির ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করতে পারবে।	ইতিহাস ও ঐতিহ্যবিষয়ক গদ্য ও কবিতা
২৩	আর্থ-সামাজিক শ্রেণি-পেশা ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের প্রতি সংবেদনশীলতা ও সমমর্যাদার মনোভাব প্রকাশ করতে পারবে।	বিষয়সংশ্লিষ্ট গদ্য ও কবিতা
২৪	শিশুর প্রতি সংবেদনশীল মনোভাব প্রকাশ করতে পারবে।	শিশুতোষ গল্প
২৫	নারী ও নারীর কর্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করতে পারবে।	নারীর প্রতি সংবেদনশীলতা সৃষ্টিকারী কবিতা
২৬	ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, বিশেষ শ্রেণি, ক্ষুদ্র পেশাগোষ্ঠী সম্পর্কে শ্রদ্ধার পরিচয় দিতে পারবে।	ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীকে নিয়ে লেখা গদ্য ও কবিতা
২৭	বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষের প্রতি মমত্ব ও সহমর্মিতার পরিচয় দিতে পারবে।	বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষ বিষয়ক গদ্য ও কবিতা
২৮	পরিবেশ চেতনার পরিচয় দিতে পারবে।	পরিবেশ চেতনা বিষয়ক গদ্য ও কবিতা
২৯	বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতির পরিচয় দিতে পারবে।	অপরসংস্কৃতি বিষয়ক গদ্য
৩০	জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিজ্ঞানমনস্কতার পরিচয় দিতে পারবে।	বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ

মাধ্যমিক স্তর (নবম-দশম শ্রেণি) :

মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা বাংলা। বাংলা ভাষার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে মহান ভাষা আন্দোলনের অবিনাশী চেতনা। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে, ভাব-বিনিময়ে, কর্মসম্পাদনে ও যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে বাংলা ভাষার ভূমিকা অপরিহার্য। শিক্ষার্থীর মানস-বিকাশ, ব্যক্তিত্ব অর্জন এবং সামাজিক-বৈশ্বিক চেতনাসম্পন্ন পরিশীলিত সংস্কৃতিমনা নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার পেছনেও প্রমিত বাংলা ভাষায় দক্ষতা অর্জনের গুরুত্ব অপরিসীম। এ ভাষায় দক্ষতা অর্জনের ওপর অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা ও নৈপুণ্য অর্জন বহুলাংশে নির্ভরশীল। তাই জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাংলা ভাষার ব্যবহার ও শুদ্ধ প্রয়োগ দৃঢ় করার জন্যও শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে বাংলা ভাষা শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া সুপরিকল্পিত ও যথাযথ হওয়া প্রয়োজন।

মাধ্যমিক শিক্ষা (নবম-দশম শ্রেণি) জাতীয় শিক্ষা-কাঠামোর দ্বিতীয় স্তর। এস্তরে সাহিত্যের মাধ্যমে জীবন ও জগতের নানা বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে আগ্রহী ও কৌতূহলী করে তোলা, দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন পরিবেশ-পরিস্থিতিতে স্বচ্ছন্দে ভাববিনিময় ও যোগাযোগের পারদর্শিতা অর্জন, ভাব প্রকাশের উপযোগী শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধি, সাহিত্যের নানা রূপশ্রেণির সঙ্গে পরিচয় লাভের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর কল্পনাশক্তি ও সৃজনশীলতার বিকাশ ও বৈচিত্র্যময় পাঠের মাধ্যমে মানবিক মূল্যবোধ অর্জনকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীর অর্জিত ভাষিক দক্ষতা ও সাহিত্যবোধকে অগ্রসর করে নেওয়া এবং তাদের ভাষাজ্ঞানকে অধিকতর প্রয়োগমুখী করা নবম ও দশম শ্রেণির বাংলা শিক্ষাক্রমের মূল উদ্দেশ্য। ভাষা ও সাহিত্যভিত্তিক বিভিন্ন পাঠ এবং কর্ম-অনুশীলন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অর্জিত ভাষিক দক্ষতাসমূহ বিস্তৃত ও সংহত করা নবম-দশম শ্রেণির শিক্ষাক্রমের বিশেষ লক্ষ্য। একুশ শতকের প্রেক্ষাপটে জাতীয় ও বৈশ্বিক চেতনা এবং মানবিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত আধুনিক মানুষ গড়ার লক্ষ্য সামনে রেখে বিষয়বস্তু নির্বাচনে ভাষা আন্দোলন, মহান মুক্তিযুদ্ধ, বাঙালি জাতীয়তাবাদ, অসাম্প্রদায়িক জীবনচেতনা, নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষের প্রসঙ্গ এ শিক্ষাক্রমে গুরুত্ব পেয়েছে। একই সঙ্গে ভাষায় দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে দেশপ্রেমিক নাগরিক এবং দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি- বর্তমান শিক্ষানীতির এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে নবম-দশম শ্রেণির বাংলা শিক্ষাক্রম প্রণীত হয়েছে। নতুন বাংলা শিক্ষাক্রম যাতে শিক্ষার্থীর জন্য বোঝা হয়ে না দাঁড়ায় সেজন্য আকর্ষণীয়, সক্রিয় অংশগ্রহণমূলক, প্রায়োগিক ও পরিমিত করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

মাধ্যমিক স্তরে (নবম-দশম শ্রেণি) বাংলা পঠন-পাঠনের উদ্দেশ্য

১. বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা অর্জন করা
২. বাংলা ভাষার বিভিন্ন উপাদান ও অন্তর্নিহিত শৃঙ্খলা সম্পর্কে ধারণা সংহত করা এবং তা প্রয়োগে সক্ষম হওয়া
৩. প্রমিত বাংলা ভাষা ব্যবহারে অধিকতর দক্ষতা, দৃঢ়তা ও সংহতি অর্জন করা
৪. প্রায়োগিক ও কর্মমুখী ভাষাদক্ষতা অর্জনে সক্ষম হওয়া
৫. পাঠাভ্যাসে আগ্রহী হওয়া ও পঠিত বিষয়ের মর্ম অনুধাবনে সক্ষম হওয়া
৬. বাংলা সাহিত্য পাঠের মাধ্যমে সাহিত্যের বিভিন্ন রূপশ্রেণি সম্পর্কে ধারণা লাভ এবং সেগুলোর মর্মোপলব্ধি ও রসাস্বাদনে সক্ষমতা অর্জন করা
৭. অনুসন্ধিৎসা, কল্পনাশক্তি ও সৃজনশীলতার বিকাশ সাধনে সক্ষম হওয়া
৮. নৈতিক, সামাজিক মূল্যবোধ ও চারিত্রিক গুণাবলি অর্জন করা
৯. ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আলোকে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হওয়া
১০. অসাম্প্রদায়িক মনোভাব ও মানবিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত হওয়া
১১. বাংলার সংস্কৃতি, লোকসংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে ধারণা লাভ এবং মমত্বের মনোভাব অর্জন করা
১২. আর্থ-সামাজিক শ্রেণি-পেশা, শিশু-নারী-পুরুষ, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তি নির্বিশেষে সকলের প্রতি সংবেদনশীলতা ও সমমর্যাদার মনোভাব অর্জন করা
১৩. পরিবেশ-চেতনা, বিজ্ঞানমনস্কতা ও বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করা।

শিখনফলের আলোকে রচিত বাংলা বিষয়ের বিষয়বস্তু (নবম-দশম শ্রেণি)

ক) বাংলা ভাষা শিক্ষা

ক্রমিক	শিখনফল (বুদ্ধিবৃত্তিক)	বিষয়বস্তু
১	বাংলা ভাষার বিভিন্ন রূপ ও রীতি সম্পর্কে ধারণা ব্যক্ত করতে পারবে।	বাংলা ভাষার পরিচয়
২	আঞ্চলিক ভাষা বা উপভাষা সম্পর্কে ধারণা ব্যক্ত করতে পারবে।	উপভাষা
৩	নির্বাচিত পাঠের মাধ্যমে বাংলা ভাষার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।	নির্বাচিত পাঠ
৪	জীবনের সর্বস্তরে বাংলা ভাষার গুরুত্ব প্রকাশ করতে পারবে।	বাংলা ভাষার গুরুত্ব

খ) বাংলা ভাষার ব্যাকরণ

ক্রমিক	শিখনফল (বুদ্ধিবৃত্তিক)	বিষয়বস্তু
১	বাংলা ধ্বনিসমূহের পরিচয় (উচ্চারণের স্থান ও রীতি অনুযায়ী) বর্ণনা করতে পারবে।	বাংলা ধ্বনি পরিচয়
২	বাংলা ধ্বনিগুলোর উচ্চারণের নিয়ম বর্ণনা করতে পারবে।	ধ্বনির উচ্চারণরীতি
৩	প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম প্রয়োগ করতে পারবে।	প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম
৪	বাংলা শব্দের প্রকারভেদ সনাক্ত করতে পারবে।	বাংলা শব্দ পরিচয়
৫	বাংলা শব্দ গঠনের উপায়গুলো বর্ণনা করতে পারবে।	শব্দ গঠন
৬	বাংলা বাক্যের বৈশিষ্ট্য ও প্রকারভেদ সম্পর্কে ধারণা ব্যক্ত করতে পারবে।	বাংলা বাক্য পরিচয়
৭	প্রমিত উচ্চারণে বাংলা ভাষায় কথা বলতে পারবে।	প্রমিত উচ্চারণ
৮	বিষয় ও ভাববস্তু অনুযায়ী উপযুক্ত শব্দ প্রয়োগ করতে পারবে।	শব্দ প্রয়োগ
৯	বিষয় ও ভাববস্তু অনুযায়ী শুদ্ধ বাক্য প্রয়োগ করতে পারবে।	বাক্য প্রয়োগ
১০	বাংলা ব্যাকরণে শব্দশ্রেণি (পদ) সম্পর্কিত ধারণা ব্যক্ত করতে পারবে।	বাংলা পদ পরিচয়
১১	বাংলা বিভক্তির ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা ব্যক্ত করতে ও তা প্রয়োগ করতে পারবে।	বাংলা বিভক্তি
১২	বাংলা বাক্যে বিরামচিহ্ন যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে পারবে।	বিরামচিহ্ন
১৩	বিশিষ্টার্থক বাংলা শব্দ প্রয়োগ করতে পারবে।	বিশিষ্টার্থক শব্দ
১৪	অর্থগত বিভিন্নতা অনুযায়ী শব্দ প্রয়োগ করতে পারবে।	সমার্থক ও ভিন্নার্থক শব্দ

গ) ব্যাকরণ ও নির্মিতি

ক্রমিক	শিখনফল (বুদ্ধিবৃত্তিক)	বিষয়বস্তু
১	দৈনন্দিন বা ব্যবহারিক জীবনে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে প্রমিত বাংলা ভাষা ব্যবহারের গুরুত্ব ব্যক্ত করতে পারবে।	প্রমিত বাংলা ভাষা ব্যবহারের গুরুত্ব
২	প্রমিত বাংলা ভাষা ব্যবহার করে শ্রুত বা পঠিত অংশের মর্ম ব্যক্ত করতে পারবে।	শ্রুত বিষয়ের মর্ম প্রমিত বাংলায় ব্যক্তকরণ
৩	অনুচ্ছেদ ও রচনা লেখার ক্ষেত্রে বিষয় অনুসারে যথাযথ শব্দ ব্যবহার করতে পারবে।	যথাযথ শব্দ প্রয়োগ
৪	বাক্যে বাগধারা, প্রবাদ-প্রবচন ব্যবহার করতে পারবে।	বাগধারা, প্রবাদ-প্রবচন

ঘ) বাংলা ভাষার প্রয়োগিক ক্ষেত্র

ক্রমিক	শিখনফল (বুদ্ধিবৃত্তিক)	বিষয়বস্তু
১	অভিধানের ব্যবহার জেনে তা প্রয়োগ করতে পারবে।	অভিধান ব্যবহার
২	দৈনন্দিন ব্যবহারিক প্রয়োজনে চিঠিপত্র, দরখাস্ত, খুদেবার্তা, ই-মেইল ইত্যাদি লিখতে পারবে।	সংশ্লিষ্ট বিষয়
৩	প্রুফ সংশোধনের পদ্ধতি শিখে তা প্রয়োগ করতে পারবে।	প্রুফ সংশোধন
৪	দেয়ালপত্র (পোস্টার), বিলবোর্ড, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি প্রস্তুত করতে পারবে।	সংশ্লিষ্ট পাঠ
৫	সার-সংক্ষেপণ তৈরি করতে পারবে।	সার-সংক্ষেপণ
৬	সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য প্রতিবেদন তৈরি করতে পারবে।	প্রতিবেদন
৭	বিদ্যালয়ে দেয়ালিকা, স্মরণিকা, বার্ষিক পত্রিকা ইত্যাদি সম্পাদনার কাজে অংশ নিতে পারবে। (মনোপেশিজ)	সম্পাদনা

ঙ) বাংলা ভাষা চর্চা

ক্রমিক	শিখনফল (বুদ্ধিবৃত্তিক)	বিষয়বস্তু
১	পাঠ্যসূচি বহির্ভূত বই-পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা পড়ে বিষয়বস্তুর মর্ম ব্যক্ত করতে পারবে।	পাঠসূচি বহির্ভূত পাঠনীয় উপাদান
২	পাঠের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ রচনা পড়ে তুলনামূলক আলোচনা করতে পারবে।	পাঠসূচি বহির্ভূত পাঠনীয় উপাদান

চ) বাংলা সাহিত্যের রূপশ্রেণি

ক্রমিক	শিখনফল (বুদ্ধিবৃত্তিক)	বিষয়বস্তু
১	সাহিত্যের বিভিন্ন রূপশ্রেণির পরিচয় দিতে পারবে।	সাহিত্যের রূপশ্রেণি
২	কবিতার সাধারণ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবে।	কবিতার সাধারণ বৈশিষ্ট্য
৩	কবিতা পড়ে তার মূলভাব বিশ্লেষণ করবে পারবে।	কবিতার সাধারণ বৈশিষ্ট্য
৪	ছোটগল্পের সাধারণ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবে।	ছোটগল্পের সাধারণ বৈশিষ্ট্য
৫	ছোটগল্প পড়ে তার বিষয়বস্তু,বক্তব্য ও চরিত্র বিশ্লেষণ করতে পারবে।	সংকলিত ছোটগল্প
৬	উপন্যাসের সাধারণ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবে।	উপন্যাসের সাধারণ বৈশিষ্ট্য
৭	উপন্যাস পড়ে তার বিষয়বস্তু, বক্তব্য ও চরিত্র ব্যাখ্যা করতে পারবে।	নির্বাচিত উপন্যাস
৮	নাটকের সাধারণ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবে।	নাটকের সাধারণ বৈশিষ্ট্য
৯	নাটক পড়ে তার বিষয়বস্তু, ঘটনাধারা, চরিত্র বিশ্লেষণ করতে পারবে।	নির্বাচিত নাটক
১০	প্রবন্ধ পড়ে তার বক্তব্য নিজের ভাষায় বর্ণনা করতে পারবে।	সংকলিত প্রবন্ধ

ছ) বাংলা ভাষায় সৃজনশীলতা

ক্রমিক	শিখনফল (বুদ্ধিবৃত্তিক)	বিষয়বস্তু
১	অনুসন্ধিৎসু হয়ে নতুন নতুন শব্দ শুনতে এবং তার তালিকা প্রণয়ন করতে পারবে।	সংশ্লিষ্ট বিষয়
২	পরিচিত জগৎ ও নিজের অভিজ্ঞতার বিষয় ব্যক্ত করতে পারবে।	অনুশীলন
৩	আবৃত্তি, উপস্থিত বক্তৃতা, ধারাবাহিক গল্প বলা, বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ, সঞ্চালনা ও উপস্থাপনা করতে পারবে।	সংশ্লিষ্ট বিষয় অনুশীলন
৪	ছড়া, কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ লেখার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।	সংশ্লিষ্ট বিষয় অনুশীলন
৫	দেয়াল পত্রিকা, স্কুল ম্যাগাজিন ও কিশোর পত্রিকায় প্রকাশের জন্য লেখা তৈরি করতে পারবে।	সংশ্লিষ্ট বিষয় অনুশীলন
৬	প্রমিত বাংলায় শিশু-কিশোর উপযোগী সংবাদ পরিবেশন/উপস্থাপন করতে পারবে।	সংবাদ উপস্থাপনা
৭	দিনলিপি লিখতে ও তাতে নিজের মনোভাব প্রকাশ করতে পারবে।	দিনলিপি লিখন

জ) বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মূল্যবোধ

ক্রমিক	শিখনফল (বুদ্ধিবৃত্তিক)	বিষয়বস্তু
১	ন্যায়, সততা, সৌজন্য, সদাচার ইত্যাদি নৈতিক মূল্যবোধের পরিচয় দিতে পারবে।	ন্যায়পরায়ণতা, সততা
২	অন্যায়, অসত্য ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে মতামত ব্যক্ত করতে পারবে।	দুর্নীতি ও এর প্রতিকার
৩	অপরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবে।	সম্প্রীতি, পরমতসহিষ্ণুতা
৪	সামাজিক জীবনে গঠনমূলক বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।	সামাজিক উন্নয়ন, সামাজিক অনুষ্ঠান
৫	অধ্যবসায়, সহিষ্ণুতা, শৃঙ্খলা, শিষ্টাচার ইত্যাদি চারিত্রিক গুণাবলির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।	অধ্যবসায়, সহিষ্ণুতা, শৃঙ্খলা, শিষ্টাচার

ঝ) বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে দেশপ্রেম

ক্রমিক	শিখনফল (বুদ্ধিবৃত্তিক)	বিষয়বস্তু
১	মহান ভাষা আন্দোলনের আলোকে মাতৃভাষাপ্রীতি, দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধের পরিচয় দিতে পারবে।	ভাষা আন্দোলন
২	মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশ গঠনে সক্রিয় হওয়ার গুরুত্ব ব্যক্ত করতে পারবে।	মুক্তিযুদ্ধ
৩	মুক্তিযোদ্ধাদের সংগ্রামী দেশপ্রেমিক ভূমিকার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে উদ্বুদ্ধ হবে।	মুক্তিযুদ্ধ
৪	মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সম্পর্কে অনুভূতি ব্যক্ত করতে পারবে।	মুক্তিযুদ্ধের গল্প

ঞ) বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মানবিকতা

ক্রমিক	শিখনফল (বুদ্ধিবৃত্তিক)	বিষয়বস্তু
১	মানব জীবনে অসাম্প্রদায়িক চেতনার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।	অসাম্প্রদায়িক চেতনা
২	জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি মমতা ও প্রীতির মনোভাব প্রদর্শনের গুরুত্ব ব্যক্ত করতে পারবে।	মানবজাতি
৩	মানবতাবিরোধী কাজের সঙ্গে মানবিক মূল্যবোধের তুলনা করতে পারবে।	মানবতা

ট) বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে লোকজ উপাদান

ক্রমিক	শিখনফল (বুদ্ধিবৃত্তিক)	বিষয়বস্তু
১	বাংলার সংস্কৃতি ও লোকসংস্কৃতির পরিচয় দিতে পারবে।	বাংলার সংস্কৃতি ও লোকসংস্কৃতি
২	বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও লোকজ অনুষ্ঠান দেখে ও শুনে বর্ণনা করতে ও অনুভূতি প্রকাশ করতে পারবে।	সাংস্কৃতিক ও লোকজ অনুষ্ঠান
৩	বাংলার গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহ্যের পরিচয় তুলে ধরতে পারবে।	বাংলার ঐতিহ্যের পরিচয়
৪	বাংলার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি মমত্বের মনোভাব প্রকাশ করতে পারবে।	সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য

ঠ) বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ

ক্রমিক	শিখনফল (বুদ্ধিবৃত্তিক)	বিষয়বস্তু
১	আর্থ-সামাজিক শ্রেণি-পেশার মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা, মমত্বের মনোভাব প্রকাশ করতে পারবে।	বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ
২	শিশুর প্রতি সংবেদনশীল আচরণের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।	শিশুর প্রতি সংবেদনশীলতা
৩	নারী এবং নারীর কর্ম ও জীবিকার প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব প্রকাশ করতে পারবে।	নারীর প্রতি শ্রদ্ধা
৪	ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রতি সমমর্যাদার মনোভাব প্রকাশ করতে পারবে।	ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী
৫	বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষের প্রতি সংবেদনশীল হওয়ার গুরুত্ব ব্যক্ত করতে পারবে।	বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষ

ড) বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে পরিবেশ

ক্রমিক	শিখনফল	বিষয়বস্তু
১	পরিবেশ সচেতনতার পরিচয় দিতে পারবে। (বুদ্ধিবৃত্তিক)	পরিবেশ চেতনা
২	অপর জাতি, দেশ ও তার সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব প্রকাশ করতে পারবে। (আবেগীয়)	অপর দেশ ও সংস্কৃতি
৩	বৈশ্বিক চেতনার পরিচয় দিতে পারবে। (বুদ্ধিবৃত্তিক)	বিশ্বাত্মবোধ
৪	জীবনের সর্বস্তরে বিজ্ঞানমনস্কতার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে। (বুদ্ধিবৃত্তিক)	বিজ্ঞানমনস্কতা

একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষার জন্য গঠিত আন্তর্জাতিক শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট 'Learning: The Treasure Within'-এ মাধ্যমিক শিক্ষাকে জীবনের প্রবেশদ্বার (Gateway to life) হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এর অর্থ কর্মজীবনে প্রবেশের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা মাধ্যমিক শিক্ষার মাধ্যমেই অর্জন করতে হবে। এ যোগ্যতা অর্জনের জন্য প্রতিবেদনে শিক্ষার চারটি স্তম্ভ নির্ধারণ করা হয়েছে। স্তম্ভসমূহ হচ্ছে- জানার জন্য শেখা, কাজ করার জন্য শেখা, মিলেমিশে থাকার জন্য শেখা, এবং বিকশিত হওয়ার জন্য শেখা। এসব স্তম্ভ বাস্তবায়নের মাধ্যমে একবিংশ শতাব্দীর উপযোগী দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন- সে অনুসারে শিক্ষাক্রম উন্নয়ন। তাই নির্দিষ্ট যোগ্যতা অর্জনের উপযোগী করেই জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ প্রণীত হয়েছে। বাংলাসহ বিভিন্ন বিষয়ে এখানে যেসব প্রান্তিক ও বিষয়ভিত্তিক শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে সেগুলো যথাযথভাবে অর্জিত হলে শিক্ষার্থীরা ব্যক্তিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সফলতা অর্জন ও কর্মকুশলতার পরিচয় দিতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়।

১.৩ : মাধ্যমিক বাংলা শিক্ষাক্রমে পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক

মাধ্যমিক শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য হচ্ছে 'শিক্ষার্থীদের সার্বিক বিকাশের মাধ্যমে মানবিক, সামাজিক ও নৈতিক গুণসম্পন্ন জ্ঞানী, দক্ষ, যুক্তিবাদী ও সৃজনশীল দেশপ্রেমিক জনসম্পদ সৃষ্টি।' শিক্ষাক্রমের এই লক্ষ্যের ভিত্তিতে বাংলা বিষয়টি পাঠদানের উদ্দেশ্য এবং মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের অর্জনোপযোগী শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। উপর্যুক্ত শিখনফল অর্জনের জন্য বাংলা বিষয়ের পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে শিক্ষার্থী বাংলা ভাষায় যতটুকু দক্ষতা অর্জন করেছে তাকে অগ্রসর করে নেওয়ার ক্ষেত্রে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাস্তরটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এস্তরে সাহিত্যের মাধ্যমে জীবন ও জগতের বিচিত্র বিষয়ে তাকে আগ্রহী ও কৌতূহলী করে তোলা, দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন পরিবেশ-পরিস্থিতিতে স্বচ্ছন্দে ভাব বিনিময় ও যোগাযোগের পারদর্শিতা অর্জন, ভাবপ্রকাশের উপযোগী শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধি, সাহিত্যের নানা রূপশ্রেণির সঙ্গে পরিচিতি লাভের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে কল্পনাশক্তি ও সৃজনশীলতার বিকাশ ও বৈচিত্র্যময় পাঠের মাধ্যমে মানবিক মূল্যবোধ অর্জনকে বাংলা শিক্ষাক্রমে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বর্তমান শিক্ষাক্রমে বাংলা ভাষার প্রধান চারটি দক্ষতা (লেখা, শোনা, পড়া এবং বলা) অর্জনের জন্য অংশগ্রহণমূলক অনুশীলনীসহ বিভিন্ন সুযোগ রাখা হয়েছে। পাঠ্যসূচি যেন বোঝা হয়ে না দাঁড়ায় তা বিবেচনায় নিয়ে বাংলা শিক্ষাক্রমকে যথাসম্ভব আকর্ষণীয়, সক্রিয় অংশগ্রহণমূলক, প্রায়োগিক ও পরিমিত করার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে।

পাঠ্যসূচি

ইংরেজি Syllabus এর বাংলা আভিধানিক অর্থ হলো পাঠ্যসূচি, শিক্ষাক্রমের অংশ, সংক্ষিপ্তসার, অধ্যয়নসূচির তালিকা ইত্যাদি। সুতরাং সহজভাবে বলা যায়, সিলেবাস হলো শ্রেণিভিত্তিক শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর তালিকা বা সূচি। অর্থাৎ নির্দিষ্ট শ্রেণির শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট বিষয়ের সূচিবদ্ধ সংক্ষিপ্ত রূপরেখাকেই পাঠ্যসূচি বা Syllabus বলে। সিলেবাস শ্রেণিভিত্তিক হয়। পৃথিবীর অনেক উন্নত দেশে শ্রেণিশিক্ষক বা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষাক্রমের আলোকে পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করেন। আমাদের দেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের শিক্ষার্থীদের পাঠ্যসূচি বা সিলেবাস জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রণীত হয়। শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির মধ্যে নিম্নবর্ণিত পার্থক্যসমূহ বিদ্যমান–

শিক্ষাক্রম	পাঠ্যসূচি
১. শিক্ষাক্রম একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যাপক ধারণা।	১. পাঠ্যসূচি শিক্ষাক্রমের অংশবিশেষ।
২. শিক্ষাক্রম একটি স্তরের জন্য প্রণীত।	২. পাঠ্যসূচি একটি শ্রেণির একটি মাত্র বিষয়ের জন্য প্রণীত হয়।
৩. শিক্ষাক্রমে শিখনফল, বিষয়বস্তু, শিখন-শিখানো কৌশল ও মূল্যায়ন পদ্ধতির দিক নির্দেশনা থাকে।	৩. পাঠ্যসূচিতে একটি বিষয়ের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক অংশের মানবণ্টন ও সময়ের উল্লেখ থাকে।
৪. শিক্ষাক্রমে শিখনফল,শিক্ষকের যোগ্যতা, শিখন পরিবেশ ও শিখন সামগ্রীর বিস্তারিত বিবরণ থাকে।	৪. পাঠ্যসূচিতে একটি শ্রেণিতে এক বছরে একটি বিষয়ে কী কী শেখানো হবে তার তালিকা থাকে।

শিক্ষাক্রম	পাঠ্যসূচি
৫. শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সাথে জড়িত ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক, শিক্ষা প্রশাসক, সরকার।	৫. পাঠ্যসূচির বাস্তবায়নের সাথে জড়িত শিক্ষার্থী ও বিষয় শিক্ষক।
৬. শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য শিক্ষার্থীর সামগ্রিক জীবনের বিকাশ সাধন।	৬. পাঠ্যসূচি শিক্ষার্থীর একটি বিশেষ দিকের বিকাশ ঘটায়।
৭. শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি জানার জন্য সুনির্দিষ্ট কোনো মূল্যায়ন ব্যবস্থা নেই।	৭. পাঠ্যসূচি বাস্তবায়ন কাজের মূল্যায়নের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে বিষয়বস্তুর ওপর ভিত্তি করে পরীক্ষা নেয়া হয়।

পাঠ্যপুস্তক

শিক্ষার নির্ধারিত স্তরের নির্ধারিত পাঠ্যসূচি অনুযায়ী রচিত পঠিতব্য পুস্তককেই পাঠ্যপুস্তক বলা হয়। শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে পরিচিত এবং বহুল ব্যবহৃত একটি সহায়ক সামগ্রী হচ্ছে পাঠ্যপুস্তক। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশসমূহের শ্রেণিকক্ষে যেখানে অন্যান্য শিখন সামগ্রীর পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই, পাঠ সহায়ক উপকরণেরও যথেষ্ট অভাব রয়েছে, সেখানে পাঠ্যপুস্তকই একমাত্র ও প্রধান শিক্ষা উপকরণ হিসেবে বিবেচিত হয়। বিশ্বের প্রায় সব দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠ্যপুস্তকের বহুল ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। সকল দেশেই বিশেষ কিছু নীতিমালা অনুসরণ করে পাঠ্যপুস্তক লেখা হয়; আর এ পাঠ্যপুস্তক রচনায় অনুসরণ করা হয় একটি নির্দিষ্ট শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি। পাঠ্যপুস্তকের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করা যায়– A textbook is a book designed for classroom use, carefully prepared by experts in the field and equipped with the usual teaching devices. উদ্দেশ্যমুখী শিক্ষাক্রমের আলোকে বাছাইকৃত পাঠ্যসূচি অনুযায়ী রচিত বই বা পুস্তককে পাঠ্যপুস্তক বলা হয়। প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থা হচ্ছে উদ্দেশ্যমূলক। সমাজ ও দেশের চাহিদাকে সামনে রেখে নির্বাচিত শিক্ষার জাতীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের জন্য মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পাঠ্যবিষয়, পাঠ্যসূচি ও শিক্ষাক্রমপ্রণয়ন করা হয়। আর উদ্দেশ্যমুখী এ শিক্ষাক্রমের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাছাইকৃত পাঠ্যসূচি নিয়ে শিক্ষা পদ্ধতির উপযোগী করে উপস্থাপনকারী পুস্তককে পাঠ্যপুস্তক বলা হয়।

পাঠ্যপুস্তকের গুরুত্ব

শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য পাঠ্যপুস্তক অপরিহার্য। পাঠ্যপুস্তক ছাড়া পাঠ্যসূচিও অর্থহীন হয়ে পড়ে। আমাদের দেশে এখনও অনেকে পাঠ্যপুস্তককে শিক্ষাক্রম মনে করেন। এটি শিক্ষাক্রম সম্পর্কে ধারণা না থাকা বা পাঠ্যপুস্তকের গুরুত্ব অনুধাবন করতে না পারা থেকে হতে পারে। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে শিক্ষক ও শিক্ষাথী উভয়েই পাঠ্যপুস্তকের উপর নির্ভরশীল। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক পাঠ্যপুস্তক অনুসরণ করেই মূলত পাঠদান করে থাকেন। শিক্ষার্থীরা নিজে নিজে পাঠ্যপুস্তক পড়ে জ্ঞান লাভ করে এবং শিক্ষকপ্রদত্ত বাড়ির কাজ তৈরি করে। পিতা-মাতা পাঠ্যপুস্তক দেখে সন্তানদের লেখাপড়ার সাহায্য করে থাকেন। শিক্ষার্থীদের অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতার মূল্যায়ন করার জন্য পরীক্ষকেরও পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজন হয়। তাছাড়া শিক্ষাবিদ, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ, শিক্ষক প্রশিক্ষকগণ পাঠ্যপুস্তক নিয়ে নানা রকম গবেষণা করেন এবং তাঁদের সুদূরপ্রসারী চিন্তা-ভাবনা ও বক্তব্যকে শিক্ষার্থীদের সামনে পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমেই তুলে ধরেন।

পাঠ্যপুস্তকের বৈশিষ্ট্য

শিক্ষার পূর্বনির্ধারিত বিষয়ভিত্তিক সাধারণ ও বিশেষ উদ্দেশ্যসমূহকে সামনে রেখে নির্বাচন করা হয় শিখনফল। শিখনফলের নিরিখে তালিকাভুক্ত করা হয় ভাববস্তুর। ভাববস্তুর আলোকে নির্ণীত হয় বিষয়বস্তু। আর বিষয়বস্তুর সামগ্রিক চিত্র হিসেবেই লেখা হয়ে থাকে পাঠ্যপুস্তক। পাঠ্যপুস্তকের কতিপয় সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যক, কেননা এ পাঠ্যপুস্তকই শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষক, শিক্ষার্থী, শিক্ষাক্রম ও শ্রেণিকক্ষের মধ্যে সেতুবন্ধন বা যোগসূত্র হিসেবে কাজ করে এবং জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। নিম্নে পাঠ্যপুস্তকের বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করা হলো–

১. সংশ্লিষ্ট বিষয়ের মৌলিক ধারণা ও নীতি পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত হবে।
২. পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে শিক্ষার্থীদের বয়স, সামর্থ্য, ধারণক্ষমতা ও মানসিক পরিপক্বতা বিবেচনা করা হবে।
৩. পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট পাঠ্যসূচি যথাযথভাবে অনুসরণ করা হবে।
৪. পাঠ্যপুস্তকের অধ্যায়গুলোর বিন্যাস শিক্ষাদান প্রক্রিয়ায় সহায়ক হবে।
৫. বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের চাহিদা ও আগ্রহ পূরণ করবে।
৬. পাঠ্যপুস্তকটি মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধে সহায়ক হবে।

৭. পাঠ্যপুস্তক বিতর্কিত ধ্যান ধারণা মুক্ত হবে।

৮. শিক্ষাক্রমে নির্ধারিত উদ্দেশ্য ও শিখনফলের আলোকে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু নির্বাচিত হবে।

৯. পাঠ্যপুস্তকের আকার, আয়তন, ডিজাইন, বাঁধাই, মুদ্রণ, ছাপার অক্ষরের আকার, কাগজের মান, দাম ইত্যাদি যুক্তিসঙ্গত ও উপযোগী হবে।

পাঠ্যপুস্তক রচনার নির্দেশাবলি

১. পাঠ্যপুস্তক রচনায় চলিত ভাষারীতি ব্যবহার করতে হবে। বৈজ্ঞানিক সূত্র ও পরিভাষার ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হতে পারে।

২. পাঠ্যপুস্তক রচনায় জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রণীত অথবা নির্দেশিত বানানরীতি অনুসরণ করতে হবে। পাঠ্যপুস্তকে শিক্ষার্থীদের বয়স-উপযোগী সহজ ভাষা ব্যবহার করে সাবলীল বর্ণনার মাধ্যমে তাত্ত্বিক উপস্থাপনা কাম্য।

৩. শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পাঠ্যপুস্তকের ভাষা নির্বাচিত হবে।

৪. বাংলাদেশের শিক্ষার সার্বিক লক্ষ্য, মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার সাধারণ উদ্দেশ্য এবং বিষয়গত উদ্দেশ্যের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখে এসকল উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়ক হয়- এমনভাবে পাঠ্যপুস্তকে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করতে হবে।

৫. বিষয়বস্তু আয়ত্ত করার পর শিক্ষার্থী যেন কাঙ্ক্ষিত শিখনফল অর্জনে সমর্থ হয় সেদিকে খেয়াল রেখে বিষয়বস্তু চয়ন, সংগঠন ও পরিবেশন করতে হবে।

৬. সামাজিক ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার ব্যবহার দৈনন্দিন জীবনে সমস্যার সমাধানে কীভাবে সহায়তা করে তার কিছু উদাহরণ দিতে হবে।

৭. দৈনন্দিন জীবন থেকে উদাহরণ সংগ্রহ করে যতদূর সম্ভব আরোহী পদ্ধতিতে পাঠ্যপুস্তকে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করতে হবে।

৮. প্রত্যেক পাঠে প্রয়োজনীয় ছবি ও চিত্রসহ শিক্ষামূলক ভ্রমণ ও পর্যবেক্ষণ এবং সক্রিয় কর্ম-অভিজ্ঞতা লাভ সম্পর্কে যথাযথ বর্ণনা থাকবে।

৯. উদাহরণ চিত্তাকর্ষক ও কৌতূহলোদ্দীপক হতে হবে।

১০. সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক ঘটনার ব্যাখ্যায় কার্যকারণ সম্পর্কের উল্লেখ করতে হবে।

১১. অধ্যয়ন শেষে শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যায়নের জন্য অনুশীলনী থাকবে। অনুশীলনীতে রচনামূলক, সংক্ষিপ্ত, বহু নির্বাচনি, শূন্যস্থান পূরণ, মিলকরণ ইত্যাদি বিভিন্ন রকমের প্রশ্ন দেওয়া যেতে পারে। অধ্যায়ে শিক্ষার্থীরা যেসব নতুন পারিভাষিক শব্দ শিখেছে তার একটি তালিকাও সন্নিবেশ করা যেতে পারে। অনুশীলনীর প্রশ্নগুলো জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ, বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ ও মূল্যায়নধর্মী হবে। মোটকথা, মনে রাখতে হবে- পাঠ্যপুস্তক হবে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর একান্ত সহায়ক।

পাঠ্যপুস্তকের পরিকল্পনা

সব দেশেই জ্ঞানের অন্যতম উৎস পাঠ্যপুস্তক। এই পাঠ্যপুস্তক লেখা হয় বিশেষ কিছু নীতিমালা অনুসরণ করে। আর পাঠ্যপুস্তক রচনার নীতিমালার মধ্যে সব দেশেই কিছু-না-কিছু মিল রয়েছে। পাঠ্যপুস্তক রচনায় একটি নির্দিষ্ট শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুসরণ করা হয়। পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু পরিকল্পনা ও বিন্যাসের ব্যাপারে বিশেষ নীতি ও পদ্ধতি অনুসৃত হয়। শব্দচয়ন, বাক্যগঠন ও চিত্র সন্নিবেশের ব্যাপারেও বিশেষত্ব লক্ষ করা যায়। পাঠ্যপুস্তকের আঙ্গিক, গঠনও অন্যান্য পুস্তক থেকে ভিন্নতর হয়, ফলে পাঠ্যপুস্তককে অন্যান্য বই থেকে সহজেই পৃথক করা যায়। পাঠ্যপুস্তক পরিকল্পনায় নজর রাখতে হবে যে, এর বিষয়বস্তু মনোবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ক্রমান্বয়ে সন্নিবেশিত হলো কিনা। পাঠ্যপুস্তক পরিকল্পনার ও এর বিষয়বস্তু সন্নিবেশনের নীতি নিম্নরূপ-

সহজ থেকে কঠিনের দিকে

ক্ষুদ্র থেকে বৃহত্তের দিকে

জানা থেকে অজানার দিকে

নির্দিষ্ট থেকে অনির্দিষ্টের দিকে

অংশ থেকে সমগ্রকের দিকে

মূর্ত থেকে বিমূর্তের দিকে

আদর্শ পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর বৈশিষ্ট্য

আদর্শ পাঠ্যপুস্তকের গুণাগুণ বিচার করা হয় তার বিষয়বস্তুর গুণগত মানের উপর ভিত্তি করে। বিষয়বস্তু শিক্ষাক্রমের নীতি অনুসরণ করে প্রণীত হয়েছে কি না, পাঠ্যসূচির আলোকে যথার্থ পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়েছে কি না– এসব বিষয় বিবেচনায় আনা হয় পাঠ্যপুস্তক মূল্যায়ন বা পর্যালোচনায়। পাঠ্যপুস্তক মূল্যায়ন শুধু নয় বরং পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন করার জন্য প্রয়োজন হয় পাঠ্যপুস্তকের বৈশিষ্ট্যবিচার। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ বিচারে পাঠ্যপুস্তকের সাধারণ বৈশিষ্ট্য নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

ক. বিষয়বস্তুগত বৈশিষ্ট্য

১. শিক্ষাক্রমে নির্ধারিত উদ্দেশ্য ও শিখনফলের আলোকে বিষয়বস্তু নির্বাচন করা হবে।
২. পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে পাঠ্যসূচি যথাযথভাবে অনুসরণ করা হবে।
৩. বিষয়বস্তু সব ধরনের শিক্ষার্থীর চাহিদা ও আগ্রহ পূরণ করবে।
৪. বিষয়বস্তুতে তত্ত্ব ও তথ্যগত কোনো ভুল থাকবে না।
৫. বিষয়বস্তু অবশ্যই মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধে সহায়ক হবে।
৬. বিষয়বস্তুতে কোনো রকম সংশয় থাকবে না।

খ. বিষয়বস্তুর বিন্যাসগত বৈশিষ্ট্য

১. বিষয়বস্তু বিন্যাসের নীতিমালা ও পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।
২. বিষয়বস্তুর প্রসার ও মাত্রাগত পার্থক্য দূর করতে হবে।
৩. শিক্ষাদানের দার্শনিক ও মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি অনুসরণ করে বিষয়বস্তু সাজাতে হবে।
৪. বিষয়বস্তু শ্রেণিভিত্তিক ধারাবাহিক অধ্যায়ে ও অনুচ্ছেদে বিভক্ত থাকবে।
৫. অধ্যায় ও অধ্যায়ের অনুচ্ছেদে বিষয়বস্তু যৌক্তিকতা ও ধারাবাহিকতা রক্ষা করে বিন্যস্ত হবে।

গ. উপস্থাপনগত বৈশিষ্ট্য

১. শিখনের নীতি ও তত্ত্ব অনুসরণ করে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করতে হবে।
২. বিষয়বস্তুর উপস্থাপনে ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হবে।
৩. বিষয়বস্তু উপস্থাপনে প্রয়োজনীয় ছবি, চিত্র ও চার্ট সংযোজন করতে হবে।
৪. বিষয়বস্তু প্রমিত ও চলিত রীতিতে উপস্থাপন করতে হবে।

ঘ. বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যাগত বৈশিষ্ট্য

জটিল বিষয়কে সহজবোধ্য করে উপস্থাপনের জন্য উপযুক্ত উপমা এবং উদাহরণের অবতারণা করতে হবে। বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যায় দৈনন্দিন জীবন থেকে উদাহরণ দিতে হবে। বিতর্কিত বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে সতর্কতা ও নিরপেক্ষতা অবলম্বন করতে হবে। বিষয়বস্তুর সরল ও পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা আদর্শ পাঠ্যপুস্তকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বিষয়বস্তুর পরিধি বড় হলে সমগ্র বিষয়কে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে ব্যাখ্যা করতে হবে।

ঙ. অনুশীলনী সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্য

প্রত্যেক অধ্যায় শেষে পর্যাপ্ত অনুশীলনের ব্যবস্থা থাকতে হবে। লিখিত ও মৌখিক উভয় ধরনের অনুশীলনের সুযোগ থাকতে হবে। বিভিন্ন মেধার শিক্ষার্থীদের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা যায়, এরকম অনুশীলনের ব্যবস্থা থাকবে। অনুশীলনীতে নৈর্ব্যক্তিক ও রচনামূলক অভীক্ষার প্রশ্ন থাকবে। নৈর্ব্যক্তিক অংশে সঠিক উত্তর নির্বাচন, শূন্যস্থান পূরণ, সত্য-মিথ্যা নির্ণয়, মিলকরণ প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন থাকবে। এতে সৃজনশীল পদ্ধতির নমুনা প্রশ্নও থাকতে পারে।

চ. আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্য

পাঠ্যপুস্তকের আকার ও আয়তন সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীর পঠন উপযোগী হবে। পাঠ্যপুস্তকের কভার বা প্রচ্ছদ অলংকরণ বিষয় সংশ্লিষ্ট এবং আকর্ষণীয় হবে। কোনো মতেই মুদ্রণ ভুল থাকা যাবে না । পাঠ্যপুস্তকের বাঁধাই টেকসই হতে হবে। ছাপার কাগজ উন্নতমানের এবং ছাপার আকার যথাযথ হতে হবে। সর্বোপরি পাঠ্যপুস্তকের মুদ্রণ স্পষ্ট হতে হবে এবং পাঠ্যপুস্তকের দাম শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে থাকবে।

ছ. সাধারণ বৈশিষ্ট্য

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির আলোকে প্রণীত হয় পাঠ্যপুস্তক। এ কাজের মূল দায়িত্বে থাকেন জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড। তাদের প্রত্যক্ষ তদারকিতে, রচনার নির্দেশাবলি এবং বিষয়বৈশিষ্ট্যের আলোকে নির্বাচিত বিষয়বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। পাঠ্যপুস্তকটি যাতে মুখস্থ করার সুযোগরহিত হয় এবং দেশীয় প্রেক্ষাপটকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়- সে ব্যাপারে বিশেষজ্ঞগণ খেয়াল রাখেন। নিম্নে জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ এর আলোকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত মাধ্যমিক পর্যায়ের নবম-দশম শ্রেণির বাংলা বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক সংকলন ও রচনাকৌশল নমুনা হিসেবে উপস্থাপন করা হলো-

বাংলা পাঠ্যপুস্তক

নবম-দশম শ্রেণির বাংলা শিক্ষাক্রম অনুযায়ী নিম্নলিখিত বাংলা পাঠ্যপুস্তক প্রণীত হবে।

ক. মাধ্যমিক বাংলা সংকলন (গদ্য)
খ. মাধ্যমিক বাংলা সংকলন (কবিতা)
গ. মাধ্যমিক বাংলা সহপাঠ
ঘ. মাধ্যমিক বাংলা ব্যাকরণ
ঙ. মাধ্যমিক বাংলা নির্মিতি

উপর্যুক্ত পাঠ্যপুস্তকসমূহ রচনার ক্ষেত্রে শিক্ষাক্রমে বর্ণিত উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু ও শিখনফলের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। পাঠ্যপুস্তক প্রকাশকালে গদ্য ও কবিতা এক সঙ্গে এবং ব্যাকরণ ও নির্মিতি এক সঙ্গে প্রকাশ করা যেতে পারে।

ক. মাধ্যমিক বাংলা সংকলন (গদ্য)

১. সংকলনে ভাববস্তু, বিষয়বস্তু ও শিখনফল উপযোগী রচনা সংকলিত হবে।
২. রচনাগুলি প্রধানত আধুনিক যুগের বিশিষ্ট ও প্রতিনিধিত্বশীল লেখকদের রচনা থেকে সংকলিত হবে।
৩. বিশেষ প্রয়োজনে শিক্ষাক্রম অনুযায়ী জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে সহায়ক মানসম্পন্ন রচনা সংকলনে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা নিতে হবে।
৪. শিক্ষার্থীর শ্রেণি ও বয়সের উপযোগী এবং নৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক, মানবিক মূল্যবোধের বিবেচনায় নির্বাচিত পাঠ পরিমার্জন করা যাবে।
৫. বাংলা ভাষার নির্মিতির সঙ্গে শিক্ষার্থীকে পরিচয় করার লক্ষ্যে সাধু ও প্রমিত রীতিতে লিখিত রচনা সংকলনে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
৬. গদ্য রচনার পরিসর শ্রেণি ও শিক্ষার্থীর ধারণ ক্ষমতা বিবেচনা করে নির্ধারিত হবে। বিশেষ ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম করা যেতে পারে।
৭. গদ্য সংকলনে কালানুক্রমিকভাবে অনধিক ৩০টি গদ্য সংকলিত হবে। নবম-দশম শ্রেণিতে ৭টি প্রবন্ধ, ৫টি গল্প ও ৩টি অন্যান্য আঙ্গিকের রচনাসহ মোট ১৫টি রচনা পাঠ্য হবে। এ শ্রেণির জন্য নির্ধারিত ভাববস্তু ও বিষয়বস্তু অবলম্বনে সাহিত্যের বিভিন্ন আঙ্গিকের উল্লেখযোগ্য রচনাসমূহ সংকলন করতে হবে। সংকলিত গদ্যাংশ হবে নিম্নরূপ:

ক.	গদ্য রচনা/প্রবন্ধ	: ১০টি
খ.	গল্প	: ১০টি
গ.	উপন্যাসের অংশবিশেষ	: ১টি
ঘ.	ভ্রমণ কাহিনী	: ২টি
ঙ.	রম্য/রস রচনা/হাসির গল্প	: ২টি
চ.	অভিযান/আবিষ্কারের কাহিনী	: ১টি
ছ.	স্মৃতিকথা/আত্মকথা	: ১টি
জ.	নাট্যাংশ	: ১টি
ঝ.	ঐতিহাসিক ঘটনা	: ১টি
ঞ.	পত্র	: ১টি

গদ্য সংকলন গ্রন্থে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এর কাল থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত ৩০ জন লেখকের গদ্য রচনা সংকলন করা হবে। প্রতিটি রচনার শেষে লেখক পরিচিতি, শব্দার্থ, টীকা, সাহিত্যের রূপশ্রেণিগত পরিচয়, কর্ম অনুশীলন ও বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন থাকবে।

১.৪ : মাধ্যমিক বাংলা পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা: গদ্য

উনিশ শতকে বাংলা গদ্য সাহিত্যের আবির্ভাব ঘটে। ইতঃপূর্বের দলিল দস্তাবেজে এবং কিছু নীতিগল্পের মধ্যে যে গদ্য পাওয়া যায় তা নিছক গদ্য লেখার প্রয়াস বলা যায়। ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠাই বাংলা গদ্য সাহিত্যের সূচনালগ্ন। সময়ের ধারাবাহিকতায় বাংলা সাহিত্যের প্রতিভাধর রচয়িতাদের সৃষ্টিসম্ভারে গদ্যসাহিত্যে আজ সমৃদ্ধি এসেছে। বাংলা গদ্য সাহিত্যের ছোটগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক পাঠকের কাছে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। মাধ্যমিক বাংলা শিক্ষাক্রমেও গদ্যসাহিত্যকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়েছে। বিষয় হিসেবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এ দুটি দিককেই বাংলা শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মাতৃভাষা ছাড়াও বাংলা আমাদের রাষ্ট্রীয় ভাষা। শিক্ষার সকল স্তরে অন্যান্য বিষয় অধ্যয়নের মাধ্যমভাষাও বাংলা। সাধারণ, মাদ্রাসা ও ইংরেজি মাধ্যমে অধ্যয়নরত মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য বাংলা একটি আবশ্যিক বিষয়। তাই বাংলা শিক্ষাক্রমে বিষয়গত জ্ঞান, দক্ষতা ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি লাভে শিক্ষার্থীদের সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, যাতে তারা নিজেরা উন্নত ও মানসম্পন্ন জীবন যাপনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবার-সমাজ-দেশ-বিশ্বকল্যাণেও সাধ্যমতো অংশগ্রহণ ও সহায়তা করতে পারে। শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের চাহিদা অনুযায়ী বাংলা পাঠপুস্তকে নির্বাচিত বিষয়বস্তু নানা রূপ-কাঠামোয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সাহিত্যিক রচনা মানুষের বিচিত্র অনুভূতি ও উপলব্ধিতে ইতিবাচকতা সঞ্চার করে এবং ভাষার গুরুত্ব ও গৌরব অনুধাবন, ভাষার নীতি-শৃঙ্খলা সম্পর্কে ধারণা লাভ ও যোগাযোগের সাধারণ মাধ্যম হিসেবে অত্যন্ত শক্তিশালী ভূমিকা রাখে। তাই মাধ্যমিক বাংলা পাঠ্যপুস্তকে সাহিত্যিক রচনাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা

পর্যালোচনা শব্দের আভিধানিক অর্থ অনুশীলন, 'সমস্ত বিষয় চর্চা', 'সর্বতোভাবে আলোচনা' বা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করাকে বোঝায়। পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা বলতে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়-বৈশিষ্ট্য, অঙ্গসংগঠন, ধারাবাহিকতা রক্ষা, উপস্থাপন কৌশল, সুখপাঠ্যতা ইত্যাদি বিষয়ের বিচার বিশ্লেষণকে বোঝায়। নিম্নে মাধ্যমিক পর্যায়ের বাংলা পাঠ্যপুস্তকের (গদ্য) পর্যালোচনা করা হলো–

পুস্তক পরিচিতি: পুস্তকটি জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ কর্তৃক ২০১৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে নবম-দশম শ্রেণির বাংলা পাঠ্যপুস্তক রূপে নির্ধারিত। এর সংকলন, রচনা ও সম্পাদনার সঙ্গে জড়িত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের তালিকা নিম্নরূপ-

মাধ্যমিক বাংলা সাহিত্য

নবম-দশম শ্রেণি

লেখক ও সংকলক

অধ্যাপক ড. রফিকউল্লাহ খান
অধ্যাপক নূরজাহান বেগম
অধ্যাপক ড. মাসুদুজ্জামান
অধ্যাপক শ্যামলী আকবর
অধ্যাপক ড. সৌমিত্র শেখর
ড. শোয়াইব জিবরান

সম্পাদক
অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদ
অধ্যাপক ড. মাহবুবুল হক

বিষয়বস্তুর পর্যালোচনা (গদ্যাংশ) : পূর্বের শিক্ষাক্রমে গদ্যাংশ এবং পদ্যাংশের জন্য আলাদা পুস্তক ছিল। কিন্তু বর্তমান বাংলা শিক্ষাক্রমে গদ্যাংশ ও পদ্যাংশকে একটি পুস্তকে সমন্বিত করা হয়েছে। পুস্তকটির গদ্যভিত্তিক বিষয়বস্তু নিম্নে সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করা হলো-

সুভা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সুভা' গল্পটি তাঁর বিখ্যাত 'গল্পগুচ্ছ' থেকে সংগৃহীত হয়েছে। একজন বাকপ্রতিবন্ধী কিশোরী 'সুভা'র প্রতি লেখকের হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা ও মমত্ববোধের জন্য গল্পটি অমর হয়ে আছে। সুভা কথা বলতে পারে না। তাই তার সঙ্গে কেউ মেশে না। কথা বলতে পারে না- এমন পোষা প্রাণিদের কাছে সে মুখর। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ গল্পে মূলত প্রতিবন্ধী মানুষের আশ্রয়ের জন্য একটি জগৎ তৈরি করেছেন এবং সেই সঙ্গে তাদের প্রতি আমাদের মমত্ববোধের উদ্বোধন ঘটাতে চেয়েছেন।

বইপড়া : 'বই পড়া' প্রবন্ধটি প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধ সংগ্রহ থেকে নির্বাচন করা হয়েছে। একটি লাইব্রেরির বার্ষিক সভায় প্রবন্ধটি পঠিত হয়েছিল। প্রমথ চৌধুরী এ প্রবন্ধে পাঠককে মনে করিয়ে দিয়েছেন- প্রগতিশীল জগতের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য সাহিত্য চর্চা করা আবশ্যক আর যথার্থ শিক্ষিত হতে হলে আমাদের দরকার চিন্তা ও মননের প্রসার ঘটানো।

অভাগীর সর্গ : সুকুমার সেন সম্পাদিত 'শরৎসাহিত্য সমগ্র' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড থেকে 'অভাগীর স্বর্গ' নামক গল্পটি সংকলন করা হয়েছে। এগল্পে সামন্তবাদের নির্মম রূপ এবং নিচু শ্রেণির হতদরিদ্র মানুষের দুঃখ-কষ্ট ও যন্ত্রণা শরৎচন্দ্র অত্যন্ত দরদী ভাষায় উপস্থাপন করেছেন।

পল্লিসাহিত্য : ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে কিশোরগঞ্জ জেলায় 'পূর্ব ময়মনসিংহ সাহিত্য সম্মিলনী'র একাদশ অধিবেশনে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সভাপতিত্ব করেন। এ সম্মেলনে সভাপতি হিসেবে তিনি যে অভিভাষণ দেন তারই পুনর্লিখিত রূপ এই 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধটি। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ পল্লিসাহিত্য সম্পর্কে বলেছেন, 'একদিন এক বিরাট পল্লিসাহিত্য এদেশে ছিল। সেই সম্পদগুলো সংগ্রহ করা একান্ত প্রয়োজন'।

আম আঁটির ভেঁপু : 'আম আঁটির ভেঁপু' শীর্ষক গল্পটি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' উপন্যাস থেকে সংকলন করা হয়েছে। গ্রামীণ জীবনে প্রকৃতিঘনিষ্ঠ অপু ও দুর্গা দুই ভাইবোনের আনন্দের আখ্যান নিয়ে গল্পটি রচিত হয়েছে। এ গল্পের নারীচরিত্র সর্বজয়ায় পল্লি মায়ের অকৃত্রিম শাশ্বত রূপ ফুটে উঠেছে।

মানুষ মুহম্মদ (স) : 'মানুষ মুহম্মদ (স)' প্রবন্ধটি মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী রচিত 'মরুভাস্কর' গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। হযরত মুহম্মদ (স.)-এর মানবীয় গুণাবলি এ প্রবন্ধে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। হযরত মুহম্মদ (স) ছিলেন সব মানুষের প্রাণ প্রিয়। মানুষ হিসেবে হযরত (স.)-এর বৈশিষ্ট্যের আলোচনাই এ প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য।

নিমগাছ : বলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায়ের (বনফুল) 'অদৃশ্যলোক' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'নিমগাছ' গল্পটি। স্বল্প পরিসরে লেখক বিস্তৃত বক্তব্য উপস্থাপনের যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তা বাংলা সাহিত্যে বিরল। এই গল্পের ম্যাজিক বাক্য হলো শেষটি, যেখানে লেখক বুঝিয়ে দিয়েছেন সীমাহীন কথার আখ্যান।

উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন : 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন' শীর্ষক প্রবন্ধটি বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত নজরুল রচনা সম্ভার নামক গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ড থেকে চয়ন করা হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে কাজী নজরুল ইসলামের সাম্যবাদী মানসিকতার পরিচয় ফুটে উঠেছে।

শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব : 'শিক্ষাও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধটি মোতাহের হোসেন চৌধুরীর 'সংস্কৃতি কথা' গ্রন্থের 'মনুষ্যত্ব' শীর্ষক প্রবন্ধের অংশবিশেষ। মানুষের দুটি সত্তা-একটি জীবসত্তা, অপরটি মানবসত্তা বা মনুষ্যত্ব। শিক্ষার আসল কাজ মূল্যবোধ সৃষ্টি, জ্ঞানদান নয়; জ্ঞান মূল্যবোধ সৃষ্টির উপায় মাত্র।

প্রবাস বন্ধু : 'প্রবাস বন্ধু' সৈয়দ মুজতবা আলীর 'দেশে বিদেশে' গ্রন্থের পঞ্চদশ অংশ। প্রতিবেশী দেশ আফগানিস্তানের ভূমি, পরিবেশ, সেখানকার মানুষের খাদ্যাভ্যাস ও তাদের বিচিত্র জীবনাচরণ ইত্যাদি হাস্যরসাত্মকভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে 'প্রবাস বন্ধু' রচনায়।

মমতাদি : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরীসৃপ (১৯৩৯) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'মমতাদি' গল্প। এই গল্পে গৃহকর্মে নিয়োজিত মানুষের প্রতি মানবিক আচরণ করার দিকটি প্রাধান্য পেয়েছে। মমতাদি নামের এক গৃহকর্মী বাড়িতে এলেই বাড়ির স্কুল পড়ুয়া ছেলেটি মনের মধ্যে পুলক অনুভব করে, আনন্দে উদ্বেলিত হয়। এই গল্পে স্কুল পড়ুয়া ঐ ছেলেটি ও তার পরিবার সম্মান ও সহমর্মিতা নিয়ে যেভাবে মমতাদির পাশে এসে দাঁড়ায়– তা সত্যি মানবতার জয়গানে উচ্চকিত।

পয়লা বৈশাখ : বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত (২০০৮) 'বাংলাদেশের উৎসব: নববর্ষ' নামক গ্রন্থ থেকে রচনাটি সংকলন করা হয়েছে। বাংলা নববর্ষ পয়লা বৈশাখ বাঙালির সর্বশ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক উৎসব। ধর্মীয় সংকীর্ণতার বৃত্ত অতিক্রম করে বাংলা নববর্ষ উৎসব আজ আমাদের জাতীয় চৈতন্যের ধারক।

একাত্তরের দিনগুলি : জাহানারা ইমাম রচিত মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ 'একাত্তরের দিনগুলি'। গ্রন্থটি দিনপঞ্জির আকারে রচিত। এ পাঠ্যসূচিভুক্ত রচনাটি ঐ গ্রন্থেরই অংশবিশেষ। শহীদ জননী জাহানারা ইমাম তাঁর সন্তান রুমীকে মুক্তিযুদ্ধে হারিয়েছেন। এই রচনায় কষ্ট ও ত্যাগের সেই অন্তর্গত উপলব্ধিই আভাসে ইঙ্গিতে মহিমান্বিত হয়েছে।

সাহিত্যের রূপ ও রীতি : সাহিত্য নানা ধরনের। অনেক রকম উদ্ভিদ নিয়ে যেমন বাগান তেমনি বিভিন্ন সৃষ্টিকর্ম নিয়ে সাহিত্য। কবিতা, নাটক, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ ইত্যাদি নিয়ে সাহিত্যের জগৎ। 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধে সাহিত্যের এসব রীতির পরিচয় পাওয়া যায়।

নিয়তি : হুমায়ূন আহমদের 'আমার ছেলে বেলা' গ্রন্থটি থেকে 'নিয়তি' গল্পটি সংকলন করা হয়েছে। এ গল্পে উপস্থাপিত কুকুরের শেষ পরিণতি শিক্ষার্থীর চিত্তে বেদনার সঞ্চার করে পশু-পাখির প্রতি মমত্ববোধ জাগাতে সহায়তা করবে।

বাংলাদেশের মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাক্রমের (২০১২) লক্ষ্য হচ্ছে উচ্চতর মানবিক, সামাজিক ও নৈতিক গুণাবলিসম্পন্ন, জ্ঞানসমৃদ্ধ, দক্ষ, যুক্তিবোধসম্পন্ন, সৃষ্টিশীল ও দেশপ্রেমিক নাগরিক তৈরি করা। এলক্ষ্যে প্রণীত বাংলা পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তুতে জাতীয় শিক্ষাক্রম কর্তৃক নির্ধারিত উদ্দেশ্য প্রতিফলিত হয়েছে। উপর্যুক্ত গদ্যসমূহ পাঠের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা বাংলা শিক্ষাক্রমে বর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়।

বিষয়বস্তুর বিন্যাসগত পর্যালোচনা

মাধ্যমিক বাংলা পাঠ্যপুস্তকে গদ্যের বিষয়বস্তু সাজানো হয়েছে সহজ থেকে কঠিনের দিকে। গদ্য ও কবিতা একই গ্রন্থে সংযোজন করা হয়েছে। এখানে ৩১টি গদ্য সংযোজিত হয়েছে। ৩১টি গদ্যের মধ্যে ১৪টি প্রবন্ধ, ১৫টি গল্প, ১টি ভ্রমণোপন্যাস থেকে সংকলিত স্মৃতিচারণমূলক রচনা ও ১টি নাটিকা এই পাঠ্যপুস্তকে স্থান পেয়েছে। পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুতে লেখকদের জ্যেষ্ঠতার ক্রম এবং বাংলা সাহিত্যের গদ্য বিকাশের বিভিন্ন ধারার রচনার ক্রম রক্ষিত হয়েছে। বিষয়বস্তুর গতিশীলতার জন্য গদ্যরচনার বৈচিত্র্য অর্থাৎ ছোটগল্প, প্রবন্ধ, আত্মজীবনী ইত্যাদি যেভাবে সাজানো হয়েছে তাতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিরক্তি বা একঘেয়েমির জন্ম দেবে না বরং নানান রকমের সাহিত্যিক গদ্যের স্বাদ পাবে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর থেকে শুরু করে মুহাম্মাদ জাফর ইকবালের গদ্য পর্যন্ত গদ্যরচনার যে ভাষিক এবং ব্যাকরণিক পরিবর্তন সেটি পাঠ্যপুস্তক পাঠে সহজে অনুমান করা যাবে। ভাষার সাধুরীতির পাশাপাশি প্রমথ চৌধুরীর চলিত রীতির লেখা সন্নিবেশিত হয়েছে পাঠ্যপুস্তকে। পাঠ্যপুস্তকে সৈয়দ মুজতবা আলীর ভ্রমণসাহিত্য 'প্রবাসবন্ধু', জাহানারা ইমামের স্মৃতিচারণমূলক রচনা 'একাত্তরের দিনগুলি' পড়ে শিক্ষার্থীদের মানসে সাহিত্যের নবতর রূপও উন্মোচিত হবে।

পাঠ্যপুস্তকে ভাষা আন্দোলন, মহান মুক্তিযুদ্ধ, বাংলাদেশের লোকজসাহিত্য এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনার প্রতীক পয়লা বৈশাখের উপর রচনা স্থান পেয়েছে। চিন্তা উদ্রেককারী বিভিন্ন প্রবন্ধেরও স্থান হয়েছ নবম-দশম শ্রেণির বাংলা পাঠ্যপুস্তকে। শিক্ষার্থীদের মানবিক চরিত্রগঠন এবং আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলার জন্য মোহাম্মাদ ওয়াজেদ আলীর 'মানুষ মুহম্মদ (স)' প্রবন্ধে হযরত (স)-এর মানবিক গুণাবলিকে মহিমান্বিত করে দেখানো হয়েছে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের রূপ-রস-স্বাদ উপলব্ধির জন্য পাঠ্যপুস্তকে স্থান পেয়েছে হায়াৎ মামুদ ও হুমায়ূন আজাদের প্রবন্ধ। সর্বোপরি বলা যায়, পাঠ্যপুস্তকে গদ্য সংগঠনে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের বৈচিত্র্যপূর্ণ সাহিত্যরস আস্বাদন, কল্পনাপ্রবণ এবং মানবিক ব্যক্তিত্বগঠনের দিকটিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

পাঠ্যপুস্তকে গদ্যাংশের উপস্থাপনগত কৌশল পর্যালোচনা

যে কোনো বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক লেখা হয় বিশেষ কিছু নীতিমালা অনুসরণ করে। বাংলা পাঠ্যপুস্তকও বিশেষ নীতিমালার আলোকে রচিত হয়েছে। এ পুস্তকের রচনা উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি ও কৌশলকে যথাযথভাবে বিবেচনা করা হয়েছে। শিখন কৌশলকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে বিষয়বস্তুর বিন্যাস করা হয়েছে- সহজ থেকে কঠিনের দিকে, ছোট থেকে বড়র দিকে, জানা থেকে অজানার দিকে।

এ পাঠ্যপুস্তকে শিক্ষার্থীদের পাঠে জানা থেকে অজানার দিকে, নির্দিষ্ট থেকে অনির্দিষ্টের দিকে, মূর্ত থেকে বিমূর্তের দিকে এবং অংশ থেকে সমগ্রতার দিকে উৎসাহিত করার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। বাক্যগঠন, শব্দচয়ন ইত্যাদি পাঠ্যপুস্তকে সাবলীল এবং প্রাঞ্জলভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকে প্রত্যেকটি রচনায় সংক্ষেপে মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের উপযোগী লেখক পরিচিতি সন্নিবেশ করা হয়েছে। পাঠ শেষে সহজ সরল এবং প্রাঞ্জল ভাষায় রচনার সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করা হয়েছে। অতএব বলা যায়, মাধ্যমিক পর্যায়ের বাংলা পাঠ্যপুস্তকের গদ্যাংশ শিখন পদ্ধতি অনুসরণ করে চমৎকারভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। পাঠ্যপুস্তক পরিণত হয়েছে শিক্ষক শিক্ষার্থীর অন্যতম সহায়ক বন্ধুতে।

পাঠ্যপুস্তকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণগত দিক : বাংলা বিষয়ের গদ্যাংশের বিষয়বস্তু স্পষ্ট করার জন্য চিত্র, চার্ট, ছবি বা মডেলের তেমন প্রয়োজন নেই। বিষয়গত বিভিন্ন দিক স্পষ্ট করার জন্য, অপরিচিত বা কিছুটা দুর্বোধ্য শব্দ সহজভাবে বোঝানোর জন্য প্রতিটি পাঠে শব্দার্থ ও টীকা সন্নিবেশ করা হয়েছে। কিছু ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় ব্যক্তির পরিচয় টীকা লিখনের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

পাঠ্যপুস্তকের শব্দার্থ ও টীকা অংশে দেশি বিদেশি প্রবাদ প্রবচন, রূপকথা, পৌরাণিক শব্দ, পারিভাষিক শব্দের ব্যাখ্যাসহ উদাহরণ দিয়ে সহজবোধ্য করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তক শিক্ষার্থীদের কাছে সুখপাঠ্য করার জন্য এই ব্যাখ্যাকরণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সেদিক থেকেও নবম-দশম শ্রেণির বাংলা পাঠ্যপুস্তক (গদ্যাংশ) শিক্ষার্থীদের কাছে সুবোধ্য ও আদর্শ মানের একটি পাঠ্যপুস্তক।

পাঠ্যপুস্তকের অনুশীলনীর বৈশিষ্ট্য বিচার : মাধ্যমিক পর্যায়ের বাংলা পাঠ্যপুস্তকে প্রত্যেকটি গদ্যের শেষে অনুশীলনী সংযোজন করা হয়েছে। অনুশীলনীতে শিক্ষার্থীদের কর্ম-অনুশীলনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এ ধরনের সুযোগ থাকায় শিক্ষার্থীরা শুধু পঠনের মাধ্যমে পাঠটি হৃদয়ঙ্গম না করে একক, জোড়ায় বা দলগতভাবে জটিল বিষয়কেও কর্ম-অনুশীলনের মাধ্যমে আত্মস্থ করতে সক্ষম হবে। এতে বর্তমানে প্রচলিত বোর্ড পরীক্ষার আদলে বহুনির্বাচনী প্রশ্নের নমুনা যেমন আছে তেমনি রয়েছে রচনামূলক প্রশ্নের উদ্দীপকসহ জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ, বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ ও মূল্যায়নধর্মী প্রশ্নের নমুনাও। বহুনির্বাচনী প্রশ্নগুলোর বিভিন্ন ধারা অর্থাৎ সাধারণ, বহুপদী সমাপ্তিসূচক ও অভিন্নতথ্যভিত্তিক প্রশ্নের নমুনাও এতে সংযোজন করা হয়েছে। ফলে অনুশীলন ও চর্চার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা এবং আচরণিক পরিবর্তন ত্বরান্বিত হবে।

পাঠ্যপুস্তকের আঙ্গিক সাজসজ্জা: বাংলা পাঠ্যপুস্তক আকার আয়তনে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর উপযোগী। পুস্তকের প্রচ্ছদ সুসজ্জিত। রং এর সমন্বয় চিত্তাকর্ষক। প্রচ্ছদের দুটি পালক বাংলা গদ্য তথা লিখন শিল্পের প্রাচীন ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রচ্ছদে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ এর লগো খচিত হয়েছে। লগোর মধ্যে বইয়ের উপরে কলমের প্রতীক এবং তারপর বাংলাদেশের জাতীয় প্রতীক শাপলার ছবি স্থান পেয়েছে। পুস্তকটির শেষ পাতায় শিক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধকরণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণী সংযোজিত হয়েছে। তাছাড়া মনুষ্যত্ব অর্জনের তাগিদ দিয়ে একটি নীতিবাক্য সন্নিবেশ করা হয়েছে।

পাঠ্যপুস্তকটি দেশের শীর্ষস্থানীয় শিক্ষাবিদ দ্বারা সংকলন ও সম্পাদনা করা হয়েছে। পুস্তকের মুদ্রণ কাগজের মানসহ সবকিছুর গুণগত মান অক্ষুণ্ন রাখার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। সর্বোপরি, শিক্ষার্থীদের মুখস্থ নির্ভরতা কমিয়ে একটি সৃজনশীল, মননশীল এবং মানবিক জাতি গঠনে এই পাঠ্যপুস্তক সকল দৃষ্টিকোণ থেকে সার্থকতার দাবি রাখে।

১.৫ : মাধ্যমিক বাংলা পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা: কবিতা

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম ২০১২ এর আওতায় পরিচালিত হচ্ছে বর্তমান শিখন-শেখানো কার্যক্রম। মাধ্যমিক স্তরের অর্থাৎ নবম-দশম শ্রেণির জন্য গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতা সংবলিত বাংলা ১ম পত্রের জন্য নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তকটির নাম দেওয়া হয়েছে মাধ্যমিক বাংলা সাহিত্য। পাঠ্যপুস্তকটিতে গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতা এমনভাবে নির্বাচন করা হয়েছে যাতে একদিকে শিক্ষার্থীরা বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক ধারাক্রম সম্পর্কে অবগত হয় এবং অন্যদিকে এ দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, শিল্প-সংস্কৃতি, নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সম্পর্কে ধারণা লাভ করে। এছাড়া এ জনগোষ্ঠীর জীবনযাপন, মুক্তিযুদ্ধের মহান অর্জন, দেশপ্রেম, মানবতাবোধ, প্রকৃতি চেতনা, নারী-পুরুষের সমমর্যাদাবোধ, ভ্রাতৃত্ববোধ এবং বিজ্ঞানমনস্কতা পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। আলোচ্য পাঠে মাধ্যমিক বাংলা পাঠ্যপুস্তকের কবিতাংশের পর্যালোচনা তুলে ধরা হলো।

পরিচিতি

পাঠ্যপুস্তকের নাম : মাধ্যমিক বাংলা সাহিত্য

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর-২০১২

সংশোধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ : নভেম্বর ২০১৬

সংকলন ও রচনা : ড. রফিকউল্লাহ খান, নূরজাহান বেগম, ড. মাসুদুজ্জামান, শ্যামলী আকরব, ড. সৌমিত্র শেখর, ড. শোয়াইব জিবরান

সম্পাদনায় : অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ এবং অধ্যাপক ড. মাহবুবুল হক

প্রকাশনায় : জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

বাইটির কম্পিউটার কম্পোজ করেছেন লেজার স্ক্যান লি:, প্রচ্ছদ এঁকেছেন সুদর্শন বাছার এবং সুজাউল আবেদীন, মুদ্রণ: এ্যাপোলো প্রিন্টার্স, ঢাকা, ডিজাইন করেছেন জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড।

কবিতাংশ

পাঠ্যপুস্তকটির কবিতাংশে মোট ৩২টি কবিতা রয়েছে। এগুলোর মধ্যে ১৫টি কবিতা শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠ্য করা হয়েছে। উল্লেখ্য, পূর্বের শিক্ষাক্রমে গদ্যাংশ এবং পদ্যাংশের জন্য আলাদা পুস্তক ছিল।

পাঠ্যপুস্তকের কবিতাসমূহ নির্বাচনের যৌক্তিকতা

মাধ্যমিক শিক্ষা (নবম-দশম শ্রেণি পর্যন্ত) আমাদের জাতীয় শিক্ষা কাঠামোর দ্বিতীয় স্তর। এ স্তরে সাহিত্য শিখনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা জীবন ও জগতের নানা বিষয় সম্পর্কে আগ্রহী ও কৌতূহলী হবে এমন উদ্দেশ্য সামনে রেখেই কবিতাগুলো নির্বাচন করা হয়েছে। দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন পরিবেশ পরিস্থিতিতে স্বচ্ছন্দে ভাব বিনিময় ও যোগাযোগের পারদর্শিতা অর্জনের বিষয়টিও বিবেচনায় রাখা হয়েছে। এছাড়া ভাব প্রকাশের উপযোগী শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধি, সাহিত্যের নানা রূপশ্রেণির সঙ্গে পরিচয় লাভের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর কল্পনাশক্তি ও সৃজনশীলতার বিকাশ এবং বৈচিত্র্যময় পাঠের মাধ্যমে মানবিক মূল্যবোধ অর্জনকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কোমলমতি শিক্ষার্থীরা অষ্টম শ্রেণিতে যে ভাষিক দক্ষতা অর্জন করেছে এবং তাদের যে সাহিত্যবোধ জাগ্রত হয়েছে তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে কবিতাগুলো নির্বাচন করা হয়েছে।

একুশ শতকের প্রেক্ষাপটে জাতীয় ও বৈশ্বিকচেতনা এবং মানবিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত আধুনিক মানুষ গড়ার লক্ষ্য সামনে রেখে বিষয়বস্তু নির্বাচনে ভাষা আন্দোলন, মহান মুক্তিযুদ্ধ, বাঙালি জাতীয়তাবাদ, অসাম্প্রদায়িক জীবনচেতনা, নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষের প্রসঙ্গ পাঠ্য কবিতাগুলোর মধ্যে গুরুত্ব পেয়েছে। বাংলা শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত বিষয়াবলি পঠন-পাঠনের উদ্দেশ্য হচ্ছে- রাষ্ট্রভাষা বাংলায় দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে দেশপ্রেমিক নাগরিক এবং দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি। আর এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই বাংলা পাঠ্যপুস্তকে কবিতাগুলো নির্বাচন করা হয়েছে।

কবিতা সংকলনের ক্ষেত্রে জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২-এর নির্দেশনা

১. কালানুক্রমিকভাবে কবিতা নির্বাচনের জন্য নির্দিষ্ট নীতিমালার আলোকে বাংলা ভাষার খ্যাতিমান কবিদের কবিতা সংকলন করতে হবে। মধ্যযুগ থেকে (ষোড়শ শতক থেকে সপ্তদশ শতক) ২ জন কবির কবিতাসহ আধুনিক কাল পর্যন্ত সময়ের অনধিক ৩০টি কবিতা সংকলিত হবে। নবম-দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য ১৫টি কবিতা পাঠ্য হবে। সংকলনে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের একাধিক কবিতা সংকলন করা যাবে।

২. প্রতিটি কবিতার শেষে কবি পরিচিতি থাকবে। কবি পরিচিতি লেখক পরিচিতির অনুরূপ হবে।

৩. প্রতিটি কবিতার শেষে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো সন্নিবেশ করতে থাকবে।

- উৎস
- ভাববস্তু
- রূপশ্রেণির পরিচয়
- শব্দার্থ ও টীকা
- বানান ও উচ্চারণে ভুল হতে পারে এমন শব্দের উদাহরণ

৪. এরপর থাকবে 'অনুশীলনী অংশ'। এতে থাকবে-

- নমুনা বহুনির্বাচনী প্রশ্ন
- নমুনা সৃজনশীল প্রশ্ন
- কর্ম-অনুশীলন

উল্লিখিত নির্দেশনা যথাযথ অনুসরণ করে প্রতিটি কবিতা সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রতিটি কবিতার শেষে উৎস, ভাববস্তু, শব্দার্থ ও টীকাসহ নমুনা বহুনির্বাচনী প্রশ্ন, নমুনা সৃজনশীল প্রশ্ন এবং কর্ম-অনুশীলন সংযোজন করা হয়েছে।

কবিতার ভাববস্তুর সাথে বিষয়বস্তুর মিল রেখে কবিতা নির্বাচনেও যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। ভাববস্তু হিসেবে শিক্ষাক্রমে নিসর্গ, দেশপ্রেম, নীতি ও মূল্যবোধ, ভক্তি, সংকল্প/উদ্দীপনা, পরার্থপরতা, কাহিনীকাব্য, গীতিধর্মী কবিতা, জীবনচিত্র, হাস্য-কৌতুক ও ব্যঙ্গ, বিশ্ব শান্তি ও কল্যাণ, বাংলাদেশ: ইতিহাস ও ঐতিহ্য, মহৎ জীবন, পশু-প্রাণীর প্রতি মমতা, বৃক্ষের প্রতি মমতা এবং মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাবোধকে নির্ধারণ করা হয়েছে। এ ভাববস্তুগুলোকে প্রাধান্য দিয়ে কবিতাগুলোও সেভাবে সাজানো হয়েছে। যেমন- দেশপ্রেমকে আশ্রয় করে সংকলিত কবিতা 'কপোতাক্ষ নদ', 'তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা', 'স্বাধীনতা এ শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো'। জীবনচিত্র আশ্রিত কবিতা 'আমার সন্তান' এবং 'পল্লিজননী'। একইভাবে বাংলাদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে ভিত্তি করে সংকলিত কবিতা 'আমার পরিচয়' এবং 'সাহসী জননী বাংলা'। নিসর্গাশ্রিত কবিতা 'ঝর্নার গান' 'সেই দিন এই মাঠ'। মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাবোধকে কেন্দ্র করে সংকলিত কবিতা 'মানুষ' এবং 'অন্ধবধূ'। এভাবে শিক্ষাক্রমে বিধৃত এক একটি ভাববস্তুকে আশ্রয় করে এক বা একাধিক কবিতা গ্রন্থটিতে সংকলন করা হয়েছে।

কবিতার বিষয়বস্তু পর্যালোচনা

১. বাংলা কাব্য সাহিত্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ এবং সনেটের প্রবক্তা, সার্থক মহাকবি মাইকেল মদুসূদন দত্তের 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতাটি কবির চতুদর্শপদী কবিতাবলি থেকে গৃহীত হয়েছে। এ কবিতায় কবির স্মৃতি কাতরতার আবরণে তাঁর অত্যুজ্জ্বল দেশপ্রেম প্রকাশিত হয়েছে। ফ্রান্সে বসবাস কালে শৈশব ও কৈশোরের স্মৃতি বিজড়িত দিনের কথা তাঁর মনে পড়ে। কবির সাথে আর কখনো এ নদের দেখা নাও হতে পারে- এ সন্দেহে কবি কপোতাক্ষের কাছে মিনতি করেছেন যে, তিনি যেভাবে কপোতাক্ষ নদকে সুদূরে বসে স্মরণ করছেন তেমনি এ নদও যেন কবিকে স্মরণ করে। কপোতাক্ষ নদকে ভালোবাসার অন্তরালে স্বদেশ ও স্বদেশের মানুষের প্রতি গভীর ভালোবাসার প্রকাশ ঘটেছে এ কবিতায়।

২. 'জীবন সঙ্গীত' কবিতাটি কবি H.W Longfellow এর A Paslm of life কবিতার ভাবানুবাদ। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'জীবন সঙ্গীত' কবিতায় মানবজন্মকে অত্যন্ত মূল্যবান বলে অভিহিত করেছেন। জীবন ক্ষণস্থায়ী। তাই মিথ্যা সুখের কল্পনা করে দুঃখ না বাড়িয়ে যথাযথ দায়িত্ব পালন করে সগৌরবে সাহসী যোদ্ধার মতো সংগ্রাম করে বাঁচার কথা আছে এ কবিতায়। মহাজ্ঞানী ও মহান ব্যক্তিদের পথ অনুসরণ করে আমাদেরকে বরণীয় হওয়ার উপদেশও দিয়েছেন তিনি।

৩. কালজয়ী সাহিত্যিক বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত 'প্রাণ' কবিতায় মানুষের বেঁচে থাকার তাৎপর্য বর্ণিত হয়েছে। এ জগৎ সুন্দর এবং আকর্ষণীয়। হাসি-কান্না, মান-অভিমান আর আবেগ ভালোবাসায় পরিপূর্ণ এ পৃথিবী ছেড়ে অন্য কোনো মোহে আবিষ্ট হয়ে কবি মৃত্যুবরণ করতে চান না। মানুষের মন জয় করে তাদেরই সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার কথা তাঁর রচনায় ঠাঁই দিয়ে তিনি অমর হতে চান। কবি বোঝাতে চেয়েছেন যে, সৎ ও শুভকর্ম করে জগতে মানুষের মধ্যে দীর্ঘ দিন বেঁচে থাকার জন্য দৃঢ় সংকল্প প্রয়োজন।

৪. 'অন্ধবধূ' কবিতায় কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী একজন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষের অনুভবের এক অসাধারণ চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। দৃষ্টিহীন হয়েও প্রকৃতির বিচিত্র জ্ঞান ও অনুভব থেকে ঋতুর পরিবর্তন, শরীরের স্পর্শ দিয়ে পারিপার্শ্বিকতাকে বুঝে নেওয়া সম্ভব। তাই দৃষ্টিহীন হয়ে নিজেকে অসহায় না ভেবে, ঘরের মধ্যে আবদ্ধ না থেকে অন্তর্দৃষ্টিকে প্রসারিত করা প্রয়োজন।

৫. প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্যের এক অপূর্ব নিদর্শন পাহাড়ি ঝরনা। চঞ্চল পায়ে পুলকিত গতিময় ছন্দে ঝরনা কীভাবে বয়ে চলে তারই বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি ঝরনার ওপর নানা সত্তা আরোপ করেছেন। আনন্দময় পদধ্বনিতে পর্বত থেকে নেমে আসা ঝর্না সাদা জলরাশির ধারা। চমৎকার এর ধ্বনিমাধুর্য ও বর্ণবৈভব। এই জলধারার সৌন্দর্য অমিয়। স্বাদ তুলনাহীন।

৬. কাজী নজরুল ইসলামের 'সাম্যবাদী' কাব্যগ্রন্থ থেকে 'মানুষ' কবিতাটি সম্পাদনা করে সংকলিত হয়েছে। মানুষের মাহাত্ম্য কীর্তন করা হয়েছে কবিতাটিতে। মানুষের জন্যই ধর্ম, ধর্মের জন্য মানুষ নয়। পৃথিবীতে সকল মানুষ যার যার ধর্মকে জীবনের চেয়েও বেশি ভালোবাসে। সাধারণ মানুষ ধর্মের জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত থাকে কিন্তু ধর্মীয় পুরোহিত/মোল্লারা হতো দরিদ্রদের সাথে হৃদয়হীন কাজ করে। তাই কবি বলেছেন, মানুষের চেয়ে বড় কিছু হতে পারে না। ধর্মও তো সে কথাই বলে। তাই যেখানে মানুষকে ঘৃণা করে অন্য কিছুকে বড় করা হয়, সেখানেই প্রতিবাদ জানাতে হবে।

৭. পৃথিবীতে একদিকে পুরাতন সভ্যতা ধ্বংস হয় অন্যদিকে নতুন সভ্যতা গড়ে ওঠে। মানুষ কোলাহলশূন্য মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেও প্রকৃতিতে সর্বদাই বিরাজ করে কোলাহলপূর্ণ ব্যস্ততা। কোনো কিছুই মৃত্যুকে রোধ করতে পারে না। তাই 'সেই দিন এই মাঠ' কবিতায় কবি জীবনানন্দ দাশ বলেছেন– মানুষের মৃত্যু আছে কিন্তু এ জগতে সৌন্দর্যের মৃত্যু নেই। সৌন্দর্যবিলাসী মানুষের স্বপ্নও অজর, অমর।

৮. কবি আহসান হাবীব 'আমি কোনো আগন্তুক নই' কবিতায় জন্মভূমির সাথে মানুষের সম্পর্কের স্বরূপ চিত্রায়িত করেছেন। জন্মভূমির সঙ্গে মানুষের নাড়ির সম্পর্ক। তার প্রতিটি উপাদান আপন সত্তায় অনুভব করাই প্রকৃত দেশপ্রেমের শামিল। কবি নিজস্ব অনুভব নানা উপমার সাহায্যে তুলে ধরেছেন। গোটা গ্রামীণ প্রকৃতির সাথে তাঁর জীবন বাঁধা। তবে এ জীবনবোধ কবির একার নয়, সমগ্র মানুষের।

৯. 'তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা' কবিতাটি কবি শামসুর রাহমান-এর 'বন্দী শিবির' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। স্বাধীনতা শুধু শব্দমাত্র নয়, এটি এমন এক অধিকার ও অনুভব যা মানুষের জন্মগত। কবিতাটিতে ১৯৭১ সালে পাক হানাদার বাহিনীর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের চিত্র এবং এদেশের বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষ কীভাবে আত্মত্যাগের মাধ্যমে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনবে তার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত হয়েছে।

১০. কিশোরদের বন্দনা গীতি নিয়ে রচিত হাসান হাফিজুর রহমান-এর 'অবাক সূর্যোদয়' কবিতাটি। কিছু ছবি, ভাবনা আর প্রতীকের মধ্য দিয়ে কবি এ কবিতায় কিশোরদের জয়গান করেছেন। কিশোররা ভয়হীন সত্তার অধিকারী। শহীদের খুন তাদের দুহাতে সূর্যোদয়ের মতো লেখা আছে।

১১. 'পল্লিজননী' কবিতাটি কবি জসীম উদদীনের 'রাখালী' কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলন করা হয়েছে। মায়ের মতো মমতাময়ী আর কেউ নেই। অসুস্থ ছেলের মৃত্যুপূর্ব করুণ অবস্থা বর্ণনায় কবি অনেক উপমার ব্যবহার করেছেন। দুরন্ত ছেলে ভালো হয়েই খেলতে যাবে এমন অঙ্গীকারসহ কত না আবদার আর অঙ্গীকারের চিত্র কবি তুলে ধরেছেন। দরিদ্র মায়ের ঔষধ পথ্য কোনোটাই কেনার সামর্থ্য নেই। অপত্যস্নেহের অনিবার্য আকর্ষণই এ কবিতার মূলকথা।

১২. 'আমার পরিচয়' কবি সৈয়দ শামসুল হক-এর 'কিশোর কবিতা সমগ্র' থেকে সংকলিত। কবিতাটিতে স্বাধীন সার্বভৌম বাঙালি জাতিসত্তার সমৃদ্ধ ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির পটভূমি চিত্রায়িত হয়েছে। অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতিসত্তার ক্রমবিবর্তন ধারা ও বিচিত্র জীবনবোধের পরিচয় মুদ্রিত হয়েছে এ কবিতায়। সর্বোপরি কবি বাঙালি জাতির পথচলার বিভিন্ন পর্যায় যেমন তাৎপর্যময় করে তুলেছেন তেমনি সন্ধান দিয়েছেন আমাদের অস্তিত্বের শেকড়ের।

১৩. 'স্বাধীনতা, এ শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো' কবিতাটির উদ্দেশ্য হলো বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের সত্যস্বরূপ উন্মোচনের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের মনে স্বাধীনতা ও দেশপ্রেমের প্রেরণা জাগ্রত করা। সেদিনের ভাষণে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ডাক দিলে এ দেশের কৃষক-শ্রমিক-মজুর-বুদ্ধিজীবী-নারী-পুরুষ-যুবক-বৃদ্ধ সবাই যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তাই তিনি কোনো সাধারণ নেতা নন, তিনি একজন বিদগ্ধ রাজনীতিক, একজন রাজনীতির কবি। এ দেশের আপামরসাধারণ মানুষের ভালোবাসায় সিক্ত একজন আদর্শনেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

১৪. বাঙালি জাতির শৌর্য-বীর্যের মাহাত্ম্যগীতি কবি কামাল চৌধুরীর 'সাহসী জননী বাংলা' কবিতাটি। ইতিহাসে ভীতু এবং ভেতো বলে যাদের কটাক্ষ করা হয়েছিল তারাই সকল মিথ্যাচার ব্যর্থ করে দিয়ে ছিনিয়ে আনে জাতির মুক্তি ও স্বাধীনতা। ভাষা আন্দোলনের প্রেরণাকে অন্তরে ধারণ করা এবং অনাদি অতীতের সংগ্রামী ঐতিহ্যকে লালন করা একাত্তরের এ দেশের মানুষ- জননীর প্রাণের উত্তাপে স্পন্দিত, তারা মাটি থেকে ওঠে আসা সাহসের ফোয়ারায় স্নাত।

১৫. এছাড়া কবি আবদুল হাকিমের 'বঙ্গবাণী' কবিতায় মাতৃভাষার মহিমা বর্ণনা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জুতা আবিষ্কার' কবিতায় জীবন উপলব্ধির রসাত্মক প্রকাশ, সিকানদার আবু জাফরের 'আশা' কবিতায় আত্মকেন্দ্রিক ও বিচ্ছিন্নতাবোধে আক্রান্ত মানুষকে অতিক্রম করার বাসনা, সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'রানার' কবিতায় শ্রমজীবী মানুষের কর্মনিষ্ঠতা তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

মূল্যায়ন

সবল দিক : জাতীয় শিক্ষানীতি ও শিক্ষাক্রমের ভাববস্তু ও বিষয়বস্তুর ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে প্রতিটি শ্রেণির পাঠ্যসূচি নির্বাচন করা হয়। মাধ্যমিক স্তরের নবম-দশম শ্রেণির জন্য নির্ধারিত 'মাধ্যমিক বাংলা সাহিত্য' বইটিতে সংকলিত ৩২টি কবিতার মধ্যে নির্বাচিত ১৫টি কবিতাও সেই বিবেচনায় পাঠ্য করা হয়েছে। কবিতাগুলো কালানুক্রমিকভাবে সাজানো হয়েছে। বেশি বড় কবিতাগুলোকে সংক্ষিপ্ত রূপ দিয়ে সংকলন করা হয়েছে। প্রতিটি কবিতার শেষে অনুশীলনী অংশে কর্মানুশীলন দিয়ে পুরো অধ্যায়টিকে সক্রিয়তাভিত্তিক করা হয়েছে। পাশাপাশি ভাষার প্রতিটি দক্ষতাকে অর্জনের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বহুনির্বাচনী ও রচনামূলক সৃজনশীল নমুনাপ্রশ্নের উদাহরণও দেওয়া হয়েছে শিক্ষাক্রমের নির্দেশনা অনুযায়ী। সুতরাং বলা যায়, এ পাঠ্য বইটির কবিতা অংশ শিক্ষাক্রমে বর্ণিত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে যেমন সহায়ক তেমনি শিক্ষার্থীর ভাষা ও সাহিত্যচর্চার একটি যুগোপযোগী পাঠ্যপুস্তক।

দুর্বল দিক : নবম-দশম শ্রেণির জন্য নির্ধারিত মাধ্যমিক বাংলা সাহিত্য পাঠ্যবইটির কাগজ মানসম্মত নয়। বইটির কভার পৃষ্ঠা (মলাট) আরও মজবুত এবং উন্নত মানের হলে বছর মেয়াদি ব্যবহারে এটি আরও উপযোগী হতো। অনুশীলনী অংশে নমুনা প্রশ্নসংখ্যা আরো বাড়ানো গেলে শিক্ষার্থীরা উপকৃত হতো।

১.৬ : মাধ্যমিক বাংলা পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা : সহপাঠ

মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রমে নবম-দশম শ্রেণির আবশ্যিক বাংলা বিষয়ের অন্তর্গত সহপাঠ পাঠ্যপুস্তকটির প্রথমাংশে একটি উপন্যাস ও দ্বিতীয়াংশে একটি নাটক অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উপন্যাস ও নাটকের প্রেক্ষাপট, শব্দসংখ্যা, ফন্ট, সাইজ, পৃষ্ঠা সংখ্যা, আঙ্গিক ও গঠনকৌশল, বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, ঔপন্যাসিক ও নাট্যকারের পরিচিতি, সমাজ ও চরিত্র চিত্রণ, ভাষারীতি এমনকি অভ্যন্তরভাগে কোন অংশ কত পৃষ্ঠার হবে- শিক্ষাক্রমের সেসব নির্দেশনা যথাযথ অনুসরণ করে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাস এবং 'বহিপীর' নাটকটি পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যের দুটি বিশেষ শাখা যথাক্রমে উপন্যাস এবং নাটকের সাথে শিক্ষার্থীদের পূর্ণাঙ্গরূপে পরিচয় ঘটানোর জন্য এবং জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের পাশাপাশি তাদের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য উপন্যাস 'কাকতাড়ুয়া' ও নাটক 'বহিপীর' নির্বাচন করা হয়েছে।

পাঠ্যপুস্তকটির লেখক ও সংকলকগণ হলেন অধ্যাপক ড. রফিকউল্লাহ খান, অধ্যাপক নূরজাহান বেগম, অধ্যাপক ড. মাসুদুজ্জামান, অধ্যাপক শ্যামলী আকবর, অধ্যাপক ড. সৌমিত্র শেখর ও ড. শোয়াইব জিবরান। পুস্তকটির সম্পাদনা করেছেন অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ ও অধ্যাপক ড. মাহবুবুল হক। প্রথম প্রকাশ নভেম্বর, ২০১২। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত এ পুস্তকটিও সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।

পুস্তকটিতে উপন্যাস এবং নাটক একই সাথে সন্নিবেশ করা হয়েছে। শুরুতেই উপন্যাসের ধারণা ও সংজ্ঞা, উপন্যাসের আঙ্গিক, গঠনকৌশল এবং বাংলা উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি আলোচনা করা হয়েছে। উপন্যাসের আকার কতটা ক্ষুদ্র বা বৃহৎ হতে পারে, তার উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহত্তম উপন্যাস In Search of lost time যার শব্দ সংখ্যা ১২ লাখের মতো। আর ক্ষুদ্রতম উপন্যাস ইতালির উমবার্তো একোর সাত শব্দের এক বাক্যে লেখা একটি উপন্যাস।

উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য বা গঠন কাঠামো নিয়েও ঔপন্যাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা গেছে। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়– উপন্যাস অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের সৃষ্টি। কবিতা, মহাকাব্য ও আখ্যানকাব্যের পরই উপন্যাসের সৃষ্টি। উপন্যাস মূলত লেখকের জীবনদর্শন ও জীবনবোধের বহিঃপ্রকাশ।

পুস্তকটিতে বাংলা উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি অংশে বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস রচনার সূত্রপাত, বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস ও প্রথম সার্থক উপন্যাস এবং বঙ্কিমচন্দ্রই যে প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিক– সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এরপর যেসব খ্যাতিমান ঔপন্যাসিকের হাতে বাংলা উপন্যাস সাহিত্য ক্রমবিকাশ লাভ করেছে তার ধারাবাহিক বর্ণনাও দেয়া হয়েছে।

কাকতাড়ুয়া উপন্যাসের চরিত্র বিশ্লেষণ

উপন্যাসটির প্রধান চরিত্র বুধা। অসীম সাহসের অধিকারী এ বালক চরিত্রটিকে ঘিরে গোটা উপন্যাসের কাহিনী গড়ে ওঠেছে। মা-বাবা ও ভাই-বোনের মৃত্যুই তাকে সাহসী বানিয়েছে। আরও সাহসী হয়েছে সে একা একা বেড়ে ওঠার কারণে। একা একা থাকতে গিয়ে সে স্বাধীন মানুষ হিসেবেও গড়ে ওঠে। বুধা চরিত্রটির মাধ্যমে লেখিকা একজন কিশোরের ভাবনাহীনভাবে বেড়ে ওঠা এবং মুক্তিযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার কাহিনী চিত্রায়িত করেছেন। যুদ্ধে জড়িয়ে সে শান্তি কমিটি আর রাজাকার কমান্ডারের বাড়ি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। ক্যাম্পের বাঙ্কারে মাইন পেতে রেখে আসে। ভয় পায় না। বুধার চরিত্রের এ বিকাশ তাই খুবই স্বাভাবিক বলে মনে হয়। কিশোর হিসেবে তার মুক্তিযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার বিষয়টি এভাবেই যৌক্তিক হয়ে ওঠেছে।

কাকতাড়ুয়া উপন্যাসে আরো বেশ কয়েকটি চরিত্র আমরা দেখতে পাই। তারা খুব বড় ভূমিকা পালন করেনি। তবে উপন্যাসের কাহিনী গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। এ চরিত্রগুলো হচ্ছে কুন্তি, নোলক বুয়া, হরিকাকু, আহাদ মুন্সি, আলি, মিঠু, ফুলকলি, রাজাকার কুদ্দুস ও মুক্তিযোদ্ধা শিল্পী শাহাবুদ্দিন। এ চরিত্রগুলো ছাড়া আরও একজনের প্রভাব এ উপন্যাসে স্পষ্ট। সেই মানুষটি হচ্ছেন বঙ্গবন্ধু। বুধা অনেক সময় যখন মুক্তিযুদ্ধের কথা ভেবেছে, তখনই ছায়ার মতো তাঁর স্বাধীনতার আহ্বান বুধাকে উদ্দীপ্ত করেছে। এ চরিত্রগুলো দিয়ে ঔপন্যাসিক সেলিনা হোসেন উপন্যাসের কাহিনীকে পাঠকের কাছে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছেন।

উপন্যাসের ভাষা বিশ্লেষণ

উপন্যাসটির ভাষাভঙ্গি, পরিবেশ চিত্রণ ও বর্ণনারীতিও বেশ আকর্ষণীয়। লেখিকা শুরু থেকেই ছোট ছোট বাক্যে সাবলীলভাবে উপন্যাসের কাহিনী গেঁথে তুলেছেন। বাক্য বিন্যাসে তিনি যেমন কৌশলী তেমনি ঘটনার আবহ সৃষ্টিতেও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। যুদ্ধকালীন আবেগঘন ও শ্বাসরুদ্ধকর বর্ণনা পড়ে মনে হয় যেন যুদ্ধের ঘটনা সামনেই ঘটছে। লেখিকা গ্রামীণ জনপদের অতি সাধারণ মানুষের কথ্য ভাষাকে প্রমিতভাবে উপস্থাপন করেছেন। প্রেক্ষাপটগুলো এমনভাবে উপস্থাপন করা

হয়েছে যে সাধারণ পাঠকেরও উপন্যাসটির বিষয়আঙ্গিক ও প্রকরণ বুঝতে কোনো কষ্ট হয় না। একজন দক্ষ ভাষাশিল্পী না হলে এতটা লালিত্যপূর্ণ ভাষা প্রয়োগ কখনোই সম্ভব হতো না। ভাষার চমকপ্রদ ব্যবহারের মাধ্যমে সেলিনা হোসেন মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাকে নতুন প্রজন্মের সামনে এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন যে– যুদ্ধ না দেখেও উত্তীর্ণ কৈশোরের শিক্ষার্থীর কাছেও যুদ্ধকালীন বিভীষিকা আঁচ করতে কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয়। আর এখানেই উপন্যাসটির সার্থকতা।

কাকতাড়ুয়া উপন্যাসের বিষয়বস্তু পর্যালোচনা

প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক সেলিনা হোসেন-এর 'কাকতাড়ুয়া' ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত এক সাহসী কিশোর মুক্তিযোদ্ধার কাহিনী। পাক হানাদার বাহিনী দ্বারা আক্রান্ত বাংলাদেশের কোনো একটি গ্রাম। সেখানে পাক বাহিনীর পাশাপাশি বিচরণ রয়েছে রাজাকারদেরও। নির্বিচারে আক্রান্ত হওয়া এ গ্রামের বাজারের দোকানপাট হানাদার বাহিনী পুড়িয়ে দিলে তা দেখে কিশোর বুধার ভেতরে প্রতিশোধের আগুন জ্বলে ওঠে। তিন কুলে তার কেউ নেই। পুরো গ্রাম, হাট-বাজার সর্বত্র তার বিচরণক্ষেত্র। আশপাশের সকল মানুষ তার চেনা-জানা। সকলেই তার আপনজন। কেউ তাকে অবিশ্বাস করে না বলে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়ে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে কঠিন এবং ঝুঁকিপূর্ণ কাজটিও সে অনায়াসে করতে পেরেছে। বিনা অপরাধে পাক হানাদার কর্তৃক দোকানপাট পোড়ানোর ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়েই বুধা স্থির করে- সে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যাবে না। এ কাজের প্রতিশোধ নিবে এবং সে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেবে। কিন্তু বয়সে খুব ছোট হওয়ায় মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে পারা নিয়ে তার মধ্যে সন্দেহ ছিল। যাহোক এক রাতের আঁধারে মুক্তিযোদ্ধা অলি ও মিঠু গ্রামে এলে বুধার সাথে তাদের পরিচয় ঘটে। গ্রামেই মিলিটারি ক্যাম্পটা উড়িয়ে দিয়ে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তার আত্মপ্রকাশ ঘটল। এরপর একে একে শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান আহাদ মুন্সির বাড়ি এবং রাজাকার কমান্ডার এর বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েও বুধা সকলের সন্দেহের ঊর্ধ্বে রয়ে গেল। এতিম ভবঘুরে কিশোর বলে কেউ তাকে সন্দেহ করল না। অবশেষে আসল সেই দিন। মুক্তিযোদ্ধাদের নেতা শিল্পী সাহাবুদ্দিনের পরিকল্পনায় মাইন পেতে পাক বাহিনীর প্রধান ক্যাম্প উড়িয়ে দেওয়ার দায়িত্ব পেল বুধা। সুকৌশলে বাঙ্কার খননের সময় তার ভেতরে সে মাইন পুঁতে চলে এলো নদীর ধারে। যেখানে নৌকায় অপেক্ষা করছিলেন অন্যান্য সহযোদ্ধা নিয়ে শিল্পী সাহাবুদ্দিন। তারপর সে মাহেন্দ্রক্ষণ। পাক সেনারা বাঙ্কারে ঢুকতেই মাইন বিস্ফোরণে পুরো ক্যাম্পটা উড়ে গেল। বুধার অভিযান সফল হলো। তারা সবাই নৌকা নিয়ে নিরাপদ দূরত্বে চলে গেল। এভাবেই কিশোর বুধার বীরত্বপূর্ণ কাহিনী দিয়ে উপন্যাসের পরিসমাপ্তি ঘটে।

নাটক : বহিপীর

নাটক অংশে নাটকের ধারণা ও সংজ্ঞা, নাটকের আঙ্গিক ও গঠনকৌশল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এরপরই আলোচনা করা হয়েছে বাংলা নাটকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি। বাংলা সাহিত্যে নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ এবং উল্লেখযোগ্য নাট্যকারগণের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে এ অংশে।

বহিপীর নাটকের চরিত্র বিশ্লেষণ

নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র বহিপীর। বইয়ের ভাষায় কথা বলার কারণে তার এ নামকরণ। অত্যন্ত ধূর্ত ও বাস্তবজ্ঞান সম্পন্ন মানুষ এই বহিপির। তিনি অশিক্ষিত সাধারণ মানুষের কুসংস্কার ও ধর্মবিশ্বাসকে পুঁজি করে তাঁর ধর্মব্যবসা পরিচালনা করেন। সারা বছর মুরিদদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে অর্থ সম্পদ সংগ্রহ করেন। বৃদ্ধ বয়সে বিয়ে করেন এক মুরিদের কন্যাকে। কন্যা পালিয়ে গেলে অনেক চালাকি আর বুদ্ধিমত্তা খাটিয়ে উদ্ধারের চেষ্টা করেন। পুলিশের ভয় দেখান। কিন্তু প্রতিপক্ষও সহজে হার না মানায় বাস্তবতাকে বহিপীর মেনে নেন। নাট্যকার তাকে অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও বাস্তববাদী হিসেবে আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন।

অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে তাহেরা, হাসেম আলী ও হাতেম আলী প্রধান। তাহেরা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। তাকে কেন্দ্র করেই নাটকটির ঘটনাপ্রবাহ আবর্তিত হয়েছে। মাতৃহারা তাহেরা তার কুসংস্কারাচ্ছন্ন বাবা এবং সৎ মাতার ষড়যন্ত্রের বিয়ে সুকৌশলে নস্যাৎ করেছে। সবাই একমত হলেও বৃদ্ধের সাথে সে সংসার করে নি। সবশেষে সে জমিদার পুত্র হাসেম আলীর হাত ধরে নতুন জীবনের সন্ধানে রওয়ানা দিয়েছে। নাট্যকার তাহেরাকে বিশ শতকের প্রারম্ভে নারী অধিকার ও জাগরণের প্রতীক হিসেবে সার্থকভাবে উপস্থাপন করেছেন।

হাসেম আলী জমিদারপুত্র। নাটকের গুরুত্বপূর্ণ নায়ক চরিত্র। নাট্যকার তাকে বহিপীরের বিপরীত চরিত্র হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। মানবীয় মূল্যবোধ ও ন্যায়বোধের প্রতীক হাসেম আলী শিক্ষিত রুচিবান। সে অত্যন্ত যুক্তিবাদী, আধুনিক ও মানবিক অনুভূতিসম্পন্ন। তাই জমিদারি নিয়ে না ভেবে নিজে ব্যবসা কিংবা চাকরির মাধ্যমে স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করেছে। মানবতাবাদী বলেই সে তাহেরাকে বাঁচাতে চেয়েছে। হাশেম আলী ধর্মীয় কুসংস্কার ও সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রতীক চরিত্র।

এছাড়া হাতেম আলী, হকিকুল্লাহ ও জমিদার গিন্নি চরিত্রগুলোও দক্ষ হাতে নাট্যকার চিত্রণ করেছেন। তৎকালীন সমাজ চিত্র, সামাজিক অনাচার, জমিদারি প্রথা, পির প্রথা, সূর্যাস্ত আইন, কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসকে ফুটিয়ে তুলতে যখন যে চরিত্রকে যেভাবে প্রয়োজন সেভাবেই অত্যন্ত নিপুণ হাতে সাজিয়েছেন তিনি।

নাটকের ভাষা বিচার

ষাটের দশকের শক্তিমান লেখকদের একজন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ। সাবলীল ভঙ্গিতে বাংলা ভাষার প্রমিত রূপ তিনি ব্যবহার করেছেন সুনিপুণ হাতে। ভাষার চপল প্রকাশভঙ্গির কারণে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর প্রতিটি রচনাই বাংলা সাহিত্যের মৌলিক সম্পদে পরিণত হয়েছে। বহিপীর নাটকটিও তার বাইরে নয়। ছোট বাক্যবিন্যাস আর সহজ ও বোধগম্য শব্দচয়ন একদিকে যেমন নাটকটির অর্থব্যক্তি রক্ষা করেছে তেমনি বক্তব্য বর্ণনাকে করেছে প্রাঞ্জল। চলিত ভাষারীতির এমন পরিশীলিত ব্যবহার কমসংখ্যক লেখকের মাঝেই দেখা যায়। নাট্যকার শুধু বহিপিরের সংলাপে সাধু ভাষারীতির প্রয়োগ দেখিয়েছেন। এটাও নাট্যকার করেছেন সচেতনভাবে। কিন্তু এতে নাটকের জৌলুস কোনো অংশে কমে নি। চরিত্রের বিশেষত্বকে ফুটিয়ে তুলতেই তিনি তা করেছেন। গ্রামীণ সমাজের অতি সাধারণের সংলাপেও তিনি দিয়েছেন প্রমিত চলিত রীতি। সব মিলিয়ে ভাষা বিচারে এটিকে একটি সুখপাঠ্য নাটক হিসেবেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়।

বহিপীর নাটকের বিষয়বস্তু পর্যালোচনা

প্রখ্যাত সাহিত্যিক ওয়ালীউল্লাহ (১৯২০-১৯৭১) রচিত বহিপীর নাটকটি ১৯৬০ সালে ঢাকা থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। তৎকালীন বাঙালি মুসলিম সমাজে প্রচলিত পীর ব্যবসাকে কেন্দ্র করে নাটকের কাহিনী আবর্তিত হয়েছে। নাটকটি গড়ে ওঠেছে বহিপিরের সর্বগ্রাসী স্বার্থ ও নতুন দিনের প্রতীক এক বালিকার বিদ্রোহের কাহিনীকে কেন্দ্র করে। নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র বহিপীর। তিনি দুই বছর পর পর একবার শিষ্য বা মুরিদদের বাড়িতে ঘুরে বেড়ান। তখন মুরিদরা সর্বস্ব দিয়ে তাঁর সেবা করেন। একবার এক মুরিদ তার মাতৃহারা কন্যা তাহেরাকে এই বৃদ্ধ পিরের সাথে জোর করে বিয়ে দেন। তাহেরা তা মেনে নেয়নি। সে পালিয়ে হাতেম আলি জমিদারের শহরগামী বজরায় আশ্রয় নেয়। বহিপীরও তার সঙ্গী হকিকুল্লাহকে সঙ্গে নিয়ে তার সন্ধানে বের হন। পথিমধ্যে বহিপিরের নৌকা দুর্ঘটনায় পতিত হয় এবং ঘটনাচক্রে তিনি হাতেম আলীর বজরাতেই আশ্রয় লাভ করেন। একসময় এ বজরাতেই তাহেরার অবস্থান জানতে পেরে বহিপির তাহেরাকে পাওয়ার জন্য কূটকৌশলের আশ্রয় নেন। কিন্তু জমিদারপুত্র হাসেম আলী তাহেরার পক্ষ নিলে দ্বন্দ্ব চরমে ওঠে। এক পর্যায়ে বহিপীর জমিদারের অসহায়ত্বের সুযোগ নেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জয়ী হতে পারেন না। তাহেরা ও হাসেম আলী সব বাধা ছিন্ন করে পালিয়ে যায় এবং বহিপীরও পরে বাস্তব পরিস্থিতি মেনে নেন।

১.৭ : মাধ্যমিক বাংলা পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা: ব্যাকরণ ও নির্মিতি (অনুরচন)

মাধ্যমিক স্তরে নবম ও দশম শ্রেণির জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রণীত 'বাংলা ভাষার ব্যাকরণ' বইটি পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ বইটি ১৯৯৬ শিক্ষাবর্ষ থেকেই নবম ও দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত। নিচে এর পর্যালোচনা তুলে ধরা হলো।

পরিচিতি

পুস্তকের নাম	: বাংলা ভাষার ব্যাকরণ
রচনায়	: মুনির চৌধুরী ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী
সম্পাদনায়	: ইব্রাহীম খলিল, ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ এবং শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী
প্রকাশনায়	: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা
প্রথম মুদ্রণ	: ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৩
সংশোধিত পরিমার্জিত সংস্করণ	: নভেম্বর, ২০০০
পুনর্মুদ্রণ	: জুন, ২০১৬
চিত্রাঙ্কন	: বীরেন সোম
কম্পিউটার কম্পোজ	: পারফর্ম কালার গ্রাফিক্স লি:
ডিজাইন	: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
মুদ্রণ	: বলাকা প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স
মূল্য	: সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।

বিষয়বস্তু পর্যালোচনা

বাংলা ভাষার ব্যাকরণ পুস্তকটিতে মোট পাঁচটি অধ্যায় রয়েছে। অধ্যায়ভিত্তিক বিষয়বস্তু নিম্নরূপ-

১ম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদে রয়েছে 'ভাষা'। ভাষা কী? কীভাবে ভাষার পরিবর্তন ঘটে, পৃথিবীতে ভাষার মোট সংখ্যা, বাংলা ভাষা ব্যবহারকারীর সংখ্যা, বাংলা ভাষার অবস্থান, ভাষারীতি (কথ্য, চলিত ও সাধুরীতি), সাধু ও চলিত রীতির পার্থক্য, উদাহরণ, বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডার, পারিভাষিক শব্দ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বাংলা ব্যাকরণ ও এর আলোচ্য বিষয়ে রয়েছে ভাষার মৌলিক অংশ ধ্বনি, শব্দ, বাক্য এবং অর্থ। এছাড়াও এতে ব্যাকরণের ৪টি আলোচ্য বিষয়: ধ্বনিতত্ত্ব, শব্দ বা রূপতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব এবং অর্থতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বাংলা ব্যাকরণের আলোচনায় ব্যবহৃত কতিপয় পারিভাষিক শব্দের পরিচয় পুস্তকটিতে তুলে ধরা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়ে রয়েছে 'ধ্বনিতত্ত্বের আলোচনা। এর প্রথম পরিচ্ছেদে রয়েছে ধ্বনি ও বর্ণ প্রকরণ। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত ধ্বনি ও বর্ণের শ্রেণিবিভাগ, বর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ 'কার' ও 'ফলা', উচ্চারণস্থান ভেদে ধ্বনির শ্রেণিবিভাগ, ধ্বনির উচ্চারণ বিধি এবং 'অ' এবং 'এ' ধ্বনির সংবৃত ও বিবৃত উচ্চারণ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে এ অংশে। এছাড়াও এ বইটিতে ব্যঞ্জন ধ্বনির উচ্চারণ রীতি, অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ, অঘোষ ও ঘোষ ধ্বনি, সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি ও যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে রয়েছে ধ্বনির পরিবর্তন। ভাষার পরিবর্তন ধ্বনি পরিবর্তনের সাথে সম্পৃক্ত। তাই এ অংশে ধ্বনি পরিবর্তনের নানা প্রক্রিয়া যেমন- স্বরাগম, স্বরলোপ, অপিনিহিতি, অভিশ্রুতি, স্বরসঙ্গতি, ধ্বনি বিপর্যয়, সমীভবন, বিষমীভবন, দ্বিত্ব ব্যঞ্জন, ব্যঞ্জন বিকৃতি, ব্যঞ্জনচ্যুতি, অ-শ্রুতি ও ব-শ্রুতি প্রভৃতি আলোচনা এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে রয়েছে ণত্ব ও ষত্ব বিধান। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত তৎসম বা সংস্কৃত শব্দে ণ এবং ষ এর ব্যবহারের নিয়মগুলো এবং স্বভাবতই যেসব শব্দে ণ এবং ষ হয় সেগুলোর উদাহরণ এ অংশে দেওয়া হয়েছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে রয়েছে সন্ধি। সন্ধির সংজ্ঞা, সন্ধি পাঠের উদ্দেশ্য, বাংলা সন্ধির শ্রেণিবিভাগ, তৎসম সন্ধির উদাহরণসহ শ্রেণিবিভাগ, সন্ধি গঠনের সূত্র, আলাদাভাবে স্বর ও ব্যঞ্জন সন্ধি, বিসর্গ সন্ধি, বিশেষ নিয়মে সাধিত সন্ধি, নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধির উদাহরণ এ অংশে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়ে রয়েছে শব্দতত্ত্ব বা রূপতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা। এ অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে আছে পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ। পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দের পরিচয়, পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দের শ্রেণিবিভাগ, নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দ, সংস্কৃত স্ত্রী প্রত্যয়যোগে গঠিত স্ত্রীবাচক শব্দ, ঈ, ইকা, আনী, ঈনী, নী যোগে গঠিত স্ত্রীবাচক শব্দ, বিশেষ নিয়মে সাধিত স্ত্রীবাচক শব্দ, নিত্য পুরুষবাচক শব্দ গঠনের সহজ ও সাবলীল উপস্থাপনা রয়েছে এ অধ্যায়ে।

তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে দ্বিরুক্ত শব্দ, দ্বিরুক্ত শব্দের শ্রেণিবিভাগ, দ্বিরুক্ত শব্দের গঠন, শব্দাত্মক, পদাত্মক ও ধনাত্মক শব্দের দ্বিরুক্তি এবং বাক্যের মধ্যে দ্বিরুক্ত শব্দের ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে সংখ্যাবাচক শব্দের ধারণা দেওয়া হয়েছে। সংখ্যাবাচক শব্দের শ্রেণিবিভাগ যথা অঙ্কবাচক, গুণবাচক, পুরণবাচক এবং তারিখবাচক সংখ্যা নিয়ে আলোচনা রয়েছে এ অংশে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে 'বচন' অংশে একবচন ও বহুবচনজ্ঞাপক শব্দের ব্যবহার দেখানো হয়েছে। প্রাণিবাচক, অপ্রাণিবাচক এবং উন্নত প্রাণিবাচক শব্দে কোন কোন বহুবচন বাচক শব্দ ব্যবহার করা হবে সেগুলো উদাহরণসহ দেখানো হয়েছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদে পদাশ্রিত নির্দেশক অংশে পদাশ্রিত নির্দেশকের পরিচয়, একবচন ও বহুবচনে ব্যবহৃত পদাশ্রিত নির্দেশক এবং শব্দ বা বাক্যে পদাশ্রিত নির্দেশক-এর ব্যবহার দেখানো হয়েছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে রয়েছে সমাস। সমাসের প্রাথমিক আলোচনা, উদাহরণসহ সমাসের শ্রেণিবিভাগ, প্রত্যেক প্রকার সমাসের ওপর বিস্তারিত আলোচনা, প্রধান ৬টি সমাস ছাড়াও অপ্রধান সমাস যেমন- অলুক সমাস, উপপদ সমাস, প্রাদি সমাস, নিত্য সমাস প্রভৃতির উদাহরণসহ আলোচনা রয়েছে সমাস অধ্যায়ে।

সপ্তম পরিচ্ছেদে রয়েছে উপসর্গ। উপসর্গ ও উপসর্গের শ্রেণিবিভাগের সাথে শিক্ষার্থীর পরিচিতির পাশাপাশি প্রতিটি উপসর্গ কী অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে– তা উদাহরণসহ উপস্থাপিত হয়েছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদে ধাতু ও এর শ্রেণিবিভাগ নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি মৌলিক, সাধিত ও সংযোগমূলক ধাতুর বাক্যে প্রয়োগ দেখানো হয়েছে।

নবম ও দশম পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে প্রকৃতি ও প্রত্যয়। প্রথমে প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের প্রাথমিক আলোচনা ও শ্রেণিবিভাগ দেখানো হয়েছে। এরপর প্রতিটি প্রত্যয়যোগে কীভাবে পদ গঠিত হয়- উদাহরণসহ তা উপস্থাপন করা হয়েছে। তদ্ধিত প্রত্যয় অংশে প্রতিটি প্রত্যয় কী অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে তা দেখানো হয়েছে।

একাদশ পরিচ্ছেদে রয়েছে শব্দের শ্রেণিবিভাগ। এ অংশে শব্দের গঠনগত, অর্থগত ও উৎসমূলক শ্রেণিবিভাগ আলোচিত হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে 'পদ' নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রত্যেক প্রকার পদের আবার আলাদা শ্রেণিবিভাগ, বিশেষণের অতিশায়ন, পুরুষ, পদের বিশিষ্ট প্রয়োগ, একই পদের ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহার তুলে ধরা হয়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে রয়েছে ক্রিয়াপদ। ক্রিয়াপদের সংজ্ঞা, গঠন, ক্রিয়ার প্রকারভেদ এবং বাক্যে বিভিন্ন ক্রিয়ার প্রয়োগ আলোচনা করা হয়েছে এ অংশে। ক্রিয়াপদ আলোচনার পাশাপাশি এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে ক্রিয়ার ভাব। ক্রিয়ার ভাবের শ্রেণিবিভাগ এবং অনুজ্ঞা ও সাপেক্ষভাব কতভাবে ব্যবহার হতে পারে তা দেখানো হয়েছে এখানে।

তৃতীয় ও চতুর্থ পরিচ্ছেদে কাল, পুরুষ ও কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ অংশে বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যত কালের শ্রেণিবিভাগ, সমাপিকা, অসমাপিকা ও যৌগিক ক্রিয়ার গঠন এবং বাক্যে ব্যবহার দেখানো হয়েছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদে রয়েছে 'বাংলা অনুজ্ঞা'। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালে কীভাবে অনুজ্ঞার ব্যবহার করতে হয়– বিশেষ করে সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের ক্ষেত্রে অনুজ্ঞার ধরন উপস্থাপন করা হয়েছে এখানে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে ক্রিয়া-বিভক্তির সাধু ও চলিত রূপ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ ক্রিয়া বিভক্তিগুলো কাল ও পুরুষ ভেদে কোন ধরনের রূপ পরিগ্রহ করে তা সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত সকল ধাতুর ২০টি 'গণ' এবং ধাতুর 'গণ' ঠিক করার রীতি এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদে কারক ও বিভক্তি এবং সম্বন্ধ ও সম্বোধন পদ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কারকের সংজ্ঞা, শ্রেণিবিভাগ, বিভক্তি (শব্দ বিভক্তি), কর্তার শ্রেণিবিভাগ, কর্মকারকের শ্রেণিবিভাগসহ অপাদান ও অধিকরণ কারকের বিস্তারিত আলোচনা এবং সম্বন্ধ ও সম্বোধন পদের বাক্যে ব্যবহার দেখানো হয়েছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে অনুসর্গ বা কর্মপ্রবচনীয় শব্দ। অনুসর্গের ধারণা দেওয়ার পাশাপাশি বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত কতিপয় অনুসর্গের বাক্যে প্রয়োগও দেখানো হয়েছে–

পঞ্চম অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়ে বাক্যতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বাক্যতত্ত্বের শুরুতেই প্রথম পরিচ্ছেদে বাক্য প্রকরণ অংশে একটি সার্থক বাক্যের তিনটি গুণ- আকাঙ্ক্ষা, আসত্তি ও যোগ্যতা এবং যোগ্যতার সঙ্গে জড়িত ৬টি বিষয়, উদ্দেশ্য ও বিধেয়, গঠন অনুযায়ী বাক্যের শ্রেণিবিভাগ, বাক্য পরিবর্তনের নিয়ম উদাহরণসহ আলোচনা করা হয়েছে। বাক্য সংক্ষেপণের বেশ কিছু উদাহরণ রয়েছে এ পরিচ্ছেদের শেষ অংশে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে শব্দের যোগ্যতার বিকাশ ও বাগ্‌ধারা নিয়ে। শব্দের অর্থ পরিবর্তনের কারণ, বাগ্‌ধারা বা বাক্যরীতির উদাহরণ রয়েছে এ অংশে। এরপরই সন্নিবেশ করা হয়েছে সমার্থক শব্দ, বিপরীতার্থক শব্দ প্রভৃতি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে বাচ্য ও বাচ্য পরিবর্তন অংশে বাচ্যের সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগ, বাচ্য পরিবর্তনের রীতি আলোচিত হয়েছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে রয়েছে উক্তি পরিবর্তন। প্রত্যক্ষ উক্তি থেকে পরোক্ষ উক্তিতে পরিবর্তনের নিয়ম উদাহরণসহ দেওয়া হয়েছে এ পরিচ্ছেদে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদে যতি বা ছেদ চিহ্নের লিখন কৌশল অংশে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত ১১টি যতি চিহ্ন এবং কিছু গাণিতিক চিহ্নের ব্যবহার এবং বাক্যে এদের প্রয়োগ উদাহরণসহ তুলে ধরা হয়েছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে বাক্যের শ্রেণিবিভাগ অংশে প্রকাশভঙ্গি অনুযায়ী বাক্যের ৫টি শ্রেণি আলোচনা করা হয়েছে।

সবশেষে সপ্তম পরিচ্ছেদে বাক্যে পদ সংস্থাপনার ক্রম অংশে বাক্যের কোথায় কোন পদ বসবে তা উদাহরণসহ আলোচনা করা হয়েছে।

এছাড়াও নবম-দশম শ্রেণির জন্য 'রচনা সম্ভার' নামে বিরচন ও প্রবন্ধ রচনার একটি পাঠ্যপুস্তক রয়েছে। পুস্তকটি রচনা করেছেন ড. মাহবুবুল হক ও ড. আহমেদ মাওলা। এ পুস্তকটি সম্পদনা করেছেন জিয়াউল হাসান। পুস্তকটি এই শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বাগ্‌ধারা, সারমর্ম ও সারাংশ লিখন, ভাব-সম্প্রসারণ, পত্র লিখন, দরখাস্ত লিখন এবং অনুবাদ কৌশলের শিখনচাহিদা পূরণ করবে। এ পুস্তকটি সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. শিক্ষাক্রম বলতে কী বোঝায় ?
২. পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা কী?
৩. পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা প্রয়োজন কেন?
৪. ধারাবাহিক মূল্যায়ন বলতে কী বোঝায় ?
৫. সার্থক বাক্যের কী কী গুণ থাকে?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. পুস্তক পর্যালোচনার উল্লেখযোগ্য দিকগুলো লিখুন। 'মাধ্যমিক বাংলা সহপাঠ' গ্রন্থটির পর্যালোচনা করুন।
২. পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা কী? পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন। আপনার সদ্য পঠিত যে কোনো একটি পুস্তকের পর্যালোচনা লিখুন।
৩. জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২- এর প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ চিহ্নিত করে বাংলা বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহের ব্যাখ্যা দিন।
৪. ধারাবাহিক মূল্যায়ন বলতে কী বোঝায় ? নতুন শিক্ষাক্রমের আলোকে বাংলা বিষয়ের ধারাবাহিক মূল্যায়নের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করুন।
৫. মাধ্যমিক বাংলা শিক্ষাক্রমের অবস্থান ব্যাখ্যা করুন। নবম-দশম শ্রেণির বাংলা শিক্ষাক্রমের শিখনফল ও বিষয়বস্তুর সম্পর্ক নির্ণয় করুন।

ইউনিট ২ : বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিখনের বিবেচ্যদিকসমূহ

বাংলা ভাষা মনোভাব প্রকাশের দিক থেকে পৃথিবীতে অনন্য। এ ভাষার রয়েছে সুদীর্ঘ ইতিহাস এবং ঐতিহ্য। এটি আমাদের মাতৃভাষা। আমরা এ ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করি। এটি আমাদের হৃদয়ের একান্ত অনুভূতি প্রকাশের প্রাণের ভাষা। এই ভাষা শিক্ষার জন্য সবার আগে প্রয়োজন এর উপাদান সম্পর্কে সম্যক ধারণা। ভাষার ধর্মই বদলে যাওয়া। এই বদল ঘটে মানুষের মুখে মুখে। বদলে যাওয়ারও একটি নিয়ম শৃঙ্খলা থাকে। তাই ভাষার শুদ্ধতার প্রয়োজনে গড়ে ওঠেছে ভাষার সংবিধান বা ব্যাকরণ। ব্যাকরণ ভাষাকে পরিশীলিত করার জন্য ভাষার মৌলিক ধ্বনি, শব্দ এবং বাক্যের উৎপত্তি, গঠনকৌশল, বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে। তাই এ বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা জরুরি। প্রত্যেকটি উন্নত ভাষার মতো বাংলা ভাষারও রয়েছে লেখ্য ও কথ্য রূপ এবং প্রত্যেক রূপেরই সাধু ও চলিত রীতি। তাছাড়া ভাষা শিষ্ট এবং সাধারণ মানুষের প্রয়োজন মেটানোর পাশাপাশি অঞ্চলভিত্তিক এবং শ্রেণিভিত্তিক মানুষের মুখের ভাষার বৈচিত্র্য রক্ষা করে। ব্যাকরণ সর্বজনস্বীকৃত প্রমিত ভাষা এবং প্রমিত বানান রীতিও নির্ধারণ করে।

বাংলা ভাষা শিখনের অন্যতম বিবেচ্য দিক উচ্চারণরীতি। উচ্চারণ তারতম্যের কারণে একই শব্দের অর্থের পরিবর্তন ঘটতে পারে। উচ্চারণ কখনো সংবৃত আবার কখনো বিবৃত হতে পারে। তাই ভাষার শুদ্ধ উপস্থাপনের জন্য উচ্চারণরীতি আয়ত্তে রাখা জরুরি। মানুষ সহজাতভাবেই তার ভাব অন্যের কাছে প্রকাশ করতে চায়। ভাব ও ভাষার সম্মিলনে গড়ে তুলতে চায় শিল্প। মানুষের এই শৈল্পিক প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম সাহিত্য। সাহিত্য শিল্পময় বলেই এর প্রকাশ ঘটে বিভিন্ন ধারা ও বিভিন্ন আঙ্গিকে। কোনো নির্দিষ্ট কাঠামোয় সব মানুষ হৃদয়ানুভূতি প্রকাশ করতে পারেনা। ব্যক্তি বিশেষের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে এর অঙ্গ-সৌষ্ঠব। বাংলা সাহিত্যের আদিকাল থেকে বর্তমান সাহিত্যের ধারা ও আঙ্গিকে ঘটেছে নানান পরিবর্তন। সাহিত্যের আদি ও মধ্যযুগের ভাবাবেগ এবং উচ্ছ্বাসের পরিবর্তে আধুনিক যুগে আবির্ভূত হয়েছে সৃজনশীল গদ্য সাহিত্য। গদ্য সাহিত্য ধারায় ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ ইত্যাদি মানুষের হৃদয়ে আসন করে নিয়েছে। তাই এ বিষয়গুলোও আয়ত্তে রাখা জরুরি। এসব দিক বিবেচনায় 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিখনের বিবেচ্যদিকসমূহ' শীর্ষক ইউনিটটিতে নিম্নবর্ণিত পাঠসমূহ ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করা হলো।

২.১: বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য ও অন্তর্নিহিত শৃঙ্খলা
২.২: বাংলা উচ্চারণ : উচ্চারণরীতি
২.৩: বাংলা উচ্চারণ : সংবৃত ও বিবৃতরীতি
২.৪: বাংলা ভাষারীতি ও বানান
২.৫: সাহিত্য শিক্ষণের বিষয়আঙ্গিকগত দিক

২.১ : বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য ও অন্তর্নিহিত শৃঙ্খলা

মানুষের মনোভাব প্রকাশের সর্বোত্তম মাধ্যম ভাষা। ভাষা ভাবের বাহন। ভাষার প্রধান কাজই হলো একের ভাবনাকে অনেকের কাছে পৌঁছে দেওয়া। ভাষা যদি না থাকত তাহলে মানুষ পরস্পরের ভাবের আদান প্রদান করতে পারতো না, ফলে পরিবার, গোষ্ঠী এবং সমাজও গড়ে উঠত না। ভাষার সংজ্ঞায় ভাষাতাত্ত্বিক ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'মনেরভাব প্রকাশের জন্য বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনির দ্বারা নিষ্পন্ন, কোনো বিশেষ জনসমাজে ব্যবহৃত, স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত তথা বাক্যে প্রযুক্ত, শব্দ-সমষ্টিকে ভাষা বলে।'

ড. মুহম্মদ এনামুল হকের মতে, 'মানুষ তাহার মনের ভাব প্রকাশ করিবার জন্য কণ্ঠ, জিহ্বা, তালু, ওষ্ঠ, দন্ত, নাসিকা, মুখবিবর প্রভৃতি বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে অপরের বোধগম্য যে ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টির উচ্চারণ করিয়া থাকে, সেই ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টিকে ভাষা বলা হয়।'

উপর্যুক্ত সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করে ভাষার নিম্নরূপ বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়-

১. ভাষা হবে মনোভাব প্রকাশক, অর্থাৎ পরস্পর ভাব-বিনিময়ের একটি মাধ্যম।
২. যে-কোনো রকমের ধ্বনিই ভাষা নয়, যে ধ্বনি মানুষের বাগযন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত, শুধু তা-ই ভাষার মূল উপাদান। জীবজন্তুর কণ্ঠস্বর, মানুষের হাততালি বা একাধিক বস্তুর মধ্যে ঘর্ষণের ধ্বনি ভাষা নয়। অঙ্গভঙ্গি বা ইশারার সাহায্যেও মানুষ অনেক ভাব প্রকাশ করে থাকে, কিন্তু ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এগুলোও ভাষা নয়। বলা যায়, কোনো ভঙ্গিগত প্রতীক নয়, একমাত্র ধ্বনিগত প্রতীকই ভাষা এবং সে ধ্বনি মানুষের বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত হতে হবে। মানুষের

বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত আওয়াজকে ভাব প্রকাশের সর্বোত্তম বাহন বলার কারণ- এর ফলে বক্তা এবং শ্রোতার মধ্যে স্পষ্টভাবেই ভাব বিনিময় ঘটে। পক্ষান্তরে ইশারা বা ইঙ্গিত সার্বজনীন না হয়ে অঞ্চলভিত্তিক, ব্যক্তিভিত্তিক পৃথক হতে পারে বলে মনোভাব প্রকাশ অস্পষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়।

৩. মানুষের বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনিমাত্রই ভাষা নয়, সেই ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টির অর্থ থাকতে হবে। অর্থাৎ সেই ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টিই ভাষা যা বিশেষ-বিশেষ বস্তু বা ভাবের প্রতীক। ধ্বনি যদি কোনো ভাবের বাহন না হয়, তা হলে তাকে ভাষা বলা যায় না।

৪. পাগলের অর্থহীন ধ্বনি বা শিশুর অস্ফুট চিৎকার মানুষের বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনি বটে, কিন্তু তাকে ভাষা বলা যায় না। কারণ তা কোনো ভাব বা বস্তুর প্রতিষ্ঠিত প্রতীক নয়। মোটকথা অর্থবোধক আওয়াজ ছাড়া ভাষা হয় না।

৫. অর্থবোধক ধ্বনি দিয়ে তৈরি শব্দ বিধিবদ্ধভাবে বাক্যে ব্যবহৃত হবে। যেমন– বাংলা 'কলম' শব্দের ধ্বনিগুলো উল্টে 'মলক' বললে চলে না, ধ্বনিগুলো সাজাবার একটি নিয়ম শৃঙ্খলা আছে। তেমনি পদবিন্যাস বা পদক্রম অনুযায়ী বাক্য গঠন করতে হবে। বাংলা বাক্য 'কর্তা + কর্ম + ক্রিয়া' এই শৃঙ্খলা মেনে চলে। যেমন– মোস্তাফিজ ভালো ক্রিকেট খেলে। এখানে খেলে ক্রিকেট ভালো মোস্তাফিজ বললে শ্রুতি মধুরতা আসে না। তাছাড়া বাক্য গঠনে অবশ্যই যোগ্যতা রক্ষিত হবে অর্থাৎ বাক্যগঠনের পাশাপাশি অর্থদ্যোতকতা না থাকলে, বাক্য যোগ্যতা হারায়। এটিও বাংলা রূপের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

৬. ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য বদলে যাওয়া। প্রবহমান নদী যেমন চলতে চলতে নতুন নতুন বাঁকে নতুন নাম ধারণ করে, ভাষার ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। একটি শব্দের উচ্চারণ, অর্থ-পরিবর্তন হতে হতে নতুন রূপ ধারণ করে। পরিবর্তনের এই ধারাবাহিকতা ব্যাকরণের স্বীকৃতি পায়। বাংলা ভাষা জন্ম থেকে আদরে-অনাদরে শাসনে-শোষণে বেশিমাত্রায় বদলে গেছে। সংস্কৃত ভাষার অবাধ্য কন্যার মতো যেমন নিজেই বদলে গেছে তেমনি বহু রাজভাষার শব্দকে আত্মস্থ করে নিয়েছে। সংস্কৃত শব্দের পরিবর্তনের ধারাবাহিকতায় তৎসম, অর্ধতৎসম এবং তদ্ভব শব্দে পরিণত হয়েছে। তদ্ভব শব্দ বাংলার খাঁটি শব্দের মর্যাদা পেয়েছে। বিদেশি ভাষার প্রচুর শব্দ বাংলা ভাষার শব্দের সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। বর্তমানে বাংলা ভাষার রয়েছে একটি সমৃদ্ধ শব্দভাণ্ডার যার সমৃদ্ধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলা ভাষার কথ্যরূপ ও লেখ্যরূপ প্রকাশের জন্য সাধু ও চলিত রীতির প্রচলন আছে। মানুষের সহজতম উপায়ে উচ্চারণের সুবিধার জন্য অভিশ্রুতি, স্বরসঙ্গতি, প্রভৃতি ধ্বনি পরিবর্তনের বিচিত্র রীতি গড়ে ওঠছে। ক্রিয়াপদ ব্যবহার, বাক্য গঠনের শৃঙ্খলা ইত্যাদি বাংলা ভাষার নিজস্বতার সাক্ষর বহন করে চলেছে। বর্তমানে পৃথিবীতে সাড়ে তিন হাজারের বেশি ভাষা প্রচলিত আছে। তার মধ্যে ভাষাভাষী জনসংখ্যার দিক দিয়ে বাংলা পৃথিবীর চতুর্থ বৃহৎ মাতৃভাষা। এ বিশাল জনগোষ্ঠীর ভাষার অন্তর্নিহিত শৃঙ্খলা বিদ্যমান।

বাংলা ভাষারীতি

বিভিন্ন অঞ্চলের জনগণ নিজ নিজ অঞ্চলের ভাষায় কথা বলে। এগুলো আঞ্চলিক কথ্য ভাষা বা উপভাষা। পৃথিবীর সব ভাষারই উপভাষা আছে। এক অঞ্চলের জনগণের মুখের ভাষার সঙ্গে অপর অঞ্চলের জনগণের মুখের ভাষার যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। ফলে এমন হয় যে, এক অঞ্চলের সাধারণের কথ্য ভাষা অন্য অঞ্চলের লোকের কাছে দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে। সে কারণে, দেশের শিক্ষিত ও পণ্ডিত সমাজ একটি আদর্শ ভাষা ব্যবহার করেন। বাংলা ভাষাভাষী শিক্ষিত জনগণ এ আদর্শ ভাষাতেই পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা ও ভাবের আদান প্রদান করে থাকেন। বিভিন্ন অঞ্চলের উপভাষার কথ্যরীতি সমন্বয়ে শিষ্টজনের ব্যবহৃত এই ভাষাই আদর্শ চলিত ভাষা।

বাংলা, ইংরেজি, আরবি, হিন্দি প্রভৃতি ভাষার মৌখিক বা কথ্য এবং লৈখিক বা লেখ্য এই দুটি রূপ দেখা যায়। ভাষার মৌখিক রূপের আবার রয়েছে একাধিক রীতি: একটি প্রমিত রীতি (Standard Colloquial Language) অপরটি আঞ্চলিক কথ্যরীতি (Regional Colloquial Style)। বাংলা ভাষার লৈখিক বা লেখ্য রূপেরও রয়েছে দুটি রীতি: একটি চলিত রীতি (StandardColloquial Language) অপরটি সাধুরীতি (Standard written form).

বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডার

প্রত্যেকটি ভাষার প্রকাশ ক্ষমতা নির্ভর করে তার শব্দভাণ্ডারের উপর। বাংলা ভাষার ঠিক কত ভাগ শব্দ খাঁটি বাংলা তা বলা মুশকিল। তবে বাংলা ভাষার শব্দে সংস্কৃত প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয় বলে একে সংস্কৃতের দুহিতা বলা হয়। তাছাড়া বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে যুগে যুগে ব্যবসা, ধর্মপ্রচার, শাসন-শোষণ ইত্যাদির কারণে ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন ভাষার সংমিশ্রণ ঘটেছে। বাংলাদেশে তুর্কি আগমন ও মুসলিম শাসন পত্তনের সুযোগে প্রচুর আরবি ও ফারসি শব্দ বাংলা ভাষার নিজস্ব সম্পদে পরিণত হয়েছে। এরপর ইংরেজ শাসনামলেও তাদের নিজস্ব সাহিত্য এবং সংস্কৃতির বহু শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবেশ করেছে।

বাংলা ভাষা এসব ভাষার শব্দকে আপন করে নিয়েছে। এভাবে বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়েছে। বাংলা শব্দভাণ্ডারকে উৎসগত দিক থেকে প্রধানত পাঁচভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- তৎসম, অর্ধ-তৎসম, তদ্ভব, দেশি ও বিদেশি শব্দ।

১. তৎসম শব্দ : যেসব শব্দ সংস্কৃত ভাষা থেকে সরাসরি বাংলায় এসেছে এবং যাদের রূপ অপরিবর্তিত রয়েছে, সে সব শব্দকে তৎসম শব্দ বলে। যেমন: সূর্য, কর্মকার, নক্ষত্র, ধর্ম ইত্যাদি।

২. অর্ধ-তৎসম শব্দ : বাংলা ভাষায় কিছু সংস্কৃত শব্দ কিছুটা পরিবর্তিত আকারে ব্যবহৃত হয়। এগুলোকে অর্ধ-তৎসম শব্দ বলে। যেমন : জ্যোৎস্না>জ্যোছনা, গৃহিণী>গিন্নি, বৈষ্ণব> বোষ্টম ইত্যাদি।

৩. তদ্ভব শব্দ : যেসব শব্দের মূল সংস্কৃত ভাষায় পাওয়া যায়, কিন্তু ভাষার স্বাভাবিক বিবর্তন ধারায় প্রাকৃতের মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়ে আধুনিক বাংলা ভাষায় স্থান করে নিয়েছে, সেসব শব্দকে তদ্ভব শব্দ বলা হয়। যেমন: সংস্কৃত-চন্দ্র, প্রাকৃত-চন্দ, তদ্ভব চাঁদ। সংস্কৃত-চর্মকার, প্রাকৃত-চম্মআর, তদ্ভব-চামার ইত্যাদি। বর্তমানে তদ্ভব শব্দকে খাঁটি বাংলা শব্দও বলা হয়।

৪. দেশি শব্দ : বাংলাদেশের আদিম অধিবাসীদের (যেমন: কোল, মুণ্ডা প্রভৃতি) ভাষা ও সংস্কৃতির কিছু কিছু উপাদান বাংলায় রক্ষিত রয়েছে। এসব শব্দকে দেশি শব্দ নামে অভিহিত করা হয়। অনেক সময় এসব শব্দের মূল নির্ধারণ করা যায় না; কিন্তু কোন ভাষা থেকে এসেছে তার সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন- কুড়ি (বিশ)- কোলভাষা, পেট (উদর)- তামিল ভাষা, চুলা (উনুন)-মুণ্ডারী ভাষা। এরূপ- কুলা, গঞ্জ, চোঙ্গা, টোপর, ডাব, ডাগর, ঢেঁকি ইত্যাদি বহু দেশি শব্দ বাংলায় ব্যবহৃত হয়।

৫. বাণিজ্যিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কারণে বাংলাদেশে আগত বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের বহু শব্দ বাংলায় এসে স্থান করে নিয়েছে। এ সব শব্দকে বলা হয় বিদেশি শব্দ। বিদেশি শব্দের মধ্যে আরবি, ফারসি এবং ইংরেজি শব্দই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া পর্তুগিজ, ফরাসি, ওলন্দাজ, তুর্কি- এসব ভাষারও কিছু শব্দ একইভাবে বাংলা ভাষায় এসে গেছে। আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারত, মিয়ানমার, মালয়, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশের কিছু শব্দ আমাদের ভাষায় প্রচলিত রয়েছে।

মিশ্রশব্দ : কোনো কোনো সময় দেশি ও বিদেশি শব্দের মিলনে শব্দদ্বৈত সৃষ্টি হয়ে থাকে। যেমন– হাট-বাজার (বাংলা + ফারসি), হেড-মৌলভী (ইংরেজি + ফারসি), ডাক্তার-খানা (ইংরেজি + ফারসি) ইত্যাদি।

পারিভাষিক শব্দ : বাংলা ভাষায় প্রচলিত বিদেশি শব্দের ভাবানুবাদমূলক প্রতিশব্দই হলো পারিভাষিক শব্দ। বেতার- radio, মহাব্যবস্থাপক- general manager, সচিব- secretary, স্নাতক- graduate, স্নাতকোত্তর- postgraduate ইত্যাদি।

ভাষার অন্তর্নিহিত শৃঙ্খলা রক্ষায় ব্যাকরণ

ব্যাকরণ=(বি+আ+কৃ+অন) শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিশেষভাবে বিশ্লেষণ। ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অনুযায়ী বলা যায়, যে শাস্ত্রে কোনো ভাষার বিভিন্ন উপাদানের প্রকৃতি ও স্বরূপের বিচার-বিশ্লেষণ করা হয় এবং বিভিন্ন উপাদানের সম্পর্ক নির্ণয় ও প্রয়োগবিধি বিশদভাবে আলোচিত হয়, তাকে ব্যাকরণ বলে। যে শাস্ত্রে বাংলা ভাষার বিভিন্ন উপাদানের গঠনপ্রকৃতি ও স্বরূপ বিশ্লেষণ করা হয় এবং এদের সম্পর্কও সুষ্ঠু প্রয়োগবিধি আলোচনা করা হয়, তাই বাংলা ব্যাকরণ।

প্রত্যেক ভাষারই ধ্বনি, শব্দ, বাক্য, অর্থ এই চারটি মৌলিক অংশ থাকে। সে অনুযায়ী প্রত্যেক ভাষার ব্যাকরণেই প্রধানত চারটি বিষয়ের আলোচনা করা হয়। এগুলো হলো- ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব বা শব্দতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব ও অর্থতত্ত্ব। এই চার তত্ত্ব নিয়েই বাংলা ব্যাকরণের কাঠামো গড়ে ওঠেছে। এছাড়া অলঙ্কার, ছন্দ ও রসতত্ত্ব প্রভৃতিও ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয়।

ধ্বনি

ধ্বনি/বর্ণের সংজ্ঞার্থ, উচ্চারণের স্থান, ধ্বনির প্রতীক বা বর্ণের বিন্যাস, ধ্বনিসংযোগ বা সন্ধি, ধ্বনির পরিবর্তন ও লোপ, ণত্ব বা যত্ব-বিধান ইত্যাদি বাংলা ব্যাকরণে ধ্বনিতত্ত্বে আলোচিত হয়।বাংলা ভাষার মৌলিক ধ্বনিগুলো প্রধানত দু প্রকার যথা–স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জন ধ্বনি।

১. স্বরধ্বনি : যে সকল ধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুস তাড়িত বাতাস বেরিয়ে যেতে মুখবিবরের কোথাও কোনো প্রকার বাধা পায়না, তাদের বলা হয় স্বরধ্বনি (Vowel Sound)। যেমন- অ, আ, ই, উ, ঊ ইত্যাদি।

২. ব্যঞ্জনধ্বনি : যে সকল ধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুস তাড়িত বাতাস বেরিয়ে যেতে মুখবিবরের কোথাও না কোথাও বাধা পায় কিংবা ঘর্ষণ লাগে, সেগুলো ব্যঞ্জনধ্বনি (Consonant Sound) যেমন- ক খ গ ঘ ইত্যাদি।

বর্ণ

ধ্বনির লিখিত রূপ বা নির্দেশক চিহ্নকে বর্ণ (Letter) বলে।

স্বরবর্ণ : স্বরধ্বনি দ্যোতক লিখিত সাংকেতিক চিহ্নকে বলা হয় স্বরবর্ণ। যেমন- অ, আ, ই, ঈ ইত্যাদি।

ব্যঞ্জনবর্ণ : ব্যঞ্জনধ্বনি দ্যোতক লিখিত সাংকেতিক চিহ্নকে বলা হয় ব্যঞ্জনবর্ণ। যেমন- ক, চ, ট ইত্যাদি।

বর্ণমালা : যে কোনো ভাষায় ব্যবহৃত লিখিত বর্ণসমষ্টিকে সেই ভাষার বর্ণমালা (Alphabet) বলা হয়। যে বর্ণমালায় বাংলা ভাষা লিখিত হয়, তাকে বলা হয় বঙ্গলিপি।

স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ

কার ও ফলা

কার : স্বরবর্ণের এবং কতকগুলো ব্যঞ্জনবর্ণের দুটি রূপ রয়েছে। স্বরবর্ণ যখন নিরপেক্ষ বা স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হয়, অর্থাৎ কোনো বর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয় না, তখন এর পূর্ণরূপ লেখা হয়। একে বলা হয় প্রাথমিক বা পূর্ণরূপ। যেমন– অ, আ, ই, ঈ ইত্যাদি। এই রূপ শব্দের আদি, মধ্য, অন্ত যে কোনো অবস্থানে বসতে পারে।

স্বরধ্বনি যখন যুক্তধ্বনির সাথে যুক্ত হয়ে উচ্চারিত হয়, তখন সে স্বরধ্বনির বর্ণ সংক্ষিপ্ত আকারে ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয়। স্বরবর্ণের এ সংক্ষিপ্ত রূপকে বলা হয় সংক্ষিপ্ত স্বর বা কার। যেমন– 'আ' এর সংক্ষিপ্ত রূপ (া)। স্বরবর্ণের নামানুসারে এদের নামকরণ করা হয়।

ফলা : স্বরবর্ণ যেমন ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে যুক্ত হলে আকৃতির পরিবর্তন হয়, তেমনি কোনো কোনো ব্যঞ্জনবর্ণও কোনো কোনো স্বর কিংবা অন্য ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে যুক্ত হলে আকৃতির পরিবর্তন হয় এবং কখনো কখনো সংক্ষিপ্তও হয়। স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে যেমন কার বলা হয় তেমনি ব্যঞ্জনবর্ণের সংক্ষিপ্তরূপকে ফলা বলা হয়। যেমন- ম-এ র-ফলা = ম্র, ম-এ ল-ফলা = ম্ল, ইত্যাদি।

উচ্চারণের স্থান অনুযায়ী ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেণিবিভাগ

ধ্বনি উৎপাদনের ক্ষেত্রে মুখবিবরে উচ্চারণের মূল উপকরণ জিহ্বা ও ওষ্ঠ। আর উচ্চারণের স্থান হলো কণ্ঠ বা জিহ্বামূল, অগ্রতালু, মূর্ধা বা পশ্চাৎ দন্তমূল, দন্ত বা অগ্রদন্তমূল, ওষ্ঠ ইত্যাদি। উচ্চারণের স্থান অনুযায়ী ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোকে পাঁচভাগে ভাগ করা যায়-

১. কণ্ঠ্য বা জিহ্বামূলীয়: ক খ গ ঘ ঙ
২. তালব্য বা অগ্রতালুজাত: চ ছ জ ঝ শ য
৩. মূর্ধন্য বা পশ্চাৎ দন্তমূলীয়: ট ঠ ড ঢ ণ ষ র ড় ঢ়
৪. দন্ত্য বা অগ্র দন্ত্যমূলীয়: ত থ দ ধ ন ল স
৫. ওষ্ঠ্য: প ফ ব ভ ম

উচ্চারণবৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ব্যঞ্জন ধ্বনিগুলোকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়: অঘোষ এবং ঘোষ।

১. অঘোষধ্বনি : উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী অনুরণিত হয় না, যেমন– ক, খ, চ, ছ ইত্যাদি।
২. ঘোষ ধ্বনি : উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী অনুরণিত হয়, যেমন– গ, ঘ, জ, ঝ ইত্যাদি।

উচ্চারণে বাতাসের চাপের তারতম্যের ভিত্তিতে ব্যঞ্জনধ্বনি দু প্রকার- অল্পপ্রাণ এবং মহাপ্রাণ।

১. অল্পপ্রাণ : উচ্চারণের সময় বাতাসের চাপের স্বল্পতা থাকে, যেমন– ক, গ, চ, জ ইত্যাদি।
২. মহাপ্রাণ : উচ্চারণের সময় বাতাসের চাপের আধিক্য থাকে, যেমন– খ, ঘ, ছ, ঝ ইত্যাদি।

রূপতত্ত্ব ও শব্দতত্ত্ব

এক বা একাধিক ধ্বনির অর্থবোধক সম্মিলনে শব্দ তৈরি হয়, শব্দের ক্ষুদ্রাংশকে বলা হয় রূপ। রূপ গঠন করে শব্দ। সেই জন্য শব্দতত্ত্বকে রূপতত্ত্বও বলা হয়। গঠন অনুসারে বাংলা শব্দ দুই প্রকার- মৌলিক শব্দ এবং সাধিত শব্দ।

মৌলিক শব্দ : ভাষার যে সব শব্দকে বিশ্লেষণ করা যায় না এবং যাদের সঙ্গে কোনো প্রত্যয়, বিভক্তি, উপসর্গ ইত্যাদি যুক্ত থাকে না, তাদের মৌলিক শব্দ বলে। কখনো মৌলিক শব্দ ভেঙে দেখানোর চেষ্টা করলে ভাঙা অংশের কোনো অর্থ হয় না। যেমন- গোলাপ, মা, ভাত ইত্যাদি।

সাধিত শব্দ : যেসব শব্দকে বিশ্লেষণ করা হলে আলাদা অর্থবোধক শব্দ পাওয়া যায়, সেগুলোকে সাধিত শব্দ বলে। সাধারণত একাধিক শব্দের সমাস হয়ে কিংবা প্রত্যয় বা উপসর্গ যোগ হয়ে সাধিত শব্দ গঠিত হয়।

সমাসের সাহায্যে শব্দগঠন: সিংহ চিহ্নিত যে আসন=সিংহাসন, তিন পায়া যার= তেপায়া ইত্যাদি।

প্রত্যয়ের সাহায্যে শব্দগঠন: তদ্ধিত প্রত্যয় যোগে যেমন- হাত + ল = হাতল, ঢাকা + আই = ঢাকাই ইত্যাদি।

কৃৎ প্রত্যয় যোগে যেমন– চল্ + অন্ত = চলন্ত, পড়্ + আ = পড়া ইত্যাদি।

প্রাতিপদিক : বিভক্তিহীন নাম শব্দকে প্রাতিপদিক বলে। যেমন: বল, মোবাইল, হাত ইত্যাদি।

প্রকৃতি : যে শব্দকে বা কোনো শব্দের যে অংশকে আর কোনো ক্ষুদ্রতর অংশে ভাগ করা যায় না তাকে প্রকৃতি বলে।

প্রকৃতি দুই প্রকার : নাম প্রকৃতি ও ক্রিয়া প্রকৃতি বা ধাতু।

নাম প্রকৃতি : প্রত্যয়যোগে গঠিত শব্দের প্রত্যয় অংশটুকু বাদ দিলে যে অংশটুকু থাকে তা যদি কোনো নাম বা বিশেষ্যপদ হয় তাহলে তাকে নাম প্রকৃতি বলে। যেমন: গোলাপী। এখানে গোলাপ + ঈ অর্থাৎ ঈ প্রত্যয় বাদ দিলে গোলাপ নাম প্রকৃতি। অনুরূপ ফুল + এল= ফুলেল। এখানে ফুল নাম প্রকৃতি।

ক্রিয়া প্রকৃতি : প্রত্যয়যোগে গঠিত শব্দের প্রত্যয় অংশটুকু বাদ দিলে যে মূল অংশটুকু থাকে তা যদি কোন ক্রিয়ামূল বা ক্রিয়ার মূল অংশ হয় তাহলে তাকে ক্রিয়া প্রকৃতি বলে। ক্রিয়া প্রকৃতিকে ধাতু বলা যায়।

উপসর্গ ও উপসর্গযোগে শব্দগঠন : বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত এমন কতকগুলো সুনির্দিষ্ট অব্যয়সূচক শব্দাংশ রয়েছে, যা স্বাধীন পদ হিসেবে বাক্যে ব্যবহৃত হতে পারে না। এগুলো শব্দ বা ধাতুর পূর্বে যুক্ত হয়ে সাধিত শব্দের অর্থের পরিবর্তন, সম্প্রসারণ ও সংকোচন ঘটিয়ে থাকে। এগুলোকে উপসর্গ বলা হয়। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত উপসর্গগুলোর নিজস্ব কোনো অর্থ না থাকলেও শব্দ বা ধাতুর পূর্বে ব্যবহৃত হলেই অর্থবাচকতা সূচিত হয়। যেমন– 'হার' শব্দের সাথে প্র+হার= প্রহার, আ+হার= আহার, বি+হার= বিহার ইত্যাদি পৃথক পৃথক অর্থের শব্দ গঠিত হয়েছে। বাংলা ভাষায় সাধারণত তিন শ্রেণির উপসর্গ দেখা যায়: ১. সংস্কৃত উপসর্গ ২. বাংলা উপসর্গ ৩. বিদেশি উপসর্গ।

বাক্যতত্ত্ব

মানুষের বাক্প্রত্যঙ্গজাত ধ্বনির সমন্বয়ে গঠিত শব্দসহযোগে সৃষ্ট অর্থবোধক বাকপ্রবাহের বিশেষ বিশেষ অংশকে বলা হয় বাক্য। বাক্যের সঠিক গঠনপ্রণালি, বিভিন্ন উপাদানের সংযোজন, বিয়োজন, এদের সার্থক ব্যবহারযোগ্যতা, বাক্য মধ্যে শব্দ বা পদের স্থান বা ক্রম, পদের রূপ পরিবর্তন ইত্যাদি বিষয় বাক্যতত্ত্বে আলোচিত হয়। বাক্যের মধ্যে কোনো পদের পর কোনো পদ বসে, কোনো পদের স্থান কোথায়, বাক্যতত্ত্বে এসবের পূর্ণ বিশ্লেষণ থাকে। বাক্যতত্ত্বকে এজন্য পদক্রমও বলা হয়। কতকগুলো পদের সমষ্টিতে বাক্য গঠিত হলেও যে কোনো পদসমষ্টিই বাক্য নয়। বাক্যের বিভিন্ন পদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক থাকা আবশ্যক। এছাড়াও বাক্যের অন্তর্গত বিভিন্ন পদ দ্বারা মিলিতভাবে একটি অখণ্ড ভাব পূর্ণরূপে প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন, তবেই তা বাক্য হবে।

বিশ্বনাথ কবিরাজের 'সাহিত্যদপর্ণ' এর মতে, যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা আর আসত্তিযুক্ত পদসমুচ্চয়কে বাক্য বলে। নিম্নে ভাষার বিচারে উপর্যুক্ত গুণগুলো আলোচনা করা হলো-

১. **আকাঙ্ক্ষা :** বাক্যের অর্থ পরিষ্কারভাবে বোঝার জন্য এক পদের পর অন্য পদ শোনার যে ইচ্ছা তা-ই আকাঙ্ক্ষা। যেমন: 'বসন্তে ফুল' এটুকু বললে বাক্যটি সম্পূর্ণ মনোভাব প্রকাশ করেনা, আরও কিছু শোনার ইচ্ছা থাকে। বাক্যটি এভাবে পূর্ণাঙ্গ করা যায়- বসন্তে ফুল ফোটে। এখানে আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয়েছে বলে এটি পূর্ণাঙ্গ বাক্য।

২. **আসত্তি :** মনোভাব প্রকাশের জন্য বাক্যে শব্দগুলো এমনভাবে পরপর সাজাতে হবে যাতে মনোভাব প্রকাশ বাধাগ্রস্ত না হয়। বাক্যের অর্থসঙ্গতি রক্ষার জন্য সুশৃঙ্খল পদবিন্যাসই আসত্তি। যেমন: কাল আগামী বাবা না বাড়িতে আসবেন শব্দগুলোর সন্নিবেশ ঠিকভাবে না হওয়ায় অন্তর্নিহিত ভাবটি যথাযথ প্রকাশিত হয় নি। তাই এটি বাক্য হয় নি। মনোভাব পূর্ণভাবে প্রকাশ করার জন্য পদগুলোকে যথাস্থানে সন্নিবেশ করতে হবে। যেমন- আগামীকাল বাবা বাড়িতে আসবেন না। পদবিন্যাস যথার্থ হওয়ায় বাক্যটি আসত্তিসম্পন্ন।

৩. **যোগ্যতা :** বাক্যস্থিত পদসমূহের অন্তর্গত এবং ভাবগত মিলবন্ধনের নাম যোগ্যতা। যেমন– পদ্মার ইলিশ খেতে ভারি মজা। এটি একটি যোগ্যতাসম্পন্ন বাক্য। কারণ, বাক্যটিতে পদসমূহের অর্থগত এবং ভাবগত সমন্বয় রয়েছে। কিন্তু 'ইলিশ মাছ আকাশে ওড়ে'-বললে বাক্যটি ভাবপ্রকাশের যোগ্যতা হারাবে। কারণ, ইলিশ মাছ পানিতে থাকে, আকাশে পাওয়া যায় না।

অর্থতত্ত্ব

শব্দের অর্থবিচার, বাক্যের অর্থবিচার, অর্থের বিভিন্ন প্রকারভেদ, যেমন– মুখ্যার্থ, গৌণার্থ, বিপরীতার্থ ইত্যাদি অর্থতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়। বাক্যগঠিত হওয়ার পর যদি বাক্যের অর্থ না থাকে তবে সেটি ভাষার ক্ষেত্রে গুরুত্বহীন। পাশাপাশি শব্দের অর্থদ্যোতকতা যদি ভাব প্রকাশের সহায়ক না হয় তবে সেটিও ভাষার বিচারে অর্থহীন। নিম্নে শব্দের যোগ্যতার সঙ্গে কতিপয় জড়িত বিষয় উল্লেখ করা হলো–

রীতিসিদ্ধ অর্থবাচকতা : প্রকৃতি-প্রত্যয়জাত অর্থে শব্দ সর্বদা ব্যবহার হয়। যোগ্যতার দিক থেকে রীতিসিদ্ধ অর্থের দিকে লক্ষ রেখে কতকগুলো শব্দ ব্যবহার করতে হয়। যেমন–

শব্দ	রীতিসিদ্ধ অর্থ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রকৃতি + প্রত্যয়জাত অর্থ
বাধিত	অনুগৃহীত বা কৃতজ্ঞ	বাধ + ইত	বাধাপ্রাপ্ত
তৈল	তিল জাতীয়	তিল + অ	তিলজাত স্নেহ পদার্থ, যে কোনো শস্যের রস।

দুর্বোধ্যতা : অপ্রচলিত, দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহার করলে বাক্যের যোগ্যতা বিনষ্ট হয়। যেমন: তুমি আমার সঙ্গে প্রপঞ্চ (চাতুরী বা মায়া অর্থে) করেছ। প্রপঞ্চ শব্দটি বাংলায় অপ্রচলিত থাকায় এটি সহজে বোধগম্য নয়।

অলঙ্কারের ভুল প্রয়োগ বা উপমার ভুল প্রয়োগ : অলঙ্কার সাজিয়ে ভাষাকে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করা হয়। কিন্তু অলঙ্কার বা উপমার প্রয়োগ যদি ভুল হয় তাহলে অর্থ বিভ্রান্তি ঘটতে পারে। যেমন : শোকসাগরে সে উড়ে বেড়ায়, শুদ্ধ হবে- শোকসাগরে সে নিমজ্জিত হয়।

বাগধারার শব্দ পরিবর্তন : বাগ্‌ধারা ভাষা বিশেষের ঐতিহ্য। এর ইচ্ছামতো পরিবর্তন করলে শব্দ তার যোগ্যতা হারায়। যেমন- 'অরণ্যে রোদন' (অর্থ: নিষ্ফল আবেদন) এর পরিবর্তে 'বনে ক্রন্দন' বলা হলে বাগ্‌ধারাটি তার যোগ্যতা হারাবে।

গুরুচণ্ডালী দোষ : তৎসম শব্দের সঙ্গে দেশীয় শব্দের প্রয়োগ কখনো কখনো গুরুচণ্ডালী দোষ সৃষ্টি করে। এ দোষে দুষ্ট শব্দ তার যোগ্যতা হারায়। যেমন- 'গরুর গাড়ি', 'শবদাহ' প্রভৃতি স্থলে যথাক্রমে 'গরুর শকট', 'মড়াদাহ' প্রভৃতির ব্যবহার গুরুচণ্ডালী দোষ সৃষ্টি করে।

বাহুল্য দোষ : প্রয়োজনের অতিরিক্ত শব্দ ব্যবহারে বাহুল্য দোষ ঘটে এবং এর ফলে শব্দ তার যোগ্যতাগুণ হারিয়ে থাকে। বাহুল্যদোষ বহুবচনের দুইবার বর্ণনা, বিশেষণের অতিশায়নের বর্ণনা, সমার্থক শব্দের ব্যবহার ইত্যাদিভাবে ঘটতে পারে। যেমন- এসব লোকগুলোকে আমি চিনি। এখানে বহুবচনের দ্বিত্ব হয়েছে। এ বাক্যকে শুদ্ধভাবে বলা যায়- এ লোকগুলোকে আমি চিনি অথবা এসব লোককে আমি চিনি। অতএব ভাষার শুদ্ধতার জন্য বাহুল্যদোষ মুক্ত থাকা জরুরি।

যতি বা ছেদচিহ্নের লিখন কৌশল

বাক্যের অর্থ সুস্পষ্টভাবে বোঝার জন্য বাক্যের মধ্যে বা বাক্যের সমাপ্তিতে কিংবা বাক্যে আবেগ, জিজ্ঞাসা ইত্যাদি প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে বাক্য-গঠনে যেভাবে বিরতি দিতে হয় এবং লেখার সময় বাক্যের মধ্যে তা দেখানোর জন্য যেসব সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়, তা-ই যতি বা ছেদ চিহ্ন। নিম্নে বিভিন্ন প্রকার যতিচিহ্নের নাম, আকৃতি এবং তাদের কালের পরিমাণ উল্লেখ করা হলো–

যতি চিহ্নের নাম	আকৃতি	বিরতি-কাল-পরিমাণ
কমা	,	১ (এক) বলতে যে সময় প্রয়োজন।
সেমিকোলন	;	১ বলার দ্বিগুণ সময়।
দাঁড়ি (পূর্ণচ্ছেদ)	।	এক সেকেন্ড।
জিজ্ঞাসা চিহ্ন	?	ঐ
বিস্ময় চিহ্ন	!	ঐ
কোলন	:	ঐ
কোলন ড্যাস	:-	ঐ
ড্যাস	–	ঐ
হাইফেন	-	থামার প্রয়োজন নেই।
ইলেক বা লোপ চিহ্ন	'	থামার প্রয়োজন নেই।
উদ্ধরণ চিহ্ন	" "	'এক' উচ্চারণে যে সময় লাগে।
ব্রাকেট (বন্ধনী-চিহ্ন)	()	থামার প্রয়োজন নেই।
	{ }	থামার প্রয়োজন নেই।
	[]	থামার প্রয়োজন নেই।

২.২ : বাংলা উচ্চারণ : উচ্চারণরীতি

ভাষা মানুষের মনোভাব প্রকাশের সর্বোত্তম বাহন। এর মৌলিক গঠন-উপাদান হচ্ছে অর্থবোধক ধ্বনি। মানুষের মুখে তা উচ্চারিত হয় এবং অপরের কানে তা অর্থবহ হয়ে প্রবেশ করে। অর্থহীন ধ্বনি উচ্চারণ করা যায় বটে, তবে তা মানব-সমাজের কোনো কাজে আসে না। ভাষার একক হচ্ছে ধ্বনি। ধ্বনির শৃঙ্খলাবদ্ধ বিন্যাসে গঠিত হয় শব্দ। শব্দমধ্যস্থ ধ্বনিসমূহকে চিহ্নিত করা হয় বর্ণের সাহায্যে। প্রতিটি বর্ণের রয়েছে নিজস্ব উচ্চারণ ও ধ্বনিগাম্ভীর্য। কিন্তু একাধিক বর্ণ মিলে যখন শব্দ তৈরি হয় তখন বর্ণের উচ্চারণ কোথাও অপরিবর্তিত থাকে আবার কোথাও পরিবর্তিত বা বিকৃত হয়ে যায়। আবার কখনো কখনো নতুন ধ্বনির সংযোজনও ঘটে। ফলে একটি শব্দ তার সংশ্লিষ্ট বর্ণের উচ্চারণ অনুযায়ী উচ্চারিত না হয়ে ভিন্নভাবে উচ্চারিত হয়। অন্যান্য ভাষার মতো বাংলা ভাষার ক্ষেত্রেও এ প্রবণতা লক্ষ করা যায়।

উচ্চারণরীতি

উচ্চারণরীতি বলতে সাধারণত উচ্চারণের নিয়মকানুন বোঝায়। সব ভাষারই কিছু নিয়মকানুন আছে, সে লেখার বেলায় যেমন, তেমনি উচ্চারণের ক্ষেত্রেও। বাংলা ভাষাও এর ব্যতিক্রম নয়। শুদ্ধ করে লেখার জন্য ও শুদ্ধ উচ্চারণের জন্য সে-সব নিয়মকানুন বুঝে নেওয়া প্রয়োজন। আবার ভাষা ক্রমাগত পরিবর্তনশীল, সেই পরিবর্তনের কথাও মনে রাখা উচিত। আজ থেকে প্রায় দেড়শ' বছর আগে রবীন্দ্রনাথ বাংলা উচ্চারণের নিয়মরীতি নিয়ে ভেবেছিলেন। তখন তিনি ছিলেন যুবক। এক বিদেশি রবীন্দ্রনাথের কাছে বাংলা ভাষা শিখতে এসেছিলেন। তাঁকে শেখাতে গিয়েই বাংলা উচ্চারণের ক্ষেত্রে প্রচুর বিশৃঙ্খলার প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় রবীন্দ্রনাথের। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ভেবেছেন, 'বাংলা ভাষার এই রূপ উচ্চারণের বিশৃঙ্খলার মধ্যে একটা নিয়ম আছে কিনা'। নিয়ম তো অবশ্যই আছে। প্রমিত উচ্চারণের বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ মৌলিক নির্দেশনা তো দিয়েছেনই, প্রমিত উচ্চারণ শেখার জন্য 'সহজ পাঠ' নামে চার খণ্ডের শিশুসাহিত্যও রচনা করেছেন। আমরা শিশুকাল থেকে যদি শুদ্ধ উচ্চারণ করার চেষ্টা করি তাহলে প্রমিতভাষা সহজেই আয়ত্ত করতে পারি। বাংলা প্রমিত উচ্চারণ শেখার জন্য সবার আগে প্রয়োজন ভালোভাবে বর্ণমালার শুদ্ধ উচ্চারণ শেখা।

উচ্চারণের বিবেচ্য বিষয়

বাক্‌যন্ত্র: যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সাহায্যে আমরা ধ্বনি উচ্চারণ করে থাকি সেগুলোকে একত্রে বাক্‌যন্ত্র বলা হয়। বাক্‌যন্ত্রের বিভিন্ন অংশ নিম্নরূপ-

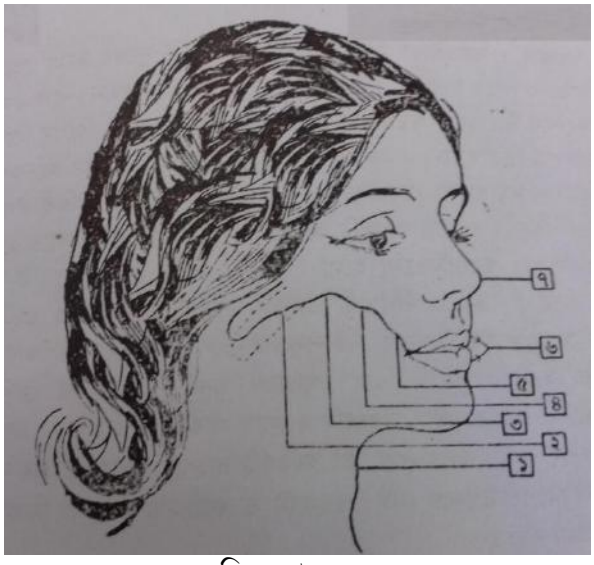

১. কণ্ঠ
২. কোমলতালু
৩. মূর্ধা
৪. অগ্রতালু
৫. দন্তমূল
৬. ওষ্ঠাধার
৭. নাসিকা

চিত্র: বাক্‌যন্ত্র

ধ্বনিবিজ্ঞানীরা নাসিকাকে বাক্‌যন্ত্র হিসেবে চিহ্নিত করেন না। কিন্তু, যেহেতু ঙ ঞ ণ ম বর্গীয় বর্ণ এবং বর্ণগুলোর উচ্চারণস্থান 'নাসিক্য' নির্দেশিত আছে সেহেতু এই বর্ণগুলোর উচ্চারণ নাসিক্য। আবার ং আর ঁ এর উচ্চারণও নাসিক্য হয়, তাই নাসিকাকে বাক্‌যন্ত্র হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

স্বরধ্বনি উচ্চারণস্থান, প্রকারভেদ ও শ্রেণিকরণ

বাংলা বর্ণমালায় মোট ১১টি স্বরধ্বনি আছে। উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী এগুলোকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যায়

বর্ণ	উচ্চারণ স্থান	উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী শ্রেণিবিভাগ
অ আ	কণ্ঠ	কণ্ঠ্য বর্ণ
ই ঈ	তালু	তালব্য বর্ণ
উ ঊ	ওষ্ঠ	ওষ্ঠ্য বর্ণ
ঋ	মূর্ধা	মূর্ধন্য বর্ণ
ও ঔ	কণ্ঠ ও তালু	কণ্ঠৌষ্ঠ্য বর্ণ

বাংলা বর্ণমালায় ঋ বর্ণটি থাকলেও, ঋ ধ্বনিটি নেই। আর হ্রস্ব-ই, দীর্ঘ- ঈ, হ্রস্ব-উ এবং দীর্ঘ-ঊ-র উচ্চারণেও পার্থক্য নেই। সুতরাং খাঁটি বাংলা উচ্চারণের দিক বিচার করলে শুদ্ধ যে সাতটি স্বর পাই, সেগুলো হচ্ছে- অ আ ই উ এ অ্যা ও। আসলে ধ্বনির উচ্চারণ সচেতনভাবে করলে আমরা প্রত্যেকেই এই উচ্চারণ স্থানগুলো নিজেরাই স্থির করতে পারি।

যৌগিক ধ্বনির উচ্চারণের নিয়ম

দুটি স্বর একই সঙ্গে অর্থাৎ এক অক্ষরে (Syllable)বা প্রয়াসে উচ্চারিত হলে তাকে যৌগিক বা যুগ্মস্বর বলা হয়। বাংলা বর্ণমালায় ঐ এবং ঔ স্বরধ্বনিদুটি যৌগিক স্বরধ্বনি হিসাবে পরিচিত। যেমন-

ঐ = উচ্চারণ অ+ই, ওই (কৈ, দৈ)
ঔ = উচ্চারণ অ+উ, ওউ (বৌ, মৌ)

ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণস্থান

ব্যঞ্জন ধ্বনি: যে সব ধ্বনি স্বরধ্বনির সাহায্য ছাড়া উচ্চারিত হতে পারে না সেগুলোকে ব্যঞ্জনধ্বনি বলে। এসব ধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুস থেকে বেরিয়ে আসা বাতাস মুখের কোনো কোনো স্থানে বাধা পায় বা ঘষা খায়। বাংলা বর্ণমালায় ব্যঞ্জনবর্ণ ৩৫টি। যেমন- ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, ত, থ, দ, ধ, ন, প, ফ, ব, ভ, ম, য, র, ল,শ, ষ, স, হ, ড়, ঢ়, য়। এছাড়া ৪টি অতিরিক্ত চিহ্ন আছে। যেমন-ঃ (বিসর্গ), ঁ(চন্দ্রবিন্দু), ং (অনুস্বর), ৎ (খণ্ডত) এই চারটিকে ধ্বনি ধরেই আমরা মোট ৩৯টি ব্যঞ্জন ধ্বনি বা বর্ণ বলে থাকি।

উচ্চারণ স্থান অনুসারে ব্যঞ্জনবর্ণের নাম

বর্ণ	উচ্চারণ স্থান	উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী শ্রেণিভাগ
ক, খ, গ, ঘ, ঙ, হ	কণ্ঠ বা জিহ্বামূল	কণ্ঠ্য বর্ণ বা জিহ্বামূলীয় বর্ণ
চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, য, শ	তালু	তালব্য বর্ণ
ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, র, ষ	মূর্ধা	মূর্ধন্য বর্ণ
ত, থ, দ, ধ, ল, স	দন্ত	দন্ত্য বর্ণ
প, ফ, ব, ভ, ম	ওষ্ঠ	ওষ্ঠ্য বর্ণ
অন্তঃস্থ বর্ণ	দন্ত ও ওষ্ঠ	দন্তৌষ্ঠ্য বর্ণ

ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোকে উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী ৫টি বর্গে ভাগ করা হয়েছে। যেমন–

১. ক- বর্গীয় ধ্বনি (ক, খ, গ, ঘ, ঙ)
২. চ- বর্গীয় ধ্বনি (চ, ছ, জ, ঝ, ঞ)
৩. ট- বর্গীয় ধ্বনি (ট, ঠ, ড, ঢ, ণ)
৪. ত- বর্গীয় ধ্বনি (ত, থ, দ, ধ, ন)
৫. প- বর্গীয় ধ্বনি (প, ফ, ব, ভ, ম)

১. ক-বর্গীয় ধ্বনি : এই বর্গের ধ্বনিগুলো জিভের মূল বা পিছনের দিক দিয়ে কণ্ঠের তালুর কোমল অংশ স্পর্শ করে উচ্চারণ করতে হয়। তাই এগুলোকে কণ্ঠ্য বর্ণ বলা হয়। তবে ঙ হলো অনুনাসিক বর্ণ কারণ উচ্চারণ করার সময় নাক দিয়ে বাতাস বের হয়।

২. **চ- বর্গীয় ধ্বনি :** এ ধ্বনিগুলো জিভের মাঝের অংশ দিয়ে তালুর সামনের অংশ বা কঠিন অংশ স্পর্শ করে উচ্চারণ করতে হয়। তাই এ বর্গীয় বর্ণগুলোকে তালব্য বর্ণ বলা হয়। জিভ ও তালুর স্পর্শের পরে দুয়ের মাঝখানে ঘর্ষণ লাগে, ফলে এ ধ্বনিগুলোকে ঘৃষ্টবর্ণও বলা হয়। তবে ঞ এক্ষেত্রে অনুনাসিক বর্ণ।

৩. **ট-বর্গীয় ধ্বনি :** এই বর্গীয় বর্ণগুলো জিভের ডগাকে উল্টিয়ে মূর্ধা আর তালুর শীর্ষদেশের কাছে কঠিন অংশটি স্পর্শ করে উচ্চারণ করতে হয়। তাই এদের মূর্ধণ্য বর্ণ বলা হয়।

৪. **ত-বর্গীয় বর্ণ :** এগুলো উচ্চারণ করার সময় জিভের অগ্রভাগ পাখার মতো প্রসারিত করে তা দিয়ে দাঁতের নিচু অংশ স্পর্শ করে উচ্চারণ করতে হয়। তাই এ ধ্বনিগুলোকে দন্ত্য ধ্বনি বলা হয়।

৫. **প-বর্গীয় বর্ণ :** ওষ্ঠ আর অধর স্পর্শ করে এই বর্ণগুলো উচ্চারণ করতে হয়। তাই এই ধ্বনিগুলোকে ওষ্ঠ্য ধ্বনি বলা হয়। এই বর্গীয় ধ্বনিগুলোর ক্ষেত্রে 'ম' অনুনাসিক বর্ণ কারণ উচ্চারণের সময় নাক দিয়ে বাতাস বের হয়।

এছাড়া বাকি ব্যঞ্জনধ্বনিগুলো উচ্চারণ স্থান ও উচ্চারণ রীতি অনুযায়ী নিম্নে বর্ণনা করা হলো–

য, র, ল, ব : এগুলো অন্তঃস্থ বর্ণ, কারণ স্পর্শ বর্ণ আর উষ্মবর্ণের মাঝখানে এদের অবস্থান। এছাড়া র, ল এই বর্ণ দুটিকে উচ্চারণে প্রলম্বিত করা যায় বলে এদের তরল স্বর বলে। 'র' কে কম্পনজাত ধ্বনিও বলা হয়। 'ল' উচ্চারণের সময় জিভের ডগা মুখের মাঝামাঝি দাঁতের গোড়ায় ঠেকে জিভের দু'পাশ দিয়ে মুখের বাতাসবের করে দেয় বলে একে পার্শ্বধ্বনি বলে।

উষ্মধ্বনি : শ, ষ, স, হ এগুলো উষ্মবর্ণ। এদের উচ্চারণের সময় জিভ, তালু, দাঁত, সম্পূর্ণভাবে যুক্ত হয়েও ধ্বনি উচ্চারণের সময় শিশের মতো শব্দ হয় বলে এদের শিশ ধ্বনি বলা হয়।

ং (অনুস্বার) এর উচ্চারণ বাংলা 'ঙ' এর মত। যেমন- রঙ-রং, বাঙলা-বাংলা ইত্যাদি।

ঃ (বিসর্গ) ধ্বনি 'হ'- ধ্বনির কাছাকাছি। ফঃ আঃ ইত্যাদি ক্ষেত্রে উচ্চারণ 'হ'-এর মতো। বাংলায় বিসর্গের অন্য উচ্চারণও আছে। কোনো শব্দের মাঝে বিসর্গ বসলে পরবর্তী ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়। যেমন : দুঃখ (দুকখো), দুঃশাসন (দুশশাশোন)

চন্দ্রবিন্দু (ঁ) : চন্দ্রবিন্দুর কোনো স্বতন্ত্র বা আলাদা অস্তিত্ব নেই। কোনো বর্ণের ওপর চন্দ্রবিন্দু বসলে সেই বর্ণের সঙ্গে যুক্ত স্বরের উচ্চারণ অনুনাসিক (নাসিক্য) হয়। চন্দ্রবিন্দুর উচ্চারণ তারতাম্যে অর্থের পার্থক্য ঘটে। যেমন: আঁধার, রাত অর্থ প্রকাশ করে তবে চন্দ্র বিন্দু ছাড়া আধার উচ্চারণ করলে কোনো কিছু রাখার পাত্র বোঝাবে।

(ৎ)বাংলা ব্যঞ্জন ত বোঝাবার জন্য 'ৎ'-এই পৃথক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। এটিকে বলা হয় খণ্ডত।

ড়, ঢ়, য়- এই বর্ণ তিনটি বাংলা ভাষার নিজস্ব সৃষ্টি। ড়, ঢ় ধ্বনি উচ্চারণে জিভের ডগা দাঁতের মূলে আঘাত করে। তাই এগুলোকে বলা হয় তাড়নজাত বর্ণ।

অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ : প্রতিটি বর্গের নাসিক্য বর্ণগুলো বাদ দিলে উক্ত পাঁচটি বর্গে চারটি করে বর্ণ থাকে। এই বর্ণগুলোর প্রতিটি পৃথকভাবে উচ্চারণ করলে আমরা দেখব যে, প্রতিটি বর্গের প্রথম ও তৃতীয় বর্ণ আমরা অনায়াসে উচ্চারণ করতে পারি; মুখ থেকে জোর করে হাওয়া বা বাতাস বের করতে হয় না। অথচ, বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ উচ্চারণ করতে বেশ জোরে হাওয়া বের করতে হয়। এ জন্য ব্যাকরণে প্রতিটি বর্গের প্রথম ও তৃতীয় বর্ণকে বলে অল্পপ্রাণ বর্ণ এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণকে বলে মহাপ্রাণ বর্ণ। 'প্রাণ' শব্দের অর্থ হাওয়া বা বাতাস। যে বর্ণগুলোর উচ্চারণে অল্প হাওয়া বেরোয় সেগুলো অল্পপ্রাণ বর্ণ। যেমন, ক্‌গ্; চ্‌জ্; ট্‌ড্; ত্‌দ্; প্‌ব্। আর যে বর্ণগুলোর উচ্চারণে হাওয়া জোরে বের হয় তাদের বলা হয় মহাপ্রাণ বর্ণ। যেমন, খঘ; ছ্‌ঝ্; ঠ্‌ঢ; থ্‌ধ; ফ্‌ভ্।

ঘোষ ও অঘোষ : যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী অনুরণিত বা কম্পিত হয় তাকে ঘোষ ধ্বনি বলা হয়। প্রতিটি বর্গের তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণ ঘোষ বর্ণ। যেমন– গঘ; জঝ; ডঢ়; দধ; ইত্যাদি। আর যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী অনুরণিত বা কম্পিত হয় না তাকে অঘোষ ধ্বনি বলা হয়। যেমন– কখ; চছ; টঠ; ইত্যাদি। প্রত্যেক বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণগুলো এই ধ্বনির অন্তর্গত।

২.৩ : বাংলা উচ্চারণ : সংবৃত ও বিবৃতরীতি

বাংলা ভাষার কিছু স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় মুখবিবর সংকুচিত (Close) থাকে; এগুলোকে সংবৃত স্বর বলে। যেমন- 'উ' উচ্চারণ করলে মুখবিবর সংবৃত বা সংকুচিত থাকে। অন্যদিকে এমন কতকগুলো স্বর রয়েছে যেগুলো আমরা উচ্চারণের সময় মুখবিবর প্রসারিত করে বা খুলে উচ্চারণ করি। এসব ধ্বনিকে বিবৃত (Open) স্বর বলে। যেমন- আ,এ,অ ইত্যাদি ধ্বনি। বাংলা ভাষায় অর্ধসংবৃত ও অর্ধ বিবৃত স্বরও রয়েছে কয়েকটি। মূলত উচ্চারণের সময় ঠোঁটের আকৃতি অনুযায়ী বাংলা স্বরধ্বনিগুলোর এ ধরনের শ্রেণিবিভাগ করা হয়।

- বিবৃত (open) স্বরধ্বনি : এ স্বরধ্বনির উচ্চারণে ঠোঁট সবচেয়ে বেশি খোলা থাকে। বাংলা ভাষায় এ জাতীয় স্বরমাত্র একটি [আ]
- অর্ধবিবৃত (half-open) স্বরধ্বনি : বিবৃত স্বরধ্বনির তুলনায় ঠোঁট কম খোলা রেখে উচ্চারিত স্বরধ্বনিগুলোকে এভাবে দেখানো হয়। বাংলা [অ্যা, অ] হলো এ জাতীয়।
- অর্ধসংবৃত (half-close) স্বরধ্বনি : সংবৃত স্বরধ্বনির তুলনায় ঠোঁট বেশি খোলা কিন্তু অর্ধ-বিবৃত স্বরধ্বনির তুলনায় কম খোলা রেখে অর্ধ-সংবৃত স্বরধ্বনিগুলো উচ্চারণ করতে হয়। বাংলা [এ,ও] ধ্বনি এ জাতীয় স্বর।
- সংবৃত (close) স্বরধ্বনি : ঠোঁট সবচেয়ে কম খোলা থেকে উচ্চারণ করতে হয়–এমন স্বরধ্বনি এ শ্রেণিতে পড়ে। যেমন- [ই,উ]

উচ্চারণের এই বিচিত্র রূপের ওপর নির্ভর করে বাংলা ভাষায় যুক্ত হয়েছে একটি ভিন্ন সৌকর্য। এটি বাংলার প্রমিত রূপকে শ্রুতিমধুর, তির্যক ও প্রবহমান করেছে। এরূপ ধ্বনির সঠিক উচ্চারণ না হলে অর্থের পার্থক্য ঘটতে পারে। সেজন্য উচ্চারণের ক্ষেত্রে সংবৃত ও বিবৃত উচ্চারণ রীতি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

সংবৃত ও বিবৃতরীতি

সংবৃত শব্দের অর্থ আবৃত বা আচ্ছাদিত। ব্যাকরণের ভাষায় বলা যেতে পারে অপরিবর্তিত রূপ। অর্থাৎ যে সব ধ্বনি উচ্চারণের সময় মুখবিবর সংকুচিত থাকে সেগুলোর উচ্চারণরীতিকে সংবৃতরীতি বলা যায়। অপরদিকে বিবৃত অর্থ প্রসারিত, উন্মুক্ত, খোলা ইত্যাদি। বাংলা ভাষায় এমন কতকগুলো স্বর রয়েছে যেগুলো আমরা উচ্চারণের সময় মুখবিবর খুলে উচ্চারণ করি। সেগুলোর উচ্চারণরীতিকে বিবৃতরীতি বলা যায়। সংবৃত এবং বিবৃত উচ্চারণ ঘটে মূলত স্বরধ্বনির ক্ষেত্রে, বিশেষ করে 'অ', 'এ' এবং 'এ্যা/অ্যা'-র ক্ষেত্রে। আবার 'অ', 'এ' ধ্বনি উচ্চারণে যেরকম বিবিধ পরিবর্তন (কখনও অর্ধসংবৃত কখনও অর্ধবিবৃত) হয় তেমনটি আর কোনো ধ্বনির বেলায় ঘটে না। এ দুটি ধ্বনির যেহেতু অন্তত দুই রকম উচ্চারণ, তাই উচ্চারণ শিখানোর ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে 'অ' এবং 'এ' ধ্বনির উচ্চারণ অনুশীলন আবশ্যক। 'অ' ধ্বনির কোথায় অর্ধসংবৃত (ও) উচ্চারণ আর কোথায় অভিশ্রুত বা অর্ধবিবৃত (অ) উচ্চারণ হবে তা নিম্নে দেখানো হলো।

যেমন, অত (অতো), শত (শতো), কত (কতো), মত (মতো), শব্দ (শব্‌দো), বর্তমান (বর্‌তোমান্‌) ইত্যাদি। এখানে প্রতিটি শব্দের আদ্য 'অ' এর উচ্চারণ অবিকৃত 'অ' (অর্ধ বিবৃত স্বরধ্বনি)। কিন্তু ধরুন (ধোরুন্‌), অরুণ (ওরুন্‌), পতি (পোতি), নদী (নোদি), অদ্য (ওদ্‌দো), গদ্য (গোদ্‌দো), পক্ষ (পোক্‌খো), ইত্যাদি শব্দে আদ্য- 'অ' এর উচ্চারণ 'অ' থাকে না, হয়ে যায় 'ও' (অর্ধ সংবৃত স্বরধ্বনি)।

বাংলা ভাষায় শব্দের আদি মধ্য এবং অন্ত্যে ব্যবহৃত এই 'অ' নানাবিধ কারণে প্রমিত বা মানসম্মত উচ্চারণের সৌকর্য-বিধান-হেতু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে, বিশেষ কারণে কখনও পূর্ণ 'ও'-কার, অর্ধ 'ও'-কার কিংবা 'ও'- কার স্পর্শযুক্ত (আলতোভাবে) উচ্চারিত হয়। শব্দের আদ্য, মধ্য এবং অন্ত্য-'অ'-এর 'ও'-কার রূপে (বা ও-কারের মতো) উচ্চারিত হওয়া কিছু সূত্র মেনে চলে।

আদ্য 'অ' এর উচ্চারণরীতি

১. [অ+ই>ওই, অ+উ>ওউ] শব্দের আদিতে যদি 'অ' থাকে [স্বতন্ত্র বা স্বাধীন (অ) কিংবা ব্যঞ্জনে যুক্ত (ক্‌+অ=ক, গ্‌+অ = গ)] এবং তারপরে 'ই'-কার (হ্রস্ব কিংবা দীর্ঘ), 'উ'-কার (হ্রস্ব কিংবা দীর্ঘ) থাকে তবে সে 'অ'-এর উচ্চারণ সাধারণত 'ও'- কারের মতো হয়। যথা: অভিযান (ওভিজান্‌), পতি (পোতি), গতি (গোতি), অধিকার (ওধিকার), অতীত (ওতিত্‌), নদী (নোদি), বউ (বোউ), মউ (মোউ), অনুকূল (ওনুকুল), অনুমান (ওনুমান), বধূ (বোধু) ইত্যাদি।

২. [অ+্য (য) ফলা>ও] শব্দের আদ্য 'অ'-এর পরে '্য' (য) ফলাযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ থাকলে সেক্ষেত্রে 'অ'-এর উচ্চারণ প্রায়শ 'ও'-কারের মতো হয়। যেমন– অদ্য (ওদ্‌দো), অন্য (ওন্‌নো), অত্যাচার (ওত্‌তাচার্‌), কন্যা (কোন্‌না), কল্যাণ (কোল্‌ল্যান), অধ্যক্ষ (ওদ্‌ধোক্‌খো), পদ্য (পোদ্‌দো), ধন্য (ধোন্‌নো), জন্য (জোন্‌নো), সদ্য (শোদ্‌দো), সত্য (শোত্‌তো), তথ্য (তোত্‌থো) ইত্যাদি।

ব্যতিক্রম : বন্ধ্যা (বন্‌ধা), শর্ত (শর্‌তো), অর্ঘ্য (অর্‌ঘো), বন্দ্যোপাধ্যায় (বন্‌দোপাদ্‌ধায়্‌), বধ্যভূমি (বদধোভূমি), হর্স্য (হর্‌শো), কণ্ঠ্য (কন্‌ঠো), অন্ত্য (অন্‌তো), অন্ত্যেষ্টি (অন্‌তেশ্‌টি) ইত্যাদি।

৩. [অ+ক্ষ>ও; অ+জ্ঞ>ও] শব্দের আদ্য 'অ-এরপর 'ক্ষ' 'জ্ঞ' (জ্‌+ঞ= গঁ, শব্দের আদিতে 'গঁ' এবং মধ্য ও অন্তে 'গ্‌গঁ'-এর মতো) থাকলে, সে 'অ'-এর উচ্চারণ সাধারণত 'ও'-কারের মতো হয়ে থাকে। যথা: অক্ষ (ওক্‌খো), অক্ষাংশ (ওক্‌খাঙশো), লক্ষণ (লোক্‌খোন), যজ্ঞ (জোগ্‌গোঁ), লক্ষ (লোক্‌খো), পক্ষ (পোক্‌খো) ইত্যাদি।

ব্যতিক্রম : যক্ষ্মা (জক্‌খাঁ), এখানেও লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, 'ক্ষ'-এর সঙ্গে অন্য বর্ণ যুক্ত হয়েছে বলে তার আগের 'অ' (ল, য, প) ও-কার রূপে উচ্চারিত হচ্ছে না।

৪. [অ+<(ঋ) কার>ও] শব্দের প্রথমে যদি 'অ' থাকে এবং তারপর < (ঋ)-কার' যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ থাকলেও, সে-'অ'-এর উচ্চারণ সাধারণত 'ও'-কারের মতো হয়। যথা: মসৃণ (মোসৃন্‌/মোস্‌সৃন্‌), কর্তৃকারক (কোর্‌তৃকারোক্‌), বক্তৃতা (বোকতৃতা), যকৃত (জোকৃত) ইত্যাদি।

৫. শব্দের প্রথমে 'অ' যুক্ত 'র' (্র)- ফলা থাকলে সেক্ষেত্রেও আদ্য 'অ'-এর উচ্চারণ সাধারণত 'ও'-কার হয়ে থাকে। যথা: ক্রম (ক্রোম), গ্রহ (গ্রোহো), গ্রন্থ (গ্রোন্‌থো), ব্রত (ব্রোতো), প্রকৃত (প্রোকৃতো), শ্রবণ (স্রোবোন) ইত্যাদি।

ব্যতিক্রম: কিন্তু 'অ' যুক্ত র-ফলার পরে 'য' থাকলে সে 'অ'-এর উচ্চারণ প্রায়শ অবিকৃত থাকে। যথা: ক্রয় (ক্রয়), ত্রয় (ত্রয়্‌), শ্রয় (শ্রয়্‌) ইত্যাদি।

৬. যে-সব রেফ যুক্ত শব্দের বানানে পূর্বে '্য' (য)- ফলা যুক্ত, বর্তমান বাংলা একাডেমি প্রমিত বানানরীতি অনুযায়ী 'রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না' এমন শব্দের আদ্য-'অ' সাধারণত 'ও'-কারের মতো উচ্চারিত হয়ে থাকে। যথা: [পর্য্যন্ত> পর্যন্ত> পোর্‌জোন্‌তো], পর্য্যায় > পর্যায় > পোর্‌জায়্‌ ইত্যাদি।

৭. 'সাধুভাষায়' ব্যবহৃত পূর্ণাঙ্গ শব্দ কিংবা ক্রিয়াপদের বানানে 'ই' (ি)-কার আছে কিন্তু চলিত ভাষায় সেই 'ই' (ি) কার বহুক্ষেত্রে বিলুপ্ত হলেও তার পূর্ববর্তী 'অ' উচ্চারণে প্রায়শ 'ও'-কারের মতোই হয়ে থাকে। যথা: ধরিবার > ধরবার (ধোর্‌বার্‌), মরিবার > মরবার্‌ (মোর্‌বার্‌), করিয়া > করিয়া > করে (কোরে) থলিয়া > থলে (থোলে), ধনিয়া > ধনে (ধোনে) (হইল > হল (হোলো), ইত্যাদি।

৮. একাক্ষর (Monosyllable) শব্দের প্রথমে 'অ' এবং পরে দন্ত্য-'ন' থাকলে কোথাও কোথাও সে-'অ'-এর উচ্চারণ 'ও'-কারের মতো হয়। যেমন– মন (মোন), বন (বোন), জন (জোন্‌) ইত্যাদি।

ব্যতিক্রম : শব্দের মধ্যে যদি 'ন' এর পরিবর্তে 'ণ' এর ব্যবহার থাকে অথবা সমাসবদ্ধ শব্দ হয়ে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে 'অ' এর বিবৃত উচ্চারণ প্রয়োজন নেই। সংবৃত বা স্বাভাবিক উচ্চারণ বজায় রাখাই ভালো। যেমন- গণ (গন), পণ (পন্‌), রণ (রন) জনগণ (জনোগণ্‌) ইত্যাদি।

কখনও কখনও আদ্য 'অ' এর উপর্যুক্ত উচ্চারণরীতির ১,২,৩ এবং ৪ নম্বর নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে। এক্ষেত্রে 'অ' এর উচ্চারণ 'ও' এর মতো না হয়ে 'অ' এর মতোই হয়। বিশেষ করে যখন নেতিবাচক বা না অর্থে 'অ' বা অন্‌' এবং সহার্থে বা সহিত অর্থে 'স' সংযুক্ত হয়। অর্থাৎ এ সব 'অ' এবং 'স' সর্বত্র অবিবৃত 'অ' হিসাবে উচ্চারিত। যথা: অনিকেত (অনিকেত্‌), অবিচার (অবিচার্‌), অনিয়ম (অনিয়ম্‌),অদৃশ্য (অদৃশ্‌শো), সবিনয় (শবিনয়্‌), সতীর্থ (শতির্‌থো), সস্ত্রীক (শস্‌ত্রিক)। তবে নাম বোঝালে এ না-বোধক 'অ' 'ও'-এর মতো উচ্চারিত হতে পারে। যথা: অসীম (ওশিম্‌), অবিনাশ (ওবিনাশ)

উপসর্গযোগে গঠিত শব্দের আদ্য 'অ' এর উচ্চারণ

উপসর্গ যোগে গঠিত শব্দের আদ্য 'অ' সংস্কৃতানুসারী উচ্চারণে সর্বত্র অবিকৃত 'অ'-ই, কিন্তু বাংলা উচ্চারণেও তা স্বীকৃতি লাভ করেছে। যথা: সমীকরণ (শোমিকরোন্‌), সমীক্ষা (শোমিক্‌খা), সমীচীন (শোমিচিন্‌) ইত্যাদি।

কিন্তু সম্‌- উপসর্গ যোগে গঠিত বহুশব্দে এখনও পূর্ব উচ্চারণের প্রভাব লক্ষ করা যায়। যথা: সম্মিলিত (শম্‌মিলিতো), সম্পূর্ণ (শম্‌পুর্‌নো), সম্প্রীতি (শম্‌প্রিতি), সংযুক্ত (শম্‌জুক্‌তো) ইত্যাদি।

মধ্য-'অ' এর উচ্চারণ

১. শব্দমধ্যস্থিত 'অ' (ব্যঞ্জনবর্ণে যুক্ত) আদ্য 'অ' এর মতোই ই, (ি), ঈ (ী), উ (ু), ঊ (ূ), ঋ (ৃ)-কার এবং ক্ষ, জ্ঞ, ্য (য) ফলার আগে থাকলে সে 'অ'-এর উচ্চারণ সাধারণত 'ও' কারের মতো হয়ে থাকে। যথা: কাকলি (কাকোলি),

প্রণতি (প্রোনোতি), অবগতি (অবোগোতি), বিরতি (বিরোতি), জননী (জনোনি), শতমূল (শতোমুল), উপকূল (উপোকুল্) ইত্যাদি।

২. তিন বা তার অধিক বর্ণে গঠিত শব্দের মধ্য 'অ'-এর আগে যদি অ, আ, এ এবং ও কার থাকে তবে পদ-মধ্যের 'অ'-এর ও-কাররূপে উচ্চারিত হওয়ার প্রবণতা থাকে সমধিক। যথা: মতন (মতোন্), যতন (জতোন্), রতন (রতোন্), পাগল (পাগোল্), ছাগল (ছাগোল্), কানন (কানোন্), ডাগর (ডাগোর্), আদর (আদোর), বেতন (বেতোন্), কেশর (কেশোর), কোমল (কোমোল্), ছোবল (ছোবোল) ইত্যাদি।

৩. বাংলা ভাষায় বেশ কিছু সমাসবদ্ধ 'তৎসম' (সংস্কৃত) শব্দ ব্যবহৃত হয়, সেগুলো পৃথক উচ্চারণে হসন্ত হলেও সমাসবদ্ধ অবস্থায় মধ্য 'অ' রক্ষিত হয়েও কারান্ত রূপে উচ্চারিত হয়। যথা: পথচারী [পথোচারি] বনবাসী [বনোবাশি], রণতূর্য [রনোতুর্জো] কিন্তু বর্তমানে কিছু সমাসবদ্ধ পদের মধ্য 'অ' এর স্থানে হসন্ত উচ্চারণ করার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। যথা: রাজপুত্র (রাজোপুত্রো নয় 'রাজপুত্ত্রো), রাজনীতি (রাজোনীতি নয় রাজ্নিতি), শিবরাত্রি ('শিবোরাত্ত্রি' নয় 'শিবরাত্ত্রি), লোকসভা ('লোকোশভা নয় 'লোক্শভা') ইত্যাদি।

অন্ত্য-'অ' এর উচ্চারণ

শব্দান্তের 'অ' বাংলা ভাষায় সংস্কৃত বা প্রাকৃতের মতো উচ্চারিত হয় না। এই 'অ'-ধ্বনিটি পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনবর্ণে লুপ্ত বা মিশে থাকে বলে প্রায়শ হসন্তরূপে উচ্চারিত হয়ে থাকে। যথা: নাক্, কান্, হাত্, জাত, ধান, কাম্, ঘর ইত্যাদি। কিন্তু সর্বত্রই এ- রূপ উচ্চারিত হয় না, ক্ষেত্র বিশেষে এই 'অ' রক্ষিত হয় এবং 'ও'-কারান্ত উচ্চারিত হয়। যথা:

১. বাংলা ভাষায় বেশ কিছু বিশেষণে অথবা বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত পদের অন্তিম 'অ' লুপ্ত না হয়ে ও কারান্ত উচ্চারণ হয়ে থাকে। যথা: কাল (বিশেষণ, 'কালো' কিন্তু বিশেষ্য কাল্), ভাল [ভালো কিন্তু বিশেষ্য ভাল্ (কপাল)], ছোট (ছোটো), বড় (বড়ো), কত (কতো), ইত্যাদি।

২. বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত বেশ কিছু দ্বিরুক্ত শব্দ বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হলে প্রায়শ অন্তিম 'অ' ও-কারান্ত উচ্চারণ হয়। যথা: কাঁদ-কাঁদ (কাঁদো-কাঁদো), কল-কল (কলো-কলো), পড়-পড় (পড়ো-পড়ো), বড়-বড় (বড়ো-বড়ো), ঝরঝর (ঝরো-ঝরো) ইত্যাদি।

ব্যতিক্রম: করকর (কর্কর্), খড়খড় (খড় খড়), তরতর (তর্তর্) ইত্যাদি।

৩. ১১ থেকে ১৮ পর্যন্ত সংখ্যাবাচক শব্দের শেষ- 'অ' রক্ষিত এবং 'ও'-কারন্ত উচ্চারিত হয়ে থাকে। যথা: (১১) এগার (এ্যাগারো), (১২) বার (বারো), (১৩) তের (ত্যারো), (১৪) চৌদ্দ (চোউদ্দো), (১৫) পনের (পোনেরো), (১৬) ষোল (শোলো), (১৭) সতর (শতেরো) এবং (১৮) আঠার (আঠারো)।

৪. 'আন' (আনো) প্রত্যয়ান্ত শব্দের অন্তিম 'অ' ও-কারান্ত উচ্চারিত হয়। যথা: করান (করানো), তাড়ান (তাড়ানো), বলান (বলানো), লেখান (লেখানো), পাঠান (পাঠানো), চালান (চালানো) ইত্যাদি।

৫. 'ত' (ক্ত) এবং 'ইত' প্রত্যয়যোগে সাধিত বা গঠিত বিশেষণ শব্দের অন্ত্য 'অ' উচ্চারণে ও-কারান্ত হয়ে থাকে। যেমন– হত (হতো), মত (মতো), গত (গতো), নিয়মিত (নিয়োমিতো), চলিত (চোলিতো), প্রীত (প্রিতো), বিদিত (বিদিতো), পরীক্ষিত (পোরিক্খিতো) ইত্যাদি।

৬. 'ই' কিংবা 'এ'-কারের পর 'য়' ('ইঅ') থাকলে, সেই 'য়' হসন্ত রূপে উচ্চারিত না হয়ে প্রায়শ 'ও'-কারের মতো উচ্চারিত হয়ে থাকে। যেমন : নির্ণেয় (নির্নেয়ো), প্রিয় (প্রিয়ো), বিধেয় (বিধেয়ো) ইত্যাদি।

ব্যতিক্রম: কিন্তু 'ই' অথবা 'এ' কারের পরিবর্তে 'অ' বা 'আ' ধ্বনি এলেই 'য়'-এর 'অ' (বা রূপান্তরিত 'ও') বিলুপ্ত হয়ে হসন্ত রূপে উচ্চারিত হয়। যথা: বিষয় (বিশয়), নয় (নয়), লয় (লয়্) ইত্যাদি।

৭. বিশেষ্য শব্দের শেষে 'ও'-কারান্ত উচ্চারিত হয়। যথা: বিবাহ (বিবাহো), মোহ (মোহো), কলহ (কলহো), দেহ (দেহো), বিরহ (বিরহো), দ্রোহ (দ্রোহো) ইত্যাদি।

৮. 'তর' (তরো), 'তম' (তমো) প্রত্যয় সংযুক্ত বিশেষণ পদে অন্তিম 'অ' প্রায়শ ও-কারান্ত উচ্চারিত হয়। যথা: অধিকতর (ওধিকোতরো), উচ্চতর (উচ্চোতরো), বৃহত্তর (বৃহত্তরো), অধিকতম (ওধিকোতমো) ইত্যাদি।

৯. 'ইব',-'ইল',-'ইতেছ',-'ইয়াছ',-'ইতেছিল',-'ইয়াছিল' ইত্যাদি প্রত্যয়যোগে গঠিত ক্রিয়াপদের অন্তিম 'অ' সাধারণত বিলুপ্ত হয় না, এবং উচ্চারণে ঐ 'অ' ও-কারের মতো শোনা যায়। যথা: করিব (কোরিবো) > কোরবো), বলিব (বোলিবো> বোল্বো) ইত্যাদি।

১০. শব্দশেষের 'অ' এর আগে যদি ঐ ঔ ং (অনুস্বার): (বিসর্গ) এবং ঋ (ৃ)-কার থাকে, তবে সে- 'অ' প্রায়শ বিলুপ্ত না হয়ে ও কারান্ত উচ্চারণ হয়। যথা: তৈল (তোইলো), শৈল (শোইলো), জৈন (জোইনো), মৌল (মোউলো), পৌর (পোউরো), সৌর (শোউরো), বংশ (বঙ্‌শো), হংস (হঙ্‌শো), কৃশ (কৃশো), তৃণ (তৃনো), মৃগ (মৃগো) ইত্যাদি।
ব্যতিক্রম: পৌষ (পোউশ্), বৌল (বোউল্), ইত্যাদি।

১১. শব্দান্তে সংযুক্ত বর্ণ (দুটি বা তার অধিক ব্যঞ্জনবর্ণ) থাকলে, সে-ক্ষেত্রে অন্তিম 'অ'-এর উচ্চারণও 'ও'- কারের মতো হয়ে থাকে। যথা: শক্ত (শক্‌তো), ভক্ত (ভক্‌তো), যত্র (জত্‌ত্রো), কর্ম (করমো), দন্ত (দন্‌তো), মন্দ (মন্‌দো) ইত্যাদি।

'আ' ধ্বনির উচ্চারণরীতি

১. বাংলা উচ্চারণের ধারা-অনুসারে একাক্ষর শব্দের 'আ' কিছুটা দীর্ঘ উচ্চারিত হয়। যথা: রাম (রা-ম), আম (আ-ম্), জাম (জা-ম্), রাগ (রা-গ্)- এখানে আ-কার কিছুটা দীর্ঘ, কিন্তু এ শব্দগুলোই যখন রামা, জামা, কিংবা রাগা হয় তখন আ-কারটি অপেক্ষাকৃত হ্রস্ব হয়ে যায়।

২. শব্দের আদিতে 'জ্ঞ' এবং 'য়' (য)- ফলাযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে আ (া)-কার সংযুক্ত হলে সেই আ (া)- কারের উচ্চারণ প্রায়শ অ্যা-কারের মতো হয়ে থাকে। যথা : জ্ঞান (গ্যাঁন্), ব্যাধ (ব্যাধ্), ব্যাপার (ব্যাপার), ব্যাখ্যা (ব্যাক্‌খা), ব্যাকরণ (ব্যাকরোন্) ইত্যাদি।

'এ' ধ্বনির উচ্চারণ

বাংলা ভাষায় 'এ' (ে) কার লিখিতরূপ একটি হলেও, এর উচ্চারিত রূপ দুটো ('এ' এবং অ্যা)। মেষ (মেশ্), দেশ (দেশ্), এল (এলো), এস (এশো) ইত্যাদি শব্দের আদ্য- 'এ' এর উচ্চারণ নিজস্ব। কিন্তু খেলা (খ্যালা), বেলা (ব্যালা) ইত্যাদি শব্দে 'এ' এর উচ্চারণ 'অ্যা' এর মতো। 'এ', কোথায় 'অ্যা' হিসেবে উচ্চারিত হবে এবং কেবল 'এ'-কার কিংবা 'অ্যা' কারই হবে, এ-ধরনের সর্বজনস্বীকৃত বিধান দুর্লভ। চলিত বাংলা ভাষার প্রমিত উচ্চারণের বহমান ধারা অনুসরণে 'এ'-সংক্রান্ত কতিপয় শর্ত উল্লেখ করা হলো:

১. শব্দের প্রথমে যদি 'এ'-কার (ব্যঞ্জনে যুক্তও হতে পারে) থাকে এবং তারপরে 'ই' (ি), ঈ (ী), উ (ু), ঊ (ূ), এ (ে), 'ও' (ো), য়, র, ল, শ এবং হ থাকে তবে সাধারণত 'এ' অবিকৃতভাবে উচ্চারিত হয়। যথা: একি (একি), দেখি (দেখি), বেশি (বেশি) ইত্যাদি।

২. শব্দের আদ্য 'এ'-কারের পরে যদি ং (অনুস্বার) ঙ কিংবা ঙ্গ থাকে এবং তারপরে 'ই' (হ্রস্ব বা দীর্ঘ) 'উ' (হ্রস্ব বা দীর্ঘ) অনুপস্থিত থাকে তবে সেক্ষেত্রে 'এ', 'অ্যা-কারে রূপান্তরিত হয়। যথা: বেঙ [ব্যাঙ, কিন্তু ই 'ি'-কার সংযুক্ত হলে বেঙি], ভেংচা (ভ্যাঙ্‌চা কিন্তু ভেঙ্‌চি), লেংড়া (ল্যাঙ্‌ড়া কিন্তু (লেঙ্‌ড়ি), নেংটা (ন্যাঙ্‌টা কিন্তু নেঙ্‌টি)।

৩. এ- কারযুক্ত একাক্ষর ধাতুর সঙ্গে আ- প্রত্যয়যুক্ত হলে, সাধারণত সেই 'এ' কারের উচ্চারণ 'অ্যা' কার হয়ে থাকে। যথা: খেদা (খেদ্+আ = খ্যাদ্যা), ক্ষেপা (ক্ষেপ্+আ = খ্যাপা), খেলা (খেল্+আ = খ্যালা), তেলা (তেল্+আ = ত্যালা) ইত্যাদি।

৪. মূলে 'ই'- কার বা ঋ-কার যুক্ত ধাতু প্রাতিপদিকের সঙ্গে আ-কার যুক্ত হলে সেই ই-কার, এ-কার রূপে উচ্চারিত হবে, কখনও 'অ্যা'-কার হবে না। যথা: কেনা (কিন্ ধাতু থেকে), মেলা (<মিল্), জেলা (< জিলা), এনসাফ (< ইনসাফ),

৫. একাক্ষর সর্বনাম পদের 'এ' সাধারণত স্বাভাবিকভাবে অর্থাৎ অবিকৃত 'এ'-কার রূপে উচ্চারিত হয়। যথা: কে, সে, এ, যে ইত্যাদি।

৬. সংস্কৃত বা তৎসম শব্দের আদ্য এ-কার প্রায়শ অবিকৃত 'এ'-রূপে উচ্চারিত হয়ে থাকে। যথা: কেয়ূর, প্রেরক, বেদ, প্রেম, হেমন্ত বেবা ইত্যাদি।

৭. সাধারণত শব্দের আদ্য 'এ'- কারের পরে 'অ' এবং আ থাকলে 'এ'-কারের 'অ্যা'-কার রূপে উচ্চারিত হওয়ার প্রবণতা থাকে সমধিক। কিন্তু ওই 'অ' কিংবা 'আ' এর পরিবর্তে 'ই'-কার 'উ' কার কিংবা 'এ'-কারের মতো স্বরধ্বনি এলেই 'এ'-কার তার নিজস্ব উচ্চারণে ফিরে যায়। যথা: এখন (অ্যাখোন), এমন (অ্যামোন্), কেমন (ক্যামোন্), যেমন (জ্যামোন্), এক (অ্যাক্), একা (অ্যাকা) টেরা (ট্যারা), তেড়া (ত্যোড়া) ইত্যাদি।

কিন্তু এসব শব্দের শেষে যদি 'ই' কিংবা এ-কার আসে তবে 'এ'-কার নিজস্ব উচ্চারণে ফিরে যায়। যথা: একি, একুশ, হেরি, টেরি ইত্যাদি।

২.৪ : বাংলা ভাষারীতি ও বানান

বাংলা ভাষারীতি

পৃথিবীর বহু উন্নত ভাষার মতো বাংলা ভাষাতেও দু ধরনের ভাষারীতি বিদ্যমান। এই রীতি বিভিন্ন রূপ ও প্রকাশভঙ্গির মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে। এর একটি চলিতরীতি এবং অন্যটি সাধুরীতি। এই চলিত ও সাধুরীতি উভয়ই কথ্য বা মৌখিক এবং লিখিত রূপে ব্যবহৃত হতে পারে। মূলত সাহিত্যিক গদ্যের সূচনাপর্ব থেকেই বাংলা গদ্য সাহিত্যে 'সাধু' ও 'চলিত' এ দুটি রীতির প্রচলন হয়। রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের 'সাধু গদ্যের' পাশাপাশি প্যারীচাঁদ মিত্রের 'চলিত গদ্যের' প্রবর্তনই এ দু রীতির ভাষারূপের সূত্রপাত ঘটায়। বাংলা ভাষার রীতিভেদকে নিচের রেখাচিত্রের মাধ্যমে দেখানো যায়:

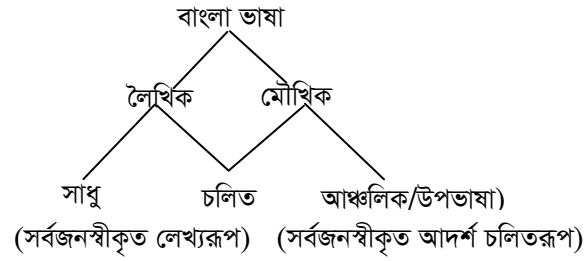

উপর্যুক্ত রীতি দুটির মধ্যে চলিত রীতিটি মৌখিক ও লেখ্য রীতি হলেও মৌখিক রীতি হিসেবে আঞ্চলিক রীতি বা উপভাষাও প্রচলিত। বলা যায়, মৌখিক রীতির মধ্যে আঞ্চলিক রীতির ব্যবহারই সবচেয়ে বেশি।

সাধুভাষা বা সাধুরীতি

উনিশ শতকে বাংলা ভাষার যে লিখিত রূপ গড়ে ওঠে, তার নাম দেওয়া হয় 'সাধু ভাষা'। রাজা রামমোহন রায় প্রথম সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের মুখের ভাষাকে 'সাধুভাষা' বলে অভিহিত করেন । পরে রামমোহন, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ গদ্যশিল্পীগণ এই 'সাধু ভাষা'র মাধ্যমেই তাঁদের সাহিত্যকীর্তি প্রতিষ্ঠিত করেছেন। প্রখ্যাত বৈয়াকরণ ও ভাষাতত্ত্ববিদ ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, 'সাধারণ গদ্য-সাহিত্যে ব্যবহৃত বাঙ্গালা ভাষাকে সাধুভাষা বলে।' সাধুভাষাশ্রয়ী গদ্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'সংস্কৃত ব্যাকরণ অভিধান থেকে ধার করা অলংকারে সাজিয়ে তোলা।' কারণ বাংলা গদ্য সৃষ্টির প্রাথমিক পর্বে গদ্য রচনার দায়িত্ব বর্তেছিল সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের ওপর। স্বাভাবিকভাবে সংস্কৃত বাক্যরীতিকে আদর্শ করে সাধু গদ্যরীতির বুনিয়াদ গড়ে ওঠে, তাছাড়া সাধুভাষা প্রতিষ্ঠার একেবারে গোড়ায় চলিত ভাষার কিছু কিছু পদ ও বাক্যরীতি গৃহীত হয়েছিল, অর্থাৎ সাধু-চলিতের মিশ্রণ ঘটেছিল প্রধানত ক্রিয়া ও সর্বনাম পদের ব্যবহারে। পরে সাধুভাষা লেখ্য বা সাহিত্য ভাষার আদর্শ হয়ে নিজেকে শক্ত ভিতের ওপর পাকাপোক্তভাবে যত দৃঢ় করে দাঁড় করাতে লাগল, ততই গ্রাম্যতা দোষ ও প্রাদেশিকতা বর্জনের তাগিদে সংস্কৃত শব্দের অধিক প্রয়োগে ও সংস্কৃত বাক্যরীতির অনুসরণে ভাষা নিয়মবদ্ধ ও কৃত্রিম হয়ে পড়ল। বক্তৃতা, নাটক ও আলাপচারিতার অনুপযোগী বলে এই ভাষা কৃত্রিম, এবং শুধু লেখ্য ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন : 'যাহাকে তাহাকে মারিতে যাওয়া তোমার উচিত হয় নাই'। এখানে 'যাহাকে', 'তাহাকে'-সর্বনাম পদ, 'মারিতে'- ক্রিয়া পদ এবং 'নাই'- নঞর্থক অব্যয় পদের পূর্ণরূপ ব্যবহার করা হয়েছে।

সাধুভাষা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বাংলাভাষা-পরিচয়' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন 'রূপকথায় বলে, এক যে ছিল রাজা, তার ছিল দুই রানি-সুয়োরানি আর দুয়োরানি। তেমনি বাংলা বাক্যবিধিরও আছে দুই রানি-একটিকে আদর করে নাম দেওয়া হয়েছে সাধু ভাষা আর একটাকে কথ্য ভাষা, কেউ বলে চলিত বা চলতি ভাষা। ... সাধু ভাষা মাজাঘষা, সংস্কৃত ব্যাকরণ অভিধান থেকে ধার করা অলংকারে সাজিয়ে তোলা। চলতি ভাষার আটপৌরে সাজ নিজের চরকায় কাটা সুতো দিয়ে বোনা। ... কিন্তু আমার বিশ্বাস, সুয়োরানি নেবেন বিদায় আর একলা দুয়োরানি বসবেন রাজাসনে।'

কথ্য বা চলিতরীতি

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের প্রথমেই চলিত ভাষার প্রচলন শুরু হয় বাংলা সাহিত্যে। সংস্কৃতবহুল সাধু ভাষার বহুল প্রচলনের ফলে বাংলা গদ্য নিছক পণ্ডিতি গদ্যে রূপান্তরিত হয়ে পড়ে এবং তার ফলে এর গতিশক্তি শিথিল ও মন্থর হতে থাকে। তাই সে যুগের কোনো কোনো গদ্যশিল্পী প্রচলিত পণ্ডিতি গদ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে আপামর জনসাধারণের কথ্যভাষার ঢঙে বাংলা গদ্যরচনায় ব্রতী হন। ফলে বাংলা গদ্যে 'নতুন রীতির মাত্রা' সংযোজিত হয় এবং গদ্যরূপে কথ্যরীতির প্রাণস্ফূর্তির আবির্ভাব ঘটে।

উনবিংশ শতাব্দীতে চলিত ভাষার সাহিত্যিক রূপের প্রথম প্রকাশ ঘটে টেঁকচাঁদ ঠাকুরের 'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাসে। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় তিনিই প্রথমে এই বিষবৃক্ষের (সাধুভাব) মূলে কুঠারাঘাত করেন। এর কিছুদিন পরেই প্রকাশিত হয় কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'। আলালি ও হুতোমী ভাষা ছিল খাস কলকাতারই কথ্য ভাষা। সেজন্য এ ভাষা সর্বগ্রাহ্য সর্বমান্য ভাষারূপে প্রতিষ্ঠা লাভে ব্যর্থ হয়।

তবে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে নাটক, উপন্যাস ও গল্পের সংলাপে চলিত ভাষার প্রয়োগ হতে থাকে। বর্ণনা অংশের ভাষা থাকে সাধু। রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিঠিপত্র ও ডায়েরি পর্যায়ের রচনায় (য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র: ১৮৮১) চলিত ভাষাকে বাহন করেন। প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত 'সবুজপত্র'-এর প্রকাশ চলিত ভাষাকে সাহিত্য ভাষা রূপে গ্রহণের স্বপক্ষে যে আন্দোলনের সূত্রপাত করে, রবীন্দ্রনাথ তার পুরোভাগে এসে দাঁড়ান। প্রমথ চৌধুরী লিখলেন, 'শুধু মুখের কথাই জীবন্ত। যতদূর পারা যায়, যে ভাষায় কথা কই সেই ভাষায় লিখতে পারলেই লেখা প্রাণ-পায়।' স্বাভাবিকভাবে সাধু ভাষাও চলিত ভাষার মধ্যে কোনটি সাহিত্যের বাহন হবে এ নিয়ে বিতর্কের ঝড় ওঠে। উভয় ভাষারূপের সমর্থকেরা যে যাঁর মতাদর্শকে আঁকড়ে থাকেন।

যত সময় যেতে থাকে, চলিত ভাষার পাল্লা ততই ভারী হতে থাকে। 'কালি-কলম' ও 'কল্লোল' গোষ্ঠীর লেখকদের সঙ্গে অন্নদাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর প্রমুখ খ্যাতিমান লেখকেরা চলিত ভাষাকে সাহিত্যের উপযোগী শক্ত ভিতের ওপর প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তী কালে চলিত ভাষা ধীরে ধীরে সাধু ভাষার জায়গা দখল করে নেয় এবং সাহিত্যের প্রধান প্রকাশমাধ্যমে পরিণত হয়ে এ ভাষা এক বিশিষ্ট আসন লাভ করে।

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, মৌখিক বা কথ্য ভাষা আর চলিত ভাষা এক নয়। বাংলা কথ্য বা মৌখিক ভাষা অঞ্চলভেদে বিভিন্ন। উপভাষাগুলোর শব্দ ও এর উচ্চারণের মধ্যে এতই পার্থক্য যে, এক উপভাষা অঞ্চলের কথা অপর উপভাষা অঞ্চলের মানুষের সহজবোধ্য নয়। সেজন্য যে কোনো উপভাষা অঞ্চলের কথ্য ভাষা সকলের গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। সকলের গ্রহণীয় ভাষারূপে সেই ভাষাই গণ্য, যা সকল রকম উপভাষার ওপরে সকলের ব্যবহারযোগ্য ও সকলের মান্য। শিক্ষিত জনসমাজে ব্যবহৃত এরকম মার্জিত ভাষার মান্য ও স্বীকৃত রূপ হল প্রমিতভাষা। বস্তুত, কলকাতা অঞ্চলের 'কথ্য ভাষা' যখন দেশের বেশিরভাগ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভাষা-প্রয়োগের সাধারণ মাধ্যমে পরিণত হল, তখন তাতে সাহিত্য রচনায় আর কোনো বাধা থাকল না। এ 'কথ্যভাষা'র মাধ্যমে যে ভাষা সৃষ্টি হলো, তা-ই পরিণামে 'প্রমিত' ভাষা নামে অভিহিত হয় ও প্রতিষ্ঠা পায়।

সাধুভাষা বা সাধুরীতির গদ্যের বৈশিষ্ট্য

১. সাধুভাষা তৎসম বা সংস্কৃত শব্দপ্রধান, যেমন- গলধঘর্ম, নিরীক্ষণ, দিবাকর ইত্যাদি।
২. সন্ধি ও সমাসবদ্ধ দীর্ঘাকৃতি পদের প্রয়োগ, যেমন- চতুর্থাংশ, মহাবুদ্ধিসম্পন্ন, বয়োবৃদ্ধিসহকারে, অস্থিরচিত্ত, শ্রবণেন্দ্রিয়।
৩. অসমাপিকা ক্রিয়ার পূর্ণাঙ্গরূপ, যেমন- করিলে, করিয়া, বলিয়া, হইয়া, তুলিয়া, বদলাইয়া ইত্যাদি।
৪. সমাপিকা ক্রিয়ার পূর্ণাঙ্গরূপ যেমন- হইলেন, করিয়াছিলেন ইত্যাদি।
৫. সর্বনাম পদের পূর্ণাঙ্গরূপ যেমন- তাহারা, তাহাদিগের ইত্যাদি।
৬. সাধুভাষা বা সাধুরীতির গদ্য এক প্রকার আভিজাত্য ও গাম্ভীর্যের অধিকারী।
৭. সাধুভাষা বা সাধুরীতির গদ্য নাটকের সংলাপ ও বক্তৃতার অনুপযোগী।
৮. সাধুভাষা মার্জিত ও সর্বজনবোধ্য, কিন্তু বহুলাংশে কৃত্রিম।

চলিতভাষা বা চলিত রীতির গদ্যের বৈশিষ্ট্য

১. চলিত ভাষায় তদ্ভব, দেশি ও বিদেশি শব্দের প্রাধান্য থাকে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'স্বদেশি বিদেশি হাল্কা ভাষা সব শব্দই ঘেঁষাঘেঁষি করতে পারে তার আঙিনায়। ...পার্সি আরবি কথা চলিত ভাষা বহুল পরিমাণে অসংকোচে হজম করে নিয়েছে।'
২. অসমাপিকা ক্রিয়ার সংক্ষিপ্তরূপ, যেমন- করে, বসে, চেয়ে ইত্যাদি।
৩. সর্বনাম পদের সংক্ষিপ্তরূপ, যেমন- তার, তারা ইত্যাদি।
৪. অনুসর্গের সংক্ষিপ্তরূপ, যেমন- বাইরের, কাছে, থেকে ইত্যাদি।
৫. পদবিন্যাস ও বাক্যের গঠনভঙ্গি বিশেষ প্রকৃতির।
৬. ভাষা কিছুটা লঘু, সাবলীল ও স্বচ্ছন্দ গতিময় এবং জীবন্ত।

৭. চলিত ভাষা বা চলিত রীতির গদ্য কৃত্রিমতা বর্জিত এবং তা মানুষের মনোভাব প্রকাশের জন্য অপেক্ষাকৃত বেশি উপযোগী।

৮. চলিত ভাষা কথনভঙ্গির অনুকূল বিধায় এখানে সমাস ও সমাসবদ্ধ পদসমূহকে ভেঙে সহজ করা হয়। যেমন- দারুনির্মিত > কাঠের তৈরি; নানা আভরণভূষিত > নানারকম গয়না পরা ইত্যাদি।

৯. অর্থের চেয়ে ধ্বনির প্রাধান্য মানুষের মনে সহজে প্রবেশ করে এবং প্রাধান্য পায় বলে বাংলা 'চলিত ভাষা'য় ধ্বনাত্মক শব্দ এবং শব্দদ্বৈতের ব্যবহার ও প্রাধান্য বেশি।

সাধু ও চলিত ভাষারীতির পার্থক্য

১. উনিশ শতকের শুরুতে সংস্কৃতানুসারী পণ্ডিতদের উদ্যোগ-আয়োজনে যে সাহিত্যিক গদ্য ভাষার উন্মেষ, তাই সাধু ভাষা।	১. বিশ শতকের শুরুতে প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্রে'র আহ্বানে ভাগীরথীর দুই তীরবর্তী অঞ্চলের ভাষাকে ভিত্তি করে যে মৌখিক ভাষা সাহিত্যিক গদ্য ভাষার মর্যাদা লাভ করে, তা-ই চলিত ভাষা।
২. সাধু ভাষায় সর্বনাম পদের পূর্ণরূপ গৃহীত হয়। যেমন– তাহার, কাহাকে, ইহার ইত্যাদি।	২. চলিত ভাষায় সর্বনাম পদের সংক্ষিপ্ত রূপ গৃহীত হয়। যেমন– তার, কাকে, একে ইত্যাদি।
৩. সাধু ভাষায় ক্রিয়াপদগুলো পূর্ণরূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন– খাইতে, খাইতেছিলাম, করিতেছিলাম ইত্যাদি।	৩. চলিত ভাষায় ক্রিয়াপদগুলো সংক্ষিপ্ত রূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন– খেতে, খাচ্ছিলাম, করছিল ইত্যাদি।
৪. সাধু ভাষায় তৎসম শব্দের সমধিক প্রয়োগ। যেমন– চন্দ্র, অঙ্গ, চর্ম, দর্পণ ইত্যাদি।	৪. চলিত ভাষায় তদ্ভব, দেশি-বিদেশি ইত্যাদি শব্দের প্রাধান্য যেমন– চাঁদ, শরীর, চামড়া, আয়না ইত্যাদি।
৫. সাধু ভাষায় সন্ধি-সমাসের আধিক্য লক্ষ করা যায়। যেমন– কাষ্ঠাহরণ, রাজাজ্ঞা, রাজপুত্রহস্তে ইত্যাদি।	৫. চলিত ভাষায় সন্ধি-সমাসের বর্জন বা সেগুলোকে ভেঙে সহজ করে লেখার বা তদ্ভব রূপ দেওয়ার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। যেমন– কাঠ আনতে, রাজার হুকুম, রাজপুত্তুরের হাতে ইত্যাদি।
৬. সাধু ভাষার বাক্যে পদবিন্যাস সুনিয়ন্ত্রিত ও সুনির্দিষ্ট, অর্থাৎ বাক্যে প্রথমে উদ্দেশ্য ও পরে বিধেয় থাকে এবং ক্রিয়াপদ সাধারণত বাক্যের শেষে থাকে। যেমন– সম্মুখে এক ক্ষুদ্র প্রান্তর দেখিতে পাইলাম।	৬. চলিত ভাষায় পদস্থাপনের রীতি অনেক সময় পরিবর্তিত হয় এবং বাক্যে ক্রিয়াপদের ব্যবহারে অনেক স্বাধীনতা রয়েছে। যেমন– দেখতে পেলাম সামনে এক ছোট্ট মাঠ; সবশেষে এল রাতের কালো পাখি ডানা মেলে।
৭. সাধু ভাষায় বহুভাষণ বা বাগাড়ম্বর প্রশংসিত। যেমন– কপালকুণ্ডলা ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে চলিলেন, তাহার কারণ তিনি অতি গভীর চিন্তামগ্ন হইয়া যাইতেছিলেন।	৭. চলিত ভাষায় মিতভাষণ আদৃত। যেমন– কপালকুণ্ডলা গভীর চিন্তায় ডুবে গিয়ে আস্তে আস্তে ঘরের দিকে চললেন। তার কারণ তিনি খুব চিন্তিত ছিলেন।
৮. সাধু ভাষায় অনুসর্গের পূর্ণাঙ্গরূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন– জন্য, হইতে, দ্বারা, দিয়া ইত্যাদি।	৮. চলিত ভাষায় অনুসর্গের সংক্ষিপ্তরূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন– জন্যে, হতে, দিয়ে ইত্যাদি।
৯. সাধু ভাষায় সংস্কৃত অব্যয়ের ব্যবহার হয়। যেমন– যদ্যপি, তথাপি, বরঞ্চ ইত্যাদি।	৯. চলিত ভাষায় সংস্কৃত অব্যয়ের তদ্ভব রূপের ব্যবহার হয়। আবার কিছু অব্যয় আছে সেগুলো শুধু চলিতেই ব্যবহৃত হয়। যেমন– যদিও, তবু, বরং ইত্যাদি।
১০. সাধু ভাষা সুনির্ধারিত ব্যাকরণের অনুসরণ করে চলে এবং এর কাঠামো অপরিবর্তনীয়।	১০. চলিত রীতির ব্যাকরণ না থাকায় এর অনুসৃতি কষ্টসাধ্য এবং এর কাঠামো পরিবর্তনশীল।
১১. সাধু ভাষা কথোপকথনে, নাটকের সংলাপ ও বক্তৃতার অনুপযোগী।	১১. চলিত ভাষা বক্তৃতা, আলাপচারিতা ও নাট্য সংলাপে বেশি উপযোগী।
১২. সাধু ভাষা গুরুগম্ভীর ও আভিজাত্যের অধিকারী।	১২. চলিত ভাষা সহজবোধ্য, সাবলীল, স্বচ্ছন্দ ও কৃত্রিমতাবর্জিত।
১৩. সাধু ভাষা সার্বজনীন লেখ্য ভাষা।	১৩. চলিত ভাষা শিক্ষিত ভদ্রসমাজের মৌখিক ও লেখ্য ভাষা।

গুরুচণ্ডালী দোষে দুষ্ট ভাষা

'সাধু' ও 'চলিত' ভাষা বা রীতির মিশ্রণের ফলে বাংলা ভাষায় বা গদ্যে যে 'তৃতীয় রূপে'র প্রকাশ ঘটে, তা 'গুরুচণ্ডালী ভাষা' দোষে দুষ্ট বলে অভিহিত হয় এবং তা ভাষার প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে। ফলে ভাষা ব্যাকরণগত দোষে দুষ্ট হয়। এ 'গুরুচণ্ডালী ভাষা দোষে দুষ্ট' হওয়ার জন্য বাংলা গদ্যের প্রথম পর্যায়ের কোনো কোনো গদ্য লেখককেও বিদ্রুপ করে বলা হতো- 'শব-পোড়া' 'মড়া-দাহে'র দল ('শব্দ-দাহ বা 'মড়া-পোড়া' না বলে)। তাই, বাংলা গদ্যে বা রচনায় এবং চলিত কথাবার্তায় এ দু রীতির মিশ্রণ পুরোপুরিভাবে নিষিদ্ধ এবং দূষণীয় ও বর্জনীয়ও বটে।

বানান

ব্যাকরণের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বানান পদ্ধতি। বাংলা বানান পদ্ধতি মোটামুটি জটিল। কারণ আমাদের বর্ণমালায় এমন কতকগুলো ধ্বনি রয়েছে, যাদের উচ্চারিত রূপ এক ও অভিন্ন। সুতরাং বানান লিখতে গেলে বিভ্রান্তি ঘটার সম্ভাবনাই বেশি। যেমন: ই, ঈ, উ, ঊ, শ, স, ষ; ন, ণ ইত্যাদি ধ্বনিগুলোর গঠনগত ভিন্নতা থাকলেও উচ্চারণের ক্ষেত্রে লক্ষযোগ্য তেমন কোনো পার্থক্য নেই। অথচ 'সব' এবং 'শব' এর মধ্যে অর্থ পার্থক্য সুস্পষ্ট।

বাংলা ভাষার মানরূপ বিধিবদ্ধকারীদের কাছে বর্ণের চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে বানানকে; বানানের এলাকাটি তাঁরা নিজেদের অধীনে রেখে বর্ণের রূপ ও গঠনের এলাকাটি ছেড়ে দেন বর্ণঢালাইকারীদের ওপর। ১৭৭৮ থেকে বাংলা ভাষাবিদেরা অনেকটা নিরবচ্ছিন্ন চিন্তা করে আসছেন বাংলা বানান ও তার সংস্কার সম্পর্কে। এর ফলে, দু-শো ত্রিশ বছরে অর্জিত হয়েছে বাংলা মান বানান, যার কয়েকটি এলাকা এখনো অস্থিত-অস্থির। উল্লেখযোগ্য যে, মানভাষার মান বানান থাকা দরবার; কিন্তু ওই বানান যে বিজ্ঞানসম্মত হবেই, তার কোনো কথা নেই। পৃথিবীর কোনো ভাষায়ই বিজ্ঞানসম্মত বানান নেই; আর চরম অর্থে 'শুদ্ধ' বলেও কোনো বানান নেই। যে বানান গৃহীত, তাই শুদ্ধ; আর যা গৃহীত নয়, যতই যুক্তিসংগত হোক না কেন, তা অশুদ্ধ। হ্যালহেডের ব্যাকরণের (১৭৭৮) আগে বাংলা বানান ছিল উচ্চারণ অনুসারী; কিন্তু হ্যালহেড থেকেই শুরু হয় সংস্কৃতনিষ্ঠ ব্যুৎপত্তিনির্ভর বানান। রবীন্দ্রনাথ (১৯৩৮) মনে করতেন যে 'বানানের ছদ্মবেশ ঘুচিয়ে দিলেই দেখা যাবে বাংলায় তৎসম শব্দ নেই বললেই হয়।'

উনিশ শতকের সূচনায় যখন বাংলা সাহিত্যের আধুনিক পর্ব শুরু হলো, বাংলা সাহিত্যিক গদ্যের উন্মেষ হলো, তখন মোটামুটি সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুশাসন-অনুযায়ী বাংলা বানান নির্ধারিত হয়। কিন্তু বাংলা ভাষায় বহু তৎসম অর্থাৎ সংস্কৃত শব্দ গৃহীত হলেও অর্ধ-তৎসম, তদ্ভব, দেশি, বিদেশি শব্দের পরিমাণ কম নয়। এ ছাড়া রয়েছে তৎসম-অতৎসম শব্দ, প্রত্যয়, বিভক্তি, উপসর্গ ইত্যাদি সহযোগে গঠিত নানারকমের মিশ্র শব্দ। তার ফলে বানান নির্ধারিত হলেও বাংলা বানানের সমতাবিধান সম্ভবপর হয় নি। তাছাড়া, বাংলা ভাষা ক্রমাগত সাধুরীতির কাঠিন্য ত্যাগ করে চলিত রূপ পরিগ্রহ করতে থাকে। তার ওপর, অন্য অনেক ভাষার মতো বাংলারও লেখ্যরূপ সম্পূর্ণ ধ্বনিভিত্তিক নয়। তাই বাংলা বানানের অসুবিধাগুলো চলতেই থাকে। এই অসুবিধা ও অসঙ্গতি দূর করার জন্য প্রথমে বিশ শতকের বিশের দশকে বিশ্বভারতী এবং পরে ত্রিশের দশকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বানানের নিয়ম নির্ধারণ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রসহ অধিকাংশ পণ্ডিত ও লেখক সমর্থন করেন।

তবু বাংলা বানানের সম্পূর্ণ সমতা বা অভিন্নতা যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা নয়। বরং কালে কালে বানানের বিশৃঙ্খলতা বেড়ে যাচ্ছে। কতকগুলো শব্দের ক্ষেত্রে দেখা যায় নানাজনে নানারকম বানান লিখছেন। এটি ভাষার জন্য গৌরবের কিছু না বরং এ বিশৃঙ্খলা দূর করার জন্য একটি মান নিয়ম-কানুন থাকা জরুরি। নানা বানানের যে-সব বিশৃঙ্খলতা ও বিভ্রান্তি দেখা যাচ্ছে সেই পরিপ্রেক্ষিতে বানানের নিয়মগুলোকে সূত্রবদ্ধ করার প্রয়াসে ১৯৭১ এর পর বাংলাদেশ সরকার, কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ও কোনো কোনো ব্যক্তি বাংলা বানান ও লিপির সংস্কারের চেষ্টা করেন। এরই পথ ধরে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ ১৯৮৮ সালে কর্মশালা করে ও বিশেষজ্ঞ কমিটির মাধ্যমে বাংলা বানানের নিয়মের একটি খসড়া প্রস্তুত করে। বাংলা একাডেমিও ১৯৯২ সালের এপ্রিলে প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম নির্ধারণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং ১৯৯৪ সালে তা চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকসমূহে বর্তমানে এই বানানরীতিই অনুসৃত হচ্ছে।

বাংলা একাডেমি বাংলা শুদ্ধ বানানের প্রয়োগের জন্য নিরলস কাজ করে চলেছে। বস্তুত বিশেষজ্ঞ কমিটির প্রস্তাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি, বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক গৃহীত বানানরীতি সবই বিশেষভাবে বিবেচিত হয়। বাংলা একাডেমির প্রমিত বানানরীতিকে এসবের সুন্দর সমন্বয় বলা যেতে পারে।

বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম

বাংলা একাডেমি ১৯৯২ সালের ডিসেম্বর মাসে বাংলা বানানকে নিয়মিত ও প্রমিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করে একটি নিয়ম দাঁড় করিয়েছিলেন। যার 'পরিমার্জিত ও সংশোধিত' সংস্করণ তাঁরা ১৯৯৪-এর জানুয়ারিতে প্রকাশ করেন। তাঁদের সেই 'প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম' পুস্তিকায় বলেছেন, 'এখন থেকে বাংলা একাডেমি তার সকল কাজে, তার বই ও পত্রপত্রিকায় এই বানান ব্যবহার করবে। ভাষা ও সাহিত্যের জাতীয় প্রতিষ্ঠান রূপে বাংলা একাডেমি সংশ্লিষ্ট সকলকে লেখক, সাংবাদিক, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী এবং বিশেষভাবে সংবাদপত্রগুলোকে, সরকারি ও বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠানকে এই বানান ব্যবহারের সুপারিশ ও অনুরোধ করছে।' সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের পাঠ্যপুস্তকে এবং সরকারি বিভিন্ন কাজে বাংলা একাডেমি প্রণীত বানানরীতি অনুসরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে 'বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম পর্যালোচনা করা হয় এবং প্রয়োজনীয় পরিমার্জনার পর পুণর্মুদ্রণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মুদ্রিত পরিমার্জিত সংস্করণের দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ আষাঢ় ১৪২৩/জুন ২০১৬ অনুযায়ী বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম উল্লেখ করা হলো-

তৎসম শব্দ

১.১ এই নিয়মে বর্ণিত ব্যতিক্রম ছাড়া তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের নির্দিষ্ট বানান অপরিবর্তিত থাকবে।

১.২ যেসব তৎসম শব্দে ই ঈ বা উ ঊ উভয় শুদ্ধ কেবল সেসব শব্দে ই বা উ এবং তার কারচিহ্ন ি ু হবে। যেমন– কিংবদন্তি, খঞ্জনি, চিৎকার, চুল্লি, তরণি, ধমনি, ধরনি, নাড়ি, পঞ্জি, পদবি, পল্লি, ভঙ্গি, মঞ্জরি, মসি, যুবতি, রচনাবলি, লহরি, শ্রেণি, সরণি, সূচিপত্র; উর্ণা, উর্ষা।

১.৩ রেফের পর ব্যঞ্জণবর্ণের দ্বিত্ব হবে না। যেমন– অর্জ্জন, উর্দ্ধ, কর্ম্ম, কার্ত্তিক, কার্য্য, বার্দ্ধক্য, মূর্চ্ছা, সূর্য্য ইত্যাদির পরিবর্তে যথাক্রমে অর্জন, উর্ধ্ব, কর্ম, কার্তিক, কার্য, বার্ধক্য, মূর্ছা, সূর্য ইত্যাদি হবে।

১.৪ সন্ধির ক্ষেত্রে ক খ গ ঘ পরে থাকলে পূর্ব পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার (ং) হবে। যেমন– অহম্ + কার = অহংকার। এভাবে ভয়ংকর, সংগীত, শুভংকর, হৃদয়ংগম, সংঘটন। সন্ধিবদ্ধ না হলে ং হবে না। যেমন: অঙ্ক, অঙ্গ, আকাঙ্ক্ষা, আতঙ্ক, কঙ্কাল, গঙ্গা, বঙ্কিম, বঙ্গ, লঙ্ঘন, শঙ্কা, শৃঙ্খলা, সঙ্গে, সঙ্গী।

১.৫ সংস্কৃত ইন্-প্রত্যয়ান্ত শব্দের দীর্ঘ ঈ-কারান্ত রূপ সমাসবদ্ধ হলে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম-অনুযায়ী সেগুলিতে হ্রস্ব ই-কার হয়। যেমন– গুণী>গুণিজন, প্রাণী>প্রাণিবিদ্যা, মন্ত্রী>মন্ত্রিপরিষদ।
তবে এগুলির সমাসবদ্ধ রূপে ঈ-কারের ব্যবহারও চলতে পারে। যেমন– গুণী>গুণীজন, প্রাণী>প্রাণীবিদ্যা, মন্ত্রী>মন্ত্রীপরিষদ। ইন্-প্রত্যয়ান্ত শব্দের সঙ্গে-ত্ব ও তা প্রত্যয় যুক্ত হলে ই-কার হবে। যেমন– কৃতী>কৃতিত্ব, দায়ী > দায়িত্ব, প্রতিযোগী > প্রতিযোগিতা, মন্ত্রী > মন্ত্রিত্ব, সহযোগী > সহযোগিতা।

১.৬ শব্দের শেষে বিসর্গ (ঃ) থাকবে না। যেমন– ইতস্তত, কার্যত, ক্রমশ, পুনঃপুন, প্রথমত, প্রধানত, প্রয়াত, প্রায়শ, ফলত, বস্তুত, মূলত। এছাড়া কিছু ক্ষেত্রে শব্দ-মধ্যস্থ বিসর্গ-বর্জিত রূপ গৃহীত হবে। যেমন– দুস্থ, নিস্পৃহ, নিশ্বাস।

অতৎসম শব্দ

২.১ ই, ঈ, উ, ঊ

সকল অতৎসম অর্থাৎ তদ্ভব, দেশি, বিদেশি, মিশ্র শব্দে কেবল ই এবং উ এবং এদের কারচিহ্ন ি ু ব্যবহৃত হবে। যেমন– আরবি, আসামি, ইংরেজি, ইমান, ইরানি, উনিশ, ওকালতি, কাহিনী, কুমির, কেরামতি, খুশি, খেয়ালি, গাড়ি, গোয়ালিনি, চাচি, জমিদারি, জাপানি, জার্মানি, টুপি, তরকারি, দাড়ি, দাদি, দাবি, দিঘি, দিদি, নানি, নিচু, পশমি, পাখি, পাগলামি, পাগলি, পিসি, ফরাসি, ফরিয়াদি, ফারসি, ফিরিঙ্গি, বর্ণালি, বাঁশি, বাঙালি, বাড়ি, বিবি, বুড়ি, বেআইনি, বেশি, বোমাবাজি, ভারি (অত্যন্ত অর্থে), মামি, মালি, মাসি, মাস্টারি, রানি, রূপালি, রেশমি, শাড়ি, সরকারি, সিন্ধি, সোনালি, হাতি, হিজরি, হিন্দি, হেঁয়ালি। চুন, পুজো, পুব, মুলা, মুলো।

পদাশ্রিত নির্দেশক টি-তে ই-কার হবে। যেমন– ছেলেটি, বইটি, লোকটি। সর্বনাম, বিশেষণ, ক্রিয়া-বিশেষণ ও যোজক পদরূপে কী শব্দটি ঈ-কার দিয়ে লেখা হবে। যেমন– এটা কী বই? কী আনন্দ! কী আর বলব? কী করছ? কী করে যাব? কী খেলে? কী জানি? কী দুরাশা! তোমার কী? কী বুদ্ধি নিয়ে এসেছিলে! কী পড়ো? কী যে করি! কীভাবে, কীরকম, কীরূপে প্রভৃতি শব্দেও ঈ-কার হবে। যেসব প্রশ্নবাচক বাক্যের উত্তর হ্যাঁ বা না হবে, সেইসব বাক্যে ব্যবহৃত 'কি' হ্রস্ব ই-কার দিয়ে লেখা হবে। যেমন– তুমি কি যাবে? সে কি এসেছিল?

২.২ এ, অ্যা

বাংলায় এ বর্ণ বা ে-কার দিয়ে এ এবং অ্যা এই উভয় ধ্বনি নির্দেশিত হয়। যেমন– কেন, কেনো (ক্রয় করো); খেলা, খেলি; গেল, গেলে, গেছে; দেখা, দেখি; জেনো, যেন।

তবে কিছু তদ্ভব এবং বিশেষভাবে দেশি শব্দ রয়েছে যেগুলির ্যা-কার যুক্ত রূপ বহুল পরিচিত। যেমন– ব্যাঙ, ল্যাঠা। এসব শব্দে ্যা অপরিবর্তিত থাকবে। বিদেশি শব্দে ক্ষেত্র অনুযায়ী অ্যা বা ্যা-কার ব্যবহৃত হবে। যেমন– অ্যাকাউন্ট, অ্যান্ড, অ্যাসিড, ক্যাসেট, ব্যাংক, ভ্যাট, ম্যানেজার, হ্যাট।

২.৩ ও

বাংলা অ-ধ্বনির উচ্চারণ বহু ক্ষেত্রে ও-র মতো হয়। শব্দ শেষের এসব অ-ধ্বনি ও-কার দিয়ে লেখা যেতে পারে। যেমন– কালো, খাটো, ছোটো, ভালো; এগারো, বারো, তেরো, পনেরো, ষোলো, সতেরো, আঠারো, করানো, খাওয়ানো, চড়ানো, চরানো, চালানো, দেখানো, নামানো, পাঠানো, বসানো, শেখানো, শোনানো, হাসানো, কুড়ানো, নিকানো, বাঁকানো, বাঁধানো, ঘোরানো, জোরালো, ধারালো, প্যাঁচানো; করো, চড়ো, জেনো, ধরো, পড়ো, বলো, বসো, শেখো; করাতো, কেনো, দেবো, হতো, হবো, হলো; কোনো, মতো।

ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞায় শব্দের আদিতেও ও-কার লেখা যেতে পারে। যেমন– কোরো, বোলো, বোসো।

২.৪ ং, ঙ

শব্দের শেষে প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে সাধারণভাবে অনুস্বার (ং) ব্যবহৃত হবে। যেমন– গাং, ঢ়ং, পালং, রং, রাং, সং।

তবে অনুস্বারের সঙ্গে স্বর যুক্ত হলে ঙ হবে। যেমন– বাঙালি, ভাঙা, রঙিন, রঙের। বাংলা ও বাংলাদেশ শব্দে অনুস্বর থাকবে।

২.৫ ক্ষ, খ

অতৎসম শব্দ খিদে, খুদ, খুদে, খুর (গবাদি পশুর পায়ের শেষ প্রান্ত), খেত, খ্যাপা, ইত্যাদি লেখা হবে।

২.৬ জ, য

বাংলায় প্রচলিত বিদেশি শব্দ সাধারণভাবে বাংলা ভাষার ধ্বনিপদ্ধতি অনুযায়ী লিখতে হবে। যেমন– কাগজ, জাদু, জাহাজ, জুলুম, জেব্রা, বাজার, হাজার। ইসলাম ধর্ম সংক্রান্ত কয়েকটি শব্দে বিকল্পে 'য' লেখা যেতে পারে। যেমন: আযান, ওযু, কাযা, নামায, মুয়ায্যিন, যোহর, রমযান, হযরত।

২.৭ মূর্ধন্য ণ, দন্ত্য ন

অতৎসম শব্দের বানানে ণ ব্যবহার করা হবে না। যেমন– অঘ্রান, ইরান, কান, কোরান, গভর্নর, গুনতি, গোনা, ঝরনা, ধরন, পরান, রানি, সোনা, হর্ন। তৎসম শব্দে ট ঠ ড ঢ-য়ের পূর্বে যুক্ত নাসিক্যবর্ণ ণ হয়, যেমন– কণ্টক, প্রচণ্ড, লুণ্ঠন। কিন্তু অতৎসম শব্দের ক্ষেত্রে ট ঠ ড ঢ- এর আগে কেবল ন হবে। যেমন: গুন্ডা, ঝান্ডা, ঠান্ডা, ডান্ডা।

২.৮ শ, ষ, স

বিদেশি শব্দের ক্ষেত্রে 'ষ' ব্যবহারের প্রয়োজন নেই। যেমন– কিশমিশ, নাশতা, পোশাক, বেহেশ্‌ত, শখ, শয়তান, শরবত, শরম, শহর, শামিয়ানা, শার্ট, সৌখিন, আপস, জিনিস, মসলা, সন, সাদা, সাল (বৎসর), স্মার্ট, হিসাব; স্টল, স্টাইল, স্টিমার, স্ট্রিট, স্টুডিয়ো, স্টেশন, স্টোর, ইসলাম, তসলিম, মুসলমান, মুসলিম, সালাত, সালাম; এশা, শাওয়াল (হিজরি মাস), শাবান (হিজরি মাস)।

ইংরেজি ও ইংরেজির মাধ্যমে আগত বিদেশি ধ্বনির জন্য স এবং sh, sion, ssion, tion প্রভৃতি বর্ণগুচ্ছ বা ধ্বনির জন্য শ ব্যবহৃত হবে। যেমন– পাসপোর্ট, বাস; ক্যাশ; টেলিভিশন; মিশন, সেশন; রেশন, স্টেশন। যেখানে বাংলায় বিদেশি শব্দের বানান পরিবর্তিত হয়ে স ছ-এর রূপ লাভ করেছে সেখানে ছ-এর ব্যবহার থাকবে। যেমন– তছনছ, পছন্দ, মিছরি, মিছিল।

২.৯ বিদেশি শব্দ ও যুক্তবর্ণ

বাংলায় বিদেশি শব্দের আদিতে বর্ণবিশ্লেষণ সম্ভব নয়। এগুলো যুক্তবর্ণ দিয়ে লিখতে হবে। যেমন– স্টেশন, স্ট্রিট, স্প্রিং। তবে অন্য ক্ষেত্রে বিশ্লেষণ করা যায়। যেমন– মার্কস, শেকসপিয়র, ইসরাফিল।

২.১০ হস-চিহ্ন

হস-চিহ্ন যথাসম্ভব বর্জন করা হবে। যেমন– কলকল, করলেন, কাত, চট, চেক, জজ, ঝরঝর, টক, টন, টাক, ডিশ, তছনছ, ফটফট, বললেন, শখ, হক। তবে যদি অর্থবিভ্রান্তি বা ভুল উচ্চারণের আশঙ্কা থাকে তাহলে হস্‌-চিহ্ন ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন– উহ্‌, বাহ্‌, যাহ্‌।

২.১১ ঊর্ধ্ব- কমা

ঊর্ধ্ব-কমা যথাসম্ভব বর্জন করা হবে। যেমন– বলে (বলিয়া), হয়ে, দুজন, চাল (চাউল), আল (আইল)।

৩ বিবিধ

৩.১ সমাসবদ্ধ শব্দগুলো যথাসম্ভব একসঙ্গে লিখতে হবে। যেমন– অদৃষ্টপূর্ব, অনাস্বাদিতপূর্ব, নেশাগ্রস্ত, পিতাপুত্র, পূর্বপরিচিত, বিষাদমণ্ডিত, মঙ্গলবার, রবিবার, লক্ষ্যভ্রষ্ট, সংবাদপত্র, সংযতবাক, সমস্যাপূর্ণ, স্বভাবগতভাবে। বিশেষ প্রয়োজনে সমাসবদ্ধ শব্দটিকে এক বা একাধিক হাইফেন (-) দিয়ে যুক্ত করা যায়। যেমন– কিছু-না-কিছু, জল-স্থল-আকাশ, বাপ-বেটা, বেটা-বেটি, মা-ছেলে, মা-মেয়ে।

৩.২ বিশেষণ পদ সাধারণভাবে পরবর্তী পদের সঙ্গে যুক্ত হবে না। যেমন– ভালো দিন, লাল গোলাপ, সুগন্ধ ফুল, সুনীল আকাশ, সুন্দরী মেয়ে, স্তব্ধ মধ্যাহ্ন।

৩.৩ না-বাচক না এবং নি-এর প্রথমটি (না) স্বতন্ত্র পদ হিসেবে এবং দ্বিতীয়টি (নি) সমাসবদ্ধ হিসেবে ব্যবহৃত হবে। যেমন– করি না, কিন্তু করিনি। এছাড়া শব্দের পূর্বে না-বাচক উপসর্গ 'না' উত্তরপদের সঙ্গে যুক্ত থাকবে। যেমন: নাবালক, নারাজ, নাহক। অর্থ-পরিস্ফুট করার জন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুভূত হলে না-এর পর হাইফেন ব্যবহার করা যায়। যেমন– না-গোনা পাখি, না-বলা বাণী, না-শোনা কথা।

৩.৪ অধিকন্ত অর্থে ব্যবহৃত 'ও' প্রত্যয় শব্দের সঙ্গে কার-চিহ্ন রূপে যুক্ত না হয়ে পূর্ণ রূপে শব্দের পরে যুক্ত হবে। যেমন– আজও, আমরাও, কালও, তোমরও।

বিশেষ কিছু বাংলা বানান

ণত্ব বিধান

বাংলা ভাষায় গৃহীত তৎসম (সংস্কৃত) শব্দাবলির ক্ষেত্রে ণত্ব বিধান বা ণ ব্যবহারের নিয়মগুলো মেনে চলা হয়। দেশি ও বিদেশি শব্দের বেলায় ণত্ব বিধান প্রযোজ্য নয়। ণ ব্যবহারের প্রধান নিয়মগুলো নিম্নরূপ:

১. ট ঠ ড ঠ ণ-এর আগে 'ন' হলে তা মূর্ধন্য 'ণ' হবে। যেমন– লণ্ঠন, কাণ্ড ইত্যাদি।
২. ঋ র ষ-এ বর্ণগুলোর পরে 'ণ' হয়। যেমন- ঋণ, বর্ণ, তৃষ্ণা (ষ+ণ) ইত্যাদি।
৩. ঋ র ষ-এর পরে স্বরধ্বনি ষ ব হ এবং ক-বর্গীয় ও প-বর্গীয় ধ্বনি থাকলে পরে 'ণ' ব্যবহৃত হয়। যেমন- কৃপণ, লক্ষণ, অর্পণ ইত্যাদি।
৪. কতকগুলো শব্দে কেবল 'ণ' হয়। যেমন– মাণিক্য, বাণিজ্য, লাবণ্য ইত্যাদি।

ষত্ব বিধান

'ষ' ব্যবহারের নিয়ম রয়েছে প্রধানত পাঁচটি। এগুলো হলো

১ অ আ ভিন্ন অন্য স্বরধ্বনি এবং ক ও র এর পর 'ষ' থাকলে তা ঠিকই থেকে যাবে। যেমন- ভবিষ্যৎ (ভ্+অ+ব+ই+ষ), বিষয়, সুষমা ইত্যাদি।
২ ই- কারন্ত ও উ-কারন্ত উপসর্গের পর কতগুলো ধাতুতে 'ষ' হয়। যেমন- অভি-সেক > অভিষেক, প্রতি-সেধক > প্রতিষেধক ইত্যাদি।
৩ ঋ-কার ও ব-এর পর 'ষ' হয়। যেমন- কৃষক, বর্ষণ ইত্যাদি।
৪ ট ও ঠ-এর সংঙ্গে 'ষ' যুক্ত হয়। যেমন- কষ্ট, ওষ্ঠ ইত্যাদি।
৫ কতকগুলো শব্দে সব সময় 'ষ' হয়। যেমন- কোষ, ঔষধ, সরিষা ইত্যাদি।

'স' ব্যবহারের নিয়ম : আধুনিক বাংলা বানানে 'স' ব্যবহারের নিয়মগুলো নিম্নরূপ-

১ তদ্ভব শব্দে 'ষ' ব্যবহৃত হবে না, সেখানে 'স' ব্যবহৃত হবে। যথা- মাসি, পিসি।
২ ক্রিয়াবিষয়ক শব্দের শেষে 'ষ' না হয়ে 'স' হবে। যথা- করিস, ধরিস, মারিস, আছিস।
৩ বিদেশি শব্দে ষ এর পরিবর্তে স ব্যবহৃত হবে। যথা- মাস্টার, মিস্টার, স্টল, স্টোর, পোস্টার ইত্যাদি। তবে খ্রিষ্টান ধর্মের অনুসারীদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলায় খ্রিষ্টান, খ্রিষ্টাব্দ প্রভৃতি শব্দে 'ষ্ট' ব্যবহার মেনে নেওয়া হয়।

৪ সংস্কৃত 'সাৎ' প্রত্যয়যুক্ত শব্দে ষ না হয়ে স হবে। যথা- ধূলিসাৎ, ভূমিসাৎ, অগ্নিসাৎ ইত্যাদি।

৫ ই-কারন্ত এবং উ-কারন্ত উপসর্গের পরও কিছু শব্দের স কখনও ষ হয় না। যথা- অনুসরণ, অনুসন্ধিৎসা, অভিসার, পরিসংখ্যান, পরিসমাপ্তি, পরিসীমা, পরিস্থিতি, বিসংবাদ, বিসর্জন, বিস্ময়, সুসংবাদ, সুসময়, সুস্পষ্ট।

৬ তদ্ভব শব্দের মূল সংস্কৃত শব্দ অনুসারে 'স' হয়। যেমন- সাপ (সর্প), শোঁস (<শস্য)।

৭ বিদেশি শব্দে স হয়। যেমন- ভিসা, পাস, স্যার, সালাম, সালাত ইত্যাদি।

বাংলা ভাষায় সমাসঘটিত বানানের নিয়ম

১. সমাসবদ্ধপদ একসঙ্গে লিখতে হয়। যেমন– বিজ্ঞানসম্মত, সংবাদপত্র, জটিলতামূলক। প্রয়োজনে শব্দের মাঝখানে হাইফেন দেওয়া যেতে পারে। যেমন– লজ্জা-শরম, ফাঁকে-ফাঁকে ইত্যাদি।

২. দুটি পদ মিলে সমাস হলে প্রথম পদের আদ্যস্থিত উ-কার বহাল থাকে। যেমন– কূটনীতি, পূর্ণচন্দ্র, ভূতপূর্ব ইত্যাদি।

৩. দুটি অর্থপূর্ণ শব্দের প্রথমটি ইন ভাগান্ত হলে তার ঈ-কার ই-কার হয়। যেমন– প্রাণিবিদ্যা, প্রাণিজগৎ ইত্যাদি।

৪. সমান স্বরযুক্ত দুটি শব্দের মধ্যে উ-কার বা ও-কারযুক্ত শব্দ পরে বসে। যেমন– হাতি ও ঘোড়া = হাতি ঘোড়া, নাক ও মুখ = নাকমুখ ইত্যাদি।

৫. অলুক সমাসের পূর্বপদের বিভক্তি সমস্তপদে বহাল থাকে। যেমন– মাঠে-ময়দানে, ঘরে-বাইরে ইত্যাদি।

৬. অব্যয়ীভাব সমাসে পর্যন্ত অর্থে 'আ' উপসর্গ যুক্ত হয়। যেমন– আকণ্ঠ, আমরণ ইত্যাদি।

৭. সমাস হলে পরপদের শেষে স্বর লুপ্ত হয়। যেমন– মহান যে রাজা = মহারাজ।

৮. কতিপয় নঞ সমাসে পদের আদিতে 'অ' উপসর্গ বসে। যেমন– অকাজ, অজানা ইত্যাদি।

২.৫ : সাহিত্য শিক্ষণের বিষয় ও আঙ্গিকগত দিক

সাহিত্য জীবনের প্রতিচ্ছবি। জগৎ জীবনের ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে মনের যে নিবিড় নিভৃত অনুভূতি রসঘন হয়ে বাণীরূপ লাভ করে তাই সাহিত্য। ভাবের সঙ্গে ভাষার, জ্ঞানের সঙ্গে রসের, বিশেষ কালের সঙ্গে নিত্যকালের, লেখকের সঙ্গে পাঠকের যে সহিতত্ব বা মিলন, তাই সাহিত্যরূপে ধরা দেয়। পৃথিবীতে একমাত্র মানুষই অনুভূতি এবং বিবেকসম্পন্ন জীব। তাই মানুষ সহজাতভাবেই তার ভাব অন্যের কাছে প্রকাশ করতে চায়। মানুষের এই প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম সাহিত্য। সাহিত্য শিল্পময় বলেই এর প্রকাশ ঘটে বিভিন্ন ধারা ও বিভিন্ন আঙ্গিকে। কোনো নির্দিষ্ট কাঠামোয় সব মানুষ হৃদয়ানুভূতি প্রকাশ করতে পারে না। ব্যক্তি বিশেষের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে এর অঙ্গ-সৌষ্ঠব। বর্তমান সাহিত্যের ধারা ও আঙ্গিকে ঘটেছে নানান পরিবর্তন। সাহিত্যধারায় বিভিন্ন যুগে যে সমস্ত নতুন আঙ্গিকের সংযোজন হয়েছে তার মধ্যে উনিশ শতকের শ্রেষ্ঠ অর্জন বাংলা সাহিত্যিক গদ্য। সাহিত্যের আদি ও মধ্যযুগের কল্পনা, বিস্ময় ও উচ্ছ্বাস প্রবণতাকে অতিক্রম করে মানুষ তার মুক্তবুদ্ধিকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে গদ্য সাহিত্যের মাধ্যমে। স্থানিক এবং কালিক বিবর্তনে এই পর্যায়ে সাহিত্যের কেবল রসকল্পে নয় রূপকল্পেও পরিবর্তন এসেছে নানাভাবে। এর ফলে, বাংলা সাহিত্যের ধারাটি ধীরে ধীরে ব্যাপকতা লাভ করে নানা আঙ্গিকে আমাদের সাহিত্য সম্ভাবনাকে পরিপুষ্ট করে তুলছে। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, রম্যরচনা, স্মৃতিকথামূলক রচনা এসবই বাংলা সাহিত্যের বিশেষ বিশেষ আঙ্গিক। বক্তব্যের বিশিষ্টতায় এবং প্রকাশভঙ্গির চমৎকারিত্বে প্রতিটি আঙ্গিকই বিশেষ শিল্পসৃষ্টির দাবিদার।

মাধ্যমিক স্তরে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের জন্য যে শিক্ষাক্রম প্রবর্তন করা হয়েছে, তাতে প্রতিটির পাঠ্যসূচিতে কবিতা, ছোটগল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস ও নাটিকা স্থান পেয়েছে। বক্তব্যের বিশিষ্টতা ও বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যের ভিন্নতার কারণে পাঠ্যপুস্তকে সংকলিত প্রতিটি আঙ্গিক সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের দাবি রাখে। পাঠ্যপুস্তকে স্থান পাওয়া সিলেবাসভুক্ত কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটকের আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য, উপজীব্য বিষয়বস্তু ইত্যাদি শিক্ষার্থীদের কাছে সহজ সরলভাবে বোধগম্য করে তোলার জন্য, আঙ্গিকগত বিষয় বিশ্লেষণ করার জন্য সবার আগে শিক্ষকের সম্যক জ্ঞান আয়ত্তে রাখা জরুরি।

কবিতা

সহজেই অনুমান করা যায় কবির বেদনাবিদ্ধ হৃদয়ই কবিতার জন্মভূমি। বাইরের জগতের রূপ-রস, স্পর্শ-শব্দ বা আপন মনের ভাবনা-বেদনা, অনুভূতি কল্পনাকে যিনি অনুভূতিস্নিগ্ধ ছন্দোময় শিল্পরূপ দিতে পারেন তিনিই কবি। বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে কোনো একটি সূত্রকে অবলম্বন করে কবির আনন্দ বেদনা যখন প্রকাশের পথ পায় তখনই জন্ম হয় কবিতার। বস্তুত মানব মনের ভাবনা কল্পনা যখন অনুভূতির রঙে রঞ্জিত হয়ে যথাযথ শব্দসম্ভারে বাস্তব, সুষমামণ্ডিত, চিত্রাত্মক ও ছন্দোময় রূপ লাভ করে তখনই তা হয়ে ওঠে কবিতা।

ছন্দোবদ্ধ পদকেই কবিতা বলা যায়। ছন্দই কবিতার প্রাণ, ছন্দই কবিতাকে তার স্বরূপগত বৈশিষ্ট্যে উন্নীত হতে সাহায্য করে। কিন্তু কেবল ছন্দই কবিতার সব ও শেষ কথা নয়। কবিতার অপরিহার্য অঙ্গ তার অলংকার। কবিতার মধ্যে কবির কল্পনাশক্তির প্রকাশ, অনুভূতির উচ্ছ্বাস বাণীমূর্তিতে ধরা পড়ে। চর্যাপদ বাংলা কাব্য সাহিত্যের আদি নিদর্শন। এর কবিতাগুলোতে শুধু ধর্মের কথাই নয়, আছে ভালো কবিতার স্বাদ; আছে সেকালের বাংলার সমাজছবি। ছবিগুলো এতো জীবন্ত যে, মনে হয় 'এই মাত্র প্রাচীন বাংলার গাছপালা, আর সাধারণ মানুষের মধ্যে একটু হেঁটে এলাম।' চর্যাপদে আছে অসহায় মানুষের বেদনার কথা; রয়েছে সুখের উল্লাস। আছে চমৎকার ছন্দোবদ্ধ পদ এবং অলংকারের ব্যবহার।

কবিতার সংজ্ঞায় ST Coleridge বলেন, Best words in best order. অর্থাৎ অপরিহার্য শব্দের অবশ্যম্ভাবী বাণী বিন্যাসকে কবিতা বলা যায়। নানাভাবে মনের ভাব-কল্পনা যখন অনুভূতিরঞ্জিত, যথাবিহীত শব্দসম্ভারে বাস্তব সুষমামণ্ডিত ছন্দময়রূপ লাভ করে তখন তা কবিতা হয়ে ওঠে। ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলেছেন, Poetry is the sponteneous overflow of powerful feelings. অর্থাৎ কবিতা দুর্নিবার আবেগের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। Shelly এর মতে- Poetry is the general sense may be defined as the expression of the imagination. কল্পনাকে প্রকাশ করার নামই কবিতা। সাধারণভাবে কবিতা বলতে ছন্দোবন্ধ পদকে বুঝি। আর বৃহৎ অর্থে রবীন্দ্রনাথের ভাষায়- 'নিজের প্রাণের মধ্যে, পরের প্রাণের মধ্যে ও প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করিবার ক্ষমতাকেই বলি কবিত্ব।'

কবিতার প্রকারভেদ

কবিতাকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন- মন্ময় কবিতা এবং তন্ময় কবিতা

মন্ময় কবিতা

অলংকার শাস্ত্রে কবিকে প্রজাপতি ব্রহ্মার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। প্রজাপতি ব্রহ্মা যেমন বিশ্বজগৎকে আপন কল্পনা দিয়ে সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন, তেমনি কবিগণ শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে এক বিচিত্র মায়ার জগৎ সৃষ্টি করেন। কবি যখন একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতি, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, ভাবনা, চিন্তা তার কাব্যে সামগ্রিক রূপে গ্রহণ করে আত্মপ্রকাশ করেন তখন সেই অমর সৃষ্টিকে মন্ময় কবিতা বলে। মন্ময় কবিতা ব্যক্তিনিষ্ঠ। কবির অন্তরের অনুভূতির দিকগুলো মন্ময় কবিতায় ধরা পড়ে। কাব্যতত্ত্ব, সাহিত্য, দর্শন, শিল্পকলা এবং রস সৌন্দর্যের বিচারে মন্ময় কবিতাই শ্রেষ্ঠ। মন্ময় কবিতা প্রধানত দুই প্রকার। যথা- গীতি কবিতা ও সনেট।

গীতি কবিতা

গীতি কবিতাকে ইংরেজি সাহিত্যে বলা হয় lyric। গীতিপ্রধান কবিতা বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে গাওয়া হতো বলে এ ধরনের কবিতাগুলো lyric নামে পরিচিত। গীতি কবিতা প্রধানত সঙ্গীতধর্মী হলেও এগুলো আত্মভাব প্রধান। গীতি কবিতা সাধারণত দীর্ঘাকারে বর্ণিত হতে পারে, এতে তার মূলরস ক্ষুণ্ন হয় না। কবির ইচ্ছা-অনিচ্ছা এক্ষেত্রে প্রধান। পরিপূর্ণ মানব জীবনের ইঙ্গিত নয় বরং মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত আনন্দ-বেদনায় গীতি কবিতা পরিপূর্ণ। শ্রীশচন্দ্র দাশের মতে- 'যে কবিতায় কবির আত্মানুভূতি বা একান্ত ব্যক্তিগত বাসনা-কামনা ও আনন্দ-বেদনা তাঁহার প্রাণের অন্তস্থল হইতে আবেগ-কল্পিত সুরে অখণ্ড ভাবমূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করে তাহাকেই গীতিকবিতা বলে।'

গীতিকবিতাকে সাধারণত নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়–

১. ভক্তিমূলক: রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'
২. স্বদেশপ্রীতিমূলক: মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'কপোতাক্ষ নদ'
৩. প্রেমমূলক: জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন'

৪. প্রকৃতি বিষয়ক: সত্যেন্দ্র নাথ দত্তের 'ঝর্না'
৫. চিন্তামূলক: রবীন্দ্রনাথের 'যেতে নাহি দিব'
৬. প্রশস্তিমূলক: রবীন্দ্রনাথের উর্বশী (চিত্রা), ছবি (বলাকা), পৃথিবী (পত্রপুট)
৭. স্তোত্র কবিতা: অক্ষয় কুমার বড়ালের 'মানব বন্দনা'
৮. শোকগীতি: বিহারীলালের 'বন্ধু বিয়োগ'

সনেট

সনেট শব্দটি ইতালিয়ান 'সনেটা' শব্দ থেকে উদ্ভূত। একটিমাত্র অখণ্ড ভাবকল্পনা বা অনুভূতিকণা যখন ১৪ অক্ষর সমন্বিত চতুর্দশ পংক্তিতে একটি বিশেষ ছন্দরীতিতে আত্মপ্রকাশ করে তখন তাকে সনেট নামে অভিহিত করা হয়। সনেটের জনক হলেন ইতালিয়ান কবি পেত্রার্ক (১৩০৪-১৩৭৪)। চতুর্দশ শতকে তিনি সনেট কাব্য রচনা করেন। এতে মোট ১৪টি পদ থাকে। প্রথম ৮ পদকে অষ্টক (octave); এবং শেষ ৪ পদকে ষট্‌ক বলে। সনেটে প্রথম ৮ পংক্তিতে একটি ভাবকল্পনার ইঙ্গিত করা হয়, এবং শেষ ৬ পংক্তিতে সেই ভাবকল্পনার বিস্তৃতি ঘটানো হয়। ইতালিয়ান কবি পেত্রার্ক, দান্তে, ট্যাসো ছাড়াও ইংরেজি সাহিত্যে শেক্সপিয়র, মিল্টন, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কিটস্ প্রমুখ কবি বিখ্যাত সনেট রচনা করেছেন। বাংলা সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রথম সনেট রচনা করেন। তিনি ১৪ অক্ষরই বাংলা সনেটের জন্য নির্ধারিত করেছিলেন। এ ছাড়াও প্রমথ চৌধুরী, মোহিতলাল মজুমদার ও ফররুখ আহমদ সনেট রচনা করেছেন।

সনেটের গঠনরীতি

- এটি ১৪ অক্ষর (কখনো ১৮ অক্ষর) সম্বলিত চতুর্দশ পঙ্‌ক্তির কবিতা
- এতে একটিমাত্র ভাবের দ্যোতনা থাকে
- অষ্টক ষটকের বিভাগ থাকে, তবে পরবর্তীতে অনেকে এই নিয়ম মেনে চলেন নি।
- এতে ভাবের গভীরতা এবং ভাষার ঋজুতা থাকবে।
- বিশেষ গঠনরীতি অনুসৃত হওয়ার কারণে অন্যান্য গীতিকবিতার তুলনায় এতে স্বতঃস্ফূর্ততা অপেক্ষাকৃত কম।

সনেটে সাধারণভাবে অষ্টক ও ষটকে অন্ত্যমিল বিন্যাসের নিয়ম অনুসরণ করা হয়ে থাকে। বিশেষত পেত্রার্কের সনেট রূপকল্পে এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায় না। অষ্টকে অন্ত্যমিল ক খ খ ক ক খ খ ক। ষট্‌কে অন্ত্যমিলে কিছুটা স্বাধীনতা দেখা যায়। যেমন, গখগ ঘগঘ অথবা, গঘঙ গঘঙ অথবা গখঘ গগঘ। লক্ষণীয়, শেষ দুটি চরণে কোনো প্রকার অন্ত্যমিল থাকে না।

তন্ময় কবিতা

আধুনিক গীতি কবিতার অন্যতম কবিতারূপ তন্ময় কবিতা। জগৎ-সংসার বা বস্তুবিশ্বের কোনো বিষয় যখন কবি হৃদয়ে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে কবির অনুভূতিতে আলোড়ন সৃষ্টি করে তখনই বিষয়গত গীতিকবিতার সৃষ্টি। তন্ময় কবিতায় বস্তুসত্তাই প্রধান। আলংকারিক ভাষার নৈপুণ্য, ছন্দের জাদুকরী বৈচিত্র্য, ভাবের ব্যঞ্জনা ও কল্পনার চমৎকারিত্বই হলো তন্ময় কবিতার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এর প্রধান দুটো ধারা নিম্নরূপ।

মহাকাব্য

মানুষের গল্প শোনার আদিম প্রবৃত্তি থেকেই মহাকাব্যের জন্ম। মহাকাব্যের সুবিশাল কাহিনী রচনার মাধ্যমে কবি মানবজীবন ও মানবসমাজের কথা শোনান। মহাকাব্যের সুবিশাল পরিসরে মহাকবি যে গল্প শোনাতে চান, তা কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা নায়ক-নায়িকার ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের গল্প নয়, আবার নিছক কাল্পনিক গল্পও নয়, তা হয়ে ওঠে ব্যক্তির জীবনের মধ্য দিয়ে সমগ্র দেশের কথা, সমগ্র জাতির কথা। সাধারণ কাব্যের সঙ্গে মহাকাব্যের মূলগত পার্থক্যটি এই যে, সাধারণ কাব্যে একক স্রষ্টার মর্মবাণী ধ্বনিত হয়, আর মহাকাব্যে স্পন্দিত হয় যুগ ও জাতির উদাত্ত ধ্বনি। মহাকাব্য তাই জাতীয় জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত হয়ে জাতীয় জীবনের অভিপ্রায়টিকে ব্যক্ত করে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'তাহাকে (মহাকাব্যকে) কোন ব্যক্তিবিশেষের রচনা বলিয়া মনে হয় না; মনে হয় যেন তাহা বৃহৎ বনস্পতির মতো দেশের ভূতল জঠর হইতে উদ্ভূত হইয়া সেই দেশকেই আশ্রয়-ছায়া দান করিয়াছে।' দেশ ও জাতির যথার্থ স্বরূপ মহাকাব্যের মধ্যে বিধৃত হয় বলেই মহাকাব্যকে 'জাতীয় কাব্য' হিসেবেও আখ্যা দেওয়া যায়।

গদ্য কবিতা

তন্ময় কবিতার অন্যতম প্রধান শাখা হলো গদ্য কবিতা। বাংলা কাব্যসাহিত্যে গদ্য কবিতা নবতর সংযোজন। রবীন্দ্রনাথ প্রথম গদ্য কবিতার সার্থক রূপনির্মাতা। তাঁর মতে-'গদ্যরীতিতে কাজের অধিকারকে অনেকদূর বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব এই আমার বিশ্বাস।' রবীন্দ্রনাথের গদ্যকাব্য পুনশ্চ, পত্রপুট, শ্যামলী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। আধুনিককালে বিষ্ণু দে, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, শামসুর রাহমান প্রমুখ কবি গদ্য কবিতা লিখে সমাদৃত হয়েছেন। গদ্য কবিতা বিভিন্ন রকমের।

- গাথা কাব্য: ময়মনসিংহ গীতিকা, গোপী চাঁদের গীত , মধ্যযুগের চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল, ধর্মমঙ্গল
- নাট্যকাব্য ও কাব্যনাট্য: রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' (নাট্যকাব্য) রবীন্দ্রনাথের 'বিদায় অভিশাপ' (কাব্যনাট্য)
- নীতি কাব্য: রবীন্দ্রনাথের 'জুতা আবিষ্কার', রজনীসেনের 'অমৃত'
- কাহিনী কাব্য: কামিনী রায়ের 'মহাশ্বেতা', রবীন্দ্রনাথের 'পরিশোধ'
- লিপিকাব্য বা পত্রিকা কাব্য: মাইকেল মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা'

উপর্যুক্ত তন্ময় কবিতার উল্লেখযোগ্য ধারার পাশাপাশি রূপক কাব্য, ছড়া কাব্য, সাংকেতিক কাব্য এবং ব্যঙ্গ কবিতার মাধ্যমেও বস্তুবিশ্বের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ-বিরহকথা শৈল্পিকভাবে ফুটে ওঠে।

ছোটগল্প

ছোটগল্প বাংলা সাহিত্যে বিজয়ী বীরের মতো। সে দখল করেছে মানুষের অনুভূতির সব জায়গা। ছোটগল্প বিষয়-বৈচিত্র্যে, ভাষার চমৎকারিত্বে, নাটকীয় বৈশিষ্ট্যে, গীতিময়তায়, জীবনের চকিত চপল মহূর্তের রস-ব্যঞ্জনায়, শিল্প সৌন্দর্যে এক রূপময় সাহিত্যকর্ম। সাহিত্যের অন্যান্য শাখার তুলনায় ছোটগল্পের আবির্ভাব পরে হলেও তার প্রকৃতিগত ও মর্মগত বৈশিষ্ট্য, বৈচিত্র্য এবং সৌন্দর্যের কারণে পাঠকচিত্ত জয় করেছে অতি দ্রুত। মানুষের জীবনে প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে অসংখ্য ঘটনাপ্রবাহ। এর মধ্যে কিছু কিছু ঘটনা হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো মানুষের মনকে হাসি-কান্নায়, আনন্দ-বেদনায়, ভয়ে-শিহরণে আপ্লুত এবং রোমাঞ্চিত করে তোলে। ক্ষণিকের এসব খণ্ড ক্ষুদ্র ঘটনা, হৃদয় মন্থনকারী এসব গভীর অনুভূতি বিমূর্ত হয়ে ওঠে ছোটগল্পের ক্ষীণ অঙ্গসৌষ্ঠবে।

অনেকে ছোটগল্পকে সংজ্ঞায়িত করতে চেয়েছেন আকার-আকৃতির দিক থেকে। কিন্তু তাতে ছোটগল্পের প্রকৃতিগত এবং মর্মগত কোনো বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় না। এডগার এলেন পো বলেছেন, আধঘণ্টা থেকে এক বা দু ঘণ্টার মধ্যে পড়ে শেষ করা যায় এমন গল্পই ছোটগল্প। কিন্তু এই সংজ্ঞায় ছোটগল্পের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য, মাধুর্য, বিষয়-বৈচিত্র্য এবং রসময় সত্তার কিছুই উপলব্ধি করা যায় না। মূলত মানব জীবনের কোনো বিশেষ একটি মুহূর্ত, একটি বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ঘটনা, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনায় মথিত কোনো অনুভূতির নাটকীয় অভিব্যক্তিকে ছোটগল্প হিসাবে আখ্যায়িত করা যায়।

উপন্যাস

উপন্যাস বাংলা সাহিত্য তথা বিশ্ব সাহিত্যে আধুনিক কালের সৃষ্টি, বর্তমানে এটি সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় মাধ্যম। বাংলা সাহিত্যের আদি ও মধ্যযুগে রচিত রূপকথা, নাথ-সাহিত্য, মঙ্গলকাব্য, গীতিকা-সাহিত্য প্রভৃতির কাব্যরূপের মধ্যেও গল্পধর্মী উপকরণ পাওয়া যায়। এগুলোতে কেবল গল্পরস নয়; সরস পরিবেশন ভঙ্গিটিও লক্ষণীয়। উপন্যাস রচনার জন্য প্রয়োজন যে নিপুণ পর্যবেক্ষণ শক্তি, জগৎ ও জীবন সম্পর্কে প্রত্যয়, ব্যাপক অভিজ্ঞতা ও গভীর সহানুভূতি, তা মধ্যযুগের কোনো কোনো কবির কাব্যে বিশেষত কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। প্রাচ্যে প্রথম প্রকৃত উপন্যাসের শিল্পগুণ ও লক্ষণ লক্ষ করা গেছে প্রায় এক হাজার বছর আগে রচিত মুরাসাকি শিকিবা নামে এক জাপানী লেখিকার 'গেন্‌জির কাহিনী' The tale of Genji রচনাটিতে। চতুর্দশ শতকে ইতালীয় লেখক বোকাচিওর হাতে প্রথম উপন্যাসধর্মী রচনার সৃষ্টি হয়।

উপন্যাস পূর্ণাঙ্গ জীবনের প্রতিচ্ছবি। অন্যান্য শিল্পকর্মের তুলনায় উপন্যাসের স্বাতন্ত্র্য এই যে, পাঠক এখানে জীবনকে বাস্তব রূপে দেখতে চায়; জীবনের গতি-প্রকৃতিকে অনুধাবন করতে চায়। কিন্তু জীবনকে কোনো বাঁধাধরা সংজ্ঞার্থে ধারণ করা যায় না বলে উপন্যাসে কোন ধরনের জীবনকে ঠিক কীভাবে অনুধাবন করা যাবে, তা সঠিক বলা যায় না। তবে মোটামুটি দীর্ঘ যে কল্পিত গদ্য-কাহিনীতে জীবনের জটিলতা সত্ত্বেও রক্ষিত হয় একটি শিল্পগত ঐক্য- তাকে উপন্যাস বলা যায়।

উপন্যাসের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বিভিন্ন লেখক বিভিন্নভাবে বিষয়টিকে উপস্থাপন করেছেন। Fielding লিখেছেন, Novel is a cosmic epic in prose.' Prof. Warren লিখেছেন, A Novel is a fictitious narrative which Contains a plot. সহজভাবে বলা যায়, লেখকের ব্যক্তিগত জীবন-দর্শন ও জীবনানুভূতি কোনো বাস্তব কাহিনীকে অবলম্বন করে যে বর্ণনাত্মক শিল্পকর্মে রূপায়িত হয়, তাকে উপন্যাস বলে। নাটকে রঙ্গমঞ্চ ও দৃশ্যাবলি যে কাজ করে, ঔপন্যাসিক বর্ণনার সাহায্যে সেই কাজটি সম্পন্ন করেন। এর ঘটনাবলি কয়েকটি চরিত্রকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে। অনেকে মনে করেন, উপন্যাসে ঘটনাই মুখ্য, চরিত্রসৃষ্টি গৌণ। আমাদের বিচারে, ঘটনা ও চরিত্র সৃষ্টি পরস্পর নিরপেক্ষ নয়- একটি অপরটির সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। চরিত্রই

নিজের চারিদিকে ঘটনার জাল বুনে ঘটনাপ্রবাহ সৃষ্টি করে এবং ঘটনা চরিত্রসৃষ্টির সাহায্য করে। চরিত্রকে ফোটাবার জন্য প্লটের দরকার, সেজন্য পারিপার্শ্বিক অবস্থা এনে যোগ করতে হয়। তখন চরিত্র ও ঘটনাবলি বিন্যাসের মধ্য দিয়ে জীবনের প্রবাহ সৃষ্টি হয়। পাত্রপাত্রীগণের কথোপকথন উপন্যাসে বিশেষ প্রয়োজনীয়। সাবলীল, সহজ ও স্বাভাবিক সংলাপ উপন্যাসের চরিত্রবিকাশে সহায়ক। এছাড়া যে-দেশের, যে-কালের, যে-সমাজের উপন্যাস লেখা হয়, সেই দেশ-কাল-সমাজের রুচি, আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতি অনুযায়ী রচিত হয়ে থাকে উপন্যাস। এতে কোনো বিষয়ের অযথা দীর্ঘ বর্ণনা শোভন নয়। কোনো কোনো ঔপন্যাসিক বিশেষ কোনো স্থান বা জেলার অধিবাসীদের আচার ব্যবহার বা জীবনযাত্রার আখ্যান নিয়ে উপন্যাস রচনা করেন।

প্রবন্ধ

'প্রবন্ধ' শব্দের অর্থ 'প্রকৃষ্ট বন্ধন'। এ বন্ধন হচ্ছে ভাব ও ভাষার বন্ধন। ভাষাকে অবলম্বন করে ভাব প্রকাশিত হয়। ভাবকে বহনও করে ভাষা। তাছাড়া ভাব অনুযায়ী ভাষা তার চেহারা ও রূপেরও পরিবর্তন ঘটায়। ভাব গুরুগম্ভীর হলে ভাষা সে-অনুযায়ী গুরুগম্ভীর হয়। ভাব হালকা চটুল হলে ভাষা হয় হালকা চটুল। ভাব-ভাষার বন্ধন যথাযথ হলে সে রচনা-দেহে সাহিত্যগুণের বিকাশ ঘটে। ভাব-ভাষার সঙ্গে যথোপযুক্ত তথ্য, তত্ত্ব, দৃষ্টান্তের প্রয়োগে বক্তব্য বিষয় সবিস্তারে সাজিয়ে নিলে প্রবন্ধের সুঠাম সংহত অবয়বটি গড়ে ওঠে। সুতরাং কোনো মননশীল ভাব কিংবা তথ্য বা তত্ত্ব উপযুক্ত ভাষার মাধ্যমে যুক্তি-পরম্পরায় সুসংহতভাবে প্রকাশিত হয়ে শিল্পরূপ লাভ করলে আমরা তাকে প্রবন্ধ বলতে পারি। প্রবন্ধ যে সবসময় মননশীল ও যুক্তিধর্মীই হবে তা নয়। প্রবন্ধ অনুভূতিপ্রধান, আবেগধর্মী, বুদ্ধিদীপ্ত কিংবা অন্তরঙ্গ চিন্তাধর্মীও হতে পারে। ব্যক্তিভেদে প্রবন্ধের প্রকাশভঙ্গি, পরিবেশন-রীতি, যুক্তিপ্রয়োগের পদ্ধতি, বিশ্লেষণী ক্ষমতা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন হওয়া স্বাভাবিক। একই বিষয়ের প্রবন্ধ বিভিন্ন লেখকের রচনায় ভিন্ন ভিন্ন শিল্প-শৈলীতে প্রকাশিত হয়।

প্রবন্ধ ও নিবন্ধ

নিবন্ধ শব্দটি প্রবন্ধ শব্দের সমার্থক। প্রবন্ধ শব্দটি যেমন প্রকৃষ্ট রূপে বন্ধন তেমনি 'নিবন্ধ' শব্দটি সাধারণত সংস্কৃত অলংকার গ্রন্থে বন্ধনযুক্ত রচনা অর্থেই গ্রহণ করা হয়। অতএব সংজ্ঞা এবং কাঠামোগত দিক দিয়ে এদুয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তবে নিবন্ধ প্রবন্ধের চেয়ে সংক্ষিপ্ত। বলা যায়- ভাবে, চিন্তায়, যুক্তিতে এবং শিল্পসম্মত সুঠাম গঠনে প্রবন্ধ ও নিবন্ধ একই, কিন্তু আয়তনে-আকারে-ব্যাপ্তিতে ও পরিসরে নিবন্ধ প্রবন্ধের তুলনায় সংক্ষিপ্ত। তাছাড়া নিবন্ধকে বিশেষ প্রয়োজনে মূল বক্তব্যের সার-সংক্ষেপ উপস্থাপন কৌশলও বলা যায় । উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিবসে দৈনিক পত্রিকাগুলোয় ঐ দিনের তাৎপর্য তুলে ধরে নিবন্ধ ছাপা হয়।

প্রবন্ধের প্রকারভেদ

বিষয়মাত্রই চিরপুরাতন ও সীমাবদ্ধ; ভঙ্গিই তাকে চলিষ্ণু ও প্রাণবান করে তোলে। প্রবন্ধ-সাহিত্যের বিচারে তাই এই বিষয়বস্তু প্রকাশের ভঙ্গিই মুখ্য। বিষয়বস্তু ও প্রকাশভঙ্গির দিক থেকে প্রবন্ধ সাহিত্যকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–
তন্ময় বা বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধ এবং মন্ময় বা ব্যক্তিনিষ্ঠ প্রবন্ধ।

তন্ময় বা বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধ

সাহিত্যের যা চিরন্তন উদ্দেশ্য– সৌন্দর্যসৃষ্টি ও আনন্দদান, তাই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। 'বস্তুনিষ্ঠ' প্রবন্ধ আমাদের বুদ্ধিকে তীক্ষ্ণতর, দৃষ্টিকে সমুজ্জ্বল ও জ্ঞানের পরিধিকে প্রশস্ত করে তোলে। বস্তুত; বিষয়বস্তুর প্রাধান্য রক্ষা করে যে সকল প্রবন্ধ লেখা হয় তাকে তন্ময় বা বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধ বলে। এ ধরনের প্রবন্ধকে চিন্তামূলক প্রবন্ধও বলা হয়। বিষয়বস্তুর গৌরবই এ ধরনের প্রবন্ধের মূল কথা। এ জাতীয় প্রবন্ধের মধ্যে লেখকের ব্যক্তিত্ব, জ্ঞান, বুদ্ধির প্রখরতা ফুটে ওঠে। তন্ময় প্রবন্ধের বিষয়বস্তু সাধারণত গুরুগম্ভীর ও তথ্যসমৃদ্ধ হয়। যেমন– ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রচিত 'বর্ণ পরিচয়', 'বাঙ্গালার ইতিহাস' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'প্রাচীন সাহিত্য', 'আধুনিক সাহিত্য' ইত্যাদি।

মন্ময় বা ব্যক্তিনিষ্ঠ প্রবন্ধ

মন্ময় প্রবন্ধে লেখকের ব্যক্তিচিন্তা অপেক্ষা ব্যক্তিহৃদয়ই প্রধান। অর্থাৎ এ ধরনের প্রবন্ধে ব্যক্তিই প্রধান, বস্তু নয়। রচনার রস সম্ভোগই এর মূল কথা। এ জাতীয় প্রবন্ধে লেখক আত্মনিবেদন করেন। মন্ময় প্রবন্ধের বিষয়বস্তু নির্বাচনে লেখকের যথেষ্ট স্বাধীনতা থাকে। এ ধরনের প্রবন্ধ ব্যক্তি জীবনের নানা জটিলতাকে আর বিষয়বস্তুর গাম্ভীর্যকে আত্মগত ভাবরসে সিক্ত করে জীবনকে সরসতা ও স্নিগ্ধতা দান করে। বলার বিষয় নয়, বরং বলার ভঙ্গিই লেখকের নিকট প্রাধান্য পায়। যেমন– বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র', 'কমলাকান্তের দপ্তর', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জীবন স্মৃতি', 'ছেলে বেলা', 'ছিন্নপত্র', প্রমথ চৌধুরীর 'তেল নুন লাকড়ি', কাজী নজরুল ইসলামের 'আমি সৈনিক', প্রভৃতি।

নাটক

প্রাচ্য অলংকার শাস্ত্র অনুযায়ী ভরতকেই নাট্যশিল্পের জনক বলা হয়। সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ নাট্যসাহিত্যকে কাব্যসাহিত্যের মধ্যে স্থান দিয়েছেন। তাদের মতে কাব্য দু'প্রকার- দৃশ্যকাব্য ও শ্রব্যকাব্য। নাটক প্রধানত দৃশ্যকাব্য এবং সকল প্রকার কাব্যসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ– কাব্যেষু নাটকং রম্যম। নাটক দৃশ্য ও শ্রব্যকাব্যের সমন্বয়ে রঙ্গমঞ্চের সাহায্যে গতিমান মানবজীবনের প্রতিচ্ছবি আমাদের সামনে তুলে ধরে।

নাটক শব্দটির উৎপত্তি নৃৎ ধাতু থেকে। ধাতুগত অর্থ বিবেচনা করলে অভিনয় বা করে দেখানোকেই নাটক বুঝায়। সে দিক থেকে বলা যায়, অনুকরণ প্রবণতা থেকেই নাটকের সৃষ্টি। মানব জীবনের বিভিন্ন ঘটনার উচ্চকিত অভিব্যক্তিই নাটক। নাটকে জীবনের ঘটনাবলি বড় করে দেখানো হয়। জীবনের গতানুগতিক স্রোতধারায় ঘটে যাওয়া অনেক ঘটনাই আমরা স্পষ্টভাবে দেখতে পাই না। নাট্যকার জীবনের সেসব অস্পষ্ট ঘটনাকে সংলাপে, সাহিত্যরসে, ভাবব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত করে আমাদের সামনে উপস্থিত করেন। সমাজ ও ব্যক্তিজীবনের হাসি-কান্না, প্রেম-বিরহ, দুঃখ-বেদনা, জটিলতা-কুটিলতা নাটকের মাধ্যমে তুলে ধরা হয় বলে নাটককে জীবনের প্রতিচ্ছবি বলা হয়। নাটক অভিনয়ের সাহায্যে মঞ্চে উপস্থাপন করা হয়। অভিনীত হওয়ার মধ্যেই নাটকের সার্থকতা। নাটক সম্পর্কে এ্যারিস্টটল বলেন, 'নাটক হচ্ছে কোনো কাজের অনুকরণ।'(Imitation of action.) ড্রাইডেন এর মতে, 'মানবিক আবেগ এবং জাগতিক পরিবর্তনের যথাযথ জীবন্ত প্রতিরূপ হচ্ছে নাটক।' নাট্যতত্ত্ববিদ সিসেরো বলেন, নাটক হচ্ছে 'a copy of life, a mirror of custom, a reflection of truth' অর্থাৎ জীবনের প্রতিরূপ, রীতিনীতির দর্পণ, সত্যের প্রতিফলনই নাটক।

নাটকে কাহিনীর সুসংবদ্ধতা, নিবিড় রসানুভূতি, পরিণতির আকস্মিকতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠা জরুরি। তাছাড়া ঘটনা, স্থান এবং সময় এই তিনের মধ্যে সুসংহতি বা ঐক্য রক্ষা করে নাট্যকার ভালো নাটক রচনা করেন। নাটকের অন্তর্গত ঘটনার বিকাশ ও পরিণতিকে পাঁচটি পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। এই পর্যায়গুলো হচ্ছে প্রারম্ভ, প্রবাহ, উৎকর্ষ, গ্রন্থিমোচন এবং উপসংহার। নাটকের প্রথম অঙ্কে কাহিনীর সূত্রপাত ঘটে। দ্বিতীয় অঙ্কে ঘটনার বিস্তার ঘটে ও জটিলতা সৃষ্টি হয়। তৃতীয় অঙ্কে নাটকের দ্বন্দ্ব-সংঘাত চরমে পৌঁছায়। চতুর্থ অঙ্কে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের নিরসন হয় এবং পঞ্চম অঙ্কে সমাপ্তি ঘটে। বর্তমানে নাটকের এই আঙ্গিকবৈশিষ্ট্য সবসময় রক্ষিত হয় না। কারণ এখন নাটকের আঙ্গিকে এসেছে বৈচিত্র্য, হচ্ছে নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রতিফলন।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. উচ্চারণ রীতি কী?
২. সংবৃত ও বিবৃত উচ্চারণরীতির পার্থক্য কী?
৩. প্রমিত ভাষা বলতে কী বোঝায়?
৪. তন্ময় ও মন্ময় প্রবন্ধের পার্থক্য কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেণিবিভাগ করুন।
২. বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রবর্তিত প্রমিত বাংলা বানানের দশটি নিয়ম লিখুন।
৩. অর্থগত দিক থেকে বাংলা শব্দ কত প্রকার ও কী কী? ব্যাখ্যাসহ বর্ণনা দিন।
৪. ণত্ব ও ষত্ব বিধানের নিয়মগুলো উদাহরণসহ লিখুন।

ইউনিট ৩ : বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষণে পদ্ধতি, কৌশল ও শিক্ষকযোগ্যতা

শিখন-শেখানোর কাজটি একটি জটিল প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় সর্বোচ্চ ফল লাভের জন্য শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অধিক মাত্রায় সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন। আবার শিক্ষক শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ করার জন্য যুগে যুগে অনেক পদ্ধতি ও কৌশল যেমন উদ্ভাবিত হয়েছে তেমনি প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে এসব পদ্ধতি ও কৌশল বাস্তবায়নের দক্ষতা ও যোগ্যতার। পদ্ধতি ও কৌশলের মধ্যে যেমন কিছু রয়েছে গতানুগতিক বা সনাতন তেমনি কিছু আছে আধুনিক বা অংশগ্রহণমূলক। শিখন-শেখানো কার্যাবলিতে আধুনিক পদ্ধতিগুলোর কার্যকারিতা বেশি হলেও সনাতন পদ্ধতিগুলোকেও একেবারে বাদ দেওয়া যাবে না। পাঠ উপস্থাপন সফল ও সার্থক করার জন্য একজন বিষয় শিক্ষকের এসব পদ্ধতি ও কৌশলের প্রয়োগসহ সমূহ ধারণা থাকতে হবে। বর্তমানে প্রচলিত পদ্ধতি ও কৌশলের সাথে নতুন মাত্রা হিসেবে যুক্ত হয়েছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার। একবিংশ শতাব্দির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় শিক্ষককে তাই তথ্য-প্রযুক্তির ওপরও ভালো দক্ষতা অর্জন করতে হবে; বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পাঠ উপস্থাপনের বহুমুখী যোগ্যতা থাকতে হবে। কারণ সাহিত্যের বিভিন্ন উপাদানের পাঠদানকৌশল বিভিন্ন রকম। গল্প-প্রবন্ধের পাঠ উপস্থাপনের সাথে যেমন কবিতার পাঠ উপস্থাপনে ভিন্নতা রয়েছে তেমনি নাটক উপন্যাসের পাঠের সাথে ব্যাকরণ ও নির্মিতির উপস্থাপনেও রয়েছে পার্থক্য। আমাদের এ অধ্যায়ে পাঠ উপস্থাপনের কিছু সনাতন ও অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির ধারণা, প্রয়োগকৌশল, এসব পদ্ধতি ও কৌশল বাস্তবায়নে সুবিধা ও অসুবিধাসহ কিছু কিছু পদ্ধতির উন্নয়ন কৌশল আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া ব্যাকরণের বিভিন্ন উপাদান ও নির্মিতি অংশের উপাদানগুলো কীভাবে পাঠদান করতে হবে তাও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এ ইউনিটে নিম্নবর্ণিত মোট চৌদ্দটি পাঠের মাধ্যমে বিষয়বস্তুগুলো ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপিত হলো।

৩.১: বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি
৩.২: আলোচনা ও প্রদর্শন পদ্ধতি
৩.৩: আরোহী, অবরোহী ও গাঠনিক পদ্ধতি
৩.৪: ভূমিকাভিনয় ও মাথা খাটানো পদ্ধতি
৩.৫: মনছবি ও সমস্যা সমাধান পদ্ধতি
৩.৬: একক, জোড়ায় ও দলীয় কাজ
৩.৭: পোস্টবক্স, জিগসো ও অন্যান্য পদ্ধতি
৩.৮: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষাদানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার
৩.৯: বাংলা বিষয়ের শিক্ষকের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা
৩.১০: বাংলা গদ্য (প্রবন্ধ ও নিবন্ধ): বৈশিষ্ট্য ও শিখন-শেখানো পদ্ধতি
৩.১১: বাংলা কথাসাহিত্য (গল্প ও উপন্যাস): বৈশিষ্ট্য ও শিখন-শেখানো পদ্ধতি
৩.১২: বাংলা কবিতা: বৈশিষ্ট্য ও শিখন-শেখানো পদ্ধতি
৩.১৩: বাংলা নাটক: বৈশিষ্ট্য ও শিখন-শেখানো পদ্ধতি
৩.১৪: বাংলা ব্যাকরণ: বৈশিষ্ট্য ও শিখন-শেখানো পদ্ধতি

৩.১ : বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি

যে কোনো কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে গেলে কোনো না কোনো পদ্ধতি অনুসরণ করে করতে হয়। অন্যান্য কাজের ন্যায় শিখন-শেখানোর কাজেও প্রাচীন কাল থেকেই নানা রকম পদ্ধতির প্রয়োগ হয়ে আসছে। কখনো জেনে কখনো না জেনে শিক্ষকগণ এসব পদ্ধতি ব্যবহার করে আসছেন। অতএব পদ্ধতি আগেও ছিল, এখনও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। তাহলে পদ্ধতি কী? পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা নেওয়ার আগে আমরা কয়েকজন শিক্ষাবিদ যে সংজ্ঞা প্রদান করেছেন সে সম্পর্কে জানব। প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী মরিস জিনসবার্গ বলেন, 'নিশ্চয়তা সহকারে ফলাফল অর্জনের উদ্দেশ্যে গবেষণা বা শিক্ষণ বিষয়ে সংক্ষিপ্তভাবে বা বিস্তারিতভাবে সম্পন্ন করার জন্য গৃহীত যথাযথ পথ, উপায় বা নিয়মকে পদ্ধতি বলে।' অন্য একজন শিক্ষাবিদ এর মতে, 'Method is the systematic arrangement of ideas and making of plans in order to get something done effective.

হাস্ট ও মেটকাফ বলেন- 'শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য শিক্ষক কর্তৃক অনুসৃত বা গৃহীত কর্মপ্রক্রিয়া বা কর্মবিধিকে পদ্ধতি বলে। আরেকজন শিক্ষাবিদ পদ্ধতি সম্পর্কে বলেন- Method is a way of doing or performing something properly .

শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় পদ্ধতি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শুধু বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান থাকলেই ভালো শিক্ষক হওয়া যায় না। এ জ্ঞানকে সহজ ও সাবলীল ভাবে শিক্ষার্থীদের মাঝে দেওয়ার জন্য শিক্ষককে জানতে হয় কোন পদ্ধতিতে তিনি বিষয়বস্তু শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করলে তা অধিকতর কার্যকর হবে। তাই আমরা বলতে পারি পদ্ধতি হলো কোনো কাজ সম্পাদনের সামগ্রিক প্রক্রিয়ার নাম। অর্থাৎ একটি কাজ যত উপায়ে সম্পাদিত হোক না কেন সকল উপায়ের সামগ্রিক রূপের নাম পদ্ধতি। যেমন 'নৌকা চালানো' একটি কাজ। এখন নৌকা বিভিন্ন ভাবে চালানো যায়। যেমন - লগি দিয়ে, দাঁড় বেয়ে, বৈঠা দিয়ে, গুণ টেনে, পাল উড়িয়ে প্রভৃতি কায়দায়। তাই যতগুলো প্রক্রিয়ায় নৌকা চালানো যায় তার সবকটি এক একটি কৌশল আর কৌশলগুলোর সামগ্রিক রূপ 'নৌকা চালানো' হলো পদ্ধতি। তবে প্রয়োগের ওপর ভিত্তি করে কখনো পদ্ধতি কৌশল এবং কৌশল পদ্ধতি হয়ে যেতে পারে।

শিখন-শেখানো ক্ষেত্রে পদ্ধতি ও কৌশল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও এ সম্পর্কে বিভিন্ন রকম মত প্রচলিত রয়েছে। অনেক শিক্ষাবিদ মনে করেন-

- শিক্ষক সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি।
- শিক্ষক কর্তৃক অনুসৃত পদ্ধতিই সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি।
- শিক্ষকের বিকল্প কোনো পদ্ধতি নেই।
- কোনো বিকল্প পদ্ধতিই শিক্ষকের শূন্যতা পূরণ করতে পারে না।

উপর্যুক্ত বিভিন্ন মতবাদ থাকার পরও শ্রেণিকক্ষে শিক্ষককে এক বা একাধিক পদ্ধতি ও কৌশল অনুসরণ করে পাঠদান কার্যাবলি পরিচালনা করতে হয়। শিখন-শেখানো কার্যক্রমে প্রচলিত পদ্ধতি ও কৌশলকে প্রথমত দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এর একটি হলো সনাতন বা গতানুগতিক পদ্ধতি এবং অপরটি হলো অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ।

সনাতন পদ্ধতি

শিক্ষককে কেন্দ্র করে এ পদ্ধতির সকল কর্মকাণ্ড আবর্তিত হয়। তাই শিক্ষার্থীদের সক্রিয় হবার সুযোগ না দিয়ে শিক্ষক সক্রিয় থেকে পাঠের সকল বিষয়বস্তু পরিচালনা করেন। পূর্বের থেকে চলে আসা নিয়ম-কানুন মেনে গতানুগতিক ধারায় শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের এ পদ্ধতিকে সনাতন পদ্ধতি বলে।

সনাতন পদ্ধতির মধ্যে যে পদ্ধতিগুলো বাংলা ভাষা শিক্ষণ পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে সেগুলো হলো-

ক . বক্তৃতা পদ্ধতি
খ . প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি
গ . আলোচনা পদ্ধতি
ঘ . প্রদর্শন পদ্ধতি
ঙ . গাঠনিক পদ্ধতি
চ . আরোহী ও অবরোহী পদ্ধতি

সনাতন পদ্ধতির কতিপয় বৈশিষ্ট্য

- শিক্ষক বেশি মাত্রায় সক্রিয় থাকেন অর্থাৎ এ পদ্ধতি শিক্ষককেন্দ্রিক ।
- শিক্ষার্থীর মুখস্থ প্রবণতা বাড়ায় এবং সৃজনশীলতা নষ্ট করে।
- নতুনত্ব বা বৈচিত্র্য কম।
- শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের সুযোগ তেমন নেই।
- এ পদ্ধতি প্রচলিত ধারার এবং অনেকটা কৃত্রিম।

দীর্ঘদিন থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসছে বলে সনাতন পদ্ধতি ব্যবহার করতে শিক্ষক শিক্ষার্থী সকলেই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। তবে এ কথাও ঠিক যে সনাতন বা গতানুগতিক বলে এ পদ্ধতি ও কৌশলগুলো বাদ দিয়ে সফলভাবে শ্রেণি পাঠদান আমাদের পক্ষে অসম্ভব।

ক. বক্তৃতা পদ্ধতি

সনাতন পদ্ধতির মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি হলো বক্তৃতা পদ্ধতি। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনও বক্তৃতা পদ্ধতি প্রচলিত। এ পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষক কেবল নিজের আয়ত্ত করা বিষয়গুলো তার মনের মাধুরী মিশিয়ে হৃদয়ের শতদল বিকশিত করে শ্রেণিকক্ষে কথা বা বক্তৃতার মাধ্যমে পরিবেশন করেন। এখানে মূল বক্তা শিক্ষক নিজেই এবং শিক্ষার্থীরা শ্রোতা হিসেবে বক্তৃতা শোনে এবং লিখে নেয়। আমাদের দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত এ পদ্ধতিতে পাঠদান চলছে। এ পদ্ধতিতে নির্ধারিত সময়ে পাঠ শেষ করার তাগিদ বেশি কাজ করে। উচ্চ শ্রেণিতে এ পদ্ধতিটি কার্যকরী হলেও নিম্ন শ্রেণিতে তা কার্যকরী নয়। কারণ শিশুরা এ পদ্ধতিতে বিষয়বস্তু সহজে আয়ত্ত করতে পারে না ।

বক্তৃতা পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

- শিক্ষক নিজের কণ্ঠ বা বাচনভঙ্গির মাধ্যমে এ পদ্ধতির প্রয়োগ করে থাকেন।
- পর্যাপ্ত বিষয়জ্ঞান এবং পূর্ব প্রস্তুতি নিয়ে শিক্ষককে শ্রেণিকক্ষে যেতে হয়।
- এ পদ্ধতির সার্থক প্রয়োগের জন্য শিক্ষকের যোগ্যতা, দক্ষতা ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।
- মূল বিষয়ের সাথে মিল রেখে উপমা, উদাহরণ ও গল্প উপস্থাপন করার সুযোগ থাকে।
- বেশি কথা বলতে হয় বিধায় অহেতুক অপ্রাসঙ্গিক বক্তব্যের অবতারণা হয়।
- শিক্ষকের কণ্ঠস্বর অঙ্গভঙ্গি ও প্রকাশভঙ্গিও আকর্ষণীয় হতে হয়।
- বক্তব্য মূল বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হয়।
- শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ ও মনোযোগ অক্ষুণ্ন রাখার দিকে সতর্ক থাকতে হয়।
- অন্য যে কোনো পদ্ধতি প্রয়োগ করতে কম-বেশি বক্তৃতা পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হয়।

বক্তৃতা পদ্ধতির সুবিধাসমূহ

এ পদ্ধতিতে পাঠ উপস্থাপনের সুবিধাসমূহ নিম্নরূপ:

- এ পদ্ধতির বাস্তবায়নে আর্থিক খরচ নেই বললেই চলে।
- অল্প সময়ে অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীর মাঝে অনেক তথ্য পরিবেশন করা যায়।
- শিক্ষার যে কোনো স্তরে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়।
- নির্ধারিত সময়ে পাঠ সম্পাদন করা যায়।
- শ্রেণিকক্ষের বাইরেও এ পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়।
- বিষয়বস্তু সহজ ও সাবলীলভাবে উপস্থাপন করা যায়।
- অন্যান্য পদ্ধতি প্রয়োগেও বক্তৃতা পদ্ধতির প্রয়োজন।
- শিক্ষা উপকরণের তেমন প্রয়োজন পড়ে না।
- শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞান জেনে নতুন বিষয়ের উপস্থাপন করা যায়।
- বর্ণনামূলক বিষয়ের ক্ষেত্রে বক্তৃতা পদ্ধতি খুবই উপযোগী।

বক্তৃতা পদ্ধতির অসুবিধা

অনেক সুবিধা থাকা সত্ত্বেও বক্তৃতা পদ্ধতির কিছু অসুবিধা রয়েছে। অসুবিধাগুলো নিম্নরূপ-

- শিক্ষক সক্রিয় বা সচল থাকায় শিক্ষার্থীরা বহুলাংশে নীরব শ্রোতা হিসেবে ভূমিকা পালন করে।
- শুধু বক্তৃতার মাধ্যমে শ্রোতার মনোযোগ ধরে রাখা যায় না।
- শিক্ষার্থীরা শিক্ষকনির্ভর হয়ে পড়ে যা তাদের প্রকৃত বিকাশের অন্তরায়।
- এ পদ্ধতিতে হাতে-কলমে কাজ করার সুযোগ কম।
- গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়ের বিষয়বস্তু উপস্থাপনে এ পদ্ধতি উপযোগী নয়।
- শ্রেণিতে শিক্ষাথীদের অর্জন যাচাইয়ের সুযোগ নেই।
- স্বতঃস্ফূর্তভাবে ও মনোযোগ সহকারে শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করতে পারে না।
- শ্রোতার মনোযোগ বেশি সময় ধরে রাখা যায় না এবং একঘেয়েমী চলে আসে।

- বক্তৃতা তথ্যবহুল হলে মনে রাখা কষ্টকর।
- বক্তৃতার ফলাফল ও প্রভাব পরিমাপ করা যায় না।
- বক্তা এবং শ্রোতার মাঝে মতামত বিনিময়ের সুযোগ কম।
- বক্তৃতা পদ্ধতি শিক্ষার্থী নয়, শিক্ষকের জ্ঞান প্রকাশক।
- শিক্ষার্থীর মুক্ত চিন্তার বিকাশ ঘটে না। এটি মনোবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি নয়।

বক্তৃতা পদ্ধতিকে কার্যকরী করার উপায়

- শিক্ষক/প্রশিক্ষককে পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি নিয়ে ক্লাসে আসতে হবে।
- বক্তৃতার ফাঁকে মনোযোগ আর্কষণী প্রশ্ন করতে হবে এবং উত্তরের জন্য পর্যাপ্ত সময় দিতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা নিঃসংকোচে তাদের মনের অস্পষ্ট বিষয় সম্পর্কে জানতে পারে।
- বক্তৃতা হতে হবে সহজবোধ্য, প্রাঞ্জল এবং সাবলীল।
- পাঠসংশ্লিষ্ট আকর্ষণীয় উপকরণ ব্যবহার করতে হবে।
- সর্বোপরি পূর্ব থেকে পরিকল্পনা করে পাঠের বিষয়বস্তু উপস্থাপন করতে হবে।

কিছু দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও এ কথা অনস্বীকার্য যে, শিক্ষাদানের সকল ক্ষেত্রেই এ পদ্ধতি ব্যবহৃত হচ্ছে। সাহিত্য, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ের জন্য এ পদ্ধতি বহুল ব্যবহৃত। তাই এ পদ্ধতিটি ব্যবহার করার সময় এর সমস্যা দূরীকরণ, অসুবিধা কমানো এবং সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ওঠার প্রতি সচেতন থাকতে হবে।

খ. প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি

শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি বহুল ব্যবহৃত একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী পরস্পরের মধ্যে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে কোনো বিষয় সম্পর্কে ধারণা প্রদান, দক্ষতা অর্জন ও আচরণের পরিবর্তন করার প্রক্রিয়াকে প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি বলে। প্রকৃতপক্ষে প্রশ্নের সাহায্য ছাড়া পাঠদানের সফল বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উৎসাহ ও আগ্রহ জাগ্রত হয়, প্রশ্ন চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি করে এবং ভালোভাবে পাঠ বুঝতে সাহায্য করে। এ পদ্ধতিতে প্রশ্ন এবং উত্তরের মাধ্যমে পাঠের আলোচনা চলে। প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়কেই সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হয়। এটি একটি দ্বিমুখী প্রক্রিয়া। এ পদ্ধতি পৃথকভাবে প্রয়োগ করা যায় আবার অন্যান্য পদ্ধতিকে কার্যকরী করার জন্যও প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

- এ পদ্ধতি বাস্তবায়নে দুটি পক্ষের উপস্থিতির প্রয়োজন।
- দুপক্ষের মধ্যে প্রশ্ন এবং উত্তরের মাধ্যমে পাঠের আলোচনা চলে।
- শিক্ষার্থী ও শিক্ষক উভয়ে আলোচ্য বিষয়কে কেন্দ্র করে পরস্পরকে প্রশ্ন করে থাকে এবং যুক্তি প্রদর্শন করে।
- সাহিত্যের বিষয়বস্তু উপস্থাপনে ছোট ছোট প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মাঝে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়।
- প্রশ্নকরণের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞানের মূল্যায়নও করা যায়।
- শিক্ষক-শিক্ষার্থী উভয়কে ভূমিকা পালন করতে হয়।
- পাঠ উপস্থাপনে অন্যান্য পদ্ধতি বাস্তবায়নে সহায়ক পদ্ধতি হিসেবে প্রশ্নোত্তর ব্যবহৃত হয়।
- যথার্থ প্রশ্নকরণের ওপর নির্ভর করে এর সার্থকতা ।
- সকল শিক্ষার্থীকে পাঠে সম্পৃক্ত করা সম্ভব।

প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির সুবিধা

- প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিতে শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থী মিথষ্ক্রিয়ার সুযোগ রয়েছে।
- একে অপরের সাথে মনের ভাব বিনিময়ের সুযোগ থাকে। শিক্ষার্থীরা জটিল বিষয়ে প্রশ্ন করে শিক্ষকের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য ও ব্যাখ্যা জেনে নিতে পারে।
- প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা পাঠে মনোযোগী কি না শিক্ষক তা জানতে পারেন।
- এ পদ্ধতি অন্যান্য পদ্ধতির সাথে ব্যবহার করা যায় বলে পাঠের একঘেয়েমী দূর করে পাঠে বৈচিত্র্য আনে।

- এ পদ্ধতি বিষয়বস্তু পর্যালোচনা, সার-সংক্ষেপ এবং ফিডব্যাক বা ফলাবর্তন সংগ্রহের ক্ষেত্রে যথেষ্ট ফলপ্রসূ।
- শিক্ষার্থীদের সক্রিয় এবং চিন্তাশীল রাখা যায়।
- শ্রেণি নিয়ন্ত্রণ সহজতর হয়।
- পাঠের সার্থকতা ও অগ্রগতি যাচাই করা সহজ হয়।

প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির অসুবিধা

- অপ্রস্তুত শিক্ষার্থীদের ঘন ঘন প্রশ্ন করার ফলে তারা বিরক্ত হতে পারে।
- পাঠসংশ্লিষ্ট নয় এমন প্রশ্ন কিংবা গুরুত্বহীন প্রশ্ন শিক্ষার্থীদের আগ্রহ কমিয়ে দিতে পারে।
- আগ্রহ কমে গেলে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণও কমে যেতে পারে।
- প্রসঙ্গের বাইরে প্রশ্ন করলে শিক্ষার্থীরা আলোচনা হতে দূরে সরে যেতে পারে। আলোচনাও ভিন্ন খাতে চলে যেতে পারে।
- প্রশ্নভীতির কারণে অনেক শিক্ষার্থী এ পদ্ধতিকে অপছন্দ করে।
- বিক্ষিপ্ত প্রশ্নের কারণে বা অবান্তর প্রশ্নের কারণে আলোচনার প্রসঙ্গও ধারাবাহিকতার বাইরে চলে যায় ।
- প্রশ্ন সংগঠন ও উপস্থাপনত্রুটির কারণে এবং প্রশ্ন খুব সহজ হলে শিক্ষার্থীরা পাঠে আনন্দ হারিয়ে ফেলে।

প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির প্রয়োগরীতি

- উদ্দেশ্যভিত্তিক প্রশ্ন করতে হবে।
- সহজ ভাষায় সকলের বোধগম্য প্রশ্ন করতে হবে।
- ডোমেইনভিত্তিক অর্থাৎ শিখনের সকল ক্ষেত্র থেকে প্রশ্ন করতে হবে।
- পাঠের সম্পূর্ণ অংশ থেকে প্রশ্ন করতে হবে।
- সমগ্র শ্রেণিকে উদ্দেশ্য করে প্রশ্ন করতে হবে।
- QPN (Question- Pause- Name) পদ্ধতিতে প্রশ্ন করতে হবে।
- প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে শ্রেণি শিক্ষার্থীদের বয়স, মেধা ও ধারণক্ষমতা অনুসারে প্রশ্ন করতে হবে।
- এমনভাবে প্রশ্ন করতে হবে যাতে প্রশ্নের উত্তরে আলোচনার মূল বিষয়বস্তু উঠে আসে।
- আলোচ্য বিষয়ের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে প্রশ্ন করতে হবে।
- হ্যাঁ বা না বোধক উত্তরের প্রশ্ন পরিহার করতে হবে।

৩.২ : আলোচনা ও প্রদর্শন পদ্ধতি

আলোচনা পদ্ধতি

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পাঠ উপস্থাপনে সনাতন পদ্ধতির মধ্যে আলোচনা একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। কোনো একটি সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে কয়েকজনের মিলিত প্রচেষ্টায় পারস্পরিক মত বা ভাব বিনিময় বা কথোপকথনকেই আলোচনা বলে। আলোচনার মাধ্যমে অনেক সময় কঠিন সমস্যার সহজ সমাধান করা যায়। নির্ধারিত এবং অনির্ধারিত যে কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হতে পারে। তাহলে আমরা বলতে পারি- কোনো সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে শ্রেণিতে বা শ্রেণির বাইরে শিক্ষার্থীরা পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে কখনো কখনো শিক্ষকের সহযোগিতায় যখন সমাধানের চেষ্টায় নিয়োজিত হয় তখন তাকে আলোচনা পদ্ধতি বলে। আলোচনা পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা স্বাধীনভাবে মতামত দেয় এবং আলোচনা করে থাকে। তাই এটি বক্তৃতা পদ্ধতি থেকে স্বতন্ত্র এবং অপেক্ষাকৃত উন্নত। আলোচনার পুরো প্রক্রিয়াটি চলে শিক্ষক অথবা দলনেতার পরিচালনায়। এখানে সম্পূর্ণ নিজেদের চেষ্টায় শিক্ষার্থীরা শিখতে পারে। এ পদ্ধতিটি জোড়া বা দলগতভাবে প্রয়োগ করা যায়। শিক্ষার্থীদের নিজস্ব মতামত দানের সুযোগ ঘটে এবং নিজেদের চেষ্টায় জ্ঞান অর্জন করার ফলে তা স্থায়ী হয়।

আলোচনা পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

- শিক্ষার্থী-শিক্ষক উভয়ে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে।
- শিক্ষক/দলনেতার নেতৃত্ব প্রদানের মাধ্যমে এ পদ্ধতি পরিচালিত হয়।
- আলোচনার বিষয়বস্তু পূর্ব নির্ধারিত বা অনির্ধারিত হতে পারে।
- পদ্ধতি বাস্তবায়নের আগেই বিষয়বস্তু নির্ধারণ, সময় নির্ধারণ, দল গঠন ইত্যাদি কাজ করে নিতে হয় ।
- এটি একটি দলভিত্তিক পদ্ধতি ।
- শিক্ষক আলোচনার বিষয়বস্তু এবং দিকনির্দেশনা দেন।
- এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের ভূমিকাই প্রধান। শিক্ষক কেবল সহযোগীর ভূমিকা পালন করেন।
- অংশগ্রহণকারী সকল শিক্ষার্থীর মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকে।
- প্রশিক্ষিত ও দক্ষ শিক্ষকের অভাব এ পদ্ধতি বাস্তবায়নের অন্তরায়।
- শিক্ষার্থী নিজস্ব চিন্তা চেতনায় বিষয়বস্তুর পক্ষে বিপক্ষে যুক্তি তৈরি করে।
- এ পদ্ধতি প্রয়োগের পূর্বে পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়।

আলোচনা পদ্ধতির সুবিধা

- শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর সক্রিয় হওয়ার সুযোগ থাকে।
- নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা ও মতবিনিময় করে সমস্যা সমাধান করতে পারে বলে মুখস্থ নির্ভরতা কমে যায়।
- শিক্ষার্থীরা চিন্তাশীল ও যুক্তিবাদী হয়।
- সৃজনশীলতা বিকশিত হয়।
- শিক্ষার্থীরা স্ব-শিখনে উদ্বুদ্ধ হয়।
- সকলের যুক্তির ভিত্তিতে সমস্যার সমাধান হয় বলে অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয় এবং শিক্ষার্থীরা সহমর্মী হয়।
- জীবনের অন্যান্য সমস্যা সমাধানের পথ উন্মুক্ত হয় বা সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা অর্জিত হয়।
- নেতৃত্ব প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি হয়।
- অন্তর্মুখী ও লাজুক শিক্ষার্থীদের সংকোচ দূর হয় এবং জড়তাগ্রস্ত শিক্ষার্থীরা জড়তামুক্ত হয়।
- ভুল ও দুর্বলতা সংশোধনের পথ সৃষ্টি হয়।
- শ্রেণিশৃঙ্খলা রক্ষায় শিক্ষার্থীরা নিজেরা দায়িত্বশীল হয় বিধায় শিক্ষকের এ ব্যাপারে ভাবতে হয় না।
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহযোগিতা, সহনশীলতা, সহানুভূতি ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধসহ নানাবিধ মানবিক গুণাবলির বিকাশ ঘটে।

আলোচনা পদ্ধতির অসুবিধা

বাংলা বিষয়ের পাঠ উপস্থাপনে বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি হিসেবে আলোচনা পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। এ পদ্ধতির অনেক সুবিধা থাকলেও কিছু অসুবিধা রয়েছে। নিচে অসুবিধাসমূহ উল্লেখ করা হলো:

- পদ্ধতিটির প্রয়োগ সময় সাপেক্ষ।
- প্রতিটি পিরিয়ডের জন্য বরাদ্দকৃত ৩৫-৪০ মিনিট সময় এ পদ্ধতি বাস্তবায়নের উপযোগী নয়।
- নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে এ পদ্ধতি কার্যকরী নয়।
- উচ্চ মেধার শিক্ষার্থীদের জন্য উপযোগী হলেও মধ্য ও নিম্ন মেধার শিক্ষার্থীদের জন্য উপযোগী নয়।
- যথাযথ তদারকির অভাবে এ পদ্ধতিতে ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা বেশি থাকে।
- অধিক শিক্ষার্থী সংবলিত শ্রেণিকক্ষে এ পদ্ধতি সফলভাবে প্রয়োগ করা যায় না।
- এ পদ্ধতি বাস্তবায়নে অনেক সময় শ্রেণিশৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয়।
- দক্ষ শিক্ষকের অভাব এ পদ্ধতি বাস্তবায়নের অন্তরায়।
- পাঠ্যসূচি ও শিক্ষাক্রম সমাপ্ত করা যায় না।

আলোচনা পদ্ধতির প্রয়োগ কৌশল

উদ্দেশ্যভিত্তিক যথাযথ পরিকল্পনা করে এ পদ্ধতি বাস্তবায়নে অগ্রসর হওয়া বাঞ্ছনীয়। এ ধরনের পরিকল্পনার ৩টি অংশ থাকে। যথা :

১. **প্রস্তুতি :** শিক্ষার্থী-শিক্ষক উভয়ের প্রস্তুতি আবশ্যক হলেও শিক্ষকের প্রস্তুতি বেশি মাত্রায় প্রয়োজন। কারণ তিনি শিক্ষার্থীদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য পরিচালিত করবেন। আনুষঙ্গিক উপকরণাদি ও অন্যান্য উপাদান সংগ্রহ করে বিষয়গুলোকে সুবিন্যস্ত করবেন। শিক্ষার্থীরা যাতে সহজে বিষয়টি অনুধাবন করতে পারে, সে জন্য তা মনোবিজ্ঞান ও যুক্তিসম্মত হতে হবে। বিষয়বস্তুকে সংক্ষিপ্ত আকারে বোর্ডে লিখে দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি থাকবে।

২. **আলোচনা :** এ পর্বে শিক্ষক শ্রেণি নিয়ন্ত্রণে রেখে সকল শিক্ষার্থী যাতে মনোযোগ দিয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করে তা নিশ্চিত করবেন। আলোচনায় প্রত্যেক দলের সদস্যবৃন্দ যাতে দলের অন্য সদস্যদের আলোচনা মনোযোগ দিয়ে শোনে এবং সকলের মতামত নিয়ে আলোচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সেদিকে খেয়াল করবেন।

৩. **মূল্যায়ন :** আলোচনা পদ্ধতির সর্বশেষ উপাদান মূল্যায়ন। এর তিনটি ধারা থাকবে-

- বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীর ধারণা মূল্যায়ন;
- শিক্ষার্থীর মানসিক ধারণার পরিবর্তন;
- আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের জন্য প্রদত্ত নির্দিষ্ট কর্মের মূল্যায়ন।

প্রদর্শন পদ্ধতি

বাংলা শিক্ষাদানের সনাতন পদ্ধতিগুলোর মধ্যে প্রদর্শন পদ্ধতিটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। বক্তৃতা পদ্ধতির পরিপূরক হিসেবে এ পদ্ধতিটি অত্যন্ত ফলপ্রসূ। এ পদ্ধতিতে শিক্ষক তাত্ত্বিক বিষয়গুলোকে শিক্ষার্থীদের সামনে ব্যবহারিকভাবে উপস্থাপন করতে পারেন যাতে শিক্ষার্থীরা বাস্তব শিক্ষা লাভ করতে পারে। এ ধরনের শিক্ষা তাদের স্মৃতিতে দীর্ঘস্থায়ী রূপ লাভ করে। তাই বলা যায়, কোনো বিষয়ের আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা বা শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তু কীভাবে বাস্তবে প্রয়োগ করবে তা ধারাবাহিকভাবে হাতে-কলমে যে পদ্ধতিতে দেখিয়ে দেওয়া হয় তাকে প্রদর্শন পদ্ধতি বলে। অন্যভাবে বলা যায়, শ্রেণিতে পাঠ উপস্থাপনে শিক্ষক যখন উপস্থাপনের ধাপ, বিষয় ও কৌশলসমূহকে উপকরণের সাহায্যে দেখিয়ে ব্যাখ্যা করেন তখন তাকে প্রদর্শন পদ্ধতি বলে।

প্রদর্শন পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

- এ পদ্ধতিটি শিক্ষককেন্দ্রিক।
- এটি বক্তৃতা পদ্ধতির পরিপূরক পদ্ধতি।
- এ পদ্ধতিতে পাঠসংশ্লিষ্ট উপকরণ ব্যবহার করা হয়।
- শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে কাজ করার দক্ষতা সৃষ্টি এ পদ্ধতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।
- এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের বক্তৃতা শোনার সাথে সাথে প্রদর্শিত বিষয়ের দিকেও মনোযোগ দিতে হয়।
- তাত্ত্বিক বিষয়কে ব্যবহারিক পরীক্ষার মাধ্যমে উপস্থাপন করতে হয়।
- এটি বিষয়বস্তু সুপরিকল্পিতভাবে উপস্থাপনের একটি উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি।

প্রদর্শন পদ্ধতির সুবিধা

- হাতে-কলমে বা ব্যবহারিক উপায়ে বা কাজের মাধ্যমে শেখার একটি শক্তিশালী পদ্ধতি।
- এ পদ্ধতিতে পাঠ উপস্থাপন করা হলে শিক্ষার্থীদের স্মৃতিতে স্থায়ী রূপ লাভ করে।
- শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।
- বাস্তব উপকরণের ব্যবহার হয় বলে বিষয়বস্তু বোঝাতে সহজ হয়।
- শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা বৃদ্ধির সুযোগ থাকে ।
- শিক্ষার্থীদের কৌতূহল ও আগ্রহ বৃদ্ধি পায়।
- প্রদর্শন পদ্ধতিতে বিষয়বস্তু সুনির্দিষ্টভাবে উপস্থাপন করা যায়।
- পাঠ উপস্থাপনে সময় কম লাগে।

- এতে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সহযোগিতার মনোভাব বৃদ্ধি পায়।
- শিক্ষার্থীকে অনুসন্ধিৎসু ও সৃজনশীল করে।
- শিক্ষার্থীদের মাঝে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি জন্মে।
- পাঠ্য বিষয়ের ধারণা সুস্পষ্ট হয়।
- শিক্ষার্থীরা পাঠের কোনো কোনো অংশে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করতে পারে।

প্রদর্শন পদ্ধতির অসুবিধা

- বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থী সংবলিত শ্রেণিকক্ষে এ পদ্ধতি উপযোগী নয়।
- এ পদ্ধতি অনেক সময় কষ্টসাধ্য ও ব্যয়সাধ্য ।
- এ পদ্ধতি ব্যবহারের অনুকূল পরিবেশ পাওয়া যায় না।
- শিক্ষক অধিক সক্রিয় থাকেন বিধায় এটি শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতি নয়।
- প্রয়োজনীয় শিক্ষোপকরণ ও যন্ত্রপাতি না হলে পাঠ উপস্থাপন সার্থক হয় না।
- সকল শিক্ষার্থীর দিকে সমান মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হয় না।
- শ্রেণিকক্ষে শুধু মেধাবী শিক্ষার্থীরাই বেশি লাভবান হয়।
- পাঠ্যসূচি সমাপ্ত করতে অনেক সময় লাগে।
- শিক্ষকের প্রস্তুতিতে ব্যাপক সময় ও শ্রমের প্রয়েজন হয়।

৩.৩ : আরোহী, অবরোহী ও গাঠনিক পদ্ধতি

আরোহী পদ্ধতি

সুদীর্ঘকাল ধরে আরোহী পদ্ধতি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ইংল্যান্ডের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ লর্ড বেকন এ পদ্ধতির উদ্ভাবক। এ পদ্ধতির মূল দর্শন হলো উদাহরণ থেকে সূত্রে, জানা থেকে অজানায়, সহজ থেকে কঠিন বিষয়ে, বিশেষ সত্য থেকে সাধারণ সত্যে এবং মূর্ত থেকে বিমূর্ত বিষয়ে গমন। এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের পরিচিত পরিবেশ বা অভিজ্ঞতা থেকে কতকগুলো উদাহরণ পরীক্ষা বা পর্যালোচনা করে সে সকল উদাহরণ থেকে যুক্তির মাধ্যমে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। যেমন– রাতুলের বাবা মারা গিয়েছেন । তার আগে তার দাদাও মারা গিয়েছেন। গত বছর তার চাচা মারা গিয়েছেন। এ সব উদাহরণ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মৃত্যুর হাত থেকে কেউ বাঁচতে পারে না। অতএব আমরা বলতে পারি 'মানুষ মরণশীল'। বাংলা ব্যাকরণ পাঠদানের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি বেশ উপযোগী। এ পদ্ধতিতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের পরিচিত পরিবেশ থেকে উদাহরণগুলো বাছাই করে নিয়ে পাঠে অগ্রসর হতে হয়। ফলে পাঠ উপস্থাপন সফল, আনন্দদায়ক ও কার্যকর হয়।

আরোহী পদ্ধতির সুবিধা

- বিশেষ সত্য থেকে সাধারণ সত্যে উপনীত হওয়া আরোহী পদ্ধতির মূল বৈশিষ্ট্য যা সাধারণ শিক্ষার্থীদের বিষয়বস্তু উপলব্ধিতে সহজ হয়।
- এ পদ্ধতিতে উপস্থাপিত উদাহরণ/ঘটনাগুলো শিক্ষার্থীদের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে এবং বাস্তব ঘটনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
- শিক্ষার্থীদের নিজের অভিজ্ঞতা ও ধারণা ব্যক্ত করার সুযোগ থাকে।
- নিজেদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে সমস্যার সমাধান করতে পারে বলে পাঠে আনন্দ পায়।
- মুখস্থ বিদ্যায় পাশ করার বিড়ম্বনা থেকে শিক্ষার্থীরা মুক্তি পায়।
- শিক্ষার্থীদের চিন্তার দ্বার উন্মোচিত হয় এবং তাদের অনুসন্ধানী হওয়ার সুযোগ তৈরি হয়।

আরোহী পদ্ধতির অসুবিধা

- জীবন চলার পথে অসংখ্য সমস্যার সমাধান এ পদ্ধতি দ্বারা সম্ভব নয়।
- বাংলা বিষয়ের পাঠ উপস্থাপনের বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অবরোহী পদ্ধতির প্রাধান্য দেখা যায়। সীমিত কিছু ক্ষেত্রে আরোহী পদ্ধতি কার্যকর।
- এ পদ্ধতি দীর্ঘ এবং সময়সাপেক্ষ।
- ক্ষীণ মেধার শিক্ষার্থীরা এতে আনন্দ ও আগ্রহ কম পায়।
- বাংলা বিষয়ের শিক্ষকের এ পদ্ধতির শর্তসমূহ জানা না থাকলে এর প্রয়োগ ফলপ্রসূ হয় না।

অবরোহী পদ্ধতি

আরোহী পদ্ধতির সম্পূর্ণ বিপরীত পদ্ধতি হলো অবরোহী পদ্ধতি। এ পদ্ধতির মূল কথা হলো সূত্র থেকে উদাহরণে যাওয়া এবং সাধারণ সত্য থেকে বিশেষ সত্যে উপনীত হওয়া। ব্যাকরণের বিভিন্ন অধ্যায়ের সূত্রগুলো শিক্ষার্থীরা প্রথমে আয়ত্ত করে এবং বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে সূত্রগুলো প্রয়োগ করে শুদ্ধতা যাচাই করে। অবরোহী পদ্ধতিতে আগেই একটি প্রমাণিত সূত্রকে গ্রহণ করা হয়। পরে এই সূত্রকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগের মাধ্যমে এর সত্যতা যাচাই করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীদের সক্রিয় ভূমিকা থাকে না। এ পদ্ধতি তাই মনোবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত হয় না। তবে বৃহত্তর ক্ষেত্রে ব্যাকরণ পঠন-পাঠনে ও পাঠ মূল্যায়ন অংশে অবরোহী পদ্ধতি সহায়ক বলে বিবেচিত।

অবরোহী পদ্ধতির সুবিধা

- এই পদ্ধতি সংক্ষিপ্ত এবং দ্রুত সমস্যা সমাধানের উপযোগী, এ কারণে শিখন-শেখানো কার্যক্রমের সকল স্তরে এ পদ্ধতি ব্যবহার করতে দেখা যায়।
- এ পদ্ধতিতে স্মরণশক্তির ব্যবহার অপরিহার্য। যাদের স্মরণশক্তি কম তাদের সর্বদা সূত্রের তালিকা ব্যবহার করতে হয়। সূত্র ভুল হলে সমস্যার সমাধান পাওয়া যায় না।
- আরোহী পদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত হলে এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীর মননশীলতার বিকাশে সহায়ক হয়।
- ব্যাকরণ পঠন-পাঠনে মূল্যায়ন স্তরে এ পদ্ধতি যথেষ্ট কার্যকর।

অবরোহী পদ্ধতির অসুবিধা

- সূত্রের সকল সাংকেতিক প্রতীক সম্পর্কে অবহিত না হয়ে শুধু সূত্র মুখস্থ করে এ পদ্ধতিতে বিষয়বস্তু আয়ত্ত করা কঠিন।
- সকল শিক্ষার্থীর পক্ষে সূত্র মুখস্থ করা এবং সঠিকভাবে মনে রাখা সম্ভব হয় না- এ জন্য যথেষ্ট অনুশীলনের প্রয়োজন হয়।
- এ পদ্ধতিতে যৌক্তিকতার অনুশীলন হয় না।
- ব্যবহারিক দক্ষতা অর্জনে এ পদ্ধতি সহায়ক এবং কার্যকরী নয়।

আরোহী এবং অবরোহী পদ্ধতি দীর্ঘদিন থেকেই প্রচলিত। বিভিন্ন বিষয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে এ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। শিক্ষকের দক্ষতা, জ্ঞান ও কৌশলের ওপর এ পদ্ধতির সার্থকতা ও ব্যর্থতা নির্ভর করে।

গাঠনিক পদ্ধতি (Structural Method)

ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে গাঠনিক পদ্ধতি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। এ পদ্ধতির মাধ্যমে ভাষার অর্থবহ চর্চা করানো হয়। এটি মূলত শিক্ষককেন্দ্রিক পদ্ধতি। শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন উপাদানের মিথষ্ক্রিয়া ও একটি কাঠামোগত পরিকল্পনার কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর অর্জন যাচাই সম্পর্কিত লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছার জন্য গাঠনিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। সাধারণত বাংলা বিষয়ের ব্যাকরণ অংশের পাঠদানে এ পদ্ধতির প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। তবে শিক্ষক চাইলে বাংলা প্রথম পত্রের সাহিত্য পাঠ উপস্থাপনে কিংবা বাংলা দ্বিতীয় পত্রের নির্মিতি অংশেও এ পদ্ধতির সফল প্রয়োগ করতে পারেন। গাঠনিক পদ্ধতিতে (Structural Method) শিক্ষক ব্যাকরণ বই ছাড়াই শ্রেণিতে বাংলা ব্যাকরণের পাঠ উপস্থাপন করতে পারেন। এ পদ্ধতিতে সাহিত্যের ক্লাসে পঠিত বিষয়ের ওপর আলোচনা এবং সাহিত্যপুস্তক অবলম্বনে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলাপ-

আলোচনার দ্বারা শিক্ষার্থীদের ভাষার শৃঙ্খলা, বিশুদ্ধ প্রয়োগ এবং রূপ-রীতি সম্বন্ধে সম্যক ধারণা দেওয়া যায়। এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা স্বাধীন ও সক্রিয় থাকে বলে ব্যাকরণের মতো বিষয়বস্তু পাঠেও আনন্দ উপভোগ করে। এতে ভাষা ও সাহিত্যের নানা ধরনের বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা চলতে পারে। তবে সব সময় লক্ষ রাখা আবশ্যক আলোচনার প্রসঙ্গটি যেন কাঠামোনিয়ন্ত্রিত এবং সুনির্বাচিত হয়। অর্থাৎ প্রসঙ্গ যেন মূল লক্ষ্যকে ছাড়িয়ে না যায়। গাঠনিক পদ্ধতিতে পাঠের যথোপযুক্ত অবতারণা শিক্ষার্থীদের নিকট ব্যাকরণ পাঠকে সহজ ও আকর্ষণীয় করে তোলে।

গাঠনিক পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

- এটি একটি চলমান ও অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া।
- এটি কার্যক্রম বাস্তবায়নকালে শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি সম্পর্কে ধারণা দেয়।
- শিক্ষাথীদের সমস্যা সমাধানে এটি তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে।
- এ পদ্ধতিকে Situational Approach হিসেবেও অভিহিতি করা হয়ে থাকে।
- এটি শিক্ষার্থীর শিখন উদ্দেশ্য পরিমাপ করতে সক্ষম।
- এ পদ্ধতি আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক দুইভাবেই সম্পন্ন করা যায়।
- এর মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষাদানের পরবর্তী করণীয় ঠিক করে থাকেন।
- এর মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে শিক্ষণ পদ্ধতি, উপকরণের ধরন ও ব্যবহার পরিবর্তন করা হয়।

গাঠনিক পদ্ধতির প্রয়োগ কৌশল

'গঠন' শব্দটি থেকে গাঠনিক পদ্ধতির উৎপত্তি। শিক্ষার্থী শিখনসময়ে যতক্ষণ শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে থাকবে ততক্ষণই এ পদ্ধতির প্রয়োগ করা যায়। শ্রেণিতে পাঠ উপস্থাপনকালে ভাষাভিত্তিক যে কোনো বিষয়বস্তুকে একটি নির্দিষ্ট ছকে ফেলে অধিকতর বোধগম্য করে শিক্ষক উপস্থাপন করলে তা গাঠনিক উপস্থাপন হয়। অর্থাৎ মুখস্থ না করিয়ে এমন একটি সহজ ও সাবলীল কৌশল অনুসরণ করা যাতে শিক্ষার্থীরা খুব সহজেই বিষয়বস্তু আত্মস্থ করতে পারে। তবে খেয়াল রাখতে হবে যাতে বিষয়বস্তুর উপস্থাপন সনাতন অন্য সব পদ্ধতির চেয়ে আনন্দঘন ও কার্যকরী হয় এবং শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞানের সাথে বর্তমান জ্ঞানের একটি সেতুবন্ধন স্থাপিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ আমরা 'সন্ধি' অধ্যায়ের একটি প্রসঙ্গের কথা বলতে পারি। ধরা যাক, একটি গল্প কিংবা প্রবন্ধের পাঠ উপস্থাপনায় শিক্ষার্থীদের কাছে 'শিরশ্ছেদ' শব্দটি তুলনামূলক দুর্বোধ্য মনে হলো। শিক্ষক শব্দটির অর্থ পরিস্ফুটনে একটি কৌশলের আশ্রয় নিলেন। কৌশলটি হলো– শব্দটির অর্থ ব্যাখ্যার সাথে সাথে এর বুৎপত্তি নির্দেশ করা এবং সেইসাথে সন্ধির একটি নিয়মও শেখানো। এই অতিরিক্ত প্রত্যাশা ও কৌশল এবার শিক্ষকের মনোযোগকে ধাবিত করাবে একটি সন্ধিকাঠামোর দিকে। তখন শিক্ষক হয়তোবা 'শিরশ্ছেদ' শব্দটির গঠন কাঠামো কিংবা সন্ধির কোন নিয়মে এ শব্দটি সাধিত হয়েছে তা বোঝাতে গিয়ে বিসর্গ সন্ধির একটি গঠনকাঠামো (structure) চেতনায় রেখে নিম্নরূপে উদাহরণসমূহ বিশ্লেষণ করে পাঠ উপস্থাপনে সচেষ্ট হবেন।

কাঠামো

বিসর্গ(ঃ)+তালব্য ব্যঞ্জন= তালব্য শিশ (শ) ধ্বনি
শিরঃ + ছেদ = শিরশ্ছেদ (ঃ + ছ = শ্ছ)

বিসর্গ(ঃ) + মূর্ধণ্য বঞ্জন = মূর্ধণ্য শিশ ধ্বনি
ধনুঃ + টঙ্কার = ধনুষ্টঙ্কার, (ঃ + ট = ষ্ট)

বিসর্গ (ঃ) + দন্ত ব্যঞ্জন = দন্ত শিশ ধ্বনি
দুঃ + থ = দুস্থ, (ঃ + থ = স্থ)

অর্থাৎ আমরা প্রতিবারই লক্ষ করছি যে, বিসর্গের পর যে বর্গের ব্যঞ্জন থাকছে সন্ধি হবার পর বিসর্গটি সে বর্গের শিশ ধ্বনিতে পরিবর্তিত হচ্ছে। এটিকে একটি কাঠামো (structure) বলতে পারি। এরকম অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে গাঠনিক পদ্ধতির। যেমন 'ধরা' ও 'বলা' ক্রিয়াপদ কি না তার প্রমাণ করতে শিক্ষক নিম্নরূপ কাঠামো ব্যাখ্যা করতে পারেন।

আমি/আমরা করা, তুমি/তোমরা করা, সে/তারা করা (ভাব প্রকাশিত হয় নি)

একইভাবে,

আমি/তোমরা বলা, তুমি/তোমরা বলা, সে/তারা বলা (ভাব প্রকাশিত হয় নি)

অর্থাৎ ক্রিয়াপদ হতে হলে কাল ও পুরুষ দ্বারা সিদ্ধ হয়ে ভাব প্রকাশ করতে হবে। এটি কোন কালে এবং কোন পুরুষ দ্বারা সংঘটিত হচ্ছে তা বোঝাতে হবে। তা না হলে সেটি ক্রিয়াপদ হবে না। সেদিক থেকে 'ধরা' ও 'বলা' পদ দুটি ক্রিয়াপদ নয়। কিন্তু করি, কর, করে, বলি, বল, বলে এগুলো ক্রিয়াপদ। যেমন-

পুরুষ	ক্রিয়াপদ	কাল
আমি/আমরা	করি	বর্তমান
তুমি/তোমরা	কর	বর্তমান
সে/তারা	করে	বর্তমান

এভাবে যে কোনো ধারণাকে প্রসঙ্গক্রমে কোনো কাঠামোতে ফেলে উপস্থাপন করা এবং শিক্ষার্থীদের নিকট ঐ ধারণা বা বিষয়বস্তুকে বাস্তবভিত্তিক, সহজ ও সাবলীল রূপ দেওয়াই হলো গাঠনিক পদ্ধতির মূল্য উদ্দেশ্য। রচনা, ভাবসম্প্রসারণ বা এ জাতীয় পাঠ উপস্থাপন করার ক্ষেত্রেও মাইন্ড ম্যাপিং এর নানা ধরনের গঠন বা কাঠামো (Structure) ব্যবহার করা যায়। যেমন নিম্নের কাঠামোটি শিক্ষার্থীদের দিয়ে 'গ্রীষ্মকাল' শিরোনামে অনুচ্ছেদ লিখতে ব্যবহার করা যেতে পারে। এ ধরনের কাঠামো/কর্মপত্র যে কোনো বিষয়ের যে কোনো পাঠে শিক্ষকের উপস্থাপনে এবং শিক্ষার্থীর কর্মানুশীলনে ব্যবহৃত হতে পারে।

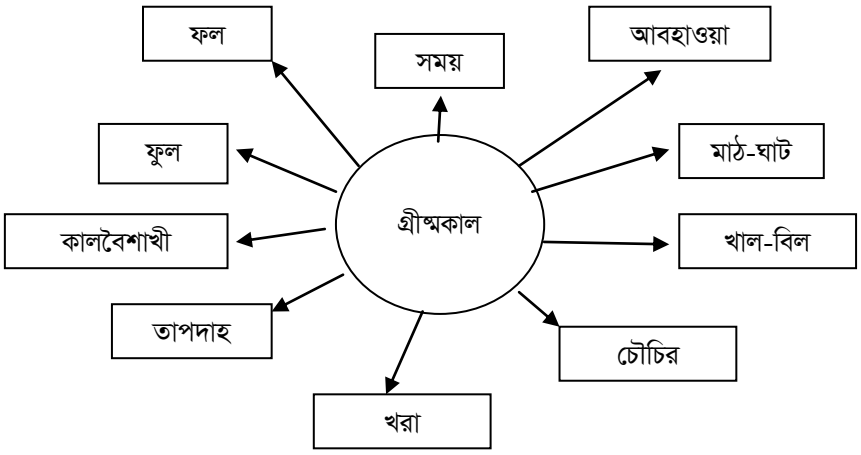

গাঠনিক পদ্ধতির সুবিধা

- শিক্ষার্থীদের নিকট ব্যাকরণ পাঠকে বাস্তবানুগ, সহজ ও আকর্ষণীয় করে তোলা যায়।
- শিক্ষার্থীদেরকে ভাষার বিশুদ্ধ প্রয়োগ এবং বিশ্লেষণ সম্বন্ধে সম্যক ধারণা দেওয়া যায়।
- শিক্ষার্থীরা স্বাধীন ও সক্রিয় থাকে।
- ব্যাকরণ পাঠে আনন্দবোধ করে।
- কেবল ভাষা নয় সাহিত্যের যে কোনো পাঠেও এ পদ্ধতি ব্যবহৃত হতে পারে।
- ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইস্যু নিয়ে আলোচনা হয় বলে শিখন শেখানো কার্যক্রমের সকল স্তরে এ পদ্ধতি ব্যবহার উপযোগী।
- এ পদ্ধতি সংক্ষিপ্ত এবং দ্রুত সমস্যার সমাধান উপযোগী।
- অগ্রগতি বা পারদর্শিতা সম্পর্কে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে গাঠনিক পদ্ধতি সাহায্য করে।
- মিথস্ক্রিয়ার সুযোগ থাকে বলে এ পদ্ধতিতে শিখন-শেখনো কার্যক্রম ফলপ্রসূ হয়।
- এ পদ্ধতিতে সমন্বিতভাবে ভাষা ও সাহিত্য পাঠদান সম্ভব।

গাঠনিক পদ্ধতির অসুবিধা

- শিক্ষার এ প্রক্রিয়া অনেকটা সময় সাপেক্ষ।
- বিষয়বস্তুর নির্বাচন সুনির্দিষ্ট না হলে শিখনফল অর্জন দুরূহ হয়ে পড়ে।
- জটিল বিষয়বস্তু অনেক সময় এ পদ্ধতিতে পাঠদান সম্ভব নয়।
- শিক্ষকের প্রশিক্ষণ না থাকলে এ পদ্ধতির বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।
- পর্যাপ্ত বিষয়জ্ঞান না থাকলে এ পদ্ধতি বাস্তবায়নে উল্টো ফল আসে।

গাঠনিক পদ্ধতি মূলত ভাষাভিত্তিক পদ্ধতি। প্রতিটি ভাষার থাকে নিজস্ব ব্যাকরণ। ব্যাকরণ হচ্ছে ভাষার কতকগুলো নিয়ম ও শৃঙ্খলার সমষ্টি। বাংলা ব্যাকরণের ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব ও বাক্যতত্ত্বে যে সুশৃঙ্খল নিয়ম দ্বারা বাংলা ভাষাকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে সেখানে প্রাধান্য পেয়েছে ভাষার কোনো না কোনো গঠন-কাঠামো (structure)। শ্রেণিতে এই গঠনকাঠামোভিত্তিক কর্মপত্র ও কর্মানুশীলনের মাধ্যমে বাংলা ব্যাকরণ পাঠ দিলে অর্থপূর্ণ শিখন নিশ্চিত হয়; না বুঝে মুখস্থ করার প্রবণতা কমে। তাই গাঠনিক পদ্ধতি ভাষাশিক্ষণের একটি আদর্শ পদ্ধতি।

৩.৪ : ভূমিকাভিনয় ও মাথা খাটানো পদ্ধতি

আধুনিক অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির মধ্যে ভূমিকাভিনয় ও মাথা খাটানো পদ্ধতি দুটি শিখনবান্ধব এবং জনপ্রিয় পদ্ধতি। শ্রেণিকক্ষে পাঠ্য বিষয়বস্তু আকর্ষণীয় করার জন্য অভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলে তাকে ভূমিকাভিনয় বলা হয়। বাংলা সাহিত্যের অনেক বিষয়বস্তু উপস্থাপনে বিশেষ করে নাটকের পাঠ উপস্থাপনে ভূমিকাভিনয় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে সার্থকভাবে সাহিত্যের পাঠ উপস্থাপন করা যায়। ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে বিষয়বস্তু উপস্থাপিত হলে শিক্ষার্থীরা আনন্দের সাথে তা উপভোগ করে এবং শিক্ষা গ্রহণে আন্তরিক হয়।

ভূমিকাভিনয়ের বৈশিষ্ট্য

- পাঠের গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হলো অভিনয়। এ পদ্ধতিতে বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতা বজায় রেখে অভিনয়ের মাধ্যমে তা শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করা হয়।
- শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীর সামনে জীবন্ত হয়ে ওঠে।
- বাংলা সাহিত্যের পাশাপাশি বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ের জন্য ভূমিকাভিনয় বেশ গুরুত্বপূর্ণ।
- প্রয়োজনীয় বিষয়ের রূপরেখা প্রণয়ন, অনুশীলন, অবস্থা ও পরিবেশ সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হয়।
- ব্যক্তি যে বিষয়ে অভিনয় করবেন সে বিষয়, চরিত্র ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা থাকা জরুরি।
- ভূমিকাভিনয়ে পাঠ সংশ্লিষ্ট সকল উপাদানের সমন্বয় সাধন করতে হয়।
- আচরণ সম্পর্কে সচেতন থাকতে হয়।
- সময়সূচি পূর্বেই ঠিক করে নিতে হয়।
- দর্শকদের মতামত ও ফলাবর্তন নিতে হয়।
- ভূমিকাভিনয়কে কার্যকর করতে অভিনীত অংশ ভিডিও ক্যামেরায় ধারণ করে দলীয় এবং একক ফলাবর্তন নেওয়া যেতে পারে।
- মূর্ত এবং বিমূর্ত বিষয়কে মাঝে মাঝে জীবন্ত এবং দুর্বোধ্য বিষয়কে সহজবোধ্য করার ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।
- এতে সৃজনশীলতা ও শিল্পনৈপুণ্য আবশ্যক।

ভূমিকাভিনয় পদ্ধতির সুবিধা

- ঘটনা/বিষয়বস্তু জীবন্ত করে শিক্ষার্থীদের অবগত করানো হয় বলে শিখন দ্রুত হয়।
- খুব বেশি উপকরণ প্রয়োজন হয় না বিধায় এ পদ্ধতি সাশ্রয়ী।
- সহজবোধ্য করে পাঠ উপস্থাপিত হওয়ার কারণে অনেক দিন পর্যন্ত মনে থাকে।
- শিক্ষার্থীদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটে।

- এ পদ্ধতির বাস্তবধর্মিতা শিক্ষার্থীদের প্রচুর আনন্দ দেয় এবং কর্মানুরাগী করে তোলে।
- এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা সক্রিয় ও জড়তামুক্ত হয়।
- শিক্ষার্থীরা ভাষা দক্ষতা (শোনা ও বলা দক্ষতা) আয়ত্ত করতে পারে।
- দলগতভাবে অভিনয় করতে গিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামাজিকতা এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব বৃদ্ধি পায়।

ভূমিকাভিনয় পদ্ধতির অসুবিধা

- দক্ষ ও অভিজ্ঞ না হলে এ পদ্ধতির পরিকল্পনা করা সম্ভব নয়।
- এ পদ্ধতির প্রয়োগে যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন যা সীমিত সময়ের পিরিয়ডে পর্যাপ্ত নয়।
- অভিনয় যথার্থ না হলে পদ্ধতি প্রয়োগের উদ্দেশ্য বিফল হয়।
- অভিনয় পাঠসংশ্লিষ্ট না হলে পুরো সময়টাই বৃথা নষ্ট হয়।
- শিক্ষণীয় বিষয়ের পরিবর্তে পাঠ অনেক সময় নিছক বিনোদনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।
- অভিনয় অনেক সময় অতিরঞ্জনের পর্যায়ে চলে গেলে উদ্দেশ্য অর্জন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।
- সব বিষয়ের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি সমানভাবে কার্যকর নয়।

শিখন শিখানো কার্যক্রমে অনেক পুরনো পদ্ধতি হলেও বাস্তবে এর ব্যবহার অত্যন্ত সীমিত। সাহিত্য, ইতিহাস, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়-এর মতো কিছু বিষয়ের ক্ষেত্রে কেবল এ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। প্রশিক্ষিত ও দক্ষ শিক্ষক দ্বারা এ পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারলে অনেক সুফল পাওয়া যায়।

মাথা খাটানো (Brain Storming)

শিক্ষার্থীদের মুক্ত চিন্তার সুযোগ দিয়ে সমস্যা সমাধানে উদ্বুদ্ধ করার প্রক্রিয়া মাথা খাটানো পদ্ধতি। সমস্যাবহুল মানব জীবনে প্রতি মুহূর্তে সমস্যা মোকাবেলা করতে হয়। শিক্ষার্থীরা শিখন-শিখানো কার্যক্রমের উচ্চচিন্তনমূলক সমস্যাগুলো মাথা খাটিয়ে নিজে এককভাবে বা সতীর্থদের সাথে আলাপ আলোচনা করে সমাধানের এক বা একাধিক উপায় খুঁজে বের করতে পারে। মাথা খাটানো পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের মাথায় একরকম চিন্তার ঝড় বইয়ে দেওয়া হয়। সে অর্থে বলা যায়, যে পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের সামনে কোনো সুনির্দিষ্ট সমস্যা উপস্থাপন করে তাদের তাৎক্ষণিক চিন্তা করার সুযোগ দেওয়া হয় এবং তাদের চিন্তা ভাবনাকে এককভাবে, জোড়ায় বা দলগতভাবে উপস্থাপনের মাধ্যমে সমস্যাসমাধানে সচেষ্ট করা হয় তাকে ব্রেইন স্টর্মিং বা মাথা খাটানো পদ্ধতি বলে। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের সফলভাবে কর্মতৎপর রাখার জন্য চিন্তামূলক এ পদ্ধতি খুবই কার্যকর। এ পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে শিক্ষার্থীরা নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের জন্য বিভিন্নমুখী চিন্তাভাবনা করার সুযোগ পায়। ফলে তাদের চিন্তাশক্তি ও কল্পনাশক্তি বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি হয়। আর শিক্ষার্থীরাও পাঠে কার্যকরভাবে সক্রিয় থাকে।

প্রয়োগ কৌশল

- একক, জোড়ায়, দলগতভাবে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়।
- দলগতভাবে প্রয়োগ করতে হলে বিশেষ নিয়ম অনুসরণ করে দল গঠন করতে হবে।
- সুবিধা অনুযায়ী বিষয়বস্তুকে কয়েকটি অংশে ভাগ করে প্রত্যক দলের মাঝে বিভাজন করে দিতে হবে।
- প্রত্যেক দলের জন্য আলাদা আলাদা সমস্যা হলে ভালো হয়।
- দলগত কাজের উপস্থাপনা থাকবে। উপস্থাপনে পোস্টার পেপার বা প্রজেক্টরের মাধ্যমে ডিজিটাল স্লাইড ব্যবহার করা যেতে পারে।
- এক দলের পোস্টার অন্য দলের সাথে বিনিময় করে মতামত নেওয়া যেতে পারে।
- প্রত্যেক দলের লিখিত মতামতের সাথে অন্যান্য দলের মতামত বা Feed back নিয়ে সংযোজন বা বিয়োজন করা যেতে পারে।

মাথা খাটানো পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

- বিষয়বস্তু সম্পর্কিত বিভিন্ন জটিল সমস্যা সমাধানে গভীরভাবে চিন্তা করার সুযোগ পায়।
- বিভিন্ন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ সম্ভব হয়।
- শিক্ষার্থীদের চিন্তা ও কল্পনাশক্তি বৃদ্ধিতে সহায়ক।
- সমগ্র শ্রেণিতে একই সময়ে প্রয়োগযোগ্য।
- পদ্ধতিটি শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক হলেও শিক্ষককে আগে থেকেই ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয়।
- আগে থেকেই সময় বরাদ্দকরণের পাশাপাশি রূপরেখা প্রণয়ন করতে হয়।
- শিক্ষক দল এবং কাজ ঠিক করে দেন এবং ঘুরে ঘুরে তা পর্যবেক্ষণ করেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেন।
- একক, জোড়া এবং দলগতভাবে কাজে অংশ নিতে পারে।
- বরাদ্দকৃত সময়ের পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার নিশ্চিত হয়।
- উপস্থাপন অংশে প্রতিটি দলের পক্ষে তাদের প্রতিনিধি দলীয় মতামত উপস্থাপন করে।

মাথা খাটানো পদ্ধতির সুবিধা

- শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতি বলে শিক্ষার্থীরা পাঠে সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ পায়।
- শিক্ষার্থীরা স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের সুযোগ পায়।
- এ পদ্ধতি সৃজনশীলতাকে উদ্বুদ্ধ করে।
- জটিল সমস্যাগুলোর সহজ সমাধান সম্ভব।
- শিক্ষার্থীদের চিন্তা ও কল্পনাশক্তির উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পায়।
- একে অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের অভ্যাস গড়ে ওঠে।
- শিক্ষার্থীদের বিশ্লেষণী ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।
- দলে কাজ করে আত্মতৃপ্তি উপভোগ করে।
- বাংলা শিখন-শেখানোয় পদ্ধতিটি বেশ কার্যকরী।

মাথা খাটানো পদ্ধতির অসুবিধা

অনেক সুবিধা থাকা সত্ত্বেও মাথা খাটানো পদ্ধতির কিছু অসুবিধা বা সীমাবদ্ধতা রয়েছে। নিচে এ অসুবিধাগুলো তুলে ধরা হলো–

- শ্রেণিতে শিক্ষার্থী সংখ্যা বেশি হলে সকল শিক্ষার্থীর সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায় না।
- মেধাবী শিক্ষার্থীরা এতে বিশেষ সুবিধা পেলেও সাধারণ শিক্ষার্থীরা সুযোগবঞ্চিত হয়।
- যথাযথ তদারকির অভাবে শিক্ষার্থীদের ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা লক্ষ করা যায়।
- চূড়ান্তভাবে সমস্যা সমাধানের পদ্ধতি এটি নয়, কারণ উপস্থাপন ও ফলাবর্তন পর্বেও পরিবর্তন বা পরিমার্জনের সুপারিশ আসতে পারে।
- এ পদ্ধতি ব্যবহারের সময় শ্রেণি নিয়ন্ত্রণে না থাকলে কোলাহল ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে।
- শিক্ষকের প্রস্তুতি ও দক্ষতার অভাবে এ পদ্ধতি ব্যর্থ হতে পারে।
- বিষয় বা সমস্যা নির্বাচন যথার্থ না হলে সময় ও পরিশ্রম বিফলে যেতে পারে। বিভিন্ন দলের মতামত সার-সংক্ষেপ করার সময় মতভেদ বা বিরোধ সৃষ্টি হতে পারে।
- অনেক সময় আলোচনা দীর্ঘায়িত হয়। ফলে সময় বেশি লাগে।
- শ্রেণিকক্ষের আয়তন ছোট হলে অনেক সময় দল গঠনে সমস্যা হয়।
- বিষয়বস্তুর ওপর প্রাথমিক ধারণা না থাকলে অনেক শিক্ষার্থী মতামত প্রদান থেকে বিরত থাকে।

মাথা খাটানো পদ্ধতি কার্যকর করার উপায়

- সকল শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চত করতে হবে।
- দলের সকল সদস্যের কাছ থেকে মতামত নিতে হবে।
- কাজ সমাপ্ত করার জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দিতে হবে এবং ফাঁকে ফাঁকে সচেতন বার্তা দিতে হবে।

- প্রাথমিকভাবে সকলের মতামত গ্রহণ করতে হবে।
- ভুল বক্তব্য বা মতামতের জন্য কাউকে তিরস্কার বা উপহাস করা যাবে না।

এ পদ্ধতিটি শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় এ পদ্ধতিটির সর্বাধিক ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। শিক্ষার্থীদের পাঠের সাথে সম্পৃক্ত করতে, তাদের চিন্তাশক্তির উৎকর্ষ সাধন করতে, সৃজনশীল কাজে উদ্বুদ্ধ করতে এ পদ্ধতি বেশ ফলপ্রসূ। এ পদ্ধতিটি প্রয়োগে শিখন উদ্দেশ্য অর্জিত হয় বেশি। তাই এটি প্রয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষকের জ্ঞান, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও কৌশল সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে।

৩.৫ : মনছবি ও সমস্যা সমাধান পদ্ধতি

মনছবি (Mind Mapping)

আমাদের চিন্তন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন তথ্যকে আন্তঃসম্পর্কের বিবেচনায় বিশেষ কৌশলে কোনো কাঠামোগত বিন্যাসের মাধ্যমে একীভূত করে পোস্টার পেপার, বোর্ড বা প্রজেক্টরে প্রদর্শন করাই হচ্ছে মনছবি বা Mind Mapping পদ্ধতি। মনছবি পদ্ধতিটি একটি অংশগ্রহণমূলক শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতি। এটি সমস্যা সমাধান পদ্ধতির একটি উপ-পদ্ধতিও বটে। বাংলা শিখন-শেখানো কার্যক্রমে এ পদ্ধতিটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য এ পদ্ধতিটি উপযোগী। এ পদ্ধতিতে শিক্ষক কাজের পরিকল্পনা করেন এবং দিকনির্দেশনা দেন আর শিক্ষার্থীরা সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে থাকে।

আমাদের চিন্তার সংরক্ষণ ও পরবর্তীতে তার দর্শনযোগ্য প্রতিফলনই হলো মনছবি (Mind Map)। এ পদ্ধতিতে পাঠের বিষয়বস্তুর ওপর শিক্ষক/শিক্ষার্থী তাদের চিন্তন প্রক্রিয়াকে কাজে লাগিয়ে বিষয়বস্তুর কিছু তাৎপর্যমণ্ডিত শব্দ বা তথ্য নির্বাচন করে বোর্ডে বা খাতায় বা পোস্টার পেপারে লিখে নিজস্ব চেতনায় তথ্যছক বা মানসিক দৃশ্য নির্মাণ করেন। এই ছবি বা মানসিক দৃশ্যের আলোকে বিষয়বস্তুর একটি ধারণা-কাঠামো নির্মাণ করা হয়। তাই কোনো কোনো ক্ষেত্রে একে Concept Mapping বা ধারণা মানচিত্রও বলা হয়ে থাকে । শিখন-শেখানো কার্যক্রমে বিভিন্ন ধরনের মনছবি বা Mind Map ব্যবহার করা হয়।

১. **মাকড় বা মাকড়সা মানচিত্র:**আন্তঃসম্পর্ক রক্ষা করে তথ্যকে যখন কেন্দ্র থেকে মাকড়সার জালের ন্যায় চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিন্যস্ত করা হয় তখন তাকে মাকড় বা মাকড়সা মানচিত্র বলে। কবি বা লেখক পরিচিতি উপস্থাপনে এটি একটি জনপ্রিয় পদ্ধতি।

চিত্র: মাকড় মানচিত্র (ধারণা মানচিত্র)

২. শিকল মানচিত্র:

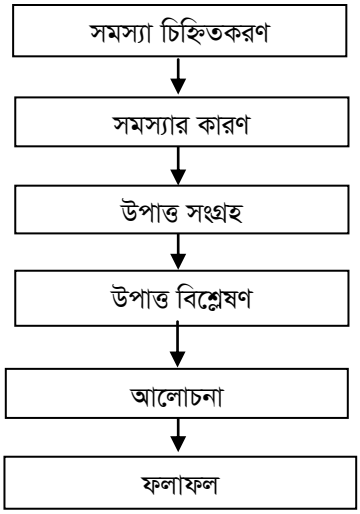

এটি মই বা শিকলের ন্যায় ক্রমাগত নিচের দিকে কোনো প্রক্রিয়ার ধাপ/তথ্য নির্দেশ করে।

এছাড়াও শিক্ষক গাছ, বল, বিভিন্ন আল্পনা প্রভৃতির কাঠামো এঁকে মনছবি পদ্ধতির ব্যবহার করতে পারেন।

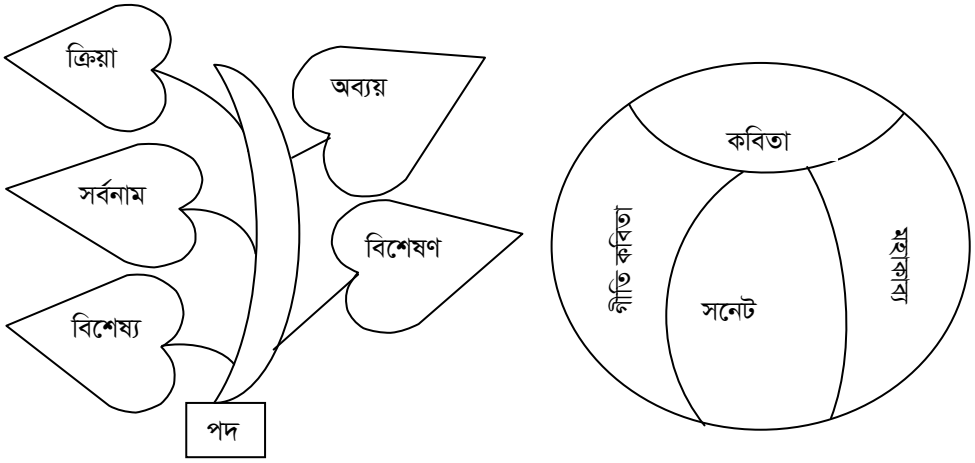

মনছবি পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

- সমস্যা চিহ্নিত করে এর আলোচনা ও সমাধানের জন্য মনছবি অংকন এ পদ্ধতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।
- ধারণা কাঠামো তৈরির মাধ্যমে সমাধানের দিকে এগিয়ে যাওয়া হয়।
- প্রয়োজনীয় দল, জোড়া বা এককভাবে তা প্রয়োগ করা যায়।
- কাজ চলাকালীন শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা প্রদান করা হয়।
- কাজ শেষে সকল দলের কাঠামোবদ্ধ চিত্র শ্রেণিতে উপস্থাপন করা হয়।
- এটি সমস্যা সমাধান পদ্ধতির উপপদ্ধতি।
- এটি একটি আধুনিক অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি।

মনছবি পদ্ধতির সুবিধা

- পারস্পরিক মতামতের ভিত্তিতে সমস্যার সমাধান করা হয় বলে শিক্ষার্থীরা একে অপরকে সহযোগিতা করতে পারে।
- মনছবি পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের উচ্চচিন্তন ও কল্পনাশক্তি বৃদ্ধি পায়।
- শিক্ষার্থীরা সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ পায়।
- বিভিন্ন ইন্দ্রিয়কে কাজে লাগানোর সুযোগ থাকে।
- শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ ঘটে।
- এ পদ্ধতির মাধ্যমে অধিকতর ফলপ্রসূ সমাধানে পৌঁছানো সম্ভব।
- অন্যান্য সমস্যা সমাধানে এ পদ্ধতি ব্যবহারের আগ্রহ সৃষ্টি হয়।
- পরিকল্পিতভাবে কর্মসম্পাদন করা যায়।
- এ প্রক্রিয়ায় শিখন দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং পাঠে বৈচিত্র্য আসে।
- এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ, অন্তর্দৃষ্টির সম্প্রসারণ ঘটে এবং সামগ্রিক শিখন হয়।

মনছবি পদ্ধতির অসুবিধা

অনেক সুবিধা থাকা সত্ত্বেও এ পদ্ধতি ব্যবহারে নিম্নবর্ণিত অসুবিধা বিদ্যমান-

- শ্রেণিতে শিক্ষার্থী সংখ্যা বেশি হলে এ পদ্ধতি সফলভাবে প্রয়োগ করা যায় না।
- কখনো কখনো এ পদ্ধতি বাস্তবায়নে অনেক ব্যয় হয়।
- শিক্ষার্থীদের ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা দেখা দিতে পারে।
- গ্রুপের সদস্যদের মধ্যে নেতৃত্বের কোন্দল বা মতবিরোধ দেখা দিতে পারে।
- নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা কষ্টসাধ্য ।
- সঠিক দিক নির্দেশনা দিতে না পারলে যথার্থ কার্যকারিতা আসে না।
- ধৈর্য ও পেশাগত নৈপূণ্য প্রয়োজন।

মনছবি মিথষ্ক্রিয়ামূলক একটি শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতি। এই পদ্ধতি যথাযথভাবে ব্যবহার করতে পারলে শিখন দ্রুত হয়, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর কর্মতৃপ্তি আসে এবং ফলপ্রসূ সমাধানে উপনীত হওয়া যায়। এ পদ্ধতির সার্থকতাও শিক্ষকের জ্ঞান, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, কৌশল ও পরিচালনার উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল।

সমস্যা সমাধান পদ্ধতি

সমস্যাসংকুল এ পৃথিবীতে নানাবিধ সমস্যার পাশাপাশি শিক্ষাক্ষেত্রেও আমরা বিভিন্ন সমস্যা দেখতে পাই। শেখার মূল অনুষঙ্গই হলো সমস্যা। মানুষ যখনই ঠেকে তখনই শেখে। বাংলা পাঠ উপস্থাপনের ক্ষেত্রে সমস্যা সমাধান একটি পুরাতন ও অন্যতম পদ্ধতি। শিক্ষাক্ষেত্রে এর যথেষ্ট উপযোগিতা রয়েছে। এ পদ্ধতিকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিও বলা হয়। কোনো সমস্যাকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সমাধান করাই এ পদ্ধতির মূল কথা। এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান ও ধারনার ভিত্তিতে কোনো সমস্যা নির্বাচন করা হয়। পাঠ উপস্থাপনকালে শিক্ষক তাঁর বক্তৃতা ও আলাপ আলোচনার ফাঁকে শিক্ষার্থীদের সামনে অলক্ষ্যে সমস্যাটির অবতারণা করেন। এর সমাধান শিক্ষার্থীদের আগে থেকে জানা থাকে না। প্রত্যেক শিক্ষার্থী তার ব্যক্তিগত সামর্থ্য অনুযায়ী বিভিন্ন উপায়ে সমাধানের চেষ্টা করে। সমস্যাটিকে সমাধানের একটি অনুকূল পরিবেশও শিক্ষক তৈরি করেন যাতে শিক্ষার্থীরা নিজেদের চেষ্টায় সমাধান করতে উদ্বুদ্ধ হয়। এ ক্ষেত্রে অবশ্য শিক্ষকের বুদ্ধি, যুক্তি, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা এবং পরিচালনা ক্ষমতার ওপর পদ্ধতির সাফল্য নির্ভর করে। শিক্ষক সুস্পষ্ট ভাষায় এবং শৃঙ্খলার সাথে সমস্যাটি শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করতে পারলেই এ পদ্ধতির দ্বারা পাঠ উপস্থাপন সত্যিকার অর্থে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

সমস্যা সমাধান পদ্ধতিতে শিক্ষকের করণীয়

প্রধানত তিনটি করণীয়কে কেন্দ্র করে এ পদ্ধতি আবর্তিত। যথা:

১. সমস্যাটি শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করা।
২. নিজের জানা বিষয় শিক্ষার্থীদের জানানোর জন্য সার্বক্ষণিক প্রস্তুত থাকা।
৩. গৃহীত সমাধান মূল্যায়নে শিক্ষার্থীদের প্রেরণা যোগানো।

সমস্যা সমাধান পদ্ধতির স্তর বা ধাপ

সমস্যা সমাধান পদ্ধতিতে নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করা হয়-

১. সমস্যা শনাক্তকরণ
২. সমস্যা বিশ্লেষণ
৩. তথ্য সংগ্রহ
৪. তথ্য গ্রহণ, বর্জন ও বিশ্লেষণ
৫. সমস্যা সমাধানের বিকল্প পন্থা উপস্থাপন
৬. প্রকল্প তৈরি (Hypothesis)/অনুমিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ
৭. প্রকল্প যাচাই
৪. সমস্যা সমাধানের পন্থা নির্বাচন
৯. সিদ্ধান্ত গ্রহণ
১০. ফলাফল মূল্যায়ন
১১. ফলাফল গ্রহণ ও চূড়ান্তকরণ

সমস্যা সমাধান পদ্ধতির সুবিধা

অন্যান্য পদ্ধতির চেয়ে সমস্যা সমাধান পদ্ধতিতে সুবিধার দিকই বেশি। নিচে এ পদ্ধতির সুবিধাসমূহ উল্লেখ করা হলো-

- মনোবিজ্ঞানসম্মত এ পদ্ধতিটি শিক্ষার্থীদের চিন্তাশীল ও সৃজনধর্মী করে তোলে।
- শিক্ষার্থীরা বাস্তব পরিস্থিতির আলোকে সমস্যার সমাধান করে বলে শিখন দীর্ঘস্থায়ী হয়।
- বয়ঃসন্ধিকালের নানা জটিল সমস্যাসহ ব্যক্তিগত অন্যান্য সমস্যা সমাধানে এ পদ্ধতি কাজে লাগাতে পারে।
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে।
- সমস্যা সমাধানের পাশাপাশি রিপোর্ট তৈরিতে শিক্ষার্থীরা দক্ষ হয়ে ওঠে।
- সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বাধীনতা ভোগ করে।
- এ পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ, পরিমাপন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।
- এ পদ্ধতিতে হাতে-কলমে শেখার সুযোগ রয়েছে। তাই পাঠ অনুশীলনে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়।
- ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক মধুর হয়।
- শিক্ষার্থীর স্মৃতি প্রখরতা এবং নেতৃত্ব দানের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।
- সমাজ জীবনে নানাবিধ সমস্যার মোকাবিলা করতে এ পদ্ধতির অভিজ্ঞতা কাজে লাগে।
- তথ্য সংগ্রহ করতে হয় বলে শিক্ষার্থীর তথ্যভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়।
- বিষয়ের প্রতি শিক্ষার্থীর অনুরাগ বৃদ্ধি পায়।
- বিজ্ঞানের নীতি, তত্ত্ব ও সূত্রপ্রয়োগ অনুধাবন করতে পারে এবং বিশ্লেষণধর্মী ক্ষমতার বিকাশ ঘটে।

সমস্যা সমাধান পদ্ধতির অসুবিধা/সীমাবদ্ধতা

- এ পদ্ধতিতে পাঠ উপস্থাপনে সময় বেশি লাগে, ফলে পাঠ্যসূচি শেষ করা যায় না।
- উপকরণের অপ্রতুলতায় পাঠ্যবিষয়ের কমসংখ্যক বিষয়বস্তু এ পদ্ধতিতে উপস্থাপন করা যায়।
- অনেক সময় বিষয়ের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সম্ভব হয় না।
- এ পদ্ধতিতে অনেক সময় একঘেয়েমীর সৃষ্টি হয়।
- পূর্ব-পরিকল্পনা না থাকলে ব্যর্থতা অনিবার্য; ফলে উদ্দেশ্য অর্জন অসম্ভব হয়ে পড়ে।
- অন্যান্য পদ্ধতির ন্যায় অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী সংবলিত শ্রেণিকক্ষে এর প্রয়োগ অসম্ভব।
- মেধাবী শিক্ষার্থীর সমন্বয় না থাকলে এটির প্রয়োগ ফলপ্রসূ হয় না।

কিছু অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও সমস্যা সমাধান পদ্ধতি একটি বাস্তবমুখী শিক্ষা পদ্ধতি হিসেবে বাংলা বিষয়ের পাঠ উপস্থাপনে যথেষ্ট কার্যকর।

৩.৬ : একক, জোড়ায় ও দলীয় কাজ

শিখন হচ্ছে আচরণের ইতিবাচক পরিবর্তন। শুধু জ্ঞানার্জন শিখন নয়। শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য অর্জনে বা শিক্ষার্থীকে শিখনফল উপযোগী আচরণে নিয়ে যাওয়ার জন্য বা শিক্ষার্থীর নিকট থেকে শিখনফলভিত্তিক আচরণ প্রাপ্তির জন্য কেবল বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানার্জনই যথেষ্ট নয়। বরং দক্ষতা এবং মানসিকতার উন্নয়নের বিষয়টি অনুধাবনে এনে কর্মানুশীলন করা প্রয়োজন। বিষয় এবং শিক্ষার্থী উপযোগী শিক্ষণ পদ্ধতিই এটি নিশ্চিত করতে পারে।

যে পন্থা বা উপায় অবলম্বন করে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় তাই শিক্ষণ পদ্ধতি/কৌশল। পদ্ধতি/কৌশল দু'ধরনের- একটি শিক্ষককেন্দ্রিক অন্যটি শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক। শিক্ষাক্রম-২০১২ এ শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিখন শেখানো পদ্ধতির সুপারিশ করা হয়েছে। কারণ শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিক্ষণে শিক্ষার্থীরা আনন্দের সাথে শিক্ষা গ্রহণ করে। আর শিখন প্রক্রিয়া যখন আনন্দময় অভিজ্ঞতায় পূর্ণ হয় তখন শিখন স্থায়ী ও ফলপ্রসূ হয়। তাই শিক্ষাদানে শুধু বক্তৃতানির্ভর পদ্ধতির পরিবর্তে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির প্রয়োগ থাকা দরকার। অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিগুলোর মধ্যে একক, জোড়ায় ও দলীয় কাজের প্রয়োগ মোটামুটি প্রায় সকল ধরনের শিক্ষণ পরিবেশেই সম্ভব। এ পাঠে একক, জোড়ায় ও দলীয় কাজের স্বরূপ, পরিবেশ, প্রয়োগযোগ্যতা এবং সুবিধা-অসুবিধা আলোচনা করা হয়েছে।

একক কাজ

শিক্ষক কর্তৃক শিক্ষার্থীদের স্বতন্ত্রভাবে কোনো কাজ করতে দেয়াকে একক কাজ বলে। অপেক্ষাকৃত সহজ এবং ছোট কাজ যা করতে অপেক্ষাকৃত কম সময়ের প্রয়োজন হয় এমন কাজকেই একক কাজের জন্য নির্বাচন করতে হবে। (যেমন– ধ্বনি ও বর্ণের মধ্যে পার্থক্য কী?) একক কাজে কোনো বিষয়ে শিক্ষার্থীদের স্বতন্ত্রভাবে চিন্তা করে সমাধান বের করতে বলা হয়। নির্ধারিত সময় শেষে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে প্রাপ্ত একই বিষয়ের বিকল্প উত্তরগুলো থেকে অপেক্ষাকৃত সঠিক উত্তরটি বাছাই করে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়।

একক কাজের সুবিধা

- শিখন প্রক্রিয়ায় সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণের সুযোগ থাকে।
- সকল শিক্ষার্থীর চিন্তাশক্তি বিকাশের সুযোগ তৈরি হয়।
- শিক্ষার্থীদের আত্মনির্ভরশীল হওয়ার সুযোগ থাকে।
- শিক্ষার্থীর মনোবল বৃদ্ধি পায়।
- শ্রেণিতে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে সক্রিয় রাখা সম্ভব হয়।
- শিক্ষার্থীকে পাঠে মনোযোগী রাখা যায়।

একক কাজের অসুবিধা

- সকলের মত প্রকাশ করতে না দিলে কোনো কোনো শিক্ষার্থী নিরুৎসাহিত হতে পারে।
- কাজে অমনোযোগ দেখা দিতে পারে।
- যথেষ্ট দক্ষতা না থাকলে শিক্ষকের সময় ব্যবস্থাপনা ঠিক নাও থাকতে পারে।
- কখনও কখনও শিক্ষার্থীদের মধ্যে অলসতা দেখা দিতে পারে।

শিখন শেখানো কাজে বাংলা বিষয়ের শিক্ষকের প্রয়োজনীয় দক্ষতা থাকলে সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে একক কাজে সফলতা অর্জন করা সম্ভব।

জোড়ায় কাজ

দুইজন শিক্ষার্থীর একত্রে কোনো একটি বিষয় নিয়ে কাজ করার প্রক্রিয়াই হলো জোড়ায় কাজ। শিক্ষণ ক্ষেত্রে প্রায় সকল পরিবেশে সম্ভব- জোড়ায় কাজ এমন একটি উপযোগী কৌশল। এ কৌশলে পাশাপাশি অথবা মুখোমুখি দু'জন শিক্ষার্থী নিয়ে এক একটি জোড়া গঠন করে কোনো সমস্যার সমাধানে কাজ করতে দেওয়া হয়। অপেক্ষাকৃত দুর্বল এবং সবল শিক্ষার্থী নিয়ে জোড়া গঠন করা বাঞ্ছনীয়। শিক্ষার্থীরা চিন্তা করে নিজের ভাষায় উত্তর লিখতে পারে এমন অনুধাবনমূলক প্রশ্ন জোড়ায়

আলোচনার জন্য দেওয়া যেতে পারে। (যেমন; সম্বন্ধ পদ কারক নয় কেন?) জোড়ায় আলোচনা করে সমাধান/উত্তর শিক্ষার্থীরা খাতায় লিখবে। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থী একে অপরের মতামতের উপর গুরুত্ব দেবে। দ্বৈবচয়নের মাধ্যমে নির্বাচিত কয়েক জোড়া শিক্ষার্থীর মধ্য থেকে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সমাধানের/উত্তরের উত্তম বিকল্পটি বেছে নিয়ে চকবোর্ডে ফলাবর্তনের মাধ্যমে শিক্ষক পরবর্তী কার্যক্রমে অগ্রসর হবেন।

জোড়ায় কাজের সুবিধা

- শিক্ষার্থীদের চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটে।
- তথ্যের আদান প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সমৃদ্ধ হয়।
- একক কাজের তুলনায় নির্দিষ্ট বিষয়ে অধিক তথ্য প্রদান করা সম্ভব হয়।
- পারস্পরিক ভাবের আদান-প্রদানের সুযোগ তৈরি হয় বলে শিক্ষার্থীদের আন্তঃসম্পর্ক বৃদ্ধি পায়।
- অপেক্ষাকৃত দুর্বল শিক্ষার্থীর শিখনের জড়তা দূর হয়।

জোড়ায় কাজের অসুবিধা

- এ পদ্ধতিতে সময় একটু বেশি লাগতে পারে।
- জোড়া দলের সদস্যের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিতে পারে।
- জোড়া দল নির্বাচনে শিক্ষকের দক্ষতার অভাব থাকলে পদ্ধতি সফল নাও হতে পারে।

দলীয় কাজ

শিখন শেখানো কার্যক্রমে দলগত কাজ একটি কার্যকর কৌশল হিসেবে বিবেচিত। একই বয়সের বা একই শ্রেণির শিক্ষার্থীরা একত্রে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে এ শিক্ষালাভ করে। এক্ষেত্রে শিক্ষকের তুলনায় শিক্ষার্থীরাই বেশি সক্রিয় থাকে। শিক্ষক শুধু গাইড বা মডারেটর হিসেবে এখানে কাজ করেন। এ প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতার পাশাপাশি মানবিক গুণাবলিরও বিকাশ ঘটে। দলনেতাকে দলের সব সদস্যের মতামতের উপর গুরুত্ব দিতে হয়। এভাবে তাদের মধ্যে সামাজিক গুণাবলিরও বিকাশ ঘটে। এ পদ্ধতিতে দ্বৈবচয়নের মাধ্যমে নির্বাচিত কয়েকটি দলকে শিক্ষক তাদের কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন। শ্রেণির অন্য শিক্ষার্থীদের ফলাবর্তনের সুযোগ দিবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক নিজে ফলাবর্তন প্রদান করবেন। এক্ষেত্রে চকবোর্ড, পোস্টার বা মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ব্যবহার করা যেতে পারে।

দল গঠন প্রক্রিয়া

বিভিন্ন পদ্ধতিতে দল গঠন করা যায়। যেমন-

- নামের আদ্যক্ষর বিবেচনায় দল গঠন করা যেতে পারে
- একই মেধার শিক্ষার্থীদের নিয়ে দল গঠন করা যেতে পারে
- ভিন্ন মেধার শিক্ষার্থীদের নিয়ে দল গঠন করা যেতে পারে
- অঞ্চলভিত্তিক শিক্ষার্থীদের নিয়ে দল গঠন করা যেতে পারে
- ছেলে-মেয়ের মিশ্রণে দল গঠন করা যেতে পারে
- চিরকুটে ফুল, ফল, পাখি ইত্যাদির নাম লিখে সরবরাহ করে দ্বৈবচয়নের মাধ্যমে দল গঠন করা যেতে পারে
- বাংলা বিষয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কবি-সাহিত্যিকদের নাম বা বিশিষ্ট লেখক ও গবেষকদের নামে দলের নাম দেওয়া যেতে পারে।

দল গঠনের এসব পদ্ধতির মধ্যে মিশ্রমেধা ও মিশ্র-জেন্ডারের শিক্ষার্থীদের নিয়ে দল গঠন করা অপেক্ষাকৃত বেশি কার্যকর হিসেবে স্বীকৃত। তবে দল গঠন প্রক্রিয়ায় আবার বৈচিত্র্যও থাকা দরকার। যেভাবেই দল গঠন করা হোক না কেন মাধ্যমিক স্তরে দলের সদস্য সংখ্যা ৪ থেকে ৫ জন বা সর্বোচ্চ ৬ জন হওয়া বাঞ্ছনীয়। দল গঠন সময়সাপেক্ষ বলে প্রতি বিষয়ের জন্য আলাদা আলাদা দল গঠন না করে শ্রেণিশিক্ষক কর্তৃক গঠিত দলে অন্য বিষয়ের শিক্ষকেরাও কাজ দিতে পারেন। তবে এক্ষেত্রে কিছুদিন পরপর নতুনভাবে দল গঠন করা দরকার। প্রত্যেক দলে একটি করে নাম এবং নির্বাচিত দলনেতা থাকা ভালো। মাঝে মাঝে দলনেতা পরিবর্তন করা দরকার।

আসন বিন্যাস

দলের সদস্যরা মুখোমুখি বসবে। শ্রেণিকক্ষে পর্যাপ্ত জায়গা এবং বিদ্যালয়ের সামর্থ্য থাকলে প্রতিটি দলের জন্য একটি টেবিলের ব্যবস্থা থাকা ভালো। আমাদের দেশে অধিকাংশ বিদ্যালয়ে এ ব্যবস্থা না থাকায় ১ম বেঞ্চের শিক্ষার্থীরা ঘুরে ২য় বেঞ্চের শিক্ষার্থীদের মুখোমুখি বসতে পারে। বড় বেঞ্চ হলে দুই বেঞ্চের মোট সদস্য সংখ্যাকে দুই ভাগ করে আড়াআড়ি একটি অদৃশ্য রেখা টেনে দুটি দল গঠন করা যেতে পারে।

দলীয় কাজের ধরন

যে কাজে অনুসন্ধান বা চিন্তা উদ্রেগকারী কিছু না থাকে তা দলীয় কাজ হিসেবে দেওয়া যাবে না। দলীয় কাজের ধরন অবশ্যই চিন্তাশ্রয়ী হবে। তত্ত্ব, তথ্য বা জ্ঞানমূলক কিছু জানার জন্য দলগত কাজ নয়; বরং বিশ্লেষণধর্মী, অনুসন্ধানমূলক এবং চিন্তার উদ্রেক করে এমন সৃজনশীল কাজই দলগত কাজের প্রশ্ন হিসেবে নির্বাচন করতে হবে। দলীয় কাজের প্রশ্ন নিম্নরূপ হবে:

প্রশ্ন- ১: প্রাণিদের প্রতি উপযুক্ত মমত্ববোধ দেখানোর জন্য আমাদের আচরণে কী কী পরিবর্তন আনা উচিত?

প্রশ্ন-২: বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন একজন শিক্ষার্থীর প্রতি সহপাঠী হিসেবে তোমাদের কী কী করণীয় আছে ?

প্রশ্ন-৩: আমাদের লোকশিল্প বিলুপ্তির কারণ ও তা রক্ষা করার উপায়গুলি লেখ।

দলীয় কাজে শিক্ষকের করণীয়

- স্পষ্ট করে দলগত কাজ বুঝিয়ে দেওয়া
- দলনেতা মনোনয়ন এবং প্রতিটি ভিন্ন কাজে দলনেতা পরিবর্তন করা
- ঘুরে ঘুরে কাজ পর্যবেক্ষণ করা এবং প্রয়োজনে সহযোগিতা করা
- দলের সদস্যদের মধ্যে কোনো বিষয়ে মতানৈক্য হলে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া
- কাজ শেষে দলনেতাকে উপস্থাপন করতে বলা
- সকল দলে একই কাজ না দেয়া থাকলে একটি দলের উপস্থাপন শেষে অন্য দলের ফিডব্যাক চাওয়া
- একই বিষয়ের বিভিন্ন দলের উপস্থাপন এবং অন্য শিক্ষার্থীদের ফিডব্যাক শেষে প্রয়োজনে চূড়ান্ত ফিডব্যাক ও নির্দেশনা দেওয়া।

দলীয় কাজে শিক্ষার্থীদের করণীয়

- শিক্ষার্থীদের দলে ভাগ হয়ে বসা
- দলের সকল সদস্যের বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করা ও আলোচনায় অংশ নেওয়া
- একসময় একজন কথা বলা
- একজন কথা বলার সময় অন্যরা মন দিয়ে শোনা
- সকলের মতামতকে প্রাধান্য দেওয়া
- একে অপরকে সম্মান দেওয়া
- সহযোগিতামূলক মনোভাব দেখানো
- অন্যের মতামতের উপর গুরুত্ব দেওয়া
- নিজের মতামত জোর করে অন্যদের উপর চাপিয়ে না দেওয়া
- কাজের সময় দীর্ঘ হলে দলনেতা কর্তৃক সময় নিয়ন্ত্রণ করা
- আলোচনা শেষে সিদ্ধান্তগুলো খাতায় লেখা
- কাজ শেষে শিক্ষক কর্তৃক নির্দেশিত হলে দলনেতা কর্তৃক উপস্থাপন
- শিক্ষক বা অন্য দলের শিক্ষার্থীদের থেকে প্রাপ্ত ফলাবর্তনের ভিত্তিতে প্রয়োজনে সংশোধন করে নেওয়া।

দলীয় কাজের সুবিধা

- দলের সদস্যরা কাজের মধ্যে আনন্দ পায়
- পাঠদানে বৈচিত্র্য আনা যায় ফলে একঘেয়েমি দূর হয়
- কাজে গতির সৃষ্টি হয়
- পাঠে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ধরে রাখা সহজ হয়

- বিষয় বিশ্লেষণে শিক্ষার্থীরা সক্রিয় থাকে বিধায় পাঠে ক্লান্তিবোধ হয় না
- বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ সম্ভব হয়
- শিক্ষার্থীদের জড়তা দূর হয়
- হার-জিতের লজ্জা থাকে না
- দলের সদস্যদের মধ্যে ভাব বিনিময়ের সুযোগ তৈরি হয় বলে শিক্ষার্থীদের সামাজিকীকরণ সহজ হয়
- পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের এগিয়ে আনা সহজ হয়
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে নেতৃত্বের যোগ্যতা গড়ে ওঠে
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে যুক্তিবাদী মানসিকতা গড়ে ওঠে
- পরমতের প্রতি শ্রদ্ধার মানসিকতা গড়ে ওঠে
- শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল চিন্তন দক্ষতার বিকাশ ঘটে
- শিখন কার্যকর, ফলপ্রসূ ও স্থায়ী হয়।

দলীয় কাজের অসুবিধা

- শিক্ষার্থীদের মধ্যে মাঝে মাঝে ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে পারে।
- অনেক সময় মতপার্থক্য দ্বন্দ্বে রূপ নিতে পারে।
- শিক্ষকের পরিমিতিবোধ এবং সময় ব্যবস্থাপনা ঠিক না থাকলে উদ্দেশ্য অর্জন সম্ভব নাও হতে পারে।
- অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী সংবলিত শ্রেণিকক্ষে এ পদ্ধতির শিক্ষণ কার্যক্রমে শ্রেণি নিয়ন্ত্রণে রাখা অপেক্ষাকৃত কঠিন হতে পারে।

দলীয় কাজ ভিন্ন ভিন্ন মেধার শিক্ষার্থীদের শিখন সহযোগিতা প্রদানের জন্য একটি উত্তম কৌশল। শ্রেণিতে অপেক্ষাকৃত দুর্বল শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের কাছে অনেক সময় জড়তা ভেঙে তাদের দুর্বলতা প্রকাশ করতে লজ্জাবোধ করে। শিক্ষক ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে এ সকল শিক্ষার্থী চিহ্নিত করলে এবং এসব শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন দলে ভাগ করে প্রতি দলে শ্রেণির একজন অগ্রসর শিক্ষার্থীকে দলনেতা করে কাজ প্রদান করলে দলনেতা সমপর্যায়ের দুর্বল শিক্ষার্থীদের শিখন সহযোগিতা প্রদান করতে পারেন। এভাবে দলীয় কাজে শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীকে সক্রিয় ও মনোযোগী করতে পারলে বিভিন্ন মেধা ও সক্ষমতার শিক্ষার্থীদের কাছে শিখন আনন্দদায়ক হয়ে উঠতে পারে। আর শিখন আনন্দময় অভিজ্ঞতায় পরিণত হলে তা শিক্ষার্থীদের কাছে বেশি স্থায়ী হয়।

৩.৭ : পোস্টবক্স, জিগসো ও অন্যান্য পদ্ধতি

অংশগ্রহণমূলক শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিখন শেখানো পদ্ধতির পুনঃপুনঃ ব্যবহার অনেক সময় একঘেয়েমির সৃষ্টি করতে পারে। এই একঘেয়েমি দূর করার জন্য পাঠদান পদ্ধতি ও কৌশলে বৈচিত্র্য আনা দরকার। বৈচিত্র্যধর্মী পোস্টবক্স এবং জিগসো পদ্ধতি অনেকদিন ধরে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পাঠদানে বিশেষভাবে ব্যবহার হয়ে আসছে। শ্রেণিকক্ষে ব্যবহার উপযোগী পরিবেশ বিদ্যমান থাকলে এ ধরনের পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের সক্রিয় ও মনোযোগী করার ক্ষেত্রে কার্যকর হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

পোস্টবক্স পদ্ধতি

এটি একটি শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিখন শেখানো পদ্ধতি। কোনো বিষয়ে শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর পূর্ব ধারণা সমন্বিত করে সিদ্ধান্তে আসার মাধ্যমে এখানে শিক্ষার্থীদের শিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। শিক্ষার্থীরা প্রত্যেকে পূর্বনির্দিষ্ট ৪/৫টি বিষয়ের/প্রশ্নের ধারণাসমূহ প্রতিটি বিষয়ের জন্য একটি কাগজের টুকরা নির্দিষ্ট করে তাতে লিখে ঐ বিষয়ের জন্য নির্ধারিত বাক্সে ফেলবে। পরবর্তীতে শিক্ষার্থীরা কাগজের টুকরোগুলো বাক্স থেকে বের করে সকল কাগজে লিখিত ধারণাগুলোকে বিষয় অনুযায়ী দলে ভাগ হয়ে পোস্টার পেপারে লিখবে। দলনেতা কর্তৃক উপস্থাপনের পর নির্দিষ্ট বিষয়ে শিক্ষকের ফলাবর্তনের মাধ্যমে শিক্ষণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে।

পোস্টবক্স পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

- এটি শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতি
- শিক্ষার্থীদের পূর্ব ধারণা সমন্বয়ের মাধ্যমে শিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়
- এখানে সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ থাকে
- এটি অপেক্ষাকৃত সময়সাপেক্ষ পদ্ধতি
- এ পদ্ধতিতে ব্যবহৃত প্রশ্নগুলোর ধরন হবে উন্মুক্ত
- সাধারণত কোনো অধ্যায়ের শুরুতে অথবা শেষে এ পদ্ধতির ব্যবহার হয়ে থাকে
- এ পদ্ধতিতে স্বল্পমূল্যের উপকরণের ব্যবহার হয়।

প্রয়োগকৌশল

- এ পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট পাঠের সমগ্র ভাবকে ধারাবাহিকভাবে কয়েকটি অংশে ভাগ করে প্রতিটি অংশ থেকে একটি করে মুক্ত প্রশ্ন তৈরি করা হয়। সাধারণত কমপক্ষে ৪টি প্রশ্ন করা যায় এমন পাঠই এ পদ্ধতির জন্য উপযোগী।
- প্রতিটি প্রশ্নের জন্য পূর্বেই একটি করে বাক্স তৈরি করে রাখতে হবে। বাক্সগুলো মোটা কাগজের তৈরি অথবা অন্য কোনো উপাদানে তৈরি হতে পারে। সাধারণত কাজের শেষে অপ্রয়োজনীয় কোনো বাক্স যেমন টিস্যুবক্স, আইসক্রিম বক্স, ঔষধের খালি প্যাকেট ইত্যাদি এ কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রতিটি প্রশ্নের জন্য একটি করে বাক্স সুনির্দিষ্ট করে সমান দূরত্বে শ্রেণিকক্ষের বিভিন্ন স্থানে আগেই রাখতে হবে।
- বাক্সগুলির গায়ে প্রশ্নের লেবেল সেটে দিতে হবে। প্রশ্নগুলো বোর্ডে লিখে দেওয়া যেতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রশ্নের সংখ্যাচিহ্নের লেবেল বাক্সের গায়ে সেটে দিতে হবে। বাক্সের সামনে শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজের টুকরা রাখতে হবে অথবা শিক্ষার্থীদের কাছে সরাসরি কাগজ সরবরাহ করতে হবে।
- শিক্ষার্থীরা কাগজগুলো নির্দিষ্ট মাপে কেটে প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরের জন্য একটি কাগজের টুকরা ব্যবহার করবে। একটি বড় কাগজে সবগুলো প্রশ্নের উত্তর পর পর লিখে তারপর উত্তরগুলি আলাদাভাবে কেটেও বাক্সে ফেলা যেতে পারে।
- প্রতিটি প্রশ্নের জন্য শিক্ষার্থীরা তাদের পূর্ব ধারণা মোতাবেক একটি উত্তর লিখবে। উত্তর লেখার সময় শিক্ষার্থীরা কোনো আলোচনায় অংশগ্রহণ করবে না। বরং নিজের ধারণা চুপচাপ লিখবে। মুক্ত প্রশ্ন হওয়ায় একই প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষার্থীদের ভিন্ন ভিন্ন ধারণার প্রকাশ থাকবে।
- এবার শিক্ষার্থীরা ঘুরে ঘুরে শ্রেণিকক্ষের বিভিন্ন স্থানে রাখা নির্দিষ্ট প্রশ্নের জন্য রাখা নির্দিষ্ট বাক্সে তাদের উত্তর সংবলিত কাগজের টুকরাগুলো ফেলবে।
- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রতি ৪/৫ জনকে নিয়ে এক একটি দল গঠন করে বাক্সগুলোকে ভাগ করে দিবেন। প্রতিটি দল তখন বাক্সগুলো থেকে কাগজের টুকরাগুলো বের করে সেগুলো থেকে প্রাপ্ত ধারণাগুলো শ্রেণিবদ্ধ করে এবং প্রয়োজনে সারসংক্ষেপ করে একটি পোস্টার পেপারে লিখবে।
- অতঃপর প্রতিটি দল সমগ্র শ্রেণিতে (প্রাপ্ত ধারণার উপর ভিত্তি করে) নির্দিষ্ট বিষয়ে তাদের প্রস্তুতকৃত পোস্টার উপস্থাপন করবে। উপস্থাপনের পর সমগ্র শ্রেণি থেকে প্রাপ্ত ফলাবর্তনের ভিত্তিতে শিক্ষক চকবোর্ডে অথবা ভিন্ন ফ্লিপচার্ট/পোস্টার পেপারে সার সংক্ষেপ তুলে ধরবেন।
- এভাবে প্রতিটি দলের উপস্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষকের সহায়তায় নির্দিষ্ট বিষয়ে ধারণা সংগঠনের মাধ্যমে শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

পোস্টবক্স পদ্ধতির সুবিধা

- এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা সক্রিয় থাকে
- পাঠের একঘেয়েমি দূর হয়
- শিক্ষার্থীরা কাজের মধ্যে থাকে বিধায় আনন্দ পায়
- শিক্ষার্থীদের মিথষ্ক্রিয়ার সুযোগ থাকে
- শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে ঘোরাঘুরির সুযোগ পায় বলে কাজটি মজার অভিজ্ঞতায় পরিণত হয়

- কাজের ধারাতে বৈচিত্র্য থাকে বিধায় শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ধরে রাখা সহজ হয়
- শ্রেণির কঠোর নিয়মের বাইরে নিজেদের মতামত প্রকাশ করার স্বাধীনতা এখানে থাকে বিধায় পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীরাও তাদের জড়তা কাটিয়ে উঠতে পারে।

পোস্টবক্স পদ্ধতির অসুবিধা

- ছোট আকারের শ্রেণিকক্ষে এ পদ্ধতির ব্যবহার একটু অসুবিধাজনক
- এ পদ্ধতিতে সময় একটু বেশি লাগতে পারে
- প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যক্তিগতভাবে দেওয়া উত্তরে ভুল তথ্য থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে পরবর্তীতে দলীয় আলোচনায় তথ্যটি বাতিল করতে কালক্ষেপণ হতে পারে
- সকল পাঠের জন্য এটি উপযোগী নয়
- শ্রেণি শৃঙ্খলা রক্ষায় শিক্ষককে বেশ বেগ পেতে হয়।

পোস্টবক্স পদ্ধতির কার্যকর প্রয়োগে শিক্ষকের করণীয়

- শ্রেণিকক্ষে প্রবেশের পূর্বে প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রস্তুত করে রাখা
- যথাযথ সময় ব্যবস্থাপনাসহ পাঠ-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা
- শ্রেণিতে শিক্ষণ কার্যক্রম শুরুর আগে শিক্ষার্থীদের কাজের ধারা ভালোভাবে বুঝিয়ে দেওয়া
- নির্ধারিত সময়ের উপর ভিত্তি করে কাজের ধাপগুলো অগ্রসর হচ্ছে কিনা সে বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়া
- শিক্ষার্থীদের একক চিন্তায় উত্তরগুলি বাক্সে ফেলার পর দল গঠন, দলনেতা তৈরি ও দলভিত্তিক কাজের দায়িত্ব বণ্টন করে দেওয়া
- দলনেতা কর্তৃক উপস্থাপনের পর অন্য দলের ফলাবর্তনের সুযোগ দেওয়া
- শিক্ষার্থীদের ফলাবর্তন শেষে প্রয়োজনে শিক্ষকের ফলাবর্তনের মাধ্যমে বিষয়টি স্পষ্ট ও চূড়ান্ত করা (এক্ষেত্রে চকবোর্ড, শিক্ষক কর্তৃক পূর্ব থেকে প্রস্তুতকৃত পোস্টার, সম্ভব হলে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ব্যবহার করা যেতে পারে।)

জিগসো পদ্ধতি

অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির মধ্যে জিগসো এমন একটি শিখন কার্যক্রম বা পদ্ধতি যেখানে শিক্ষার্থীদের ধারণা ও মতামতের উপর ভিত্তি করে একটি চূড়ান্ত ধারণা অর্জনের চেষ্টা করা হয়। এখানে শিক্ষার্থীরা একে অপরের মতামতের উপর শ্রদ্ধা রেখে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে শিখন কাজে অগ্রসর হয়। শিক্ষক এখানে সরাসরি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন না করে শিক্ষার্থীদের গাইড বা মডারেটর হিসেবে পরোক্ষ ভূমিকা পালন করেন। এ ধরনের শিক্ষণ কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের শিখনের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে দায়িত্বশীল করে গড়ে তোলে।

প্রয়োগকৌশল

শ্রেণিকক্ষে এ পদ্ধতি কার্যকর করতে হলে নিচের ৬টি ধাপ অনুসরণ করতে হবে:

- প্রথমে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে বসবে। প্রতি দলে সদস্য সংখ্যা থাকবে ৪ থেকে ৬ জন।
- আজকের জন্য নির্ধারিত পাঠটিকে বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতায় ৪ থেকে ৬টি অংশে ভাগ করতে হবে। তারপর দলের প্রত্যেক সদস্যকে একটি করে অংশ পাঠের জন্য নির্ধারণ করে দিতে হবে। পাঠের বিষয়বস্তু কর্মপত্র আকারে শিক্ষার্থীদের সরবরাহ করতে হবে। পাঠ্যবই থেকে ধারাবাহিকভাবে বিষয়বস্তু/প্রশ্ন নির্বাচন করলে পাঠ্য বইয়ের নির্দিষ্ট অংশ চিহ্নিত করে দেওয়া যেতে পারে।
- এবার প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে স্বাধীনভাবে পাঠের জন্য এবং তার জন্য নির্ধারিত প্রশ্নের উত্তর বা সমস্যার সমাধান বের করার জন্য পরিকল্পনামতো সময় নির্ধারণ করে দিতে হবে।
- অতঃপর প্রতিটি নির্দিষ্ট বিষয়ে যে সকল শিক্ষার্থী কাজ করেছে তাদের সকলকে নিয়ে একটি Expert দল গঠন করতে হবে। এই নতুন দলের (Expert Group) প্রত্যেকে তাদের প্রত্যেকের জন্য দেওয়া একই বিষয়ের উপর পরস্পর

মতবিনিময় করবে। মতামত এবং যুক্তি প্রদানের পর গ্রহণ ও বর্জনের মাধ্যমে তারা তাদের জন্য নির্ধারিত বিষয়ে একটি গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হবে।

- এভাবে একটি বিষয়ের উপর একটি টেবিলের সকল সদস্য সমান ধারণা ও দক্ষতা অর্জনের পর তারা তাদের মূল জিগসো দলে (Jigsaw Group) ফিরে আসবে এবং মূল দলের সকল সদস্যের মধ্যে Expert দল থেকে নির্দিষ্ট বিষয়ে তাদের অর্জিত দক্ষতা/ধারণা বর্ণনা করবে।
- সবশেষে প্রত্যেক দলের শিক্ষার্থীদের তাদের পূর্ববর্তী Expert দল থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা একত্র করে গোটা পাঠের উপর সামগ্রিক ধারণা গঠনের সুযোগ দিতে হবে।

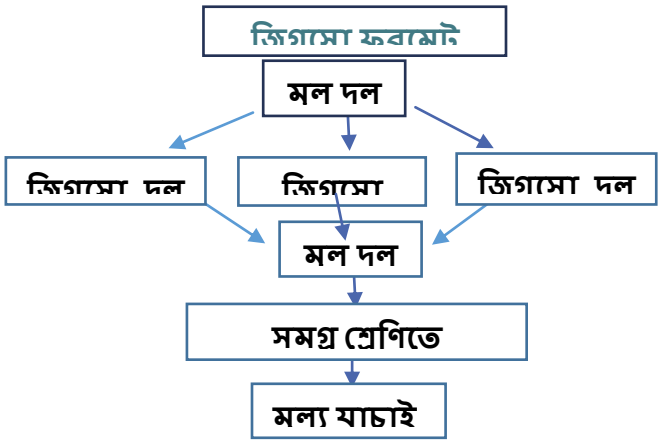

চিত্র- ১: **জিগসো ফরমেট**

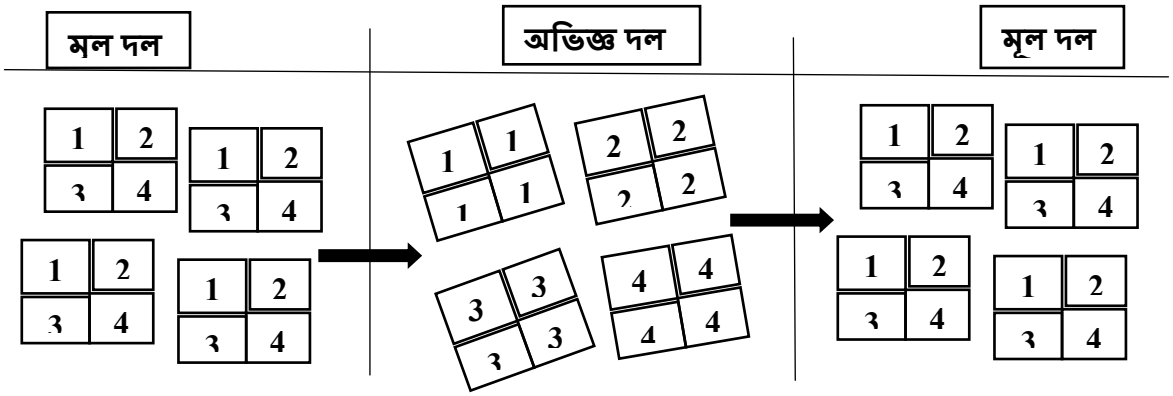

চিত্র- ২: দল পুনর্বিন্যাস

জিগসো পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

- এখানে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর চিন্তার স্বাধীনতা থাকে।
- সবল ও দুর্বল সকল শিক্ষার্থীকে শ্রেণিকক্ষে দায়িত্বশীল করে তোলা যায়।
- প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাজের স্বীকৃতি থাকে।
- কর্মপত্রের ব্যবহার হয়।
- নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর উপর দলের সকলের মতামত একত্রিত করা হয়।
- সকল শিক্ষার্থীকে সমানভাবে সক্রিয় রাখা যায়।

- এটি একটি সহযোগিতামূলক শিক্ষণ পদ্ধতি।
- এখানে শিক্ষকের ভূমিকা পরোক্ষ।
- শিখনের ক্ষেত্রে পারস্পরিক যোগাযোগ রক্ষিত হয়।

জিগসো পদ্ধতির সুবিধা

- শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে পাঠ চলাকালীন সার্বক্ষণিক সক্রিয় ও মনোযোগী থাকে।
- পাঠের নির্দিষ্ট অংশ ব্যক্তিগতভাবে পড়তে এবং ধারণা অর্জন করতে দেওয়ায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধি পায়।
- Expert দলে সকলের মতামত একত্রিত করায় সহযোগিতামূলক মনোভাব বৃদ্ধি পায়।
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়।
- পাঠের মাধ্যমে অর্জিত ব্যক্তিগত ধারণা ভুল হলে Expert দলে peer শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে তা সংশোধনের এবং সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর সুযোগ থাকে।
- সমপর্যায়ের শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক মতবিনিময়ের মাধ্যমে শিখন সম্পন্ন হয় বিধায় শিখনে শিক্ষার্থীদের জড়তা থাকে না।
- আনন্দময় অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিখন অর্জিত হয়।
- যে কোনো খোলা জায়গায় এমনকি মাঠে বসেও এ ধরনের শিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা যায়।
- সিলেবাস শেষে পুনরালোচনার সময় এ ধরনের শিক্ষণ কার্যক্রম খুবই ফলপ্রসূ।

জিগসো পদ্ধতির অসুবিধা

- সময় বেশি লাগতে পারে।
- পাঠের বিভাজিত বিভিন্ন সেগমেন্টের মধ্যে বিষয়বস্তুর দৈর্ঘ্য এবং কাঠিন্যের ক্ষেত্রে ভারসাম্য না থাকলে সময় ব্যবস্থাপনা ঠিক নাও থাকতে পারে বা শ্রেণিতে গোলমাল সৃষ্টি হতে পারে।
- সকল পাঠের জন্য এটি উপযোগী নাও হতে পারে।
- অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীরা দলের সদস্যদের কাছে চিহ্নিত হলেও শিক্ষকের কাছে চিহ্নিত হওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের এগিয়ে আনার বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ তাৎক্ষণিকভাবে শিক্ষকের পক্ষে সম্ভব হয় না।
- অধিক শিক্ষার্থীর শ্রেণিকক্ষে এ পদ্ধতির ব্যবহার একটু অসুবিধাজনক।
- শুরুতে কাজের ধারা শিক্ষার্থীরা বুঝে নিতে না পারলে শ্রেণিতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে।
- কিছু শিক্ষার্থীর মধ্যে ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা তৈরি হতে পারে।
- প্রাথমিক দল তৈরিতে সমমেধার শিক্ষার্থীদের নিয়ে দল গঠন না করলে Expert দলের সকল শিক্ষার্থী নিম্ন বা উচ্চ মেধাসম্পন্ন হয়ে যেতে পারে। ফলে সামগ্রিক ফল ভালো নাও আসতে পারে।

জিগসো পদ্ধতির কার্যকর ব্যবহারে শিক্ষকের করণীয়

গতানুগতিক পদ্ধতির বাইরে একটি আধুনিক ও আকর্ষণীয় শিক্ষণ পদ্ধতি হলেও এ পদ্ধতি কার্যকরভাবে ব্যবহৃত না হলে তা ফলপ্রসূ নাও হতে পারে। বরং শ্রেণি কার্যক্রম কোনোভাবে গোজামিল দিয়ে বা বিশৃঙ্খলভাবে শেষ হতে পারে। এজন্য কার্যকরভাবে এ পদ্ধতির ব্যবহারে শিক্ষককে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হয়। জিগসো পদ্ধতির কার্যকর ব্যবহারে শিক্ষককে নিম্নরূপ পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করতে হবে।

- যথাযথ সময় ব্যবস্থাপনাসহ কার্যকর একটি পাঠ-পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।
- বিষয়বস্তু বিভিন্ন সেগমেন্টে ভাগ করার সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন প্রতিটি সেগমেন্ট (কোনো গল্প, প্রবন্ধ বা কবিতার অংশবিশেষ) এর দৈর্ঘ্য ও কাঠিন্যের ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় থাকে।
- বিষয়বস্তু উল্লিখিত কর্মপত্র সরবরাহ করতে হবে। সম্ভব ক্ষেত্রে পাঠ্য বইয়ের ধারাবাহিক বিষয়বস্তু চিহ্নিত করে দেয়াও যেতে পারে।

- কোনো সেগমেন্টের প্রশ্ন বা কোনো একটি Expert দলের প্রশ্ন/বিষয়বস্তু নির্বাচনের সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন প্রশ্ন/বিষয়বস্তু শুধু জ্ঞানমুলক বা তথ্যনির্ভর না হয়ে যায়। কমপক্ষে অনুধাবন স্তরের বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে হবে।
- শুরুতে শিক্ষার্থীদের কাজের ধারা ভালোভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে।
- সবার সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য শ্রেণিকক্ষে ঘুরে ঘুরে তদারকি করতে হবে।
- সময় ব্যবস্থাপনা ঠিক রাখার জন্য মাঝে মাঝে শিক্ষার্থীদের সতর্ক করতে হবে।
- শ্রেণিতে যাতে কোনোভাবে গোলমাল বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে না পারে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।
- দলনেতা কর্তৃক সমগ্র পাঠ উপস্থাপনের পর অন্য শিক্ষার্থীদের ফলাবর্তন প্রদানের সুযোগ দান ও প্রয়োজনে শিক্ষকের নিজের ফলাবর্তন প্রদান করতে হবে।

অন্যান্য পদ্ধতি

বিষয়বস্তুর ভিন্নতার কারণে সব পদ্ধতি সবসময় একইরূপ ফলদায়ক বা উপযোগী হয় না। আবার সকল শিখন পরিবেশেও সব পদ্ধতি কার্যকর নয়। যেমন ইতিহাস, ভূগোল ও অর্থনীতি বিষয়ের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ 'স্থানিক তথ্য সন্ধান' পদ্ধতি অধিকতর কার্যকর বলে মত দিয়েছেন। এছাড়া কবি-সাহিত্যিকদের জীবন ও কর্ম বিষয়ক শিক্ষণ কার্যক্রমেও এ পদ্ধতি কার্যকর হতে পারে। স্থানিক তথ্য সন্ধানের জন্য শিক্ষার্থীদের নিয়ে শিক্ষা ভ্রমণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এরূপ বিষয়বস্তু, শিখন পরিবেশ, উপকরণের প্রাপ্যতা বা সহজলভ্যতা, স্থানীয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ ইত্যাদি বিবেচনা করে নতুন নতুন পরিস্থিতিতে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহার করা যেতে পারে। নিম্নে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য কিছু পদ্ধতি ও কৌশলের নাম উল্লেখ করা হলো :

বক্তৃতা	ভূমিকাভিনয়	মার্কেট প্লেস	শিক্ষাভ্রমণ
পর্যবেক্ষণ	বিতর্ক	ওয়াকিং ওয়াল	ধারণা মানচিত্র
তথ্যানুসন্ধান	গল্প বলা	পর্যায়ক্রমে আলোচনা	সমাজ জরিপ
দলীয় প্রকল্প	গুণগুণ পাঠ	প্রজেক্ট ওয়ার্ক	কর্মশালা
সামাজিক গবেষণা	জার্নাল লেখা	সমস্যা সমাধান	ফিসবোল
প্রদর্শন	স্নো বোলিং	পরীক্ষণ	প্রকল্প

৩.৮ : বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষাদানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার

আজকের দিনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অবদান সকল কাজে ব্যাপক পরিসরে নতুন সামর্থ্য নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে। মানব জীবনের নানা ক্ষেত্রে এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি। প্রতিনিয়ত নতুন আবিষ্কৃত প্রযুক্তি যোগাযোগ ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ উন্নতি সাধনের মাধ্যমে মানুষের জীবনকে বদলে দিচ্ছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এমন একটি ছাতার মতো কাজ করে যার মধ্যে যোগাযোগ সংক্রান্ত সকল যন্ত্রপাতি এবং এপ্লিকেশন যেমন– রেডিও, টেলিভিশন, সেলুলার ফোন, কম্পিউটার এবং নেটওয়ার্ক, হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার, স্যাটেলাইট সিস্টেম ইত্যাদি রয়েছে। এছাড়া এর সাথে সংশিষ্ট নানাবিধ কার্যক্রম যেমন– ভিডিও কনফারেন্সিং, দূরশিক্ষণ এগুলোও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অংশবিশেষ।

বিশ্বায়নের এই যুগে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার আজ সর্বত্র বিদ্যমান। কৃষি, স্বাস্থ্য, ব্যবসা, শিক্ষা প্রভৃতি নানা ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার দৈনন্দিন কাজে ব্যাপক উন্নয়ন সাধন করেছে। শিক্ষকতা পেশায়ও তাই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার অত্যন্ত জরুরি। আশার কথা, আমাদের দেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে এর অবদান শুরু হয়েছে অনেক আগে থেকেই। দীর্ঘদিন ধরে মাতৃভাষা শিক্ষা কার্যক্রমেও শ্রেণিকক্ষে আইসিটির ব্যবহার হয়ে আসছে। একজন বাংলা শিক্ষকের সকল কাজে (পাঠ-পরিকল্পনা প্রণয়ন, শিখন শেখানো কার্যক্রম, শিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল, শিক্ষার্থী মূল্যায়ন ইত্যাদি) ICT-এর সমন্বয় থাকা দরকার।

হ্যাডাড এবং ড্রাক্সলার এর মতে নিম্নোক্ত ৫টি ক্ষেত্রে শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার হতে পারে-

- উপস্থাপন (Presentation)
- প্রদর্শন (Demonstration)
- অনুশীলন (Drill and Practice)
- মিথস্ক্রিয়া (Interaction)
- সহযোগিতা (Collaboration)

একজন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষকেরও উপর্যুক্ত ৫টি ক্ষেত্রে ICT ব্যবহারের প্রয়োজন হয়। উপযুক্ত পরিসর বিবেচনায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে শিক্ষকের ICT ব্যবহারের ক্ষেত্র ও কৌশলগুলো বর্ণনা করা হলো :

উপস্থাপন (Presentation) : শ্রেণিকক্ষে শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনায় একজন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক ICT উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে নিম্নরূপে পাঠকে সহজতর করতে পারেন–

অডিও : শ্রেণিকক্ষে আদর্শ পাঠের ক্ষেত্রে বিশেষ করে কবিতা পাঠের ক্ষেত্রে শিক্ষক আদর্শ কোনো আবৃত্তিকার এর আবৃত্তি শুনিয়ে শিক্ষার্থীদের আদর্শ আবৃত্তি বা পাঠে উৎসাহিত করতে পারেন। এতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে দীর্ঘদিনের থেকে যাওয়া ভুল উচ্চারণের ক্ষেত্রগুলো তারা চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়। শিক্ষকের আদর্শ পাঠ/আবৃত্তি অনেক ক্ষেত্রে মানসম্মত নাও হতে পারে। সেক্ষেত্রেও শিক্ষক এ কৌশল প্রয়োগ করতে পারেন।

স্থিরচিত্র : এর মাধ্যমে পাঠের বর্ণনামূলক ব্যাখ্যা করে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাছে বিষয়বস্তুর বিমূর্ত ধারণা প্রদান করতে পারেন। শিক্ষার্থীদের মূর্ত থেকে বিমূর্ত ধারণা প্রদান করতে পারলে তা অনেকটা সহজে বোধগম্য হয়। পাঠের বিষয়বস্তুভিত্তিক স্থিরচিত্র দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের কাছে ধারণা স্পষ্ট করা যেতে পারে। যেমন– 'মাথাল' শব্দটির অর্থ কী- এটা শিক্ষার্থীদের বর্ণনা করে বোঝানো যতটা সহজ, একজন কৃষকের মাথায় পরিহিত একটি মাথাল এর স্থিরচিত্র মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের মাধ্যমে প্রদর্শন করলে তার চেয়ে অনেক সহজে শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারে। এভাবে বিষয়সংক্রান্ত স্থিরচিত্রের মাধ্যমে সাহিত্যের যে কোনো কঠিন বিষয়কে সহজভাবে শিক্ষক উপস্থাপন করতে পারেন।

ভিডিও : সাহিত্যের বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীদের সামনে সহজভাবে উপস্থাপনের জন্য অডিও অপেক্ষা ভিডিও অধিক কার্যকর। কোনো গল্প বা বিশেষ করে নাটক পাঠদানের ক্ষেত্রে দৃশ্যপটগুলোকে পর্যায়ক্রমে ভিডিও-এর মাধ্যমে তুলে ধরতে পারলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই শিক্ষার্থীদের মানসপটে গল্পের ধারণা বা নাটকের দৃশ্য সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা সম্ভব। এছাড়া লেখক/কবি পরিচিতি তুলে ধরার সময় লেখক বা কবির ব্যক্তিগত কোনো ভিডিও প্রদর্শন করতে পারলেও তা অধিকতর কার্যকর হতে পারে।

টেক্সট : শিক্ষার্থীদের লেখায় শব্দ ও বাক্য গঠনে ব্যাকরণগত সাধারণ ত্রুটিগুলিকে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের মাধ্যমে প্রদর্শন করলে শিক্ষার্থীরা তা সহজে অনুধাবন করতে পারে। এছাড়া অনেক সময় অধিক ব্যাখ্যাযোগ্য কোনো বাক্য বা বাক্যাংশ সহজে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য শিক্ষক প্রজেক্টর ব্যবহার করলে শিক্ষার্থীদের জন্য যেমন তা সহজে বোধগম্য হয়, তেমনি সময় ব্যবস্থাপনাও সহজ হয়।

এনিমেশন : শিশু শিক্ষার্থীদের বর্ণ শিক্ষার ক্ষেত্রে বর্ণের রেখা বিন্যাসগুলো যদি এনিমেশনের মাধ্যমে দেখানো যায় তবে শিক্ষার্থীদের কাছে তা মজার অভিজ্ঞতায় পরিণত হয় এবং শিখন সহজ হয়। এছাড়া শব্দ গঠন ও বাক্য গঠনের ক্ষেত্রেও এনিমেশনের প্রয়োগ করা যেতে পারে। মূল্যায়নের ক্ষেত্রে মিলকরণ, শূন্যস্থান পূরণ ইত্যাদিতে এনিমেশনের প্রয়োগ করা যেতে পারে।

প্রদর্শন (Demonstration) : শ্রেণিকক্ষে শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বাংলা শিক্ষকের প্রদর্শন একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া। ভাষা ও সাহিত্যের পাঠদানের উপযোগী করে শ্রেণিকক্ষকে ICT উপকরণে সাজানো প্রদর্শনের একটি অংশ। এছাড়া সুনির্দিষ্ট সেশনের নির্ধারিত বিষয়বস্তু ও ভাববস্তু শিক্ষার্থীদের কাছে স্পষ্ট ও বোধগম্য করার জন্য সংশ্লিষ্ট ছবি, লেখক/কবির ছবি ইত্যাদি প্রদর্শন ও শিক্ষার্থীদের প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে পাঠে অগ্রসর হওয়া যায়। যেমন 'বাংলাদেশের ষড়ঋতু' রচনাটি শিক্ষার শুরুতে শিক্ষক মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরে ঋতুবৈশিষ্ট্যের স্থিরচিত্র বা ভিডিও শিক্ষার্থীদের প্রদর্শন করতে পারেন।

অনুশীলন (Drilland Practice) : শ্রেণিকক্ষে শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার সময় অথবা শিখন কার্যক্রম শেষে শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর উপর অনুশীলনের সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন। বাংলা শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অনুশীলনের কাজ এমনভাবে দেবেন যাতে শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইট থেকে বের করতে পারে। এছাড়া সিডি বা পেনড্রাইভে ধারণ করা ছবি, ভিডিও, অডিও (আবৃত্তি বা অন্য কোনো বর্ণনা) ইত্যাদি সরবরাহ করে সেগুলি শ্রেণিতে বা বাড়িতে অনুশীলনের জন্য বলতে পারেন। ICT উপকরণাদি ব্যবহারের মাধ্যমে অনুশীলনে উৎসাহিত করলে শিক্ষার্থীরা কাজে আনন্দ বোধ করে। আর আনন্দময় অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জিত শিখন বেশি কার্যকর ও স্থায়ী হয়।

মিথষ্ক্রিয়া (Interaction) : সমজাতীয় শিক্ষার্থীদের পরস্পরের মধ্যে আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে শিখন কার্যক্রমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার করতে পারলে শিখন সহজ হবে। বাংলা শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে যথেষ্ট পরিমাণ ICT উপকরণ যেমন ইন্টারনেট সংযোগসহ কম্পিউটার, সিডি, পেনড্রাইভ, ইত্যাদি দ্বারা শ্রেণিকক্ষ সাজিয়ে রাখবেন। শিক্ষার্থীরা পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়ায় এগুলোর যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে শিখন অর্জন করবে। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের নিজস্ব যন্ত্রপাতি ও উপকরণও পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়ায় ব্যবহার করতে পারে। শিখন শেখানো কার্যক্রমে শুধু শিক্ষার্থীদের মিথষ্ক্রিয়া নয়; পাঠদানের যথাযথ প্রস্তুতির জন্য বাংলা বিষয়ের শিক্ষকগণ পাঠ-পরিকল্পনা প্রণয়ন, উপকরণ তৈরি ইত্যাদিতে পারস্পরিক পরামর্শের জন্য ICT উপকরণ ব্যবহার করতে পারেন।

সহযোগিতা (Collaboration) : শিক্ষণে আধুনিক কলাকৌশল ব্যবহারে শিক্ষক-শিক্ষক, শিক্ষক-শিক্ষার্থী, শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক-অভিভাবকগণের মধ্যে সহযোগিতা প্রয়োজন। শুধুমাত্র শিখন শেখানো কার্যক্রম নয় বরং বিদ্যালয়ের যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার প্রয়োজন হয়। ICT উপকরণের ব্যবহার সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলোকে পূর্বাপেক্ষা অনেক সহজ করে তুলেছে। বাংলা শিক্ষকগণ নিম্নোক্ত উপায়ে ICT উপকরণ ব্যবহার করে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে শিখন শেখানো কার্যক্রমকে আরো কার্যকর ও গতিশীল করতে পারেন:

ওয়েবসাইটের ব্যবহার : নির্দিষ্ট শ্রেণির শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকগণ সুনির্দিষ্ট ওয়েবসাইটের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রাখতে পারেন। শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য ওয়েবসাইটে আলাদা আলাদা প্রোফাইল তৈরি করে তাতে শিক্ষার্থী সম্পর্কিত হালনাগাদ তথ্য সন্নিবেশ করতে পারেন। এতে অভিভাবকগণ সরাসরি ওয়েবসাইট থেকে সন্তানের পাঠোন্নতি সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য পেতে পারেন। এছাড়া বাংলা শিক্ষকগণ পারস্পরিক সহযোগিতা ও যোগাযোগের ক্ষেত্রেও উক্ত ওয়েবসাইট ব্যবহার করতে পারেন। নির্দিষ্ট শ্রেণির বাংলা বিষয়ের সকল বিষয়বস্তুর সহযোগিতা পাওয়া যায় এমন ওয়েবসাইটগুলির ঠিকানাও এখানে হাইপারলিংক করা থাকতে পারে। এতে শিক্ষার্থীদের ওয়েবসাইটে তথ্য খুঁজে বের করা সহজ হয়। এলাকাভিত্তিক বাংলা বিষয়ের শিক্ষকদের সদস্য করে এমন একটি ওয়েবসাইট খোলা যেতে পারে যাতে বাংলা বিষয়ের সকল শিক্ষক পরস্পরের সহযোগিতার জন্য বিভিন্ন তথ্য (যেমন শিক্ষকদের তৈরি ডিজিটাল কন্টেন্ট) আপলোড ও ডাউনলোড করতে পারেন।

স্মার্ট ফোনের ব্যবহার : তথ্য ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার অন্যতম মাধ্যম হলো সেলফোন। শুধু শিখন শেখানো কার্যক্রম সম্পর্কিত বিষয়ে নয় বরং বিদ্যালয়ের অন্যান্য ব্যবস্থাপনাগত নানা কাজে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক সেলফোন ব্যবহার করে সহজে সহযোগিতামূলক কাজ করতে পারেন। শিক্ষার্থীরাও শিখন বিষয়ে যে কোনো সহযোগিতা বিদ্যালয় সময়ের বাইরেও শিক্ষকের নিকট থেকে গ্রহণ করতে পারে।

ফেসবুকের ব্যবহার: বর্তমান দুনিয়ায় ফেসবুক যোগাযোগের এক নতুন দিগন্ত। বাংলা শিক্ষক তাঁর সকল শিক্ষার্থীকে নিয়ে ফেসবুকে একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে পারেন। শিক্ষণ বিষয়ক যে কোনো তথ্য ফেসবুকের মাধ্যমে আদান-প্রদান করতে পারেন। তবে শিক্ষার্থীরা যেন শিক্ষণ বিষয়ের বাইরে অন্য ব্যাপারে ফেসবুকের অপব্যবহার না করে সে বিষয়েও শিক্ষককে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। অন্যথায় শিক্ষার্থী তাদের সময়ের একটা বড় অংশ অপ্রয়োজনীয় কাজে নষ্ট করে ফেলতে পারে।

ই-মেইলের ব্যবহার : শিখন শেখানো কার্যক্রমের নানা পরামর্শ গ্রহণ ও প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলা শিক্ষক অন্যান্য বাংলা শিক্ষক ছাড়াও অন্য বিষয়ের শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক, শিক্ষা কর্মকর্তা, এমনকি অভিভাবকের সঙ্গেও এর মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারেন। বিদ্যালয়ের অন্যান্য কাজের সহযোগিতার ক্ষেত্রেও ই-মেইলের ব্যবহার করা যেতে পারে। বিশেষ করে যেসব ক্ষেত্রে গোপনীয়তা রক্ষার প্রয়োজন রয়েছে এমন তথ্য আদান-প্রদানের সবচেয়ে উত্তম মাধ্যম হচ্ছে ই-মেইল।

ডিজিটাল কন্টেন্ট-এর ব্যবহার : শিখন শেখানো কার্যক্রমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রয়োগের একটি সফল ও কার্যকর পদ্ধতি হল ডিজিটাল কন্টেন্ট বা মাল্টিমিডিয়া কন্টেন্ট-এর ব্যবহার। বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীদের কাছে আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করার জন্য ডিজিটাল কন্টেন্ট এখন বিশ্বব্যাপী ব্যবহার হচ্ছে। বাংলাদেশের সকল শিক্ষকের জন্য শিক্ষকদেরই তৈরি ডিজিটাল কন্টেন্ট সংরক্ষণের একটি উত্তম এবং কার্যকর ওয়েবসাইট হচ্ছে 'শিক্ষক বাতায়ন'। সারা দেশের শিক্ষকদের পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতার এটি একটি উত্তম ক্ষেত্র। শিক্ষক বাতায়নে সংরক্ষিত বিষয়ভিত্তিক মডেল কন্টেন্ট ডাউনলোড করে যে কোনো শিক্ষক শ্রেণি কার্যক্রমে তা ব্যবহার করতে পারেন। ইতোমধ্যে বাংলাদেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের সকল শিক্ষককে শিক্ষক বাতায়নের সদস্য করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরির জন্য সকল শিক্ষককে প্রশিক্ষণের আওতায় আনা হচ্ছে। বাংলা শিক্ষকগণ নিজে কন্টেন্ট তৈরি করে অথবা ডাউনলোড করে শ্রেণিকক্ষে ব্যবহার করলে শিক্ষার্থীদের পক্ষে পাঠের বিষয়বস্তু অনুধাবন করা সহজ হবে। 'শিক্ষক বাতায়ন'-এর পাশাপাশি 'মুক্তপাঠ' এর ব্যবহারও শিক্ষককে এ বিষয়ে আরো দক্ষ করে তুলতে পারে।

বাংলা বিষয়ের শিক্ষকের শিখন শেখানো কাজে আইসিটি ব্যবহারের সুবিধা

- আইসিটির মাধ্যমে শিক্ষাদানে ছবি/ইমেজ সহজে প্রদর্শন করা যায়- যার ফলে শিক্ষার্থীদের অর্জিত ধারণা স্মৃতিতে ধরে রাখা সহজ হয়।
- আইসিটির মাধ্যমে শিক্ষাদানে জটিল বিষয় ব্যাখ্যা করা শিক্ষকের পক্ষে সহজ হয় এবং শিক্ষার্থীদের ধারণাও স্পষ্ট করা সহজ হয়।
- শিক্ষাদানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে মিথস্ক্রিয়ামূলক পরিবেশ তৈরি করতে সক্ষম হন এবং শিখন আনন্দময় অভিজ্ঞতায় পরিণত হয় বিধায় শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ধরে রাখা সহজ হয় ও উপস্থিতি বৃদ্ধি পায়।
- আইসিটির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষের বাইরেও অনুশীলনের অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা থাকার কারণে ভাষা শিক্ষাদান গতিশীল ও কার্যকর হয়।
- শিক্ষার্থীরা সচরাচর দেখে না– বাস্তব জীবনের এমন কিছু বস্তু বা বিষয়, ছবি ও ভিডিওর মাধ্যমে দৃষ্টিগোচর করানো যায়। এতে শিক্ষণ অর্থবহ হয়ে ওঠে।
- আইসিটি ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষক নানারকম শিক্ষাদান পদ্ধতি ও কৌশল জানতে পারেন এবং শ্রেণিকক্ষে তা প্রয়োগ করতে পারেন।

শিখন শেখানো কাজে আইসিটি ব্যবহারের অসুবিধা

শিক্ষকের শিক্ষাদান পদ্ধতির উন্নয়নে আইসিটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলেও আইসিটি ব্যবহারে শিক্ষকগণ কিছু অসুবিধার সম্মুখীনও হতে পারেন। যেমন-

- শ্রেণিকক্ষে আইসিটি যন্ত্রাংশ সংস্থাপনে অসুবিধা হতে পারে।
- এটি অতিরিক্ত ব্যয়বহুল।
- যথাযথ প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতার অভাব থাকলে এর ব্যবহার– চেষ্টা সুফল দেয় না।

সামগ্রিক কার্যক্রমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করতে বাংলা বিষয়ের একজন শিক্ষকের নিম্নোক্ত ক্ষেত্রগুলিতে পারদর্শী হওয়া প্রয়োজন:

- মৌলিক কম্পিউটার দক্ষতা
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা সম্পর্কে ধারণা
- অনলাইন সিকিউরিটি বিষয়ে ধারণা ও দক্ষতা
- সর্বশেষ তথ্য প্রযুক্তি উপকরণের জ্ঞান ও এর ব্যবহারিক দক্ষতা
- শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সর্বশেষ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সমন্বয় সাধনের জ্ঞান, দক্ষতা ও মানসিকতা
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির চলমান উন্নয়নকে শিক্ষণ কাজে লাগানোর দক্ষতা
- ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরির দক্ষতা
- ব্লগ ও উইকিপিডিয়া ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের স্বশিখনে উৎসাহিত করার সক্ষমতা
- শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় মোবাইল ফোনের ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা

- শিক্ষামূলক ওয়েবসাইট ব্যবহারের সক্ষমতা
- ডিজিটাল অডিও (সরব পাঠ/আবৃত্তির জন্য) নির্মাণ ও সম্পাদনার পারদর্শিতা
- সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারে পারদর্শিতা।
- কম্পিউটার গেমকে কৌশলে শিখন কাজে ব্যবহারের দক্ষতা
- ডিজিটাল মূল্যায়ন পদ্ধতি ব্যবহারের দক্ষতা
- শিক্ষার্থীদের শিখন প্রক্রিয়াকে আনন্দময় অভিজ্ঞতায় পরিণত করার দক্ষতা

একবিংশ শতাব্দীর এই বিশ্বায়নের যুগে তথ্য ও প্রযুক্তির ব্যবহার সর্বত্র বিদ্যমান। বাংলাদেশে একটু দেরিতে হলেও এর ব্যবহার ব্যাপকভাবে বিস্তৃতি লাভ করছে। একথা অনস্বীকার্য যে প্রযুক্তি ছাড়া গোটা পৃথিবীই আজ অচল। গবেষণা থেকে শুরু করে, ব্যবসা, শিক্ষা, কৃষি, চিকিৎসাসহ ঘরে-বাইরে, মহাকাশে, মহাসমুদ্রে সকল ক্ষেত্রেই আজ প্রযুক্তির ছোঁয়া। প্রযুক্তির ব্যবহার ছাড়া আজকের পৃথিবীতে কোনো কিছুই কল্পনা করা যায় না। তাই প্রযুক্তি সম্পর্কে আমাদের প্রত্যেকেরই সম্যক জ্ঞান থাকা একান্ত আবশ্যক।

বাংলাদেশের সর্বত্র তথা– ব্যবসায়, শিক্ষা, কৃষি, উন্নয়নমূলক, সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডসহ সকল কর্মক্ষেত্রে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহারের লক্ষ্যে সরকার বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মোট কথা, এ দেশের সরকার ও জনগণ বাংলাদেশকে তথ্য-প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ একটি ডিজিটাল দেশ হিসেবে দেখতে চায়। এ লক্ষ্যে প্রযুক্তির উন্নয়নে নিরলস কাজ করে চলেছে সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও দপ্তরগুলো। পাশাপাশি এদেশের জনগোষ্ঠীকে তথ্য ও প্রযুক্তিতে দক্ষ করে গড়ে তুলতে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে । শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নামের একটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে; যাতে শিক্ষার্থীরাও তথ্য প্রযুক্তিতে সম্যক জ্ঞান অর্জন করতে পারে এবং প্রযুক্তির ব্যবহার শিখতে পারে। এছাড়াও দেশের বিভিন্ন স্থানে বেসরকারিভাবে কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদনে ও পরিচালনায় গড়ে ওঠেছে তথ্য প্রযুক্তিসহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর বেসিক শিক্ষা গ্রহণের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। ব্যক্তি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এসব বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীর সংখ্যাও কম নয়। এছাড়াও অনলাইনে এসব শিক্ষা গ্রহণের সুযোগতো রয়েছেই। ফলে এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়, বাংলাদেশের ঘরে ঘরে একদিন প্রযুক্তিবিদের ছড়াছড়ি হবে। সেক্ষেত্রে মানুষ গড়ার কারিগর শিক্ষকদের বসে থাকলে চলবে না। প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে সর্বক্ষেত্রে যে গতির সঞ্চার হয়েছে সে গতির সাথে আজকের শিক্ষককেও তাল মেলাতে হবে। অন্যথায় একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানে তিনি ব্যর্থ হবেন। এজন্য শিক্ষাদানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষককে, বিশেষ করে বাংলা শিক্ষককে পরিবর্তনের এ মিছিলের অগ্রভাগে থাকতে হবে।

৩.৯ : বাংলা শিক্ষকের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা

বাংলা শিক্ষকের যোগ্যতা কী- এ বিষয়টি জানার আগে আমাদের শিক্ষকযোগ্যতা বলতে কী বোঝায় তা জানা দরকার। যোগ্যতা শব্দটি সমাজে ব্যাপকভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে- যা বিভিন্ন বিষয়ে কর্মরত বিভিন্ন ব্যক্তির জন্য ভিন্ন প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করা হয়। এ কারণে বিভিন্নভাবে এটিকে সংজ্ঞায়িতও করা যায়। শিক্ষকযোগ্যতা এবং অন্য চাকুরির যোগ্যতাকে এক করে দেখা ঠিক নয়। শিক্ষকযোগ্যতা বলতে শিক্ষকের শিক্ষকতা পেশায় প্রয়োগযোগ্য তার জ্ঞান, দক্ষতা ও মানসিকতার সমন্বয়ে গঠিত এমন কিছু পারদর্শিতাকে বোঝায় যার মাধ্যমে একজন শিক্ষক পেশায় সফলতা অর্জন করতে পারে। স্থান, কাল, পরিবেশ বা অবস্থান ভেদে শিক্ষকযোগ্যতার বিষয়টি আবার ভিন্ন ভিন্নও হতে পারে। শিক্ষকযোগ্যতার বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ হতে পারে।

- একাধিক দক্ষতা নিয়ে শিক্ষকযোগ্যতা গড়ে ওঠে।
- শিখনের ৩টি ক্ষেত্রের সঙ্গেই শিক্ষকযোগ্যতার বিষয়টি সম্পর্কিত; ফলে ক্ষেত্রভিত্তিক শিক্ষকযোগ্যতা পরিমাপ করা সম্ভব হয়।
- কোনো একটি পারদর্শিতার ভিত্তিতে যোগ্যতাসমূহ (Competencies) প্রদর্শন ও পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব।
- যোগ্যতা পর্যবেক্ষণযোগ্য, তাই তা পরিমাপও করা যায়। শিক্ষকের কোনো একটি কার্য সম্পাদনের মাধ্যমে তার সুনির্দিষ্ট যোগ্যতাও পরিমাপ করা সম্ভব।
- শিক্ষকযোগ্যতার জন্য কখনো কখনো জ্ঞান, দক্ষতা ও মানসিকতা সমানভাবে দরকার হতে পারে আবার কিছু ক্ষেত্রে তা নাও হতে পারে। কোনো যোগ্যতার জন্য দক্ষতার চেয়ে জ্ঞান বেশি দরকার হতে পারে আবার কোনো যোগ্যতার জন্য জ্ঞানের চেয়ে দক্ষতা বা মানসিকতার প্রয়োজনও বেশি হতে পারে।

স্থান, কাল, পরিবেশ বা অবস্থান ভেদে শিক্ষকযোগ্যতার বিষয়টি ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে বলে বিশ্বব্যাপী শিক্ষকযোগ্যতার সুনির্দিষ্ট বা প্রমিত মান নির্ণয় করা কঠিন। বিভিন্ন শিক্ষাবিদ শিক্ষকযোগ্যতার যেসব ক্ষেত্র চিহ্নিত করেছেন সেগুলো মোটামুটি নিম্নরূপ।

- সকল শিক্ষার্থীকে শিখনে নিয়োজিত করা ও সহায়তা করা।
- শিক্ষার্থীদের শিখন উপযোগী কার্যকর পরিবেশ তৈরি করা ও বজায় রাখা।
- শিক্ষার্থীদের শিখনের বিষয়বস্তু অনুধাবন করানো ও সংগঠিত করা।
- শিক্ষণ পরিকল্পনা করা এবং শিক্ষার্থীদের শিখন অভিজ্ঞতার নকশা তৈরি করা।
- শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়ন করা।
- শিক্ষক হিসেবে পেশাদারিত্বের উন্নয়নসাধন করা।
- শিখন কার্যক্রমে ICT ব্যবহার করা।

বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষক যোগ্যতার প্রমিত মানের ক্ষেত্র চিহ্নিত করতে গিয়ে TQI প্রকল্প নিম্নোক্ত ৪টি ক্ষেত্রে শিক্ষক যোগ্যতার প্রমিত মান সংগঠিত করার প্রস্তাব করে। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক যোগ্যতা হিসেবে বর্তমানে এই ক্ষেত্রসমূহ মোটামুটি স্বীকৃত বিবেচ্য। প্রস্তাবিত শিক্ষক যোগ্যতার ক্ষেত্র চারটি নিম্নরূপ-

ক) পেশাগত জ্ঞান (Professional Knowledge)
খ) পেশাগত অনুশীলন (Professional Practice)
গ) শিক্ষকতা পেশায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT integration in Teaching Profession)
ঘ) পেশাগত শিখন, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ (Professional Learning, Ethics and Values)

সামগ্রিকভাবে শিক্ষক যোগ্যতার এ সকল ক্ষেত্র বিবেচনায় বাংলা বিষয়ের একজন শিক্ষকের নিম্নরূপ দক্ষতা ও গুণাবলি থাকা আবশ্যক।

ক) পেশাগত জ্ঞান (Professional Knowledge)

১. **শিক্ষানীতি সম্পর্কে ধারণা :** শিক্ষার মাধ্যমে দেশের বর্তমান জনগোষ্ঠী ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে মানবসম্পদরূপে গড়ে তোলার জন্য সর্বসাধারণ কর্তৃক গৃহীত এবং সরকার কর্তৃক সুপরিকল্পিত ও সুলিখিত দীর্ঘমেয়াদি শিক্ষা কার্যক্রমের রূপরেখাই হচ্ছে শিক্ষানীতি। স্বাধীনতার ৩৯ বছর পরে হলেও আমাদের দেশে 'জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০' প্রণীত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের যথাযথভাবে মানবসম্পদ রূপে গড়ে তোলার জন্য একজন শিক্ষকের তথা বাংলা শিক্ষকের 'জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০' সম্পর্কে ধারণা থাকা জরুরি।

২. **শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি সম্পর্কিত ধারণা :** 'জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০' এর আলোকে জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০১২ প্রণীত হয়েছে। শিক্ষাক্রম-২০১২ এ শিক্ষার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, শিখন শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল, মূল্যায়ন পদ্ধতি ইত্যাদি সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। একজন বাংলা বিষয়ের শিক্ষক বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষাদানের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, শ্রেণিভিত্তিক শিখনফল, পাঠ্যসূচি, শিক্ষণ পদ্ধতি ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা শিক্ষাক্রম থেকে অর্জন করতে পারেন। শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি সম্পর্কিত সঠিক ধারণাই কেবল শিক্ষার্থীদের শিখনের উদ্দেশ্যকে সফল ও ফলপ্রসূ করতে পারে।

৩. **বিষয়জ্ঞান :** যথাযথ বিষয়জ্ঞান ছাড়া একজন শিক্ষকের শিখন শেখানো কার্যক্রম সফল হতে পারে না। এজন্য বাংলা শিক্ষককে যথাযথ ও সুস্পষ্ট বিষয়জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে।

৪. **পাঠদান পদ্ধতির ধারণা :** বাংলা শিক্ষককে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক আধুনিক পাঠদান পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে হবে। শিক্ষাক্রমে উল্লিখিত পাঠদান পদ্ধতি ছাড়াও দিন বদলের ধারাবাহিকতায় স্থান-কাল ও পরিবেশভেদে তাকে পাঠদানের নতুন নতুন কলাকৌশল আবিষ্কার করতে হবে।

৫. **পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান :** শিক্ষাক্রমে নির্দেশিত পরীক্ষা পদ্ধতি এবং সরকারের বিধিবদ্ধ সংস্থা কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্দেশিত পরীক্ষা পদ্ধতি একজন বাংলা শিক্ষককে অবশ্যই জানতে হবে।

৬. **শিক্ষা মনোবিজ্ঞান সম্পর্কিত ধারণা :** শিক্ষাদান পদ্ধতি ও কৌশল নির্ধারণে শিশু মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের ধারণা অর্জন করা জরুরি। কারণ শিশুর মানসিক অবস্থা এবং তার ধারণক্ষমতা অনুধাবনে ব্যর্থ হলে শিক্ষকের শিক্ষণ কার্যক্রম অনেক সময় উদ্দেশ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়।

৭. **সাহিত্যানুরাগ :** বাংলা শিক্ষককে অবশ্যই সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী হতে হবে। শিক্ষকের এ সাহিত্যানুরাগ তাকে যেমন সমৃদ্ধ করে তেমনি সাহিত্যের প্রতি শিক্ষার্থীদেরও আকৃষ্ট করে।

৮. **পাঠানুরাগ :** পাঠানুরাগ বাংলা শিক্ষকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। শিক্ষকের পাঠের প্রতি অনুরাগ পরোক্ষভাবে শিক্ষার্থীদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়।

৯. **কবিতা পাঠে আগ্রহী :** কবিতা শুধু একজন মানুষকে নয়; গোটা জাতিকে শিল্প সচেতন করে। কবিতা পঠন ও অনুধাবনের মধ্য দিয়ে শিক্ষক কবিতার প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহী করে তুলতে পারেন। শিক্ষার্থীরা কবিতা পঠনে উদ্বুদ্ধ হলে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে সচেতনতার পাশাপাশি শিল্পিত জাতি গঠনে ভূমিকা রাখতে পারে।

১০. **ছন্দবোধ :** বাংলা শিক্ষকের ছন্দবোধ থাকা জরুরি। ছন্দবোধ বাংলা শিক্ষককে শিক্ষার্থীদের কাছে আরো বেশি আকর্ষণীয় ও গ্রহণযোগ্য করে তোলে।

১১. **সংবাদপত্র পাঠে আগ্রহ :** সংবাদপত্রের মাধ্যমে দেশ-বিদেশের খবরাখবর জেনে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পাঠে সুকৌশলে প্রাসঙ্গিকভাবে তা তুলে ধরতে পারলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে জানার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। এজন্য বাংলা শিক্ষকের সংবাদপত্র পাঠে আগ্রহ থাকতে হবে।

খ) পেশাগত অনুশীলন (Professional Practice)

- **সুললিত কণ্ঠস্বর :** যদিও এটি আলাহর দান তবুও সুললিত কণ্ঠস্বর বাংলা ভাষা শিক্ষকের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। যে সব ভাষা শিক্ষকের মধ্যে এ গুণ রয়েছে তাঁরা এর প্রয়োগে সচেষ্ট ও মনোযোগী হবেন। কারণ শিক্ষার্থীরা এতে আকর্ষণ বোধ করে, শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পায় এবং নিজেরা এর অনুশীলনে প্রয়াসী হয়।
- **শুদ্ধ উচ্চারণ :** শুদ্ধ উচ্চারণ ভাষাকে শ্রুতিমধুর করে, সঠিক অর্থ প্রকাশ করে এবং শ্রোতার কাছে আকর্ষণীয় করে তোলে। এজন্য বাংলা শিক্ষকের সঠিক উচ্চারণে শ্রেণিকক্ষে কথা বলা দরকার।
- **সুন্দর বাচনভঙ্গি :** কথায় বলে বচনে, বসনে, আচরণে ও বিচরণে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে। একজন শিক্ষকের সুন্দর বাচনভঙ্গি শিক্ষার্থীদের তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করে তোলে। বাচনভঙ্গি সুন্দর হলে শিক্ষকের পরিবেশিত তথ্য শিক্ষার্থীরা সহজে ধারণ করতে পারে।
- সুষ্ঠু আবৃত্তি : কবিতার ভাব, আবেগ ও রস অনুধাবনে আবৃত্তি সুষ্ঠু ও সুন্দর হওয়া দরকার। বাংলা শিক্ষকের সুন্দর আবৃত্তি শিক্ষার্থীদের কবিতার রসাস্বাদন ও মর্মবাণী উপলব্ধি করতে সহায়তা করে।
- **সুন্দর হাতের লেখা :** স্বাভাবিকভাবেই একজন ভাষা শিক্ষকের হাতের লেখা সুন্দর হওয়া উচিত। শিশু শিক্ষার্থীদের অক্ষরের ছাঁচ, গঠন, মাত্রা ইত্যাদি শিক্ষা দিতে গেলে বাংলা শিক্ষকের নিজের হাতের লেখা সুন্দর ও আকর্ষণীয় হওয়া দরকার। এজন্য বাংলা শিক্ষককে হাতের লেখা সুন্দর, নির্ভুল ও স্পষ্ট করার কৌশল আয়ত্ত করতে হবে।
- **শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পাঠদান :** পাঠদানের গতানুগতিকতা থেকে বেরিয়ে বাংলা শিক্ষককে আধুনিক শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পাঠদানে দক্ষ হতে হবে। শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পাঠদান শিক্ষার্থীদের পাঠে মনোযোগী করে ও শিখন স্থায়ী হয়।
- **মূল্যযাচাইকরণ :** শিক্ষাক্রম- ২০১২ এ উল্লিখিত এবং সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে নির্দেশিত আধুনিক মূল্যযাচাই প্রক্রিয়া, কৌশল ও পদ্ধতি মোতাবেক বাংলা শিক্ষককে শিক্ষার্থীদের শিখন যাচাই করতে হবে।
- **প্রশ্নপত্র প্রণয়ন :** গতানুগতিক মুখস্থনির্ভর প্রশ্নপত্রের পরিবর্তে বাংলা শিক্ষককে আধুনিক সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়নের দক্ষতা অর্জন করতে হবে।
- **শ্রেণি ব্যবস্থাপনা :** শিক্ষার্থীদের শিখনফল অর্জন অনেকাংশে শিক্ষকের শ্রেণি ব্যবস্থাপনার উপর নির্ভর করে। বাংলা শিক্ষককে উত্তম শ্রেণি ব্যবস্থাপনা কৌশল আরোপ করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা পাঠে মনোযোগী থাকে এবং শিখনফল অর্জন সহজ হয়।
- **মানভাষার ব্যবহার :** যে কোনো আনুষ্ঠানিক বা বৈঠকি পরিবেশে বক্তার মানভাষা ব্যবহার করা উচিত। শ্রেণিকক্ষ একটি আনুষ্ঠানিক পরিবেশ। এ পরিবেশে বিভিন্ন অঞ্চলের শিক্ষার্থী থাকতে পারে। এ কারণে শিক্ষকের আঞ্চলিক ভাষা সকলের কাছে বোধগম্য নাও হতে পারে। এজন্য বাংলা শিক্ষকের মানভাষায় কথা বলা দরকার।
- **একীভূত শিখনবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি :** শ্রেণিকক্ষে ভিন্ন ভিন্ন চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থী থাকতে পারে। সকল শিক্ষার্থীর শিখন নিশ্চিত করাই শিক্ষকের কাজ। সেজন্য বাংলা শিক্ষককে শ্রেণিকক্ষে এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যাতে সকল শিক্ষার্থী শিখন প্রক্রিয়ায় নিজেকে অন্তর্ভুক্ত মনে করে।
- **উপকরণ তৈরি ও ব্যবহার :** উপকরণ পাঠকে সহজ ও আকর্ষণীয় করে। বাংলা ভাষার শিক্ষককে শ্রেণিতে পাঠ সহজ ও আকর্ষণীয় করে তুলতে বিষয়ের সাথে প্রাসঙ্গিক ও মনোমুগ্ধকর শিক্ষা উপকরণের ব্যবহার করতে হবে।

- **পাঠ-পরিকল্পনা প্রণয়ন :** পরিকল্পনাকে বলা হয় কাজের অর্ধেক। উত্তম পাঠ-পরিকল্পনা শিক্ষার্থীদের শিখনফল অর্জনের জন্য জরুরি। এজন্য বাংলা শিক্ষকের পাঠ-পরিকল্পনা প্রণয়নের দক্ষতা থাকতে হবে।
- **উত্তরপত্র মূল্যায়ন :** শিক্ষার্থীদের শিখন যাচাইয়ে ভালো প্রশ্নপত্র প্রণয়নের পাশাপাশি উত্তরপত্র মূল্যায়ন যথাযথ হওয়া দরকার। বাংলা শিক্ষককে যথাযথভাবে উত্তরপত্র মূল্যায়নে পারদর্শী হতে হবে।

গ) শিক্ষকতা পেশায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT integration in Teaching Profession)

বিশ্বায়নের এই যুগে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার আজ সর্বত্র বিদ্যমান। প্রযুক্তি ছাড়া গোটা পৃথিবী আজ অচল। আমাদের দেশেও বর্তমানে এ প্রযুক্তি ব্যাপকভাবে বিস্তৃতি লাভ করেছে। শিক্ষকতা পেশায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার শিক্ষককে কাজে অনেক বেশি পারদর্শী করে তুলতে পারে। একজন বাংলা শিক্ষকেরও তাই সকল কাজে (পাঠ-পরিকল্পনা প্রণয়ন, শিখন শেখানো কার্যক্রম, শিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল, শিক্ষার্থী মূল্যায়ন ইত্যাদি) ICT এর সমন্বয় থাকা দরকার। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করতে একজন বাংলা শিক্ষককে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রগুলোতে পারদর্শী হওয়া প্রয়োজন:

- বাংলা শিক্ষকের মৌলিক কম্পিউটার দক্ষতা থাকতে হবে।
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা সম্পর্কে বাংলা শিক্ষকের ধারণা থাকতে হবে।
- বাংলা শিক্ষকের অনলাইন সিকিউরিটি বিষয়ে ধারণা ও দক্ষতা থাকতে হবে।
- সর্বশেষ তথ্য প্রযুক্তি উপকরণের জ্ঞান ও এর ব্যবহারিক দক্ষতা বাংলা শিক্ষকের থাকতে হবে।
- শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে একজন বাংলা শিক্ষকের সর্বশেষ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সমন্বয় সাধনের জ্ঞান, দক্ষতা ও মানসিকতা থাকতে হবে।
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির কার্যকর ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন ও ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়নের প্রচেষ্টা বাংলা শিক্ষকের থাকতে হবে।
- শিক্ষকের ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরির দক্ষতা থাকতে হবে।
- তিনি শিক্ষক ব্লগ ও উইকিপিডিয়া ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের স্বশিখনে উৎসাহিত করবেন।
- শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় মোবাইল ফোনের ব্যবহার থাকবে তবে এর বাহুল্য ব্যবহার বিশেষ করে শিক্ষার্থীরা যাতে ফেসবুকে অযথা সময় ব্যয় না করে সে ব্যাপারে সতর্ক করবেন।
- শ্রেণিকক্ষে ব্যবহারের জন্য ওয়েবসাইট থেকে তথ্য সংগ্রহ করার দক্ষতা ও মানসিকতা থাকতে হবে এবং তিনি শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন শিক্ষামূলক ওয়েবসাইট ব্যবহার করার কৌশল শেখাবেন।
- বাংলা শিক্ষক ডিজিটাল অডিও (সরব পাঠ/আবৃত্তি) নির্মাণ ও সম্পাদনায় পারদর্শী হবেন।
- তিনি সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম ব্যবহারে পারদর্শী হবেন এবং শিক্ষার্থীদের নিজেদের মধ্যে তথ্য বিনিময়ের জন্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো ব্যবহারে উৎসাহ দিবেন।
- পেশাগত প্রয়োজনে সহকর্মীদের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো নিয়মিত ব্যবহারে পারদর্শী হবেন।
- কম্পিউটার গেমকে কৌশলে শিখন কাজে ব্যবহার করবেন।
- ডিজিটাল মূল্যায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের শিখন প্রক্রিয়াকে আনন্দময় অভিজ্ঞতায় পরিণত করবেন।

ঘ) পেশাগত শিখন, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ (Professional Learning, Ethics and Values)

নৈতিকতা ও মূল্যবোধের অনুশীলন : বাংলা শিক্ষকের পেশাগত সকল ক্ষেত্রে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের চর্চা থাকতে হবে। বর্তমান যুগে মূল্যবোধের ক্ষেত্রে যে সামাজিক অবক্ষয় লক্ষ করা যায় তার প্রভাব শিক্ষার্থীদের মধ্যে যাতে না পড়ে সেজন্য শিক্ষকের প্রতিটি কাজের মধ্যে মূল্যবোধের চর্চা থাকা দরকার। রবীন্দ্রনাথের মতে শিক্ষক হবেন আদর্শ স্থানীয়। শিক্ষক হবেন পরম আদর্শের মূর্ত প্রতিরূপ, যাকে অনুসরণ করে ছাত্ররা জীবনের পরম লক্ষ্য অর্জনের পথে এগিয়ে যাবে। শিক্ষক আত্মত্যাগ ও আত্মসংযমের দ্বারা ছাত্রদের কাছে নিজেদের ভক্তির পাত্র করে তুলবেন। প্রতিদিনের প্রাণপণ যত্নে শিক্ষক সকল দোষ (পক্ষপাত, অবিচার, অধৈর্য, অল্প কারণে রেগে যাওয়া, আত্মাভিমান, লঘুচিত্ততা, অপ্রসন্নতা ইত্যাদি) পরিহার করে চলবেন।

পেশাগত শিখন : শিক্ষককে বিশেষ করে বাংলা শিক্ষককে পেশাগত জ্ঞান চর্চায় সর্বদা রত থাকতে হবে। রবীন্দ্রনাথের মতে, 'উত্তম শিক্ষক হবেন উত্তম ছাত্র, শিক্ষকের ছাত্রত্ব গ্রহণে তার মনের তারুণ্য নষ্ট হতে পারে না।'

প্রাতিষ্ঠানিক দায়-দায়িত্ব পালন : শ্রেণি পাঠদানই একজন শিক্ষকের একমাত্র কাজ নয়। বরং শিক্ষণ সংক্রান্ত এবং শিক্ষা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত অনেক কাজেই তাঁর অংশগ্রহণ থাকা দরকার। বিশেষ করে বাংলা শিক্ষকের বিদ্যালয় ম্যাগাজিন প্রকাশ, দেয়াল পত্রিকা প্রকাশ, অনুষ্ঠান/সভা পরিচালনা ইত্যাদি অনেক কাজের সাথে যুক্ত থাকতে হয়। এসব কাজের পারদর্শিতা অর্জন ও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে বাংলা শিক্ষকের ইতিবাচক মানসিকতা থাকা দরকার।

সহযোগিতা : বিদ্যালয় যেমন একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তেমনি একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠানও বটে। আর পরস্পরের সহযোগিতার উপর ভিত্তি করেই একটি সমাজ গড়ে ওঠে। প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষার্থী এবং অন্যান্য কর্মচারি ও অভিভাবকদের নিয়েও একটি সমাজ। বিদ্যালয়ের সার্বিক সফলতা এদের সকলের পারস্পরিক সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল। নানারকম সহপাঠক্রমিক কাজের সাথে জড়িত থাকায় বাংলা শিক্ষকের সহযোগিতা প্রদান ও গ্রহণের ক্ষেত্রও অনেক বেশি। সকল ক্ষেত্রে বাংলা শিক্ষকের সহযোগিতামূলক মানসিকতা থাকতে হবে।

সততা : জীবনের সর্বোৎকৃষ্ট গুণ এটি। শুধু ব্যক্তি জীবনে নয়, সামাজিক জীবনেও এর প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যালয়ে একজন বাংলা শিক্ষকের নানা কাজের মধ্যে ব্যক্তিগত, সামাজিক, আর্থিক ও প্রশাসনিক সব ক্ষেত্রেই সততার অনুশীলন থাকা দরকার।

নেতৃত্ব : লক্ষ্য অর্জনের জন্য সংশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপর প্রভাব বিস্তারের দক্ষতা হচ্ছে নেতৃত্ব। আমাদের দেশের জন্য শিক্ষক যোগ্যতার স্তরভিত্তিক প্রমিত মান নির্ধারণে যে ৪টি স্তরের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে তৃতীয় স্তর অর্থাৎ অগ্রগামী শিক্ষকদের (Advanced Teacher) নেতৃত্বের যোগ্যতা থাকা দরকার। এই স্তরের শিক্ষকগণ সহকর্মীদের নেতৃত্ব, পরামর্শ ও বিশেষ শিক্ষাদানের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের কাঙ্ক্ষিত দক্ষতা উন্নয়নে সহযোগিতা করতে পারেন। বাংলা বিষয়ের শিক্ষকগণ যেহেতু বিভিন্ন সহপাঠক্রমিক কাজে যুক্ত থাকেন সে কারণে তাঁরা নেতৃত্বদানের এ কাজে সফলতা প্রদর্শন করে বিদ্যালয়ের লক্ষ্য অর্জনকে সহজতর করতে পারেন।

কমিউনিটি সম্পৃক্ততা : বিদ্যালয় ও সমাজ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। সমাজ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে আর বিদ্যালয় সমাজের প্রয়োজন মেটায়। এজন্য সমাজকে বাদ দিয়ে বিদ্যালয়ের সফল পরিচালনা সম্ভব নয়। শিক্ষক পাঠক্রমিক এবং সহপাঠক্রমিক সকল কাজে সমাজের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করবেন এবং বিদ্যালয় পরিচালনায় কমিউনিটিকে সম্পৃক্ত করবেন।

আত্মসচেতনতা : বাংলা ভাষার শিক্ষককে আত্মসচেতন হতে হবে। নিজের সম্ভাবনাগুলোকে আবিষ্কার করতে এবং দুর্বলতাগুলোকে চিহ্নিত করতে তিনি সচেষ্ট হবেন। এতে শিক্ষার্থীরাও শিক্ষকের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নিজেদের দোষগুলোকে সংশোধন করতে পারবে এবং নিজেদের সম্ভাবনাগুলোকে আবিষ্কার করে আপন শক্তিতে জ্বলে ওঠার প্রেরণা পাবে।

শৃঙ্খলাবোধ : জাতীয় ঐক্য ও সংহতিকে সুদৃঢ় করতে শৃঙ্খলাবোধ বড়ই প্রয়োজন। শিশুকাল থেকে পারিবারিক পরিবেশে থেকেই শিক্ষার্থীদের শৃঙ্খলাবোধ জন্মে। বিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষাদানকালে বাংলা শিক্ষক নিজের শৃঙ্খলাপূর্ণ আচার-আচরণ ও চাল-চলনের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ জাগিয়ে তুলবেন।

রসবোধ : বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষককে রসবোধের অধিকারী হতে হয়। সাহিত্যের যথাযথ রস আস্বাদনে ব্যর্থ হলে কবিতা/সাহিত্যের মর্ম অনুধাবন করা কঠিন হয়। সাহিত্য পাঠদানে শিক্ষকের রসময় উপস্থাপন শিক্ষার্থীদের সাহিত্যের রস আস্বাদন করতে সক্ষম করে তোলে।

মমত্ববোধ : শিক্ষার্থীদের প্রতি বাংলা শিক্ষকের গভীর ভালোবাসা ও মমত্ববোধ থাকতে হবে। তাদের সাথে সোহাগমাখা কণ্ঠে কথা বলতে হবে। শারীরিক ও মানসিক শাস্তি প্রদান করা যাবে না। শিক্ষার্থীর প্রতি মমত্ববোধ পাঠদানের আন্তরিকতাকে বাড়িয়ে দেয়।

বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব : বাংলা শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রতি সব সময় বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করবেন। এর ফলে শিক্ষকের প্রতি শিক্ষার্থীদের ভীতি দূর হবে। শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক যত আপন হবে শিখন তত স্থায়ী ও ফলপ্রসূ হবে।

মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার প্রতি প্রেম : বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষকের মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার প্রতি অকৃত্রিম প্রেম ও ভালোবাসা থাকতে হবে। এতে শিক্ষার্থীরাও উৎসাহিত হবে এবং শিক্ষকের অনুকরণে মাতৃভাষা ও মাতৃভূমির একনিষ্ঠ প্রেমিক হয়ে উঠবে।

চির নবীন ও প্রাণবন্ত : মাতৃভাষা শিক্ষকের তারুণ্য কখনও হারিয়ে যাবে না। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'যে গুরুর অন্তরে ছেলে মানুষটি একেবারে শুকিয়ে কাঠ হয়েছে তিনি ছেলেদের ভার নেবার অযোগ্য।' আবার গতানুগতিক শিক্ষকের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করে বলেছেন,'আমরা যাহাকে স্কুলের শিক্ষক করি তাঁহাকে এমন করিয়া ব্যবহার করি যাহাতে তাঁহার হৃদয় মনের অতি অল্প অংশই কাজে খাটে, ফটোগ্রাফ যন্ত্রের সঙ্গে একখানা বেত আর কতকটা পরিমাণ মগজ জুড়িয়া দিলেই স্কুলের শিক্ষক তৈরি করা যাইতে পারে।'

শিক্ষক যোগ্যতার এ সকল উপাদান শিক্ষকতা পেশায় প্রবেশের সাথে সাথেই সাধারণত একজন বাংলা শিক্ষকের থাকে না। কর্মজীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে যোগ্যতাগুলো অর্জন করতে হয়। যোগ্যতা অর্জনের এই পরিপ্রেক্ষিত এবং শিক্ষক যোগ্যতার প্রমিত মান বিবেচনায় মাধ্যমিক স্তরে কর্মরত শিক্ষকগণকে নিম্নোক্ত ৪টি ধারাবাহিক পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে–

- নবীন শিক্ষক
- বিকাশমান শিক্ষক
- অগ্রসরমান শিক্ষক
- পারদর্শী শিক্ষক

শিক্ষকতা পেশায় প্রবেশের পর থেকে বাংলা বিষয়ের শিক্ষক 'ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন' শীর্ষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ধাপে ধাপে উপর্যুক্ত যোগ্যতাসমূহ অর্জন করবেন এবং এই প্রক্রিয়ায় সময়ান্তরে তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আদর্শ শিক্ষক হয়ে ওঠবেন।

৩.১০ : বাংলা গদ্য (প্রবন্ধ ও নিবন্ধ) : বৈশিষ্ট্য ও শিখন-শেখানো পদ্ধতি

সাহিত্য মানুষের আনন্দ-বেদনার বিচিত্র অনুভূতির শিল্পময় প্রকাশ। কল্পনার সাতরঙা পাখায় চড়ে সাহিত্যিকেরা মানব মনের সীমাহীন আকাশে বিচরণ করে জীবনের বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাতের অনুভূতিগুলোকে বের করে আনেন এবং তা রসসমৃদ্ধ করে বাণীরূপে প্রকাশ করেন। লেখকের অনুভবগুলোর শিল্পরসসমৃদ্ধ এ বাণীরূপই সাহিত্য। শিল্পময় বলেই সাহিত্য নিরাবয়ব নয়। কোনো না কোনো আঙ্গিক অবলম্বন করেই তার প্রকাশ ঘটে। এভাবেই সাহিত্যের বিভিন্ন আঙ্গিকের উদ্ভব হয়েছে।

আদিতে বাংলা সাহিত্যে গদ্যরীতি ছিল না। বাংলা সাহিত্যের আদি ও মধ্যযুগের সাহিত্য রচিত হত কবিতায়। বাঙালিরা গদ্যে কথা বললেও সাহিত্যের জন্য কবিতাকে মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছিল অনেক আগে। মধ্য ও আধুনিক যুগের সন্ধিক্ষণে পর্তুগিজ ও ইংরেজ মিশনারিদের হাতেই বাংলা গদ্যের উদ্ভব হয়েছিল। তবে আগে বাংলা গদ্য একেবারেই ছিল না এমন নয়। মানুষের দৈনন্দিন মুখের ভাষা ছিল গদ্য। তাছাড়া চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজেও বাংলা গদ্য লিখিত হত।

মূলত ষোড়শ শতাব্দী থেকে শুরু হলেও বাংলা গদ্যের ধারাবাহিক প্রয়োগ ও প্রচলন ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার পর থেকেই। তাই বলা যায়, বাংলা গদ্যের লিখিত রূপের ইতিহাস অতি অল্প সময়ের। এই অল্প সময়ের মধ্যেই বাংলা গদ্য নানা বৈচিত্র্যে বৈচিত্র্যময় হয়ে ওঠে। নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ প্রভৃতি নানা বৈচিত্র্যে বাংলা গদ্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ও বিকশিত হয়ে ওঠে। আধুনিক বাংলা গদ্য সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট দিক হিসেবে উনিশ শতকের প্রথম দিকে প্রবন্ধের সূত্রপাত ঘটে এবং ধারাবাহিকভাবে তা আরোও বিকশিত হতে থাকে। আলোচ্য পাঠে আমরা বাংলা গদ্যধারার অন্যতম শাখা প্রবন্ধ ও নিবন্ধ এর সংজ্ঞার্থ, বৈশিষ্ট্য ও শিখন-শেখানো পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করব।

প্রবন্ধ

'প্রবন্ধ' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'প্রকৃষ্টরূপে বন্ধন'। তাই প্রকৃষ্ট বন্ধনযুক্ত রচনাকেই প্রবন্ধ বলা যায়। 'কল্পনা ও বুদ্ধিবৃত্তিকে আশ্রয় করে কোনো বিষয়বস্তু সম্বন্ধে লেখক যে আত্মসচেতন, যুক্তিনির্ভর এবং নাতিদীর্ঘ সাহিত্যরূপ সৃষ্টি করেন তাকে প্রবন্ধ বলে'। বিষয়বস্তুর পারস্পরিক সম্বন্ধযুক্ত ধারাবাহিক বর্ণনা ও যুক্তিনির্ভর আলোচনার সুলিখিত রূপকে প্রবন্ধ নামে চিহ্নিত করা যায়। কল্পনা ও বুদ্ধিবৃত্তিআশ্রিত কোনো বক্তব্যকে যুক্তিপূর্ণভাবে সাহিত্যরসমণ্ডিত করে উপস্থাপন করাই প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য।

নিবন্ধ

একটি শব্দের অনেকগুলো প্রতিশব্দ থাকতে পারে। তেমনি নিবন্ধ, সন্দর্ভ, রচনা এসব প্রবন্ধের প্রতিশব্দ। প্রবন্ধ এবং নিবন্ধের মধ্যে সংজ্ঞা এবং কাঠামোগত দিক বিবেচনায় কোনো পার্থক্য নেই। তবে সাধারণত নিবন্ধ প্রবন্ধের চেয়ে আকারে একটু ছোট হয়। যুক্তিতে, বুদ্ধিতে, ভাবে-চিন্তায়, শিল্পসম্মত সুঠাম গঠনে প্রবন্ধ ও নিবন্ধের মধ্যে কোনো পার্থক্য না থাকলেও আকার-আয়তনে, ব্যাপ্তিতে ও পরিসরে প্রবন্ধের তুলনায় নিবন্ধ একটু সংক্ষিপ্ত।

প্রবন্ধ ও নিবন্ধের বৈশিষ্ট্য

প্রবন্ধ নিরাভরণ রচনা। এর কোনোচরিত্র-মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না। এতে যদি কোনো চরিত্র থেকেও থাকে তা হচ্ছে লেখক নিজেই। সাধারণত আমরা যে গদ্যে কথা বলি এর মাধ্যমও সেই গদ্য। পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত বাক্যাবলি উৎকৃষ্ট উপায়ে সাজিয়ে প্রকাশ করা প্রবন্ধ/নিবন্ধের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বিষয়বস্তুর গৌরবই প্রবন্ধ/নিবন্ধের প্রাণ। প্রবন্ধ/নিবন্ধের ক্ষেত্রে শিল্পের এ সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছাড়াও নিম্নরূপ আরো কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

- প্রবন্ধ/নিবন্ধ সাধারণত গদ্যে রচিত হয় এবং এ ধরনের সাহিত্য হয় সুগঠিত।
- বিষয়বস্তুর ব্যাপকতার কারণে প্রবন্ধের আকার দীর্ঘ হতে পারে।
- বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য প্রবন্ধ সাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। গুরুগম্ভীর দার্শনিক তত্ত্বালোচনা, ঐতিহাসিক গবেষণা, প্রকৃতি, বিজ্ঞান, সমাজ ও লোকচিত্র, বিতর্ক ও সমালোচনা ইত্যাদি সব বিষয়ই প্রবন্ধ/নিবন্ধের আওতাভুক্ত হতে পারে। জগৎ ও জীবনের বিচিত্র বিষয় এ ধরনের সাহিত্যের উপজীব্য।
- প্রবন্ধের ভাষা হবে সহজ, সরল, প্রাঞ্জল ও সাবলীল।
- প্রাবন্ধিক সাধারণত তার প্রবন্ধ বা নিবন্ধে কোনো তত্ত্ব, তথ্য ও মতবাদকে সত্যের ভিত্তিতে প্রকাশ করেন।
- পরিশীলিত মননশীলতা ও নৈর্ব্যক্তিকতা প্রবন্ধ/নিবন্ধের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।
- সার্থক প্রবন্ধ/নিবন্ধ ব্যক্তিকে ভাষার শিল্পভ্রম ও তার প্রয়োগ-নৈপুণ্য সম্পর্কে সচেতন করে।
- সরস বর্ণনাভঙ্গি প্রবন্ধ/নিবন্ধ রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।
- প্রবন্ধ বা নিবন্ধ সাহিত্য গুণসম্পন্ন রচনা।
- প্রবন্ধ ও নিবন্ধ লেখকের নিজস্ব মত, পথ, যুক্তি ও বুদ্ধিকে কেন্দ্র করে লিখিত হয়।
- বিষয়বস্তুর চমৎকার উপস্থাপন-কৌশল প্রবন্ধ সাহিত্যের অন্যতম প্রধান গুণ।
- প্রবন্ধ ও নিবন্ধ মানুষকে সংস্কারমুক্ত করে এবং বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে নিজেকে জানার ও বোঝার সুযোগ করে দেয়।
- প্রবন্ধ ও নিবন্ধে লেখকের নিজস্ব রচনারীতি ও স্টাইল প্রতিফলিত হয়।
- প্রবন্ধ ও নিবন্ধ মানুষের বুদ্ধিকে তীক্ষ্ণ, দৃষ্টিকে সমুজ্জ্বল ও জ্ঞানের পরিধিকে প্রশস্ত করে তোলে।
- সুনির্দিষ্ট কাঠামোর ভিত্তিতে প্রবন্ধের সূচনা হতে সমাপ্তি পর্যন্ত চিন্তাধারার সামঞ্জস্য থাকে।

প্রবন্ধ ও নিবন্ধ শিখন-শেখানো পদ্ধতি (পর্যায়ক্রম)

শিক্ষক শ্রেণিতে বিভিন্ন বিষয়ের প্রবন্ধ পাঠদানের ক্ষেত্রে পাঠের উদ্দেশ্যের ভিত্তিতেকাজ পরিচালনা করবেন। সাধারণত আমাদের বিদ্যালয়গুলোতে প্রবন্ধ পাঠদানের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করা হয় তা গতানুগতিক ও বৈচিত্র্যহীন। প্রায় ক্ষেত্রেই শিক্ষকগণ কেবল প্রবন্ধের বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করেন। রচনার শিল্পগুণ নিয়ে তেমন আলোচনা করেন না। এছাড়া মাঝে মাঝে শিক্ষকের ভাষার ব্যবহার ও বক্তব্যের উপস্থাপনগত ত্রুটির কারণেও পাঠদানে সাবলীলতার অভাব দেখা দেয়। ফলে স্বাভাবিকভাবেই শ্রেণিতে প্রবন্ধ পাঠদান বৈচিত্র্যহীন সাহিত্যানুশীলনে পরিণত হয়। কার্যকর উপায়ে প্রবন্ধ পাঠদান করতে হলে নিচের পর্যায়ক্রমগুলো অনুসরণ করা দরকার:

পাঠ ঘোষণা : শিক্ষক প্রথমে যথাযথ প্রসঙ্গের অবতারণার মাধ্যমে পাঠের (প্রবন্ধ/নিবন্ধের) শিরোনাম শ্রেণিতে ঘোষণা করবেন।

লেখক পরিচিতি : লেখক পরিচিতি প্রদান করার সময় বিশেষ লেখকের সময়কাল, রচনারীতি ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে শ্রেণি উপযোগী আলোচনা করবেন।

আদর্শ পাঠ : আদর্শ পাঠের মাধ্যমে শিক্ষক পঠিতব্য অংশটুকু শিক্ষার্থীদের সামনে পড়ে শোনাবেন। পাঠের সময় কণ্ঠস্বরের স্পষ্টতা বজায় রেখে শুদ্ধ উচ্চারণে পাঠ করবেন।

সমধর্মী লেখার অংশ পাঠ : পাঠের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি ও বৈচিত্র্য সাধনের জন্য মূল পাঠের সাথে সংগতি রেখে অন্যান্য লেখকের সমধর্মী রচনার অংশ পাঠ করে শোনাবেন, এতে শিক্ষার্থীর ধারণা আরো বেশি সম্প্রসারিত হয়।

নীরব পাঠ : শিক্ষার্থীদের নীরব পাঠের অনুশীলনের সুযোগ দিবেন। এতে পাঠের মধ্যকার দুর্বোধ্য শব্দ ও বাক্যাংশ চিহ্নিত করা শিক্ষার্থীদের জন্য সহজ হবে।

বিশেষ শব্দ ও বাক্যাংশের ব্যাখ্যা : বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের পূর্বে নির্ধারিত পাঠের কঠিন ও বিশেষ অর্থবোধক শব্দ বা বাক্যাংশের অর্থ ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করবেন। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে চকবোর্ডের ব্যবহার বা মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের ব্যবহার করবেন।

শীর্ষ ভাগকরণ : পাঠ বিশ্লেষণের প্রয়োজনে সমগ্র পাঠটি কয়েকটি শীর্ষে ভাগ করে নিতে পারেন।

প্রশ্নোত্তরে আলোচনা : শিক্ষার্থীদের প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষক প্রতিটি শীর্ষের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করবেন। শিক্ষার্থীদের আগ্রহী ও সক্রিয় করে তুলতে প্রশ্নোত্তরে আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এতে শিক্ষক শিক্ষার্থী পরস্পরের মধ্যে ভাব বিনিময়ের সুযোগ তৈরি হয়। এছাড়া সঠিক উত্তরের প্রশংসা করায় শিক্ষার্থীরা উৎসাহী ও আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে ওঠে।

ব্যাকরণগত দিক আলোচনা : প্রসঙ্গক্রমিক (প্রসঙ্গানুযায়ী আলোচনা) পদ্ধতিতে শিক্ষক আজকের নির্ধারিত প্রবন্ধ/নিবন্ধের পঠিত অংশের ব্যাকরণগত দিক আলোচনা করবেন।

উপকরণের ব্যবহার : প্রয়োজনীয় উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে পাঠকে আকর্ষণীয় ও আনন্দদায়ক করে তুলবেন। উপকরণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে শিক্ষক প্রাসঙ্গিকতাকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিবেন। আধুনিক উপকরণ হিসেবে বিভিন্ন লেখকের ওয়েবসাইট প্রদর্শনের জন্য ICT উপকরণ ব্যবহার করতে পারেন।

শিক্ষার্থীদের কাজ প্রদান : পঠিত অংশের ভাব-সংগতি যথাযথভাবে অনুধাবনের জন্য শিক্ষার্থীদের শীর্ষভিত্তিক দলগত কাজ দিতে পারেন। দলগত কাজ শেষে শীর্ষের ধারাবাহিকতা অনুসারে প্রতিটি দলের উপস্থাপনের সুযোগ দিবেন, অন্যান্য শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের নিজের ফলাবর্তনের মাধ্যমে পাঠের বিষয়বস্তুর সার-সংক্ষেপ তুলে ধরবেন।

পুনরালোচনা : শিক্ষক সময় সাপেক্ষে প্রয়োজনে প্রশ্নের মাধ্যমে পাঠের পুনরালোচনা করবেন।

মূল্যায়ন : মূল্যায়নের জন্য শিক্ষার্থীদের বাড়িতে অনুশীলনের কাজ দেবেন।

প্রবন্ধ ও নিবন্ধ শিখন শেখানো পদ্ধতি (বিশেষ কৌশল)

এছাড়া প্রবন্ধ ও নিবন্ধ শিক্ষণের জন্য শিক্ষককে আরোও যে সব বিষয়ে সতর্ক থাকতে হয় এবং বিভিন্ন কৌশল ও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয় সেগুলো নিম্নরূপ :

১. **বিষয় নির্বাচন:** শিক্ষার্থীদের বয়স, মেধা এবং তাদের ধারণ ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে প্রবন্ধের বিষয় নির্বাচন করা দরকার। এতে শিক্ষার্থীরা শিখনে আগ্রহ বোধ করে ও মনোযোগী হয়। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের মানসিক প্রবণতার উপর ভিত্তি করেও বিষয়বস্তু নির্বাচন করা যেতে পারে।

২. **সংকেত লিখন:** শিক্ষক আলোচনার মাধ্যমে এবং চকবোর্ড ব্যবহারের মাধ্যমে সমগ্র প্রবন্ধের উপর সংকেত লিখে দিতে পারেন। এক্ষেত্রে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরও ব্যবহার করতে পারেন। এতে শিক্ষার্থীদের কাছে বিষয়টি সহজবোধ্য হবে ও প্রদত্ত সংকেতের উপর প্রবন্ধ রচনা করতে পারবে।

৩. **তুলনাকরণ:** শিক্ষক সমজাতীয় একাধিক প্রবন্ধের বিষয়বস্তু ও রচনাশৈলীর তুলনা করতে পারেন। এতে নির্দিষ্ট লেখকের রচনারীতি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা স্পষ্ট হয় এবং শিক্ষার্থীদের মনে একটি সমালোচনামূলক মনোভাবের সৃষ্টি হয়। এতে বিষয়বস্তু সঠিকভাবে অনুধাবনও শিক্ষার্থীদের জন্য সহজতর হয়।

৪. **শুদ্ধ বানান:** লেখার ক্ষেত্রে প্রায়ই শিক্ষার্থীরা বানান ভুল করে থাকে। বানান ভুলের প্রবণতা অধিকাংশ শিক্ষার্থীর মধ্যে দেখা যায়। এক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের লেখার অশুদ্ধ বানানগুলি সংশোধন করে দিয়ে শুদ্ধ বানানের প্রতি তাদের সচেতন করে তুলবেন।

৫. **শুদ্ধ শব্দ ও বাক্য গঠন:** শিক্ষার্থীদের লেখায় শব্দ ও বাক্য গঠনজনিত ত্রুটিও থাকতে পারে। শিক্ষককে এ ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের শুদ্ধ শব্দ লিখন এবং শব্দের যথাযথ প্রয়োগকৌশল ও সঠিক বাক্যরীতি সম্পর্কে ধারণা দিতে হবে।

৬. **সহজ থেকে কঠিন:** আরোহ পদ্ধতির প্রয়োগ অর্থাৎ জানা থেকে অজানা, মূর্ত থেকে বিমূর্ত এবং সহজ থেকে কঠিন এভাবেই পাঠদানের বিষয় নির্বাচন করা দরকার। অন্যথায় শিক্ষার্থীরা পাঠে আগ্রহ হারিয়ে ফেলতে পারে।

৭. **রচনার মানঃ** শিক্ষার্থীদের লিখিত প্রবন্ধগুলো আন্তরিকভাবে পর্যবেক্ষণ করে শিক্ষক তাদের রচনার মান সম্পর্কে যেমন নিজে ধারণা অর্জন করবেন তেমনি তাদেরকেও তাদের রচনার মান সম্পর্কে অবহিত করবেন এবং সংশোধন ও উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিবেন।

৮. **উৎকৃষ্ট প্রবন্ধঃ** শিক্ষার্থীদের রচিত প্রবন্ধ যাতে কাঙ্ক্ষিত মানে পৌঁছায় সেজন্য তাদেরকে প্রবন্ধ রচনার উৎকৃষ্ট কৌশল আয়ত্ত করতে হবে। এ ব্যাপারে শিক্ষক বিভিন্ন লেখকের উৎকৃষ্ট মানের প্রবন্ধ পড়ার ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করবেন।

৯. **অনুশীলনঃ** ভাল মানের প্রবন্ধ লিখতে হলে অনুশীলন প্রয়োজন। শিক্ষার্থীরা যাতে প্রবন্ধ লেখায় নিয়মিত অনুশীলন করে এ ব্যাপারে শিক্ষক লক্ষ রাখবেন।

১০. **ব্যক্তিত্বের বিকাশ মূল্যায়নঃ** চিন্তা-চেতনা ও প্রকাশভঙ্গিতে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য লক্ষ করা যায়। শিক্ষক একে গুরুত্ব দিয়ে প্রবন্ধ রচনায় শিক্ষার্থীর প্রকাশের ধরন, বর্ণনাভঙ্গি, বিচার বিশ্লেষণ ক্ষমতা ইত্যাদি গভীর পর্যবেক্ষণের দৃষ্টিতে মূল্যায়ন করবেন। তাহলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রবন্ধ লিখনে শিক্ষার্থীরা উৎসাহবোধ করবে।

১১. **সাধু ও চলিত রীতির মিশ্রণঃ** প্রবন্ধ লেখায় শিক্ষার্থীদের ভাষাগত ত্রুটিগুলো শিক্ষক ধরিয়ে দিবেন। ভাষাগত অন্যান্য ত্রুটির পাশাপাশি সাধু-চলিতের মিশ্রণ যাতে না হয় সে ব্যাপারে শিক্ষক সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন।

১২. **সহপাঠক্রমিক কার্যাবলিঃ** সহপাঠক্রমিক কার্যাবলির মাধ্যমেও শিক্ষার্থীদের প্রবন্ধ-নিবন্ধ শিখনে উৎসাহিত করা যায়। বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠান ও জাতীয় দিবসে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন রেখে এবং তা অনুষ্ঠানে পাঠের ব্যবস্থা করে শিক্ষার্থীদের প্রবন্ধ লিখনে উৎসাহিত করা যায়। এছাড়া দেয়াল পত্রিকা ও বিভিন্ন সাহিত্য পত্রিকায় শিক্ষার্থীদের লেখা আহ্বানের সময় প্রবন্ধ বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত রেখে শিক্ষার্থীদের প্রবন্ধ লিখনে উৎসাহিত করা যায়।

৩.১১ : বাংলা কথাসাহিত্য (গল্প ও উপন্যাস): বৈশিষ্ট্য ও শিখন-শেখানো পদ্ধতি

'আত্মানুসন্ধান' মানুষের একটি সহজাত প্রবণতা। মানব শিশুর মধ্যেও এই প্রবণতা লক্ষ করা যায়। দাদি-নানির কোলে বসে শিশুরা যে রূপকথার গল্প শোনে সেখানেও কাজ করে তাদের এই আত্ম-অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা। সেও ডালিম কুমার হয়ে পঙ্খীরাজ ঘোড়ায় চড়ে পাড়ি দিতে চায় সাত সমুদ্র তের নদী। কেবল শুনেই সে ক্ষান্ত হয় না, বলাতেও তার আনন্দ সমধিক। এই আনন্দ সঞ্চারমান থাকে তার জীবন অবধি। মানুষের এই চিরন্তন তৃষ্ণা নিবারণের প্রয়োজনেই সৃষ্টি হয়েছে সাহিত্যের সর্বাধিক জনপ্রিয়, সজীব ও প্রাণবন্ত শাখা 'কথাসাহিত্য'। কথাসাহিত্যের প্রধান দুটো দিক হচ্ছে গল্প ও উপন্যাস। আঙ্গিক ও প্রকরণগত কিছু স্বাতন্ত্র্য থাকলেও রসাস্বাদন প্রক্রিয়ার অভিন্নতার কারণে গল্প ও উপন্যাস উভয়কেই কথাসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমিক স্তরে কথাসাহিত্যের পাঠ আবশ্যিক। তবে পরিসরের ভিন্নতার কারণে গল্প ও উপন্যাসের শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশলে কিছু স্বাতন্ত্র্য লক্ষ করা যায়। তাছাড়া শ্রেণিতে গল্প ও উপন্যাস পাঠদানের উদ্দেশ্যও এক নয়। মাতৃভাষার শিক্ষককে এই স্বাতন্ত্র্যের বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখেই কথাসাহিত্যের শ্রেণিপাঠের পরিকল্পনা করতে হয়।

ছোটগল্প

বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসে ছোটগল্প এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। সাহিত্যের সর্বাধিক জনপ্রিয় শাখা হচ্ছে ছোটগল্প। বিষয় বৈচিত্র্যে, ভাষার নিপুণতায়, নাটকীয় প্রারম্ভে, জীবনের চকিত চপল মুহূর্তের রসসিক্ত পরিবেশনায় শৈল্পিক ও রূপময় এক অনবদ্য সাহিত্য সৃষ্টিই হচ্ছে ছোটগল্প। মানুষের চলিষ্ণু জীবনে প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ সঞ্চারমান অসংখ্য ঘটনাপ্রবাহ। চেতনাস্রোতে বহমান এই ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে আবার কিছু ঘটনা অত্যন্ত বর্ণিল, আলোক-উজ্জ্বল, হাসি কান্নায় পরিপূর্ণ, আনন্দ বেদনায় সিক্ত থাকে। এরকম 'জলজিয়ন্ত' কোনো ঘটনাই ছোটগল্পের বিষয় গৌরব হয়ে থাকে। তবে যেহেতু বাস্তব জগতের অবিকল প্রতিরূপ সৃষ্টি করা সাহিত্যের উদ্দেশ্য নয়; বা তার পক্ষে তা সম্ভবও নয়– তাই ছোটগল্পের পক্ষেও সম্ভব হয় না জীবনের ক্ষুদ্র তুচ্ছ ঐ ঘটনাকে হুবহু উপস্থাপন করা। ঘটনাগুলো আসলে উপলক্ষ মাত্র- যার বসবাস আমাদের ইন্দ্রিয়ের জগতে। এর সাথে লেখকের ধারণার জগৎ যুক্ত হয়ে তৃতীয় একটি মাত্রা প্রতিফলিত হয় ছোটগল্পে। সংশ্লেষণের এই প্রক্রিয়ায় লেখকের স্বপ্ন ও কল্পনা জারিত হয়ে নতুন এক শিল্পরূপ ছোটগল্পে সৃষ্টি হয়।

অনেকে পরিসরের দিক বিবেচনায় ছোটগল্পের সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আকৃতিগত এই দিকটিতে ছোটগল্পের মূল বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত না হলেও তাঁদের মন্তব্যগুলো প্রণিধানযোগ্য। এডগার এলেন পো বলেছেন, ত্রিশ মিনিট থেকে এক বা দু'ঘণ্টার মধ্যে পড়ে শেষ করা যায় এমন গল্পই ছোটগল্প। এইচ জি ওয়েলস-এর মতে, দশ থেকে পঞ্চাশ মিনিটের মধ্যে পড়ে শেষ করা যায় এমন গল্পই ছোটগল্প। কিন্তু এসব সংজ্ঞায় ছোটগল্পের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য, রূপ ও মাধুর্য, কোনোটিই প্রতিফলিত হয় না।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতে, 'ছোটগল্প হচ্ছে প্রতীতিজাত (Impression) একটি সংক্ষিপ্ত গদ্য-কাহিনী যার একতম বক্তব্য কোনো ঘটনা বা কোনো পরিবেশ বা কোনো মানসিকতাকে অবলম্বন করে ঐক্য-সংকটের মধ্য দিয়ে সমগ্রতা লাভ করে।' ছোটগল্পের আকৃতিগত বিবেচনা মুখ্য নয়; বরং প্রকৃতিগত ও মর্মগত দিক বিচার করেই ছোটগল্পকে সাহিত্যের অন্যান্য শাখা থেকে আলাদা করা হয়। B. Mathews-এর মতে, the short story by its effect is a certain unity of impression which sets it apart from other kinds of fiction. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে, 'মানুষের জীবনটা বিপুল একটা বনস্পতির মতো। তার আয়তন আকৃতি সুঠাম। দিনে দিনে চলছে তার মধ্যে এলোমেলো ডালপালার পুনরাবৃত্তি। এই স্তূপাকার একঘেঁয়েমির মধ্যে হঠাৎ একটি ফল ফলে ওঠে, সে নিটোল, সে সুডৌল, সে অনিবার্য, সে দৈবলব্ধ, সে ছোটগল্প।' একই কথার কাব্যরূপ আমরা দেখতে পাই কবির 'সোনারতরী' কাব্যের 'বর্ষামঙ্গল' কবিতায়ও। এই কবিতার বক্তব্যবিষয়ে ছোটগল্পের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রতিভাত হয়েছে।

ছোট প্রাণ, ছোট ব্যথা ছোট ছোট দুঃখ কথা
নিতান্তই সহজ সরল
সহস্র বিস্মৃতি রাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
তারি দু'চারিটি অশ্রুজল।
নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘনঘটা
নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ
অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হ'য়ে হইল না শেষ-

ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য

ছোটগল্প লেখকের আত্ম-সচেতন সৃষ্টি। শেষ হয়েও হইল না শেষ, এই পংক্তিটির মধ্যে ছোটগল্পের মৌলিক বৈশিষ্ট্য ব্যঞ্জিত হয়েছে। এছাড়া ছোটগল্পে নিম্নবর্ণিত বৈশিষ্ট্যসমূহ লক্ষণীয়।

- **ব্যঞ্জনাধর্মিতা :** সাধারণত কবিতার ক্ষেত্রে ব্যঞ্জনার ব্যাপারটি লক্ষণীয় হলেও ছোটগল্পেও এর উজ্জ্বল উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। বর্ণনাভঙ্গির স্বতন্ত্র প্রয়োগের জন্যই কখনও কখনও ছোটগল্পের শব্দগুচ্ছ বা বাক্য তার অর্থকে ছাড়িয়ে গভীর ভাব-ব্যঞ্জনা মূর্ত করে তোলে। রবীন্দ্রনাথের 'বালিকা রতন আর বালিকা রহিল না। সেই মুহূর্তে সে জননীর পদ অধিকার করিয়া বসিল'- এ দুটি বাক্যে ভাবের যে ব্যঞ্জনা এবং ভাষার যে সুললিত ভঙ্গি তা পাঠকের মন অর্বাচিন আনন্দে ভরে দেয়। গদ্য হয়ে ওঠে কবিতা।
- **সুসংবদ্ধতা :** ছোটগল্পের ভাষা, চরিত্র ও ঘটনার বিন্যাস হয়ে থাকে সুসংবদ্ধ ও সুদৃঢ়। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোনো ঘটনা ও চরিত্রের স্থান ছোটগল্পে একেবারেই থাকে না। অনাবশ্যক চরিত্র ও ঘটনার ভীড় এড়িয়ে চলে বলে পাঠক একমুখি স্রোতের টানে অনেকটা এক নিঃশ্বাসেই ছোটগল্প পড়ে ফেলতে পারেন।
- **সংবেদনশীলতা :** ছোটগল্প জীবনঘনিষ্ঠ শিল্পরূপ। এতে লেখকের সংবেদনশীল মানসিকতার পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটে থাকে। গল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বর্ণনার একই বুনন লক্ষ করা যায়। ফলে লেখকের চেতনাস্রোত নির্বিঘ্নে প্রবেশ করে পাঠকের মনোভূমি প্লাবিত করে।
- **জীবনের খণ্ডিত অংশ :** ছোট গল্পের ক্যানভাসে মূর্তিত হয় বৃহৎ জীবনপ্রবাহের একটি খণ্ডিত রসঘন মুহূর্ত। আর এ মুহূর্তটির বহমানতা হয়ে থাকে দ্রুতগতির। এযেন 'একক অনুষঙ্গের আঁধারেই পূর্ণ জীবনের ব্যঞ্জনা- পদ্মপাতার শিশিরে যেমন হেসে ওঠে প্রভাতের সম্পূর্ণ সূর্য।'

- **চরম মুহূর্ত :** নাটকের তৃতীয় অংকে যেমন ঘটনার চরম উৎকর্ষ বা Climax রূপ পায়, ছোটগল্পেও তেমনি একটি চরমমুহূর্ত লক্ষ করা যায়। এ পর্যায়ে পাঠকের ইন্দ্রিয় অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে পড়ে পরবর্তী পরিণতি জানার প্রত্যাশায়। গল্পটিও এই চরম মুহূর্তের প্রভাবে অনিবার্য এক পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়। উৎকণ্ঠিত পাঠকমন গল্পের মূলরসের দিকে ধাবিত হয়।
- **ব্যঞ্জনার অতৃপ্তি :** এ বৈশিষ্ট্যটি দৃষ্টিগোচর হয় গল্পের শেষ পরিণতিতে। দৃশ্যত গল্পটি শেষ হয়ে গেলেও পাঠকের মনে একটি অতৃপ্তিবোধ থেকেই যায়। এরপর কী হলো, কী হতে পারে- এ বিষয়ে পাঠক চিন্তিত হয়। বস্তুত এটিই ছোটগল্পের সার্থক পরিণতি ও প্রধান বৈশিষ্ট্য।
- **ভাষা :** ছোট গল্পের ভাষা হয়ে থাকে বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এর ভঙ্গি ঝরঝরে, গতিশীল, গীতল, ললিতমধুর, প্রাঞ্জল, কাব্যধর্মী। তাই বলা হয়ে থাকে, 'বিষয়বস্তু নয়, বিষয়কে প্রকাশের ভাষাভঙ্গিই ছোটগল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।'

বিষয় বৈচিত্র্যের দিক থেকে ছোটগল্পকে কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যেমন-

১. রোমান্টিক বা প্রেমের গল্প- শেষরাত্রি (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)
২. সামাজিক গল্প- শাড়ী বাড়ী গাড়ী (আবু রুশদ), মহেশ (শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)
৩. মনস্তাত্ত্বিক গল্প- নয়নচারা (সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ)
৪. প্রকৃতি ও মানুষ বিষয়ক গল্প- অতিথি (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)
৫. অতিপ্রাকৃত গল্প- ক্ষুধিত পাষাণ (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর), হাসি (বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়)
৬. হাস্য-রসাত্মক গল্প - খোকার কাণ্ড (রাজশেখর বসু)
৭. রূপক বা প্রতীকী গল্প- তাসের দেশ (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর), নিমগাছ (বনফুল)
৮. ব্যঙ্গাত্মক গল্প- ফুড কনফারেন্স (আবুল মনসুর আহমদ)
৯. ঐতিহাসিক গল্প- ইতিহাসের কণ্ঠস্বর (আবুল ফজল), সময়ের প্রয়োজনে (জহির রায়হান)
১০. শ্রেণিচেতনামূলক গল্প- জেগে আছি (আলাউদ্দিন আল আজাদ), লেলিহান সাধ (শওকত আলী)
১১. নিরীক্ষাধর্মী গল্প- অন্য ঘরে অন্য স্বর (আখতারুজ্জামান ইলিয়াস)
১২. রহস্যমূলক গল্প- সোনার কেল্লা (সত্যজিৎ রায়)

'ছোটগল্পের অত্যাবশ্যকীয় উপাদান কাহিনী-চরিত্র-প্লট আর সাবলীল সংলাপরীতি।' ইউরোপীয় সাহিত্যেই সর্বপ্রথম এই বৈশিষ্ট্যসমৃদ্ধ ছোটগল্পের আবির্ভাব লক্ষ করা যায়। আর বাংলা ছোটগল্পের যাত্রা শুরু হয় উনিশ শতকের নব্বই দশকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে। পরবর্তীতে প্রমথ চৌধুরী, বুদ্ধদেব বসু, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কথাশিল্পী ছোটগল্প রচনায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। সেসময় কলকাতাকেন্দ্রিক হিন্দু মধ্যবিত্তের জীবনবোধই বাংলা ছোটগল্পে বিম্বিত হতে থাকে। বিশ শতকের তৃতীয় দশকের শুরুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯২১) প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পূর্ববঙ্গের মধ্যবিত্ত শ্রেণির জীবনচেতনা ক্রমবিকশিত হয়। এর প্রভাব পড়ে বাংলা ছোটগল্পে। ফলে পূর্ববঙ্গের ছোটগল্পে দুটো ধারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

১. সামন্ত মূল্যবোধের ধারা- মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, বন্দে আলী মিয়া প্রমুখ এই ধারার ছোটগল্প রচনায় নেতৃত্ব দেন।
২. উদার মানবতাবাদী ধারা- আবুল মনসুর আহমদ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ প্রমুখ শক্তিশালী লেখক এই ধারার ছোটগল্প রচনায় বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন।

১৯৭১ সালে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর মুক্তিযুদ্ধের অনুষঙ্গসমূহকে উপজীব্য করে গল্প লেখার ক্ষেত্রে ব্যাপক উৎসাহ, উদ্দীপনা লক্ষ করা যায়। এ সময়ের প্রায় সকল গল্পকারই মুক্তিযুদ্ধের পূর্বাপর অনুষঙ্গ নিয়ে গল্প লিখেছেন। ফলে মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের ছোটগল্পে একটি নতুন বাঁক, নতুন মোড় উপহার দিয়েছে। হাসান আজিজুল হকের নামহীন গোত্রহীন (১৯৭৫) সৈয়দ শামসুল হকের জলেশ্বরীর গল্প (১৯৯১), আলাউদ্দিন আল আজাদের আমার রক্ত আমার স্বপ্ন (১৯৭৫), রশীদ হায়দারের কল্যাণপুর এ কোন ঠিকানা, আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের অপঘাত, সেলিনা হোসেনের আমিনা ও মদিনার গল্প, জহির রায়হানের সময়ের প্রয়োজনে প্রভৃতি গল্পে মুক্তিযুদ্ধের বিবিধ অনুষঙ্গের শোভন রূপায়ণ লক্ষ করা যায়।

ছোটগল্প পাঠদানের উদ্দেশ্য

শিক্ষার্থীর ভাষাজ্ঞান বৃদ্ধি করা; পঠন-শক্তির উন্মেষ ঘটানো; পাঠের অভ্যাস গড়ে তোলা; ভাষার ব্যবহারে, শব্দ সংস্থানে, যুক্তি বিন্যাসে দক্ষ করে তোলার পাশাপাশি সাহিত্যের রসাস্বাদনে সক্ষম করে গড়ে তোলাই শ্রেণিতে ছোটগল্প পাঠদানের মূল উদ্দেশ্য। ছোটগল্প পাঠের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী হয়ে ওঠে। তাদের শব্দচেতনা বিস্তৃত হয়। নন্দনচেতনার পাশাপাশি তাদের সামাজিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, মানসিক ও চিন্তন ক্ষমতার বিকাশ সাধিত হয় ও ধী-শক্তির উন্মেষ ঘটে। একজন ভাষা শিক্ষককে শ্রেণিতে ছোটগল্প পাঠদানের এই উপযোগিতাসমূহ বিবেচনায় রেখেই পদ্ধতি ও কলাকৌশল নির্বাচন করতে হয়। শ্রেণিতে ছোটগল্প পাঠদানের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহও বিবেচ্য।

১. পাঠ্যবইয়ের বাইরে সাহিত্যধর্মী অন্যান্য বই পাঠে উদ্বুদ্ধ করা
২. বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট লেখকদের রচনার সাথে পরিচিত করা
৩. ছোটগল্পের আঙ্গিক ও কৃৎকৌশল সম্পর্কে অবহিত করা
৪. মৌলিক রচনায় অনুপ্রাণিত করা
৫. শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধি করা
৬. মাতৃভাষার শক্তি ও সম্ভাবনা সম্পর্কে সচেতন করা
৭. চিন্তা, কল্পনা ও অনুভূতির সুষ্ঠু বিকাশ সাধন করা
৮. ছোটগল্পের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে ধারণা দেওয়া।

ছোটগল্প পাঠদানের পদ্ধতি ও কলাকৌশল

অর্থপূর্ণ শিখনের প্রধান ও পূর্বশর্ত হচ্ছে অংশগ্রহণমূলক পাঠদান পদ্ধতি। অর্থাৎ শ্রেণিতে ছোটগল্প শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট গল্পটির আলোকে যে শিখনফল বা আচরণিক উদ্দেশ্য নির্বাচন করা হয়ে থাকে তা শেখাতে হবে শিক্ষার্থীকে হাতে কলমে কাজ করানোর মধ্য দিয়ে। শিখনফল অনুযায়ী এমন কাজের আয়োজন শ্রেণিতে রাখতে হবে- যেন ঐ কাজটি করতে গিয়ে শিক্ষার্থীকে চিন্তা করতে হয়; বারবার গল্পটির অংশবিশেষ পড়ে অনুধাবনের চেষ্টা করতে হয় এবং সমস্যা সমাধানের জন্য দলীয় বা জোড়ায় চিন্তা সমন্বয়ের চেষ্টা চালাতে হয়। ছোটগল্প পাঠদানের ক্ষেত্রে শ্রেণিতে শিক্ষককে কতকগুলো সাধারণ-ধাপ অনুসরণ করতে হয়। যেমন– মানসিক প্রস্তুতি/পূর্বজ্ঞান যাচাই, লেখক পরিচিতি, আদর্শ পাঠ, শব্দার্থ, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, শ্রেণির কাজ, পাঠ মূল্যায়ন, বাড়ির কাজ প্রদান প্রভৃতি।

১. **মানসিক প্রস্তুতি/পূর্বজ্ঞান যাচাই ও পাঠ ঘোষণা :** ছবি দেখিয়ে, ছবির বিষয়বস্তুভিত্তিক প্রশ্ন করে বা বাস্তব গল্পকথনের অবতারণা করে বা অন্য কোনোভাবে প্রাসঙ্গিক কথোপকথনের মাধ্যমে পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের অনুষঙ্গে শিক্ষার্থীদের মানসিকভাবে প্রস্তুত করিয়ে নিয়ে শিক্ষক পাঠের ঘোষণা দিবেন ও শিরোনাম বোর্ডে লিখে দিবেন।

২. **লেখক পরিচিতি :** যে কোনো ছোটগল্পের প্রথম অংশ পাঠদানের দিন শ্রেণিতে প্রথমে ঐ গল্পের লেখকের পরিচিতি বিবেচনায় আনতে হয়। এক্ষেত্রে শিক্ষক লেখক পরিচিতি সম্পর্কে ২/১ মিনিটের মিনি লেকচার দেওয়ার পর শিক্ষার্থীদের লেখক পরিচিতি অংশ পড়ে জোড়ায় তথ্যছক (মাইন্ড ম্যাপ/মনছবি) তৈরি করতে বলবেন। পরে ফলাবর্তন দিবেন।

৩. **আদর্শ পাঠ, সরব পাঠ ও নীরব পাঠ :** গল্পের নির্বাচিত অংশ শিক্ষক শ্রেণিমুখী হয়ে পঠনের আদর্শগত সকল দিক বিবেচনায় রেখে শিক্ষার্থীদের পাঠ করে শোনাবেন। এসময় শিক্ষার্থীরা বই দেখে শিক্ষকের আদর্শ পাঠ অনুসরণ করবে। পরে ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ৩/৪ জন শিক্ষার্থীকে দিয়ে সরব পাঠ করাবেন। শ্রেণির কাজ দেওয়ার আগে শিক্ষার্থীদের নির্বাচিত অংশ একবার নীরবে পড়ে নিতে বলবেন।

৪. **শব্দার্থ শেখানো :** শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে অর্থ-না-জানা শব্দগুলো পর্যায়ক্রমে উল্লেখ করতে বলবেন এবং সাথে সাথে শুধু মূল শব্দগুলো বোর্ডের একপাশে উল্লম্বভাবে লিখবেন। শিক্ষার্থীদের চাহিদা অনুযায়ী নির্বাচিত শব্দগুলো বোর্ডে লেখা হয়ে গেলে ঐ শব্দসমূহের অর্থ শিক্ষার্থীদের জোড়ায় চিন্তা করে নিজ নিজ খাতায় লিখতে বলবেন। পরে শিক্ষার্থীদের সহায়তায় ফলাবর্তন দিবেন।

৫. **পাঠ-বিশ্লেষণ :** শিক্ষক এই অংশে প্রথমে বর্ণনা দিবেন। পরে খুব সংক্ষেপে (২/৩ মিনিট) পুরো পাঠের মূল দিকগুলো মৌখিকভাবে উপস্থাপন করবেন। এরপর তিনি শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণমূলক শিখন পদ্ধতির সম্পূরক নিম্নরূপ কলাকৌশলভিত্তিক কাজ দিতে পারেন। এক্ষেত্রে তাকে পাঠের বিষয়বস্তুর প্রকৃতি বিবেচনায় রেখে কাজগুলো (এক বা একাধিক) নির্বাচন করতে হবে।

- সমস্যা সমাধান : শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত সমস্যার আলোকে চিন্তা করে দলীয়ভাবে বা জোড়ায় সমাধান খুঁজে বের করতে বলা ও শ্রেণিতে দল/জোড়ার পক্ষে উপস্থাপন করতে বলা।
- মাইন্ড ম্যাপিং : শিক্ষার্থীদের পোস্টার পেপারে অথবা নিজ নিজ খাতায় পাঠের একটি মূল শব্দ লিখে এর চারপাশে তার সাথে সংশ্লিষ্ট শব্দগুলো লিখতে বলা।
- Words flash : শিক্ষার্থীদের ধারবাহিকভাবে পাঠের প্রধান শব্দগুলো দিয়ে পাঠের বিষয়বস্তু/তথ্য নির্ভর বাক্য গঠন করতে দেওয়া।
- বৈষম্য অনুসন্ধান : শিক্ষার্থীদের পাঠসংশ্লিষ্ট দুটি পরস্পরবিরোধী বিষয়ের তুলনা করে বিষয় দুটির বিভিন্ন দিকের পার্থক্য নিরূপণ ও বক্তব্যের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করতে বলা।
- ব্রেইন স্টর্মিং : পাঠ-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দিক গভীরভাবে চিন্তা করে ঐ দিকসমূহের প্রকৃত স্বরূপ অনুসন্ধান করতে বলা।
- ভিজ্যুয়ালাইজেশন : শিক্ষার্থীদেরকে প্রথমে চোখ বন্ধ করে নির্দেশ মোতাবেক পাঠ-সংশ্লিষ্ট কিছু দৃশ্য স্মরণ করে পরে চোখ খুলে সঙ্গীর সাথে মত বিনিময় করে উপস্থাপিত সমস্যার সমাধান নির্ধারণ করতে বলা।
- চকবোর্ড সারসংক্ষেপ : পুরো পাঠের মূল শব্দগুলো শিক্ষার্থীদের দ্বারা নির্বাচন করিয়ে সাথে সাথে পরিকল্পনামতো ধারাবাহিকভাবে বোর্ডে লেখা।
- তালিকা প্রস্তুতকরণ : পাঠের বিভিন্ন দিক-সংশ্লিষ্ট উপ-দিকগুলো তালিকা আকারে লিখতে বলা।
- শ্রেণিকরণ : এলোমেলোভাবে মিশ্রিত অনেকগুলো তথ্যকে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের আলোকে বিভিন্ন শ্রেণিতে সাজাতে বলা।
- ত্রুটি সনাক্তকরণ : পাঠ-সংশ্লিষ্ট অথচ ভুল তথ্য সন্নিবেশিত সরবরাহকৃত অনুচ্ছেদ পড়ে তা সংশোধন করতে বলা।

এছাড়াও শিক্ষক শ্রেণিতে বাংলা ছোটগল্প শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে পাঠের উদ্দেশ্যভিত্তিক কাজ নির্বাচনে নিম্নবর্ণিত দিকগুলো বিবেচনায় রাখবেন।

- ছোটগল্পের কাঠামোগত দিক বিশ্লেষণ
- প্রধান ও পার্শ্ব চরিত্রের বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যাখ্যাকরণ
- গল্পের আদর্শগত দিক বা নীতিকথা বিশ্লেষণ
- সমধর্মী অন্য গল্পের সাথে তুলনাকরণ
- যথানিয়মে বোর্ডে তথ্যলিখন
- বিষয় অনুযায়ী উপকরণ নির্বাচন, যথার্থভাবে ব্যবহার ও সংরক্ষণ
- গল্পে বর্ণিত শৈল্পিক ও তাৎপর্যমণ্ডিত বক্তব্য/বাক্য বিশ্লেষণ
- বাংলা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যের সঙ্গে শ্রেণিতে নির্বাচিত গল্পটির পঠন-পাঠনের উদ্দেশ্যগত সাযুজ্য অনুধাবন
- শিক্ষার্থী মূল্যায়নে পঠিত গল্পের বিষয়বস্তু, ঘটনা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার গুরুত্ব প্রদান
- চরিত্র ও ঘটনার আলোকে শিক্ষার্থীদের নিজস্ব মতামতের সংশ্লেষণ
- গল্পের শিল্পরস আস্বাদনে সহায়তা প্রদান।

তবে, পাঠদানের কলাকৌশল অবশ্যই নির্বাচিত শিখনফল অনুগামী হতে হবে। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে বিষয়বস্তু পড়ে শিখনফল নির্বাচন করতে হবে। আর গল্পটির পঠন পাঠনের শিক্ষাক্রম নির্দেশিত মূল উদ্দেশ্য যাতে ব্যাহত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে সর্বাগ্রে ।

উপন্যাস

সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

বাংলা গদ্য সাহিত্যের একটি অন্যতম সংরূপ (Genere) হচ্ছে উপন্যাস । এটি একটি বর্ণনাত্মক শিল্পকর্ম। এই বর্ণনায় কখনো কখনো নাটকীয়তা ও গীতিপ্রবণতার লক্ষণ থাকতে পারে। উপন্যাসকে অনেকে 'পকেট থিয়েটার' হিসেবেও অভিহিত করেন। জীবনের রঙ্গমঞ্চে ঘটে যাওয়া প্রাত্যহিক ঘটনাবলি ঔপন্যাসিক বিস্তৃত বর্ণনার মাধ্যমে উপন্যাসে তুলে ধরেন। উপন্যাস ঔপন্যাসিকের জীবনবীক্ষাও (Criticism of life) বটে। এ জন্য সাহিত্যতাত্ত্বিক শ্রীশচন্দ্র দাশ উপন্যাসের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন– 'গ্রন্থকারের জীবনদর্শন ও জীবনানুভূতি কোন বাস্তব কাহিনী অবলম্বন করে যে বর্ণনাত্মক শিল্পকর্মে রূপায়িত হয়, তাকে উপন্যাস বলে'।

উপন্যাসের লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো কাহিনী, কাহিনীবিন্যাস (plot), চরিত্র, চরিত্রায়ণ, পদ্ধতি, দৃষ্টিকোণ, পরিচর্যারীতি (treatment) ও ভাষা। উপন্যাস যেহেতু জীবনবীক্ষা বা জীবনদর্শন সেহেতু উপন্যাসে জীবনের খণ্ডাংশ নয়, পূর্ণাঙ্গরূপ রূপায়িত হয়। উপন্যাস জীবন, সমাজ ও সময়কে অবলম্বন করে গড়ে ওঠে। উপন্যাসে সাধারণত ন্যূনতম একটি কাহিনী থাকে, কাহিনীটি একটি কার্যকারণ সূত্রে আবদ্ধ হয়ে বর্ণিত হয়। উপন্যাসে ঘটনা ও চরিত্র পরস্পর নির্ভরশীল থাকে। ঘটনা যেমন চরিত্রকে তেমনি চরিত্র ঘটনাকে প্রভাবিত করে। উপন্যাসে কোনো ঘটনার বর্ণনার ক্ষেত্রে দৃষ্টিকোণ একটি জরুরি বিষয়। ঘটনাটিকে কার, কোন দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণনা করা হয়েছে তা বিবেচ্য বিষয়। আবার লেখকের পরিচর্যা গুণেই উপন্যাসে বর্ণিত ঘটনা মোহনীয় ও তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। ভাষার সাবলীল ভঙ্গি ও প্রাঞ্জলতা উপন্যাসের সৌন্দর্য অনেকখানিই বাড়িয়ে দেয়। সর্বোপরি, এই বর্ণনাত্মক কথাশিল্পে কখনও নাটকীয়তা কখনও গীতিপ্রবণতা লক্ষ করা যায়; আখ্যানভাগ কার্য-কারণসূত্রে আবদ্ধ থাকে; ঘটনা ও চরিত্রসৃষ্টি পরস্পর পরস্পরের সম্পূরক হয়; বিশেষ বাণীভঙ্গিতে সমাজচেতনা ও যুগচেতনার আলোয় জীবনের সমগ্র রূপ প্রস্ফুটিত হয়।

বাংলা উপন্যাস

১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে কোলকাতায় ফোর্ড উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার সাথে বাংলা গদ্যের বিকাশ ধারার একটি বিশেষ যোগসূত্র আছে। বস্তুত উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যে যে বহুবিধ আঙ্গিকের আত্মপ্রকাশ ঘটে– তার সাথে জড়িয়ে আছে এই ফোর্ড উইলিয়াম কলেজের বিশেষ অবদান। বাংলা সাহিত্যের বিকাশমান এই আঙ্গিকগুলোর মধ্যে জনপ্রিয়তার শীর্ষে অবস্থান করে উপন্যাস।

ইংরেজি সাহিত্যে উপন্যাসের আবির্ভাব অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে। কিন্তু তখনও বাংলাদেশে ইংরেজি সাহিত্যের চর্চা শুরু হয়নি বলে বাঙালি ইংরেজি উপন্যাসের ধারণা লাভ করতে পারেনি। এজন্য তাকে অপেক্ষা করতে হয় উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে একদিকে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের গদ্যচর্চার প্রসার অন্যদিকে ইংরেজি উপন্যাস সাহিত্যের সাথে পরিচিতি লাভ– এ দুয়ে মিলে বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস রচনার পথ সুগম হয়।

বাংলা উপন্যাসের জনক হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম সুবিদিত থাকলেও প্যারিচাঁদ মিত্র (১৮১৪–৮৩) 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮) লিখে বাংলা উপন্যাসের বীজ বপন করেছিলেন। তবে কৃৎকৌশলের অনুপস্থিতির কারণে উপন্যাস হিসেবে তা সার্থক প্রতীয়মান হয়নি। ফলে বঙ্কিমচন্দ্রকেই (১৮৩৪–১৮৯৪) প্রথম বাংলা উপন্যাসের স্রষ্টা বলা হয়। তার দুর্গেশনন্দিনী (১৮৫৬), কপালকুণ্ডলা (১৮৬৭), বিষবৃক্ষ (১৮৭৩), কৃষ্ণকান্তের উইল(১৮৭৮), আনন্দমঠ (১৮৭২) প্রভৃতি উপন্যাসে তিনি মানবজীবনের বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিত উপস্থাপন করেছেন।

বাংলা উপন্যাসের ধারায় বঙ্কিমচন্দ্র যে আদর্শমান প্রতিষ্ঠা করলেন তা আরও উন্নত, প্রশস্ত ও দেদীপ্যমান হয়ে ওঠল রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১–১৯৪১) হাতে। তার নৌকাডুবি, চোখের বালি, গোরা, ঘরে বাইরে, শেষের কবিতা প্রভৃতি উপন্যাসের মধ্য দিয়ে তিনি বাংলা উপন্যাস সাহিত্যকে সত্যিকার অর্থে মর্যাদার আসনে অভিষিক্ত করলেন। শরৎচন্দ্রও (১৮৭৬–১৯৩৮) 'আত্মঘাতী সমাজ জীবনের বেদনা-বাষ্প এবং বাংলার উপেক্ষিত ও অনাদৃত মনুষ্যত্বকে মহিমান্বিত করলেন তাঁর শ্রীকান্ত, চরিত্রহীন, গৃহদাহ প্রভৃতি উপন্যাসে।'

পরবর্তীতে এক অভিনব আত্মকেন্দ্রিক ভাবদৃষ্টি ও মনোসমীক্ষণশক্তির পরিচয় তুলে ধরলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পথের পাঁচালী, অপরাজিত, আরণ্যক প্রভৃতি উপন্যাসে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুতুল নাচের ইতিকথা ও পদ্মানদীর মাঝিসহ অন্যান্য উপন্যাসে ফ্রয়ডীয় ও মার্ক্সীয় তত্ত্বের জীবনঘনিষ্ট উপস্থাপনও সে সময়ে বেশ সাড়া জাগায়।

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে এসে পূর্ববঙ্গে ঢাকা শহরকেন্দ্রিক যে নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণির আবির্ভাব ঘটে তাদের জীবনচেতনাকে আশ্রয় করে এই ভূখণ্ডে বাংলাদেশের উপন্যাস সাহিত্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়। 'ঢাকা শহরকেন্দ্রিক নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণি মর্মমূলে সামন্ত মূল্যবোধ ধারণ করেও বুর্জোয়া সমাজ-সংগঠনের চিন্তা-চেতনা, উদার মানবতাবাদ, যুক্তিবাদ' প্রভৃতির মিশেলে জীবনবিশ্বাসের বিশ্বস্ত এক শিল্পরূপ হয়ে ওঠে বাংলাদেশের উপন্যাস সাহিত্য। নজিবর রহমানের আনোয়ারা (১৯১৪), কাজী ইমদাদুল হকের আবদুল্লাহ (১৯৩৩), হুমায়ুন কবিরের নদী ও নারী (১৯১৯), আবুল ফজলের চৌচির (১৯২৭), সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর লালসালু (১৯৪৮), চাঁদের অমাবস্যা (১৯৬৪), কাঁদো নদী কাঁদো (১৯৬৮), আবু ইসহাকের সূর্যদীঘল বাড়ি (১৯৫৫), শামসুদ্দীন আবুল কালামের কাঁশ বনের কন্যা, আলাউদ্দিন আল আজাদের জেগে আছি (১৯৫০), শওকত ওসমানের জননী (১৯৬১), জহির রায়হানের হাজার বছর ধরে (১৯৬৪) প্রভৃতি উপন্যাসের মধ্য দিয়ে পূর্ববাংলার গ্রামীণজীবন ও জীবনসংশ্লিষ্ট অনুভব, মানুষের অস্তিত্বের সংকট, কুসংস্কার, মধ্যবিত্তের জীবনসংগ্রাম, জীবনযন্ত্রণা, জীবনজটিলতার চিত্ররূপ উপস্থাপন করার পরিপ্রেক্ষিতে এ পর্যায়ের উপন্যাসিকগণ শোষণহীন সাম্প্রদায়িকতামুক্ত সমাজ বির্নিমাণের স্বপ্ন দেখেছেন, দেখিয়েছেন।

দেশ স্বাধীন হবার পর সাহিত্যের অন্যান্য ধারার সঙ্গে বাংলাদেশের উপন্যাসেও ঘটেছে গুণগত পরিবর্তন। নৈরাজ্য, হতাশা, দ্রোহ, প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, নারীত্বের অবমাননা প্রভৃতির পাশাপাশি যুদ্ধজয়ের আনন্দ শতধারে উৎসারিত হয়েছে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের উপন্যাসে। মুক্তিযুদ্ধের মতো বড় এবং স্পর্শকাতর একটি অভিজ্ঞান বাংলা উপন্যাসকে একটি উর্বর ভূমি উপহার দিয়েছে। বাংলাদেশের উপন্যাস সাহিত্য তাই এখানে এসে একটি শক্তিশালী মোড় নিয়েছে। এ সময়ে রচিত আনোয়ার পাশার রাইফেল রোটি আওরাত (১৯৭৩), শওকত ওসমানের নেকড়ে অরণ্য (১৯৭৩), সৈয়দ শামসুল হকের পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় (১৯৭৬), নিষিদ্ধ লোবান (১৯৮১), সেলিনা হোসেনের হাঙর নদী গ্রেনেড (১৯৭৬), রশীদ হায়দারের খাঁচায় (১৯৭৫), রাবেয়া খাতুনের ফেরারী সূর্য (১৯৭৪) প্রভৃতি বিভিন্ন উপন্যাসে গ্রামবাংলার সংগ্রামমুখর মানুষের যাপিত জীবনের প্রতিচ্ছবির পাশাপাশি সামন্ত শাসক শ্রেণির শোষণের বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা পাওয়া যায়।

উপন্যাসের শ্রেণিবিভাগ

বিষয়বৈচিত্র্য অনুসারে উপন্যাসকে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। যেমন-

১. ঐতিহাসিক উপন্যাস : রাজসিংহ (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়) বৌ-ঠাকুরাণীর হাট (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)
২. সামাজিক উপন্যাস : চোখের বালি (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর), গৃহদাহ (শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)
৩. মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস : চতুষ্কোণ (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়)
৪. কাব্যোপন্যাস : শেষের কবিতা (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)
৫. রহস্যোপন্যাস : গোয়েন্দা গল্প (অম্বিকাচরণ গুপ্ত)
৬. আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস : ঘরে বাইরে (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর), শ্রীকান্ত (শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

এছাড়াও হাস্যরসাত্মক উপন্যাস, বৈপ্লবিক উপন্যাস (আনন্দমঠ- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়), পত্রোপন্যাস (ক্রৌঞ্চমিথুন- শৈলজানন্দ) উদ্দেশ্যমূলক উপন্যাস (পথের দাবী- শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়), বীরত্বব্যঞ্জক উপন্যাস (অজয়কুমার- মনীন্দ্রলাল বসু) কাহিনী উপন্যাস (শ্যামল ও কজ্জল- দীনেশ সেন), আঞ্চলিক উপন্যাস (ধাত্রীদেবতা- তারাশংকর) প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার উপন্যাস বাংলা কথা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে।

উপন্যাস পাঠদান

শিক্ষার্থীর ভাষাজ্ঞান বৃদ্ধি করা, পঠন-শক্তির উন্মেষ ঘটানো, পাঠের অভ্যাস গড়ে তোলা, ভাষার ব্যবহারে, শব্দ-সংস্থাপনে, যুক্তি বিন্যাসে দক্ষ করে তোলার পাশাপাশি সাহিত্যের রসাস্বাদনে সক্ষম করে গড়ে তোলাই শ্রেণিতে উপন্যাস পাঠদানের মূল উদ্দেশ্য। উপন্যাস পাঠের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী হয়ে ওঠে। তাদের শব্দচেতনা বিস্তৃত হয়।

নন্দনচেতনার পাশাপাশি তাদের সামাজিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, মানসিক ও চিন্তন ক্ষমতার বিকাশ সাধিত হয় ও ধীশক্তির উন্মেষ ঘটে। একজন ভাষা শিক্ষককে শ্রেণিতে উপন্যাস পাঠদানের এই উপযোগিতাসমূহ বিবেচনায় রেখেই উপন্যাস পাঠদানের পদ্ধতি ও কলাকৌশল নির্বাচন করতে হয়।

পূর্বপরিকল্পনা গ্রহণ উপন্যাস পাঠদানের ক্ষেত্রে শিক্ষককে যথেষ্ট সহায়তা করে। একটি পুরো উপন্যাস একদিনের একটি ক্লাসে পাঠদান করা সম্ভব নয়। তাই কাহিনীর বিস্তার অনুযায়ী উপন্যাসকে খণ্ডে বিভক্ত করে পাঠদান করা আবশ্যক। প্রশিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রথমে পুরো উপন্যাসের কাহিনী সরল ভাষায় বর্ণনা করে তার গুরুত্বপূর্ণ অংশসমূহ চিহ্নিত করবেন। উপন্যাসের বিভিন্ন উপাদান, কাহিনী-কাঠামো, কাহিনীবিন্যাস, চরিত্র ও চরিত্রায়ণ, দৃষ্টিকোণ ও পরিচর্যা এবং ভাষাপ্রসঙ্গ আলাদাভাবে আলোচনা করবেন। সবশেষে উপন্যাসের মূলবাণী বা জীবনবীক্ষাকে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করবেন। শ্রেণিতে বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ব্যাপী উপন্যাস পাঠদানের ক্ষেত্রে শিক্ষক নিচের ধারাবাহিক কাজগুলো করার ব্যবস্থা করতে পারেন।

সামগ্রিক পাঠ : উপন্যাসের আকৃতি যা-ই হোক না কেন, পুরো একটি উপন্যাস একদিনের একটি ক্লাসে পড়ানো সম্ভব নয়। এজন্য শিক্ষক পাঠদান কাজটি যেদিন থেকে শুরু করবেন তার আগে শিক্ষার্থীদের পুরো উপন্যাসটি বাড়িতে একা একা মনোযোগ দিয়ে পাঠ করে আসতে বলবেন। নির্বাচিত সময়ের মধ্যে শিক্ষার্থীরা নিজে নিজে বাড়িতে উপন্যাসটি পড়ে শেষ করবে। পড়ার সময় কোনো অসুবিধা বা দুর্বোধ্যতা লক্ষ করলে তার নোট রাখবে।

কাহিনী বর্ণনা : শিক্ষার্থীরা বাড়ি থেকে সামগ্রিকভাবে উপন্যাসটি পড়ে আসলে শ্রেণি পাঠের প্রথম দিন শিক্ষক নিজের ভাষায় সংক্ষেপে মাধুর্যমণ্ডিত করে পুরো উপন্যাসের কাহিনী বর্ণনা করবেন। শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের রসসিক্ত বর্ণনার সাথে নিজেদের পাঠলব্ধ ধারণা মিলিয়ে নিবে। এতে তাদের মনে আনন্দ সঞ্চারিত হবে এবং অধিক পাঠের আগ্রহ জাগবে।

শীর্ষ ভাগকরণ : কাহিনী বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষক পুরো উপন্যাসের কাহিনী বিন্যাসকে কয়েকটি শীর্ষে ভাগ করে শীর্ষগুলোর নাম চিহ্নিত করবেন ও বোর্ডে লিখে দিবেন। পরবর্তী দিনগুলোতে তিনি যে ধারাবাহিকভাবে শীর্ষ অনুযায়ী পাঠে অগ্রসর হবেন, তা-ও উল্লেখ করবেন। এক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে প্রতিটি শীর্ষ আলোচনায় যেন একটি সুনির্দিষ্ট ভাব, বিষয় ও ঘটনার সমাপ্তি থাকে। এই প্রক্রিয়াকে খণ্ডিত পাঠও বলা যায়।

আনন্দ পাঠ : সামগ্রিক পাঠের সময় শিক্ষার্থীরা কয়েকদিনে বাড়িতে পুরো উপন্যাস পড়ে প্রাথমিক ধারণা নেয় বলে শীর্ষ ভাগ করে দেওয়ার পর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত দিনের জন্য নির্ধারিত শীর্ষসংশ্লিষ্ট অংশ শ্রেণিতে পর্যায়ক্রমিকভাবে কয়েকজনকে দিয়ে পাঠ করালে পূর্বধারণা এই পাঠকে তাদের কাছে আনন্দদায়ক করে তোলে। এ পর্যায়ে পাঠচক্র চলাকালে শিক্ষার্থীরা তাদের ভালোলাগা ঘটনা, চরিত্র এবং বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ চিহ্নিত করে রাখবে। পাঠচক্র শেষে শিক্ষক তা শুনবেন ও মতামত দিবেন।

আলোচনামূলক পাঠ : শীর্ষ অনুযায়ী শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে বিষয়বস্তু আলোচনার আয়োজন করবেন। আলোচনায় কোনো শিক্ষার্থীর কোনো ঘটনা, কোনো চরিত্র এবং কোনো অংশটি ভালো লেগেছে, কেন ভালো লেগেছে তা জানতে চাইবেন। এই আলোচনার সূত্রে উপন্যাসটিতে বিধৃত কাহিনী, জীবনচিত্র এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার সামগ্রিক রূপটি তিনি শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরবেন; শীর্ষভিত্তিক কঠিন অংশসমূহ চিহ্নিত করবেন। শিক্ষার্থীদের দিক থেকে আসা প্রশ্ন ও পরিপ্রশ্নের বিশ্লেষণমূলক দিক বোর্ডে লিখে ব্যাখ্যা করবেন।

ঘটনা ও চরিত্রের সম্পর্ক বিচার : কঠিন ও জটিল অংশসমূহের বিশ্লেষণ শেষে শিক্ষক উপন্যাসের প্রধান ঘটনাসমূহ শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চাইবেন। এই ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট চরিত্রসমূহ কীভাবে সম্পর্কিত তা ব্যাখ্যা করতে বলবেন। চরিত্র কীভাবে ঘটনা দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে, ঘটনা কীভাবে চরিত্রের আচরণ নির্দেশ করছে ও পরিণতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে শিক্ষক তার বর্ণনা আলোচনা ক্রমে উপস্থাপন করবেন।

চরিত্র বিচার : শিক্ষার্থীদের চিন্তার সমন্বয়ে শিক্ষক উপন্যাসের কেন্দ্রীয় ও পার্শ্বচরিত্রগুলো নির্বাচন করবেন। চরিত্রগুলোর বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য শিক্ষার্থীদের নিরুপণ করে খাতায় লিখতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের লেখা বৈশিষ্ট্যসমূহ শ্রেণিতে উপস্থাপন করতে বলবেন। প্রত্যেকের উপস্থাপনের শেষে সংযোজক ফলাবর্তন দিয়ে চরিত্রগুলোকে জীবন্ত করে তুলবেন। প্রত্যেক চরিত্রের

বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক কিছু সংলাপ উপন্যাসে থাকে। চরিত্র বিচারের সময় শিক্ষার্থীদের দিয়ে শিক্ষক এ সংলাপগুলো বলাতে পারেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বাড়িতে উপন্যাসটি নিবিড়ভাবে পাঠ করে গুরুত্বপূর্ণ সংলাপগুলো খুঁজে বের করে উপন্যাসের একটি নাট্যরূপ নির্মাণ করতেও নির্দেশ দিতে পারেন। এবং এই নাট্যরূপ শিক্ষার্থীদের দিয়ে শ্রেণিতে অভিনয় করাতে পারেন। এতে চরিত্রগুলো শিক্ষার্থীদের মনে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হবে।

সারসংক্ষেপ তৈরি : শিক্ষক পুরো উপন্যাসটিকে ইতঃপূর্বে কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত করে প্রতিটি খণ্ডের একটি শীর্ষনাম দিয়েছিলেন। এবার তিনি শিক্ষার্থীদের দিয়ে প্রতিটি শীর্ষের সারসংক্ষেপ তৈরি করাতে পারেন এবং শ্রেণিতে পর্যায়ক্রমিকভাবে উপস্থাপন করাতে পারেন। এতে পুরো উপন্যাসের সারসংক্ষেপ শিক্ষার্থীদের ধারণায় সংস্থিত হবে।

৩.১২ : বাংলা কবিতা : বৈশিষ্ট্য ও শিখন-শেখানো পদ্ধতি

মানুষের কথা বলাটা গদ্যে শুরু হলেও লেখাটা শুরু হয় কবিতায়। সে অর্থে সাহিত্যের আদিম সৃষ্টি কবিতা। মানুষের মননশীল হৃদয় যখন রূপের মাঝে অপরূপকে আবিষ্কার করল, তখন সে তার কথাকে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে তাতে ধ্বনিঝংকার আরোপ করে মূর্ত করে তুলল নতুন ব্যঞ্জনা; সৃষ্টি হলো কবিতা। কবিতার অন্তর্গত বিষয় হচ্ছে অনুভুতি; কিন্তু এর বহিরঙ্গের আচ্ছাদন হচ্ছে ধ্বনির সুষম বিন্যাস। তাই শব্দ ও অর্থগত অলংকারে সুসজ্জিত, রসঘন, রূপময় প্রকাশই কবিতার মৌলবৈশিষ্ট্য। শ্রেণিকক্ষে কবিতা পাঠদানের ক্ষেত্রে একজন শিক্ষককেও কবিতার এইভাব, অনুভব ও অলংকারের বিষয়টি খেয়াল রেখে শিখন-শেখানোর কাজ সম্পাদন করতে হয়।

কবিতার সংজ্ঞা

অভিজ্ঞতার রূপময় অভিব্যক্তিই হচ্ছে কবিতা। অর্থাৎ– পরিশীলিত শব্দ, নিপুণ বাণীভঙ্গি আর বহুমাত্রিক অলঙ্কারে সুসজ্জিত সাহিত্যসৃষ্টিই হচ্ছে কবিতা। Coleridge এর ভাষায় কবিতা হচ্ছে - Best words in the best order. অর্থাৎ অপরিহার্য শব্দের অবশ্যম্ভাবী বাণী-বিন্যাসকে কবিতা বলে। কোলরিজের এই সংজ্ঞায় দুটো দিক বিদ্যমান। একটি অপরিহার্য শব্দ আর অন্যটি অবশ্যম্ভাবী বাণী-বিন্যাস। কবিতার ক্ষেত্রে ধ্বনি ও রূপের যথাযথ অনুষঙ্গ স্থাপনের জন্য কবিকে বেছে বেছে শব্দচয়ন করতে হয় এবং চয়িত শব্দসমূহকে দিতে হয় একটি সুশৃঙ্খল বিন্যাস। আবার Wordsworth বলেছেন, poetry is the Spontaneous overflow of powerful feelings. অর্থাৎ Wordsworth কবিতার ক্ষেত্রে মানুষের চিরন্তন আবেগকে প্রাধান্য দিয়েছেন। মানুষের সহজাত আবেগের স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাসকেই তিনি কবিতা বলার পক্ষে। সুতরাং সামষ্টিকভাবে বলা যায়, 'মানব মনের ভাবনা-কল্পনা যখন অনুভূতি-রঞ্জিত, যথাযথ শব্দসম্ভারে সুষমামণ্ডিত, চিত্রাত্মক ও ছন্দময় রূপ লাভ করে তখনই সৃষ্টি হয় কবিতার।'

কবিতার উপাদান ও বৈশিষ্ট্য-১

শব্দ ও অর্থগত অলংকার

ভাষা বিশ্লেষণে দেখা যায় এর দুটি গুণ বর্তমান। বাহ্যিক দৃষ্টিতে ভাষা হচ্ছে ধ্বনিপ্রধান আর অন্তর্গত বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে ভাষা হচ্ছে অর্থপ্রধান। ভাষার এ দুটি রূপ মূলত শব্দনির্ভর। অর্থাৎ শব্দের ধ্বনিঝংকার পাঠকের কর্ণ-ইন্দ্রিয়ে বিশেষ আবেদন সৃষ্টি করে; আর শব্দের অর্থবোধকতা আপ্লুত করে পাঠকের মন। এ দুয়ের মণিকাঞ্চন যোগেই সৃষ্টি হয় সরস কবিতা। তাই কবিতার প্রথম ও প্রধান উপাদান হচ্ছে শব্দগত অলংকার ও অর্থগত অলংকার।

শব্দালংকার : কবিতায় ব্যবহৃত শব্দের ধ্বনিঝংকার যখন সৌন্দর্য বা অলংকারের সৃষ্টি করে তখন তাকে শব্দালংকার বলে। অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার শব্দালংকার বাংলা কবিতায় ব্যবহৃত হয়ে সাহিত্যের এই শাখাটিকে সমৃদ্ধ করেছে। উদাহরণ-

অনুপ্রাস : চল চপলার চকিত চমকে
করিছে চরণ বিচরণ
কোথা চম্পক আভরণ (এখানে একই ধ্বনি 'চ' বার বার প্রযুক্ত হয়ে ধ্বনিমাধুর্য সৃষ্টি করেছে।)

যমক : কোথা হা অন্ত, চির বসন্ত, আমি বসন্তে, মরি

(ধ্বনিমাধুর্য সৃষ্টিতে একই শব্দ দুবার ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে- প্রথম 'বসন্ত' ঋতুকে আর দ্বিতীয় 'বসন্ত' রোগকে বুঝিয়েছে)

শ্লেষ : অতি বড়বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ,

(শ্লেষ একই শব্দের একাধিক সম্ভাব্য অর্থ প্রকাশ করে- বৃদ্ধ বলতে বুড়ো বা জ্ঞানীকে, সিদ্ধি বলতে মাদকদ্রব্য বা মুক্তিকে বুঝানো হতে পারে)

অর্থালংকার :

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কবিতায় কাব্যসৌন্দর্য সৃষ্টি হয়ে থাকে পঙ্‌ক্তিতে ব্যবহৃত শব্দ বা শব্দসমূহের অর্থের বিবেচনায়। কবিতায় ব্যবহৃতএ ধরনের অলংকারকে অর্থালংকার বলে। অর্থালংকার বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। তবে কবিতায় নিম্নবর্ণিত অর্থালংকারসমূহের ব্যবহার বেশি হতে দেখা যায়-

উপমা : সমান অর্থবা গুণ বিশিষ্ট দু'টি ভিন্নজাতীয় বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য দেখানো হলে তাকে উপমা অলংকার বলে। যেমন-

'পাখির নীড়ের মত চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।'

রূপক : দু'টো বিজাতীয় বস্তুর মধ্যে অভিন্নতা আরোপিত হলে তাকে রূপক অলংকার বলে। রূপকে উপমান-উপমেয় অভেদ কল্পনা করা হয়। যেমন-

আমার পূর্ব বাংলা,
একগুচ্ছ অন্ধকারের স্নিগ্ধ তমাল

উৎপ্রেক্ষা : প্রবল সাদৃশ্যের কারণে যদি দুটো বস্তুর মধ্যে তুলনাগত সংশয় দেখা দেয় তবে এ জাতীয় অর্থালংকারকে উৎপ্রেক্ষা বলে।

সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা
আঁধারে মলিন হল, যেন খাপে ঢাকা
বাঁকা তলোয়ার-

বিরোধমূলক অলংকার : পরস্পর বিরোধী দুটো বিষয় ব্যঞ্জনাময় অর্থ প্রকাশের কারণে বিরোধহীন মনে হলে এ জাতীয় অলংকারকে বিরোধমূলক অলংকার বলে। যেমন-

এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ।
মরণে তাহাই- তুমি করে গেলে দান। (বিরোধাভাস)

শৃঙ্খলামূলক অলংকার : এতে প্রতিটি পরবর্তী পদ প্রতিটি পূর্ববর্তী শব্দের বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন-

গাছে গাছে ফুল, ফুলে ফুলে অলি সুন্দর ধরাতল (একাবলি)

প্রতীক : উপমান যেখানে উপমেয়রূপে কল্পিত হয়ে প্রাধান্য বিস্তার করে তাকে প্রতীক অলংকার বলে। যেমন-

মায়ের মুখের হাসির মতো কমল-কলি উঠল ফুটে

প্রতীতি : নিন্দাচ্ছলে স্তুতি বা স্তুতিচ্ছলে নিন্দা যখন বাক্যে প্রকাশিত হয়ে কাব্যসৌন্দর্য সৃষ্টি করে তখন তাকে ব্যাজস্তুতিমূলক প্রতীতি অলংকার বলে। যেমন-

কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে,
প্রচেতঃ। (এখানে প্রশংসা স্থলে নিন্দা করা হয়েছে।)

কবিতার উপাদান ও বৈশিষ্ট্য- ২: ছন্দ প্রকরণ

ধ্বনির সাথে সময়ের সামঞ্জস্য বিধান করার অন্য নাম হচ্ছে ছন্দ। ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের কথায়- বাক্যস্থিত পদগুলোকে যেভাবে সাজালে বাক্যটি শ্রুতিমধুর হয় ও তার মাঝে একটা কালগত ও ধ্বনিগত সুষমা উপলব্ধ হয়, সেই পদসজ্জারীতিকেই ছন্দ বলে। অর্থাৎ কথাকে তার জড়ধর্ম থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্যই ছন্দের সৃষ্টি। ছন্দে কতকগুলো উপাদান রয়েছে। ছন্দবোধের জন্য এ উপাদানগুলোর সম্যক পরিচিতি লাভ করা একান্ত আবশ্যক। যেমন-

অক্ষর : বাগযন্ত্রের স্বল্পতম প্রয়াসে শব্দের যে অংশ এক ঝোঁকে উচ্চারণ করা যায় তাকে অক্ষর বলে। উচ্চারণ প্রক্রিয়ায় যে সব অক্ষরের শেষে স্বরধ্বনির উপস্থিতি লক্ষ করা যায় সেগুলো স্বরান্ত অক্ষর বা মুক্তাক্ষর আর যেসব অক্ষরের শেষে ব্যঞ্জন ধ্বনি থাকে সেগুলোকে বলে ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর। যেমন- 'আমরা' শব্দে আম ব্যঞ্জনান্ত বা বদ্ধাক্ষর এবং রা স্বরান্ত অক্ষর বা মুক্তাক্ষর ।

মাত্রা : একটি অক্ষর উচ্চারণে যে সময়ের প্রয়োজন হয় তাকে মাত্রা বলে। যেমন- আমরা শব্দে আম এক মাত্রা এবং রা এক মাত্রা ধরা হয়। তবে ছন্দভেদে মাত্রা গণনার ভিন্নতা রয়েছে।

ছেদ বা অর্থযতি : অর্থ পরিস্ফুটনের জন্য ধ্বনি প্রবাহে যে উচ্চারণবিরতি আবশ্যক হয় তাকে ছেদ বা অর্থযতি বলে। যেমন-

যেতে নাহি দিব, হায় তবু চলে যায়।

যতি বা ছন্দযতি : অর্থ প্রকাশ নয় বরং কবিতার ধ্বনিগত সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলার জন্য এক ঝোঁকে কিছু অংশ উচ্চারণ করার পর জিহ্বার যে বিরতি আবশ্যক হয় তাকে যতি বা ছন্দযতি বলে। যেমন-

রাত পোহালো/ফর্সা হল/ ফুটল কত/ ফুল।

পর্ব : এক যতি থেকে আরেক যতি পর্যন্ত পংক্তির যে অংশ তাকে পর্ব বলে।

রাত পোহালো/ ফর্সা হল/ ফুটল কত/ ফুল (এখানে ১টি পংক্তিতে ৩টি পূর্ণ পর্ব ও ১টি অপূর্ণ পর্ব)

পংক্তি : কবিতার এক সারিতে সাজানো শব্দ সমষ্টিকে পংক্তি বলে।

একলা ছিলেম কুয়োর ধারে নিমের ছায়া তলে।

চরণ : কবিতার একটি সম্পূর্ণ বাক্যই চরণ। অর্থাৎ চরণ হচ্ছে পূর্ণযতি (দাঁড়ি) দ্বারা নির্দিষ্ট ধ্বনিপ্রবাহ। ছন্দের পূর্ণরূপের প্রকাশ চরণে ফুটে ওঠে।

লয় : কবিতা পাঠের গতিভঙ্গিকেই লয় বলে। লয় কখনও দ্রুত, কখনও মধ্যম, আবার কখনও ধীর প্রকৃতির হয়ে থাকে।

শ্বাসাঘাত : কখনও কখনও কবিতার প্রতি পর্বের প্রথম অক্ষর বিশেষ ঝোঁক বা জোড় দিয়ে উচ্চারণ করতে হয়। ফলে এক ধরনের ধ্বনিপ্রবাহের সৃষ্টি হয়। একে শ্বাসাঘাত বলে। যেমন-

আজকে তোমায়/ দেখতে এলাম/ জগৎ আলো/ নুরজাহান (প্রতিটি পর্বের প্রথম ধ্বনিতে শ্বাসাঘাত পড়ছে)

ছন্দের প্রকার

রীতি ও বৈচিত্র্য অনুযায়ী আধুনিক বাংলা ছন্দকে নিম্নোক্ত তিন শ্রেণিতে সাজানো যায়।

স্বরবৃত্ত বা শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দ–

পুষ্করিনীর/ চাইর পাড়ে/ ফুটছে চাম্পা/ ফুল।
ছাইড়া দ্যাওরে/ চ্যাংড়া বন্ধু ঝাইড়া বানবাম/ চুল।

মাত্রাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান ছন্দ–

এই খানে তোর/ দাদির কবর/ ডালিম গাছের/ তলে
তিরিশ বছর/ ভিজায়ে রেখেছি/ দুই নয়নের/ জলে।

অক্ষরবৃত্ত বা তানপ্রধান ছন্দ–

মরিতে চাহিনা আমি/ সুন্দর ভূবনে
মানবের মাঝে আমি/ বাঁচিবারে চাই।

বিভিন্ন প্রকার ছন্দের বৈশিষ্ট্য

উপরে উল্লিখিত তিন প্রকার ছন্দে নিম্নরূপ বৈশিষ্ট্যসমূহ লক্ষ্য করা যায়। এ বৈশিষ্ট্যসমূহের আলোকে কবিতার ছন্দবিশ্লেষণ করা সম্ভব।

বিষয়/ দিক	স্বরবৃত্ত ছন্দ	মাত্রাবৃত্ত ছন্দ	অক্ষরবৃত্ত ছন্দ
গতি/লয়	দ্রুত গতি/দ্রুত লয়ের ছন্দ	মধ্যম/বিলম্বিত গতির/লয়ের ছন্দ	ধীর গতি/লয়ের ছন্দ
ভাব/রস	লঘু চপল ভাব/হাল্কারস	শান্ত/করুণ রস	গুরুগম্ভীর ভাব/রস
উচ্চারণভঙ্গি	সবল/জোরালো	অপেক্ষাকৃত দুর্বল/ক্ষীণ	দুর্বল/ক্ষীণ
ভাষা/ক্রিয়াপদ	প্রাকৃত ভাষা/কথ্য ক্রিয়া	চলিত ভাষা/ক্রিয়া	সাধু ভাষা
অক্ষরের মাত্রা সংখ্যা	মুক্তাক্ষর ও বদ্ধাক্ষর উভয়ই ১ মাত্রা	মুক্তাক্ষর ১ ও বদ্ধাক্ষর ২ মাত্রা	মুক্তাক্ষর- ১ মাত্রা বদ্ধাক্ষর-শুরুতে ১, মধ্যে ১ ও শেষে ২ মাত্রা
পর্ব ও পর্বে মাত্রা	ছোট পর্ব (মাত্রা ৪/৩/২)	মধ্যম পর্ব (৫/৬/৭ মাত্রা)	দীর্ঘ পর্ব (৮+৬ মাত্রা)
অন্য নাম	স্বরপ্রধান ছন্দ ছড়ার/প্রাকৃত/ঘরোয়া/বনেদী ছন্দ	ধ্বনিপ্রধান ছন্দ কলাবৃত্ত ছন্দ	তানপ্রধান ছন্দ বিস্তারপ্রধান ছন্দ
বৈচিত্র্য	একেবারেই নাই	নাই/কম	বৈচিত্র্যমণ্ডিত
শ্বাসাঘাত	শ্বাসাঘাত পড়ে	পড়ে না	পড়ে না
শোষণশক্তি	নাই (কেবল লঘুভাব প্রকাশের উপযোগী)	কম (তবে লঘু ছাড়াও অন্য ভাব প্রকাশ করতে পারে)	বেশি (সকল প্রকার ভাব প্রকাশের উপযোগী)

কবিতার ছন্দ বিশ্লেষণ : (ব্যবহারিক কাজ/বাড়ির কাজ/অর্পিত কাজ)

পল্লিজননী, আবার আসিব ফিরে, রূপাই– এই তিনটি কবিতার যে কোনো চরণ/স্তবকের ছন্দ বিশ্লেষণ করুন। (এক্ষেত্রে উদ্ধৃত চরণ/স্তবকটির নিম্নবর্ণিত দিকসমূহ খেয়াল করতে হবে।)

- কোন গতি/লয়ে আবৃত্তি করলে চরণটির ভাব ও অর্থবোধ স্পষ্ট হয়?
- কবিতাংশটি কোন ধরনের ভাব/রস সঞ্জাত?
- কবিতাংশটির উচ্চারণভঙ্গি কেমন হলে ভাবের সাথে বক্তব্যের সাজুয্য ফুটে ওঠে?
- পূর্ণ পর্বগুলোর আকৃতি কেমন এবং পূর্ণ পর্বে মাত্রা সংখ্যা কীভাবে বিন্যস্ত?
- পর্বের শুরুতে শ্বাসাঘাত পড়ে কি-না।
- কবিতাংশটি কোন ছন্দে রচিত (স্বরবৃত্ত না মাত্রাবৃত্ত না-কি অক্ষরবৃত্ত)?

কবিতার অন্যান্য বৈশিষ্ট্য

'শৈলীমুখরতা শিল্পের যেমন আরাধ্য সাধনা তেমনি জীবনবোধের গভীরতাও তার অনিবার্য আকাঙ্ক্ষা'। সাহিত্যের অন্যান্য শাখার তুলনায় বাংলা কবিতাশিল্পের ক্ষেত্রে কথাটির যথার্থতা অনেক বেশি। তাই কবিতার বৈশিষ্ট্য নিরূপণের ক্ষেত্রে এর উপাদানসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রকার ছন্দ ও অলংকার আলোচনার পাশাপাশি কবিতায় প্রতিফলিত জীবনচেতনাকেও সমান গুরুত্ব দিয়ে বিচার করা আবশ্যক। কারণ, জীবনবোধ ও শৈলিমুখরতা- এই দুটি প্রত্যয়ের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন দিকের যথাযথ উপস্থাপনই কবিতার মৌলিক বৈশিষ্ট্য। এই পরিপ্রেক্ষিতে কবিতার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহও বিবেচ্য-

১. কবিতায় জীবনবোধের সুতীব্র প্রকাশ লক্ষ করা যায়।

২. আঙ্গিক ও প্রকরণ নিয়ে কবিদের নিত্য-নতুন ভাবনা কবিতায় দৃশ্যমান থাকে। কবিদের এই প্রচেষ্টাই কবিতাকে ক্রমউৎকৃষ্টতা দান করে।

৩. কবিতায় অবচেতনের চেতন প্রয়োগ প্রাধান্য পায়। অর্থাৎ কবিমনের অবচেতন অংশে প্রাধান্যবিস্তারকারী চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছাগুলো শোভন রূপে কবিতায় প্রকাশ করা হয়।

৪. কখনও কখনও কবিতায় গভীরতাশ্রয়ী ভাব লক্ষ করা যায়। তখন শব্দের সুনির্দিষ্ট অর্থসীমা অতিক্রম করে কবিতা প্রিজমসদৃশ হয়ে ওঠে। পাঠকের কাছে তখন একই কবিতায় ভিন্ন ভিন্ন তাৎপর্য ধরা পরে।

৫. কবিতা অলংকৃত। অষ্টপ্রহরই সে সুসজ্জিত থাকে। বিভিন্ন প্রকার ছন্দ, অলংকার, ধ্বনিব্যঞ্জনা, ভাব, রস কবিতাকে সমৃদ্ধ ও সৌন্দর্যমণ্ডিত করে রাখে।

সর্বোপরি, আধুনিক বাংলা কবিতা বিষয়গৌরবে সমৃদ্ধ। এতে শেকড়সন্ধানী স্বভাব, রাজনীতি ও ঐতিহ্য সচেতনতা, ধর্মান্ধতা ও পুঁজিবাদের বিরোধিতা, অস্তিত্বচেতনা, সংস্কৃতির বিশ্বায়ন, বিজ্ঞানমনস্কতা, নাগরিক মানুষের জীবন জটিলতা, কাঠামোবদ্ধ সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বাসের বিরুদ্ধাচরণ, লাঞ্ছিত মানবতা দেখে দ্রোহী হয়ে ওঠা, রোমান্টিকতা-এন্টিরোমান্টিকতা, নিঃসঙ্গতা-বিষণ্নতাবোধ, চেতনার সৃষ্টিশীল বিবর্তন, সাবলীল ভাষাভঙ্গি, শব্দের নিপুণ খেলায় শিল্পের রীতিসিদ্ধ কাঠামো নির্মাণের প্রয়াস, প্রতীকধর্মিতা, উপমা-চিত্রকল্প ও পরাবাস্তব প্রীতি, আবেগের প্রাবল্য এবং কল্পনার সম্প্রসারণ প্রভৃতি অনুষঙ্গের শৈল্পিক উপস্থাপন লক্ষ করা যায়। সব মিলিয়ে আধুনিক বাংলা কবিতা যেন বাঙালির বহুরঙা জীবনের এক বর্ণিল পোস্টার।

কবিতা পাঠদানের কৌশল

অর্থপূর্ণ শিখনের প্রধান ও পূর্বশত হচ্ছে অংশগ্রহণমূলক পাঠদান পদ্ধতি। অর্থাৎ শ্রেণিতে কবিতা পাঠদানের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কবিতাটির আলোকে যে শিখনফল বা আচরণিক উদ্দেশ্য নির্বাচন করা হয়ে থাকে তা শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে শিখনউপযোগী এমন কাজের আয়োজন শ্রেণিকক্ষে রাখতে হবে যেন- ঐ কাজটি করতে গিয়ে তাদের চিন্তা করতে হয়, বার বার কবিতাটির অংশবিশেষ পড়ে অনুধাবনের চেষ্টা করতে হয় এবং সমস্যা সমাধানের জন্য দলে/জোড়ায় চিন্তা সমন্বয়ের চেষ্টা চালাতে হয়। কবিতা পাঠদানের ক্ষেত্রে শ্রেণিতে শিক্ষককে কতকগুলো সাধারণ ধাপ অনুসরণ করতে হয়। যেমন– কবি পরিচিতি, কবিতা আবৃত্তি, শব্দার্থ, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ।

কবি পরিচিতি : যে কোনো কবিতার প্রথম অংশ পাঠদানের দিন পাঠ ঘোষণা করার পরই কবির পরিচিতি তুলে ধরতে হয়। এক্ষেত্রে শিক্ষক কবি পরিচিতি সম্পর্কে ২/১ মিনিটের মিনি লেকচার দিবেন। এরপর শিক্ষার্থীদের কবি পরিচিতি অংশ পড়ে খাতায় তথ্যছক (জোড়ায় জোড়ায়) তৈরি করতে বলবেন। পরে শিক্ষার্থীদের কাজ উপস্থাপন করাবেন ও ত্রুটি সংশোধন করে দিবেন। কবি পরিচিতি উল্লেখ করার সময় কবিতার পটভূমির কথাও (বিশেষ করে ৯ম-১০ম শ্রেণিতে) উল্লেখ করা যেতে পারে।

আবৃত্তি : কবিতার নির্বাচিত অংশ শিক্ষক শ্রেণিমুখী হয়ে পঠনের আদর্শগত সকল দিক বিবেচনায় রেখে শিক্ষার্থীদের পাঠ করে শোনাবেন। এসময় শিক্ষার্থীরা বই খুলে শিক্ষকের আদর্শ পাঠ অনুসরণ করবে।

শব্দার্থ শেখানো : শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অর্থ-না-জানা শব্দগুলো পর্যায়ক্রমে উল্লেখ করতে বলবেন এবং সাথে সাথে শুধু মূল শব্দগুলো বোর্ডের একপাশে উল্লম্বভাবে লিখবেন। শিক্ষার্থীদের চাহিদা অনুযায়ী নির্বাচিত শব্দগুলো বোর্ডে লেখা হয়ে গেলে ঐ শব্দসমূহের অর্থ- শিক্ষার্থীদের জোড়ায় চিন্তা করে নিজ নিজ খাতায় লিখতে বলবেন। পরে শিক্ষার্থীদের সহায়তায় ফলাবর্তন দিবেন।

পাঠ-বিশ্লেষণ : শিক্ষক এই অংশে খুব সংক্ষেপে (২/৩ মিনিট) পুরো পাঠের মূল দিকগুলো মৌখিকভাবে উপস্থাপন করবেন। এরপর তিনি শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণমূলক শিখন পদ্ধতির সম্পূরক নিম্নরূপ কলাকৌশলভিত্তিক কাজ দিতে পারেন। এক্ষেত্রে তাকে পাঠের প্রকৃতির দিক বিবেচনায় রেখে কাজগুলো (এক বা একাধিক) নির্বাচন করতে হবে।

সমস্যা সমাধান : শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত সমস্যার আলোকে চিন্তা করে দলে বা জোড়ায় সমাধান খুঁজে বের করতে বলবেন ও শ্রেণিতে দল/জোড়ার পক্ষে উপস্থাপন করতে বলবেন।

মাইন্ড ম্যাপিং : শিক্ষার্থীদের পোস্টার পেপারে অথবা নিজ নিজ খাতায় পাঠের একটি মূল শব্দ লিখে এর চারপাশে তার সাথে সংশিষ্ট শব্দগুলো লিখতে বলবেন। কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বাদ পড়লে শিক্ষক সংযোজন করে দিবেন।

বিষয়বস্তুগত বাক্য গঠন : বোর্ডে ধারবাহিকভাবে (নিচে নিচে) পাঠের প্রধান প্রধান শব্দ লিখে সেগুলো দিয়ে শিক্ষার্থীদের পাঠের বিষয়বস্তু/তথ্যনির্ভর বাক্য গঠন করতে দিবেন। শব্দ নির্বাচনে শিক্ষককে এমন কৌশলী হতে হবে যেন সবগুলো শব্দের বিষয়বস্তুনির্ভর বাক্য ধারাবাহিকভাবে একত্র করলে কবিতার পুরো বিষয়বস্তু বিজ্ঞাপিত হয়।

বৈষম্য অনুসন্ধান : শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠসংশ্লিষ্ট দুটি পরস্পরবিরোধী বিষয়ের তুলনা করে বিষয় দুটির বিভিন্ন দিকের পার্থক্য নিরূপণ ও বক্তব্যের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করতে বলবেন।

ব্রেইন স্টর্মিং : শিক্ষক পাঠের বিষয়বস্তুর বিভিন্ন দিক সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করে ঐ দিকসমূহের প্রকৃত স্বরূপ শিক্ষার্থীদের অনুসন্ধান করতে বলবেন।

ভিজ্যুয়ালাইজেশন : শিক্ষার্থীদের প্রথমে চোখ বন্ধ করে নির্দেশ মোতাবেক পাঠ-সংশ্লিষ্ট কিছু দৃশ্য স্মরণ করে পরে চোখ খুলে সঙ্গীর সাথে মত বিনিময় করে উপস্থাপিত সমস্যার সমাধান নির্ধারণ করতে বলবেন।

চকবোর্ড সার-সংক্ষেপ : পুরো পাঠের মূল শব্দগুলো শিক্ষার্থীদের দ্বারা নির্বাচন করিয়ে সাথে সাথে পরিকল্পনামত ধারাবাহিকভাবে বোর্ডে লিখবেন। পরে শব্দগুলোর ভিত্তিতে পাঠের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের দিয়ে বক্তৃতার আদলে বলাবেন।

তালিকা প্রস্তুতকরণ : পাঠের বিভিন্ন দিক-সংশ্লিষ্ট উপ-দিকগুলো তালিকা আকারে লিখতে বলবেন। তালিকা আকারে প্রকাশ করা সম্ভব- এমন তথ্য পাঠে থাকলে এই কৌশলটির ব্যবহার খুবই কার্যকর হয়।

শ্রেণিকরণ : এলোমেলোভাবে মিশ্রিত বেশকিছু তথ্যকে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের আলোকে বিভিন্ন শ্রেণিতে সাজাতে বলবেন।

ত্রুটি শনাক্তকরণ : পাঠ-সংশিষ্ট অথচ ভুল তথ্য সন্নিবেশিত অনুচ্ছেদ সরবরাহ করে শিক্ষার্থীদের দিয়ে তা সংশোধন করাবেন।

পাঠদান পদ্ধতি ও কলাকৌশলের নির্বাচন পাঠের বিষয়বস্তুর উপর নির্ভর করে। সব পাঠের জন্য সব পদ্ধতি বা কৌশল সমান উপযোগ দেয় না। বিষয়বস্তু এবং পদ্ধতি-কৌশল উভয় সম্পর্কে শিক্ষকের ভালো ধারণা থাকলেই তার পক্ষে এ দুয়ের যথাযথ সম্মিলন ঘটানো সম্ভব। শিক্ষককে আরো মনে রাখতে হবে যে, পাঠদানের কলাকৌশল অবশ্যই নির্দিষ্ট পাঠের নির্বাচিত শিখনফল অনুগামী হতে হবে। আর শিখনফল অত্যন্ত সতর্কতার সাথে নির্বাচন করতে হবে। এক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে যেন কবিতাটির পঠন পাঠনের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত না হয়।

কবিতা পাঠদানের অন্যান্য লক্ষণীয় দিক

শ্রেণিতে কবিতা পাঠদানের সময় শিক্ষককে পাঠদানের পদ্ধতি ও কলাকৌশলের বাইরেও কবিতা পঠন পাঠনের উদ্দেশ্যের বিভিন্ন দিক বিবেচনায় আরো কিছু অতিরিক্ত বিষয়ে লক্ষ রাখতে হয়। যেমন-

সুষ্ঠু আবৃত্তি : ধ্বনিই কবিতার প্রাণ। কবিতার মাঝে আছে ধ্বনিঝংকার। এ ধ্বনিঝংকারের জন্যই কবিতা আবৃত্তিশিল্পের পর্যায়ে অভিষিক্ত। সুষ্ঠু আবৃত্তি কবিতার বিষয়বস্তুকে উপলব্ধির স্তরে নিয়ে যায়, বাগযন্ত্রের আড়ষ্ঠতা দূর করে এবং মনে সৃষ্টির আনন্দ ছড়িয়ে দেয়। তাই কবিতা পঠন পাঠনে আবৃত্তি যাতে আদর্শ মানের হয় সেদিকে শিক্ষককে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে।

ভাব ও রস উপলব্ধি : সব কবিতাই কোনো না কোনো ভাবসঞ্জাত। আর এই ভাবের চরমতায় পাঠক যখন পৌঁছে যায় তখনই তার মন আপ্লুত হয়ে যায় রসে। কিন্তু পাঠক সচেতন না হলে এই ভাবের দুয়ার তার কাছে উন্মুক্ত হয় না। সঞ্চারিতও হয় না মনে রসের অনুভূতি। কবিতা পাঠনে শিক্ষক হিসেবে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যেন শিক্ষার্থী কবিতার ঐ নির্দিষ্টভাব উপলব্ধি করতে পারে এবং তাদের মনেও সঞ্চারিত হয় ঐ ভাবসংশ্লিষ্ট রসটি।

ছন্দবোধ জাগানো : প্রতিটি কবিতাই ছন্দস্পন্দিত। এই ছন্দই কথাকে জড় ধর্ম থেকে মুক্তি দিয়ে কবিতায় তাকে করে তোলে প্রাণস্পন্দিত। ছন্দ অনুযায়ী কবিতার গতিবেগ স্বতন্ত্র। কবিতাটি দ্রুত, মধ্যম না-কি ধীর গতিতে পড়তে হবে সেদিকে যেমন খেয়াল রাখতে হবে তেমনি নজর দিতে হবে শব্দের বিন্যাসরীতির (Style) দিকে। আর এ ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের অবশ্যই সচেতন করে তুলতে হবে।

শিল্পমূল্য বিচার : কবিতা অলংকৃত। অনুপ্রাস, যমক, উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষার অলঙ্করণে কবিতা রমণীয় হয়ে ওঠে। কবিতায় ব্যবহৃত এসব অলংকারবিবৃত নান্দনিক চেতনা ও কাব্যগুণের সাথে শিক্ষার্থীদের যাতে পরিচয় গড়ে ওঠে সেদিকে নজর রেখে কবিতা পাঠ দিতে হবে।

সৌন্দর্যবোধ জাগানো/অনুরাগ সৃষ্টি : কবির দৃষ্টি সুন্দর। কবি কুৎসিতকেও সুন্দর রূপে অবলোকন করেন। আর তাই কবিতায় কুৎসিত হয় সুন্দর, সুন্দর হয় সুন্দরতম, ক্ষণকাল হয় চিরকালের। জীবন ও জগতের এই যে অপার রহস্য- কবিতায় তা সৃষ্টি করে অলৌকিক এক মায়ার জগৎ। শিক্ষার্থীরা যাতে এই সৌন্দর্যানুভূতির সাথে একাত্ম হয়ে ওঠে সেদিকে নজর রেখে কবিতার পাঠ দিতে হবে। পাঠ্যপুস্তক বহির্ভূত আরো কবিতা শিক্ষার্থীরা যাতে সংগ্রহ করে পড়ে সে ব্যাপারে নির্দেশনা দিতে হবে এবং সে রকম অনুরাগ তাদের মনের মধ্যে জাগাতে হবে।

ব্যাকরণগত দিক পরিহার : কবিতার পাঠদানকে রসোত্তীর্ণ করার জন্য কবিতায় ব্যবহৃত ব্যাকরণগত দিক, টীকা টিপ্পনী- এসব পরিহার করে কেবলই রসোত্তীর্ণতাকে প্রাধান্য দিতে হবে। কবিতার ক্লাসে ব্যাকরণ নয়; তবে ব্যাকরণের ক্লাসে কবিতাকে অনুষঙ্গ হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এক কথায়, কবিতাকে শিক্ষার্থীদের উপলব্ধির স্তরে নিয়ে যাবার জন্য শিক্ষক যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক বলে মনে করেন- তার প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

৩.১৩ : বাংলা নাটক : বৈশিষ্ট্য ও শিখন-শেখানো পদ্ধতি

১৯৭১ সালে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পরে বাংলা সাহিত্যের যে শাখাটি সবচেয়ে সমৃদ্ধ ও বিকশিত হয়েছে তা হচ্ছে নাটক। স্বাধীনতার চেতনাকে চৈতন্যে ধারণ করে নাট্যকারগণ বাংলাদেশের নাটকে যে ঐতিহ্যিক ধারা নির্মাণ করেছেন তা নিঃসন্দেহে আমাদের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। বস্তুত স্বাধীনতার চেতনা ও বাংলাদেশের নাটক এক ও অভিন্ন সত্তা। তবে বাংলা নাটকের দুশো বছরের পুরনো ঐতিহ্য থেকেও তা বিচ্ছিন্ন নয়। ১৭৯৫ সালে গেরাসিম পোনোভিচ লেবেদেফ (১৭৪৯–১৮১৭)-এর 'কাল্পনিক সংবদল'-এ প্রথম বাংলা নাটকের রচনাপ্রয়াস লক্ষ করা যায়। তবে উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি ইংরেজি নাটকের আদর্শে যে বাংলা নাটকের যাত্রা শুরু- তা সর্বজনগ্রাহ্য। বাংলা নাটকের এই ঐতিহ্য অনুসন্ধানের পাশাপাশি নাটকের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য, প্রকারভেদ, পাঠদান পদ্ধতি ও কলাকৌশল প্রভৃতি বিষয় এ পাঠে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

বাংলা নাটক

বাংলা সাহিত্যে যাত্রা, কথকতা, টপ্পা, খেউড়, মঙ্গলকাব্য, কবিগানের যে অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়– তাই আধুনিক বাংলা নাটকের ভ্রূণ। পরবর্তীকালে ইংরেজি নাটকের অনুকরণ বাংলা নাটকের বিকাশ ধারায় বারি সিঞ্চন করেছে। তবে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের হাতে নাটক রচনার এই প্রয়াস সাধিত হয় বলে বাংলা নাটকে সংস্কৃত প্রভাব পড়ে। সাধারণত সেসময় বাল্যবিবাহ, বিধবাবিবাহ প্রভৃতি সামাজিক নানা কুসংস্কারের স্বরূপ, কুসংস্কারের নেতিবাচক প্রভাব ও তা থেকে উত্তোরণের সদিচ্ছা জনমনে সঞ্চারিত করাই ছিল নাটকের আখ্যানভাগ জুড়ে থাকা কাহিনীর লক্ষ্য। তারাচাঁদ শিকদারের ভদ্রার্জ্জুন (১৮৫২), যোগেশচন্দ্র গুপ্তের কীর্ত্তিবিলাস (১৮৫২), হরচন্দ্র ঘোষের ভানুমতি চিত্তবিলাস (১৮৫৩), রামনারায়ণের কুলীনকুল সর্ব্বস্ব (১৮৫৪), তারকচন্দ্র চূড়ামণির সপত্নী নাটক (১৮৫৭) প্রভৃতি নাটকে সামাজিক কুসংস্কারের ছায়াপাত যেমন ঘটেছে তেমনি শেক্সপীয়র বা এলিজাবেথীয় যুগের ইংরেজি নাটকের আদর্শও অনুসরণ করা হয়েছে।

রামনারায়ণের পর মধুসূদন দত্ত ও দীনবন্ধু মিত্র বাংলা নাটকের নতুন যুগের সূচনা করেন। মধুসূদন দত্তের শর্ম্মিষ্ঠা (১৮৫৮), পদ্মাবতী ও কৃষ্ণকুমারীতে (১৮৬০) একদিকে গ্রীক নাটকের প্রভাব সুস্পষ্ট আর অন্য দিকে ইংরেজি রোমান্টিক নাটকের ঘটনাপ্রবাহের রীতি অনুসৃত হয়েছে। দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ (১৮৬০), নবীন তপস্বিনী, লীলাবতী প্রভৃতি নাটকে যে গভীর জীবনবোধ অন্তর্দৃষ্টি, বিন্যাস-নিপুণতা লক্ষ করা যায় তা তাঁকে শক্তিমান নাট্যকার হিসেবেই পরিচয় করিয়ে দেয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১–১৯৪১) মূলত কবি হলেও নাটক রচনায়ও তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁর রাজা ও রাণী, বিসর্জন, চিরকুমার সভা

প্রভৃতি নাটকে লিরিকের যে প্রাধান্য দেখা যায়, সেখানে তাঁর কবি সত্তাটিই মূর্তিত। তবে রক্তকরবী, অচলায়তন, ডাকঘর প্রভৃতি সাঙ্কেতিক নাটকে তিনি অসামান্য শক্তির পরিচয় দিয়েছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ মানুষের জীবনভাবনায় রূপান্তর আনে। এই রূপান্তর নাট্যকারদের শিল্পবোধেও সুস্পষ্ট পরিবর্তন দৃশ্যমান করে তোলে। এই প্রভাব সমসময়ে পূর্ববঙ্গের নাট্যকারদের মধ্যেও লক্ষ করা যায়। বাংলা নাটকের এই রূপান্তরের পথিকৃত নুরুল মোমেন (১৯০৮–১৯৯০)। বিশ্বজিৎ ঘোষ যথার্থই বলেছেন- 'বিষয়বস্তু, জীবনদৃষ্টি, গঠনশৈলি এবং উপস্থাপনরীতির পরীক্ষায় সাফল্য এবং সিদ্ধিতে নুরুল মোমেনের অবদান বাংলা নাটকের ধারায় বিশিষ্ট ও ব্যতিক্রমধর্মচিহ্নিত।' তাঁর লেখা একটি মাত্র নাটক নেমেসিস (১৯৪৮)। এই নাটকের গঠনশৈলি ও বিষয়বস্তুতে তিনি যে প্রজ্ঞার পরিচয় রেখেছেন সত্যিই তা বিরল। 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে অর্থনৈতিক বিপর্যয়, দুর্ভিক্ষ এবং চোরাকারবারকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠেছে নেমেসিস একাঙ্কিকার অবয়ব। সুরজিত নন্দী নামের এক স্কুল শিক্ষক...বিবেক বিসর্জন দিয়ে কীভাবে অর্থের পাহাড় গড়ে তুলেছে, এবং অবশেষে রক্তাক্ত পথযাত্রা সমাপ্তিতে আত্মহননে মুক্তির সন্ধান পেয়েছে- তারই শৈল্পিক শব্দপ্রতিমা নেমেসিস'। তাঁর এই নাটকের বিষয়ভাবনা যেমন বিশ্বজনীন তেমনি কৃৎকৌশলে স্বতন্ত্র।

ষাটের দশকের অবরুদ্ধ সমাজবাস্তবতায় রূপকের আশ্রয়ে নাটক রচনা করেন সিকান্দার আবু জাফর (১৯১৯–১৯৭৫)। মানুষের চেতনায় যে পাপ-পুণ্যের দ্বন্দ্ব সদা বিরাজমান থাকে- তাকেই তিনি রূপকায়িত করেছেন তাঁর শকুন্ত উপাখ্যানে (১৯৬১)। দেখিয়েছেন পাপ পরাজিত হয়; জয়ী হয় ভালোবাসা।

বাংলা নাট্যসাহিত্যে সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ একটি বিশিষ্ট নাম (১৯২২–১৯৭১)। আধুনিক শিল্পবোধ ও জীবনচেতনায় ভাস্বর তাঁর রচিত সকল নাটক। বহিপীর (১৯৬০), সুড়ঙ্গ (১৯৫৫), তরঙ্গভঙ্গ (১৯৬২), উজানে মৃত্যু (১৯৬৩) প্রভৃতি নাটকে মানুষের চেতন-অবচেতনের দ্বন্দ্ব, মূল্যবোধের দ্বন্দ্ব, জীবনরহস্য, অবিশ্বাস, লোভ-লালসা, ঘৃণা ও ঈর্ষা প্রভৃতি বিষয়ের যে নিপুণ ছবি তিনি উপস্থাপন করেছেন তা তাঁকে আধুনিক নাট্যকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে।

মুনীর চৌধুরীর (১৯২৫–১৯৭১) এক অসামান্য সৃষ্টি তাঁর 'কবর' (রচনাকাল ১৯৫৩; প্রকাশকাল ১৯৬৬) নাটকটি । ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে লেখা এই প্রতিবাদী নাটকটিতে প্রকাশরীতির অভিনবত্ব, শৈল্পিক পরিমিতি বোধ, রাজনীতি সচেতনতা ও সংলাপ কুশলতার যে পরিপক্বতা লক্ষ করা যায়- তা বাংলা নাটকের এক বিশিষ্ট সম্পদ। মানুষের আদিম প্রবৃত্তির শাশ্বতরূপ বিজ্ঞাপিত হয়েছে তাঁর দণ্ডকারণ্য (১৯৬৬) নাটকে; আর যুদ্ধ মানবভাগ্যকে কীভাবে বিপন্ন করে তোলে তার কাব্যিক রূপায়ণ ঘটেছে রক্তাক্ত প্রান্তর-এ। এছাড়াও ষাটের দশকের বাংলা নাটকে বিশেষ প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন শওকত ওসমান (১৯১৭–১৯৯৮), আসকার ইবনে শাইখ (১৯২৫-) আনিস চৌধুরী (১৯২৯–১৯৯১), জিয়া হায়দার (১৯৩৬–২০০৮) প্রমুখ নাট্যকার। এঁদের সমবেত চেষ্টায় বাংলা নাটকের বিকাশধারায় গতির সঞ্চার হয়েছে।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর নাট্যসাহিত্যের পূর্বতন প্রবাহধারা আরো বেগবান হয়। এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখে নাট্যকর্মীদের প্রগতিশীল নাট্য-আন্দোলন। স্বাধীন দেশে এঁদের চেতনায় জেগে ওঠে নতুন মূল্যবোধ। এতে প্রাণিত হয়ে সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকেই বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠীর আশ্রয়ে লিখিত ও মঞ্চস্থ হতে থাকে শিল্পসমৃদ্ধ নতুন নতুন নাটক। এই নাটকগুলোতে একদিকে যেমন শৈলীমুখরতা প্রাধান্য পেয়েছে অন্য দিকে মুখ্য হয়ে ওঠেছে সুস্পষ্ট বক্তব্যবিষয়। বক্তব্যবিষয়ে আবার প্রাধান্য পেয়েছে সমকালীন সমাজবাস্তবতা, 'সমাজের মূল্যবোধের অবক্ষয়, মানুষের হতাশা-বঞ্চনা, আনন্দ-উল্লাস' প্রভৃতি।

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের নাটকে আমরা বিষয় ও প্রকরণের যে রূপায়ণ লক্ষ্য করি তার পরিপ্রেক্ষিতে এসময়ের নাটকে পাঁচটি মৌল প্রবণতা চিহ্নিত করা যায়। বস্তুত প্রবণতার এ বৈচিত্র্যই বাংলা নাটকের বিকাশধারাকে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত করেছে। প্রবণতাগুলো নিম্নরূপ-

১. মুক্তিযুদ্ধের নাটক : মমতাজউদ্‌দীন আহমদের 'স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা' (১৯৭৬), 'বকুলপুরের স্বাধীনতা' (১৯৮৬), কি চাহ শঙ্খচিল (১৯৮৫), সৈয়দ শামসুল হকের 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' (১৯৭৬)।
২. প্রতিবাদের নাটক : মামুনুর রশীদের 'ওরা কদম আলী' (১৯৭৮), 'ইবলিশ' (১৯৮২), আবদুল্লাহ আল মামুনের 'এখনও ক্রীতদাস' (১৯৮৪), সেলিম আল দীনের 'কিত্তনখোলা' (১৯৮৬)
৩. ইতিহাস-ঐতিহ্য-পুরাণ পুনর্মূল্যায়নধর্মী নাটক : সৈয়দ শামসুল হকের 'নূরলদীনের সারাজীবন' (১৯৮২), সাঈদ আহমদের 'শেষ নবাব' (১৯৮৯)

৪. সামাজিক নাটক : আবদুল্লাহ আল মামুনের 'সুবচন নির্বাসনে' (১৯৮৪), 'কোকিলারা' (১৯৮৯), 'এখন দুঃসময়' (১৯৭৫), রশীদ হায়দারের 'তৈল সংকট' (১৯৭৪) ফরহাদ মজহারের 'লীলালাস্য' (১৯৭৫)

৫. অনুবাদ নাটক/রূপান্তরিত নাটক : কবীর চৌধুরীর 'গডোর প্রতীক্ষায়' (১৯৮১, মূল: বেকেটের ওয়েটিং ফর গডো) আলী যাকেরের 'বিদগ্ধ রমণীকূল' (১৯৭৪, মূল: মলিয়েরের ইনটেলেকচুয়াল উইমেন), আসাদুজ্জামান নূরের 'দেওয়ান গাজীর কিসসা' (১৯৭৪, মূল: ব্রেখটের হের পুন্টিলা অ্যান্ড হিজম্যান মাট্টি), খোন্দকার আশরাফ হোসেনের 'রাজা ঈদিপাস' (১৯৭৬, মূল: সফোক্লিসের কিং ঈদিপাস)

এভাবেই বাংলা নাটক সফল যাত্রায় ধেয়ে চলেছে ঘাট থেকে ঘাটে; পাল্টিয়েছে বিভিন্ন বাঁক ও মোড়; দেশীয় ঐতিহ্য ও জাতিসত্তার প্রত্যয়টিকে অঙ্গে ধারণ করে সমৃদ্ধ করেছে বাংলাদেশের সাহিত্যকে।

নাটকের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

জীবন সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতার কাব্যিক প্রকাশই হচ্ছে নাটক। মানব জীবনের কাহিনী যখন দৃশ্যমান হয়ে কথাশিল্পের মধ্যে বাণীময় রূপ পরিগ্রহ করে তখনই নাটকের জন্ম হয়। এদিক থেকে বিচার করলে নাটক দৃশ্যকাব্য ও শ্রব্যকাব্যের সমন্বিত রূপ। Elezabeth Drew (E, Drew) এর মতে- Drama is the creation and representation of life in terms of the theatre. Boultion-এর ভাষায়- It is a literature that walks and talks before our eyes. এরিস্টটলের মতে, নাটক হচ্ছে- Imitation of action. ড্রাইডেন বলেন–মানবিক আবেগ ও ভাবের এবং জাগতিক পরিবর্তনের যথাযথ জীবন্ত রূপ হল নাটক।

নাটককে জীবনের দর্পণ বলা হয়। মানব জীবনের প্রতিদিনের ঘটনার শৈল্পিক অভিব্যক্তিই প্রকাশ পায় নাটকে। শৈল্পিক প্রকাশ এই অর্থে যে, প্রতিদিনের গতানুগতিক স্রোতধারায় ঘটে যাওয়া তুচ্ছ, অস্পষ্ট ঘটনাগুলোই সংলাপে মুখর হয়ে, সাহিত্যরসে সিঞ্চিত হয়ে, ভাবব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত হয়ে নাটকে নবরূপ পায়। নাট্যকার মানব জীবনের হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা, প্রেম-বিরহ, দ্বন্দ্ব-সংঘাত নাটকের মাধ্যমে তুলে ধরেন বলে– নাটককে বলা হয় জীবনের প্রতিচ্ছবি। শ্রেণি অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার নাটকের বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন রকম। তবে নাটকের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ।

- নাটক জীবনেরই সুদৃশ্য রূপায়ণ। দর্শন এবং শ্রবণ-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলে নাটককে একই সাথে দৃশ্যকাব্য ও শ্রব্যকাব্য বলা হয়ে থাকে।
- নাটকের মধ্যে নাট্যকারের বলিষ্ঠ জীবনবোধ, জীবনদর্শন ও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়।
- সংলাপ এবং নাটকীয়তা হলো নাটকের প্রাণ। নাটকের আখ্যানভাগকে ভিত্তি করে কুশীলবদের চরিত্র ও সংলাপের মধ্য দিয়ে নাটকের নাটকীয়তা সৃষ্টি করা হয়।
- একটি সার্থক নাটকে ৫টি অংক এবং প্রতি অংকে ৩টি করে সর্বমোট ১৫টি দৃশ্য থাকে।
- অংক ৫টিতে ঘটনা বিন্যাসের ৫টি বিশেষ পর্যায় বা অবস্থা সংস্থাপিত হয়। যেমন- প্রারম্ভ, প্রবাহ, উৎকর্ষ, গ্রন্থিমোচন এবং উপসংহার।
- নাটক অভিনয় নির্ভর। অভিনেতা নিজেকে রূপান্তরিত করে নির্দিষ্ট চরিত্রের সাথে এক হয়ে যান। তাই নাটক হচ্ছে- Imitation of life.
- নাটককে Collective Art বলা হয়ে থাকে। কারণ, এতে একটি আখ্যানভাগের উপজীব্যে রঙ্গমঞ্চের পরিসরে পাত্র-পাত্রীর সংলাপ ও অভিনয়ের মধ্যদিয়ে গতিমান মানব জীবনের শিল্পীত প্রকাশ ঘটে থাকে।
- নাটকে ঘটনার দ্বন্দ্ব নাটকীয় দ্বন্দ্বে রূপায়িত হয়। তখনই নাটকে আসে দুর্বার গতি।

নাটকের প্রকারভেদ

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলা নাটককে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। তবে প্রধানত বিষয়বস্তু ও পরিণতির দিক থেকে নাটককে তিনভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে।

- বিয়োগাত্মক নাটক (Tragedy)
- মিলনাত্মক নাটক (Comedy)
- প্রহসনধর্মী নাটক (Farce)

বিয়োগাত্মক নাটক : অন্তর্দ্বন্দ্বে পরাভূত বা অভিভূত মানব জীবনের করুণ কাহিনীকে সাধারণত Tragedy বলে। ট্যাজেডির স্বাভাবিক পরিণতি হলো মৃত্যু। তবে বর্তমানে মৃত্যুকে সাধারণত ট্র্যাজেডির শেষ পরিণতি হিসাবে গ্রহণ করা হয় না। বরং পরিসমাপ্তিতে কেন্দ্রীয় চরিত্রের ব্যর্থতা দর্শকচিত্তে বেদনাবোধ সঞ্চার করতে সক্ষম নাটককেই ট্র্যাজেডি বলা হয়। মূলকথা হচ্ছে ট্র্যাজেডি বিয়োগাত্মক নাটক। কৃষ্ণকুমারী, নীল দর্পণ, প্রফুল্ল প্রভৃতি ট্র্যাজেডি নাটক।

মিলনাত্মক নাটক : যে নাটকে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের লঘু-চপল দিকটি আনন্দোচ্ছলরূপে নায়ক নায়িকার মিলন মাধুর্যে পরিসমাপ্তি লাভ করে তাকে কমেডি বলে। কমেডি হাস্যরস প্রধান নাটক। সধবার একাদশী, বিয়ে পাগলা বুড়ো, অচলায়তন, চিরকুমার সভা প্রভৃতি বিখ্যাত বাংলা কমেডি।

প্রহসন : সমাজের কুসংস্কার, কুকীর্তি ও অসংগতি শোধনার্থে রহস্যজনক ঘটনাসংবলিত হাস্যরস প্রধান নাটককে প্রহসনধর্মী নাটক বলে। বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রো ; একেই কি বলে সভ্যতা বাংলা সাহিত্যের উৎকৃষ্ট প্রহসনধর্মী নাটক।
উল্লিখিত শ্রেণিভাগ ছাড়াও, বাংলা নাটককে ঐতিহাসিক, পৌরাণিক, নৃত্যধর্মী, সাংকেতিক, গীতিধর্মী, সামাজিক, সমস্যা প্রধান প্রভৃতি শ্রেণিতেও ভাগ করা হয়ে থাকে।

নাটক পাঠদানের কলাকৌশল

সাহিত্যের অন্য যে-কোনো শাখা শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের চেয়ে নাটক পাঠদান ভিন্নতর। তবে নাটক পাঠদানের ক্ষেত্রে শ্রেণিতে শিক্ষক অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির সঙ্গে সম্পর্কিত নিম্নরূপ কৌশল প্রয়োগ করতে পারেন।

উদ্দেশ্য সচেতনতা : শ্রেণিকক্ষে যে কোনো বিষয় পাঠ দিতে যাবার আগে শিক্ষকের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হচ্ছে ঐ নির্দিষ্ট পাঠটির উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া। নাটক পাঠদানের কিছু স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য আছে। এই উদ্দেশ্যগুলো সম্পর্কে শুরুতেই শিক্ষককে জেনে নিতে হবে এবং এই উদ্দেশ্যের সম্পূরক কার্যক্রমের আয়োজন শ্রেণিকক্ষে করতে হবে।

শীর্ষ ভাগকরণ : পুরো নাটকটিকে শুরুতেই একেকটি ক্লাসের উপযোগী অংশ নিয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শীর্ষে ভাগ করে নিতে হবে এবং সেই অনুযায়ী উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে হবে।

ভূমিকাভিনয় ও সমস্যা সমাধান : এটি নাটক পাঠদানের গুরুত্বপূর্ণ একটি পদ্ধতি বা কৌশল। এক্ষেত্রে- শিক্ষক প্রথমে ২/৩ মিনিটের একটি মিনি লেকচারের মাধ্যমে ঐ দিনের পাঠের বিষয়বস্তু (ঘটনা) শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরবেন। এতে শিক্ষার্থীরা পাঠের একটি প্রাথমিক ধারণা পাবে। এরপর শিক্ষার্থীদের জোড়া/দল গঠন করে দিয়ে প্রতি জোড়া/দলে একটি করে চরিত্র ভাগ করে দিয়ে জোড়ায়/দলীয়ভাবে ঐ চরিত্রের ভূমিকা অনুধাবন করতে বলবেন। এবার জোড়া/দল পুনর্বিন্যাস (দল হলে প্রতি দলকে দুই ভাগ করে এক দলের অর্ধেকের সাথে অন্যদলের অর্ধেক শিক্ষার্থী নিয়ে পুনরায় নতুন দল গঠন) করে নতুন জোড়া/দল গঠন করে পুনরায় একটি নির্ধারিত চরিত্র সম্পর্কে ভাবতে বলবেন। পরে তাদেরকে দিয়ে পাঠের নির্ধারিত অংশের সংলাপ বলাবেন ও অভিনয় করাবেন (দলের পক্ষে একেকটি সংলাপ একেক জন বলবে)। এবার শিক্ষক পাঠের নির্ধারিত অংশভিত্তিক চিন্তনমূলক কাজ দিবেন। শিক্ষার্থীরা জোড়ায়/দলে উত্তর তৈরি করবে। এরপর শিক্ষক ঐ কাজের ফিডব্যাক দিবেন।

সংলাপ ও প্রশ্নোত্তর : পাঠের নির্ধারিত অংশের (আজকের পাঠের অন্তর্ভুক্ত) চরিত্রগুলোর সংলাপ সমসংখ্যক শিক্ষার্থীদের দিয়ে শ্রেণিতে আদর্শমান বজায় রেখে উপস্থাপন করাবেন। এরপর শিক্ষক আজকের পাঠভিত্তিক একগুচ্ছ চিন্তামূলক ধারাবাহিক প্রশ্ন (নির্ধারিত) বোর্ডে/পোস্টার পেপারে তুলে ধরবেন, শিক্ষার্থীরা জোড়া/দলে প্রশ্নগুলোর উত্তর তৈরি করবে ও পর্যায়ক্রমে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে। পরে শিক্ষক ফলাবর্তন দিবেন। তার ফলাবর্তনে পাঠের গূঢ়ার্থ প্রতিফলিত হবে।

তুলনামূলক বৈষম্য অনুসন্ধান : নাটকের মধ্যে/নির্দিষ্ট একটি পাঠের মধ্যে বিপরীতধর্মী দুটি চরিত্র থাকলে শিক্ষক প্রথমে চরিত্র দুটির স্বরূপ বিষয়ক ৩/৪ মিনিটের একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা উপস্থাপন করতে পারেন। এরপর শিক্ষার্থীদের এ দুটি চরিত্রের বৈষম্য দলে/জোড়ায় অনুসন্ধান (বই পড়ে) করতে দিতে পারেন।

পোস্টার প্রদর্শন : শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ক্লাসে আলোচিত প্রশ্ন/সমস্যা/কাজগুলো থেকে অর্জিত ধারণাগুলোর সার-সংক্ষেপ তৈরি করতে দিবেন। শিক্ষার্থীরা জোড়ায়/দলে পয়েন্টভিত্তিক সার সংক্ষেপ তৈরি করে পোস্টার পেপারে লিখে শ্রেণিতে তাদের

কাজ উপস্থাপন করবে। অন্য শিক্ষার্থীরা উপস্থাপিত তথ্য দেখবে, শুনবে ও মন্তব্য করবে। শিক্ষার্থীদের মন্তব্যের ভিত্তিতে শিক্ষক পরে ফলাবর্তন দিবেন।

ব্ল্যাকবোর্ডে সার-সংক্ষেপ প্রস্তুত : প্রতিদিনের ক্লাসের শেষ দিকে (সময় থাকলে) শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ঐ ক্লাসের নির্দিষ্ট সমস্যাভিত্তিক সমাধানগুলো নিজের মত করে বিবেচনা করতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা বইয়ের সহায়তায় সমস্যাগুলোর স্বরূপ অনুধাবন করে নিজস্ব মতামত আরোপ করবে ও জোড়া/দলের পক্ষে এক এক করে উত্থাপন করবে। শিক্ষার্থীদের উত্থাপিত তথ্যসমূহ শিক্ষক বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে বোর্ডে এক এক করে লিখবেন।

শিল্পগুণ বিচারভিত্তিক প্লেনারি আলোচনা : নাটক সাহিত্যের একটি বলিষ্ঠ শাখা। শৈল্পিক বিচারের মানদণ্ডে এর বিচার বিশ্লেষণ আবশ্যক। তাই নির্বাচিত নাটকটির পঠন-পাঠনে প্রতিদিনের পাঠসংশ্লিষ্ট দিকের ভিত্তিতে অথবা শিক্ষাবর্ষের শেষ পর্যায়ে শিক্ষক নাটকের শ্রেণি, অংকবিভাগ, ঐক্যনীতি, কেন্দ্রীয় চরিত্র, ঘটনাবিন্যাসভিত্তিক পর্যায়ক্রম, শ্রেণিগত সার্থকতা প্রভৃতি শৈল্পিক দিক উন্মোচন উপযোগী কার্যাবলির আয়োজন শ্রেণিকক্ষে করতে পারেন। এক্ষেত্রে দলীয় কাজের উপস্থাপনায় অন্য দলগুলো মন্তব্য সংযোজনের মাধ্যমে (পুনরুক্তি না করে) উপস্থাপনাকে তথ্যসমৃদ্ধ ও গুরুত্ববহ করে তুলবে। শিক্ষক বিষয়বস্তুর সুস্পষ্টতার জন্য দলকে সহযোগিতা করবেন ও ফলাবর্তনে সম্পূর্ণতা আনবেন।

নাটকের বৈশিষ্ট্য গল্প, কবিতা, উপন্যাস থেকে স্বতন্ত্র। তাই শ্রেণিকক্ষে নাটক পাঠদানের ক্ষেত্রে শিক্ষকেরও কিছু স্বতন্ত্র গুণ থাকা আবশ্যক। শিক্ষকের সংলাপ উচ্চারণ ও অভিনয়ের দক্ষতা থাকলে নাটকের পাঠদান শিক্ষার্থীদের কাছে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। নাটকের বিষয়বস্তু সম্পর্কিত শিক্ষকের স্পষ্ট ধারণা, চরিত্রের সঙ্গে নিবিড়ভাবে মিশে যাওয়ার দক্ষতা, ঘটনা ও চরিত্রকে বাস্তবানুগ করে তোলার সক্ষমতার উপর নাটক পাঠদানের সফলতা অনেকখানিই নির্ভর করে। তাছাড়া অঙ্গভঙ্গি, বাচনভঙ্গি, সংলাপ উচ্চারণ, কণ্ঠস্বরের প্রক্ষেপণ প্রভৃতির আদর্শমানও শ্রেণিকক্ষে নাটক পাঠদানের সাফল্যের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত।

৩.১৪ : বাংলা ব্যাকরণ : বৈশিষ্ট্য ও শিখন-শেখানো পদ্ধতি

ভাষা ভাবের বাহন। ভাব প্রকাশের তাগিদে ভাষার উদ্ভব। প্রাণিজগতে মানুষই একমাত্র মুখের কথায় মনের ভাব প্রকাশ করে। ভাব প্রকাশের পূর্বশর্ত হচ্ছে ভাষার ধ্বনিগুলোর অর্থবোধকতা। অর্থবোধক ধ্বনির সাহায্যেই সমাজের মানুষ তাদের সামাজিক জীবনে মিথস্ক্রিয়া সচল রাখে। সমাজের সকল মানুষের এই অর্থবোধক ধ্বনির সমষ্টিকেই বলে ভাষা। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন, 'মনের ভাব প্রকাশের জন্য বাগযন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত, ধ্বনির দ্বারা নিষ্পন্ন, কোনো বিশেষ জনসমাজে ব্যবহৃত, স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত, তথা বাক্যে প্রযুক্ত শব্দসমষ্টিকে ভাষা বলে'। প্রখ্যাত ভাষাবিদ বানার্ড ব্লক এবং জর্জ এল ট্রেগার বলেছেন, A Language is a system of arbitrary vocal symbols by means which a social cooperates. এ সংজ্ঞার আলোকে বলা যায়– ভাষা একটি ব্যবস্থা, ভাষা প্রতীকের (Symbols) মাধ্যমে রূপান্তরিত সংকেতমালা, ঐ প্রতীকগুলো কণ্ঠধ্বনিজাত এবং প্রতীকগুলো স্বেচ্ছাপ্রণোদিত (Arbitrary) ।

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বানার্ড ব্লক ও জর্জ এল ট্রেগার ভাষার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে যে কথাগুলো বলেছেন, তাতেই ব্যাকরণের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়েছে। মনের ভাব, বাগযন্ত্র, কণ্ঠধ্বনি, সংকেতমালা, প্রতীক, শব্দ, বাক্য প্রভৃতির সমন্বিত ব্যবস্থাকে ভাষা বলা হয়। এই সমন্বিত ব্যবস্থাটির স্বরূপ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে গিয়েই সৃষ্টি হয়েছে ব্যাকরণের। অর্থাৎ ভাষাকে সম্যক বিশ্লেষণ করে তার রূপও প্রকৃতিকে চিনিয়ে দিয়ে তাকে শুদ্ধভাবে প্রয়োগ করতে শেখায় যে শাস্ত্র– তাই ব্যাকরণ। তবে ব্যাকরণের সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা সম্পর্কে ভাষাবিজ্ঞানীগণ কখনই একমত হতে পারেননি। তাঁরা এ সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত দিয়েছেন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এ প্রসঙ্গে বলেছেন- 'যে শাস্ত্র জানিলে বাংলা ভাষা শুদ্ধরূপে লিখিতে, পড়িতে ও বলিতে পারা যায়, তাহার নাম বাংলা ব্যাকরণ।'

ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, 'যে শাস্ত্রে কোনও ভাষাকে বিশ্লেষণ করিয়া তাহার স্বরূপ, প্রকৃতি ও প্রয়োগরীতি বুঝাইয়া দেওয়া হয়, সেই শাস্ত্রকে বলে সেই ভাষার ব্যাকরণ। যে শাস্ত্রে বাংলা ভাষার স্বরূপ ও প্রকৃতি সবদিক দিয়া আলোচনা করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হয়, তাহাকে বলে বাংলা ভাষার ব্যাকরণ বা বাংলা ব্যাকরণ।' ড. এনামুল হকের মতে- 'যে শাস্ত্রের দ্বারা

ভাষাকে বিশ্লেষণ করিয়া ইহার বিবিধ অংশের পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণয় করা যায় এবং ভাষা রচনাকালে আবশ্যকমত সেই নির্ণীত তত্ত্ব ও তথ্য প্রয়োগ সম্ভবপর হইয়া ওঠে, তাহার নাম ব্যাকরণ।' ড. মুনীর চৌধুরীর মতে- 'যে শাস্ত্রে কোন ভাষার বিভিন্ন উপাদানের প্রকৃতি ও স্বরূপের বিচার বিশ্লেষণ করা হয় এবং বিভিন্ন উপাদানের সম্পর্ক নির্ণয় ও প্রয়োগবিধি বিশদভাবে আলোচিত হয়, তাকে ব্যাকরণ বলে।'

পণ্ডিতগণের উপর্যুক্ত বিভিন্ন মতামতের আলোকে ব্যাকরণের সংজ্ঞা সম্পর্কে বলা যায়– ব্যাকরণ এমন একটি বিষয় যার মাধ্যমে ভাষার বিভিন্ন উপাদানের প্রকৃতি ও স্বরূপ বিশ্লেষণ ও সমন্বয় সাধন করে ভাষার পঠন ও লিখনের শৃঙ্খলা বিধান করা যায়। মোট কথা- ভাষার বিশ্লেষণ, পঠন ও লিখনে ব্যাকরণের কোনো বিকল্প নেই।

বাংলা ব্যাকরণের বিষয়বস্তু বা কাঠামো

বাংলা ব্যাকরণের পরিধি বা বিষয়বস্তুকে চার ভাগে ভাগ করা হয়। যথা-

- ধ্বনি প্রকরণ (Phonology)
- রূপতত্ত্ব বা পদ প্রকরণ (Morphology)
- বাক্যতত্ত্ব বা বাক্য প্রকরণ (Syntax)
- অর্থতত্ত্ব বা বাগার্থ বিজ্ঞান (Semantics)

ধ্বনি প্রকরণ (Phonology): ধ্বনি প্রকরণে সাধারণত ধ্বনি, ধ্বনির উচ্চারণ, ধ্বনির বিন্যাস, ধ্বনি পরিবর্তন, বর্ণ, সন্ধি, ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান প্রভৃতি আলোচিত হয়।

রূপতত্ত্ব বা পদপ্রকরণ (Morphology) : এ অংশে শব্দের প্রকার, পদের পরিচয়, শব্দ গঠন, উপসর্গ, প্রত্যয়, বিভক্তি, লিঙ্গ, বচন, শব্দরূপ, কারক, সমাস, ক্রিয়াপ্রকরণ, শব্দের ব্যুৎপত্তি ইত্যাদি বিষয়ে আলোচিত হয়।

বাক্যতত্ত্ব বা বাক্য প্রকরণ (Syntax) : বাংলা ব্যাকরণের এ অংশে বাক্য সম্বন্ধে আলোচনা, পদক্রম, বাগধারা, বাক্য সংকোচন, বিয়োজন, বিরামচিহ্নের ব্যবহার ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।

অর্থতত্ত্ব বা বাগার্থ বিজ্ঞান (Semantics) : শব্দের অর্থবিচার, বাক্যের অর্থবিচার, অর্থের বিভিন্ন প্রকার ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয় ব্যাকরণের এ অংশে।

এছাড়াও ব্যাকরণে 'ছন্দ প্রকরণ' ও 'অলঙ্কার প্রকরণ' নামে আরও দুটি বিষয় রয়েছে। ছন্দ প্রকরণে ছন্দের প্রকার ও নিয়মসমূহ এবং অলঙ্কার প্রকরণে অলঙ্কার, অলঙ্কারের শ্রেণিবিভাগ এবং প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচিত হয়।

ব্যাকরণের বৈশিষ্ট্য

ভাষার অভ্যন্তরীণ নিয়ম-শৃঙ্খলা আবিষ্কারের মাধ্যমই হচ্ছে ব্যাকরণ। আবিষ্কারের এই প্রক্রিয়ায় ব্যাকরণ ভাষার সৌন্দর্য উদ্ঘাটন করে, তার স্বরূপ ব্যাখ্যা করে ও তার সুবিন্যস্ত ও সুসংহত বর্ণনা দেয়। তাই ব্যাকরণে নিম্নবর্ণিত বৈশিষ্ট্যসমূহ দেখা যায়।

ভাষার গঠন প্রকৃতি : ব্যাকরণ ভাষার গঠন প্রকৃতি ব্যাখ্যা করে। বিভিন্ন ভাষাতাত্ত্বিক ও ব্যাকরণবিদের অক্লান্ত পরিশ্রমেই যে-কোনো ভাষার গঠন প্রকৃতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যায় ও ভাষাশুদ্ধতার সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়।

ভাষার স্বভাবধর্ম : ব্যাকরণ শব্দটির বুৎপত্তিগত অর্থ বিশেষভাবে বিশ্লেষণ। ভাষাকে বিশ্লেষণ করে দেখাবার চেষ্টা থেকেই ব্যাকরণের জন্ম। আর বিশ্লেষণ করে দেখলেই ভাষার স্বভাবধর্ম অনুধাবন করা সম্ভব।

ভাষার সংবিধান : ভাষার সৃষ্টি হয়েছে আগে, ব্যাকরণের সৃষ্টি পরে। ভাষার পথ ধরেই শুরু হয়েছে ব্যাকরণের পথচলা। ভাষা ব্যবহৃত হতে হতে বিশেষ কিছু নিয়ম দাঁড়িয়ে যায়। এই নিয়মগুলোই পরে ব্যাকরণের অংশ হয়ে যায়। ব্যাকরণে এই নিয়মগুলো লিখিত রূপ পায় বলে ব্যাকরণকে ভাষার সংবিধান বলা যায়।

ভাষার শুদ্ধতা : ভাষা মুখ থেকে উচ্চারিত বিশৃঙ্খল ধ্বনির সমষ্টি নয় বরং এতে উচ্চারিত ধ্বনিসমষ্টির মধ্যে একটা শৃঙ্খলা লক্ষ করা যায়। ভাষার মূল গঠন-উপাদান ধ্বনি, শব্দ, বাক্য ও অর্থ- এই শৃঙ্খলাবোধেরই সৃষ্টি। এই শৃঙ্খলাবোধ ভাষার শুদ্ধতার পরিচায়ক- যা ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয়। সেই অর্থে ব্যাকরণ ভাষা শুদ্ধতার নিয়ামক।

ব্যাকরণ ভাষা-শাসিত : ভাষা ছাড়া ব্যাকরণের অস্তিত্ব অসম্ভব। ভাষা থেকেই ব্যাকরণের সৃষ্টি। ভাষা এক বহতা নদীর মতো। বিবর্তন, রূপান্তর ও ক্রমবিকাশের মধ্যদিয়ে তার অগ্রগতি সাধিত হয়। এই পথে ব্যাকরণ ভাষাকে চলতে নির্দেশ দেয় না, বা চলার গতি প্রকৃতিও নির্ধারণ করে দেয় না। বরং ভাষাই ব্যাকরণের গতি নির্দেশ করে। আর ব্যাকরণ ভাষাকে বর্ণনা করে মাত্র।

ব্যাকরণের সাহায্য ব্যতীত আমরা শব্দের বুৎপত্তি ও উৎপত্তি নির্দেশ করতে পারি না। শব্দ বা পদ কীভাবে সাধিত হয়েছে, তা ব্যাকরণই নির্দেশ করে দেয়। ভাষাকে পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, ভাষা পরিবর্তনের সাথে সাথে ব্যাকরণেরও পরিবর্তন ঘটে। ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, বাক্যরীতি ও অর্থতত্ত্ব আলোচনা করে দেখা যায়, ব্যাকরণ সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে ভাষার অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা আবিষ্কার করেছে। সে জন্যই যার যেমন খুশি তেমন করে ভাষা ব্যবহার করতে পারে না। তাই বলা যায়, ব্যাকরণই ভাষার অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলার আবিষ্কারক। পাশাপাশি একথাও সত্য যে, ভাষা অনুসারে ব্যাকরণ চলে- ব্যাকরণ অনুসারে ভাষা চলে না।

ব্যাকরণ পাঠের গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা

ব্যাকরণ ভাষার যাবতীয় নিয়মকানুন, স্বরূপ ও প্রকৃতি প্রকাশ করে বলে ভাষা সম্পর্কে আগ্রহী ব্যক্তিকে ব্যাকরণ পাঠ করতে হয়। ব্যাকরণ সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা না থাকলে ভাষা চেষ্টা করে আয়ত্ত করা গেলেও সুষ্ঠু রূপে প্রয়োগ করা যায় না। ব্যাকরণ পাঠ বা ব্যাকরণ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন ভাষার গঠন-বিধি এবং তার বিশুদ্ধ প্রয়োগের কলাকৌশল শিক্ষা দেয়। ব্যাকরণ জানা থাকলে ভাষার ভুল-ভ্রান্তি সম্পর্কে সচেতন থাকা যায়। সাহিত্যের রস উপভোগ করতে হলে ভাষার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। বিশেষ ধরনের শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে কবি-সাহিত্যিকগণ সাহিত্যে রস সঞ্চার করেন। শব্দের এ কুশলী ব্যবহার ব্যাকরণের বাইরে নয়। ছন্দ আর অলঙ্কার সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। ব্যাকরণে এসব বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করা হয়।

ব্যাকরণের গুরুত্ব সম্পর্কে ড. মুহম্মদ এনামুল হক বলেছেন, 'আলো, জল, বিদ্যুৎ, বাতাস প্রভৃতি সম্বন্ধীয় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্য না জানিয়াও মানুষ বাঁচিয়াছে, বাঁচিতেছে ও বাঁচিবে। কিন্তু, তাই বলিয়া ঐ সমস্ত বস্তুর বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্যকে মানুষ অস্বীকার করিয়া বর্তমান সভ্যতার গগনচুম্বী সৌধ নির্মাণ করিতে পারে নাই। ব্যাকরণ না জানিয়াও ভাষা চলিতে পারে; কিন্তু ভাষাগত সভ্যতা না হউক, অন্তত ভব্যতার পত্তন বা সমৃদ্ধি হইতে পারে না। ব্যাকরণ না জানিলে ভাষাগত আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইতে হয় বলিয়া ভাষা উন্নত-প্রকৃতির ভাবের বাহন হইয়া শালীনতা সম্পন্ন সাহিত্যের সৃষ্টি করিতে পারে না। এই জন্যই শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে ব্যাকরণ-সম্বন্ধীয় সাধারণ জ্ঞানের সহিত বিশেষ জ্ঞানও আবশ্যক।' অতএব আমরা বলতে পারি- শিল্পী, সাহিত্যিক, সাহিত্যরসিক, এমনকি একজন সরকারি কর্মকর্তা বা করণিক এবং ব্যবসায়ী সকলেরই ব্যাকরণ পাঠ অবশ্যই প্রয়োজন। এই আলোচনা থেকে সিদ্ধান্ত হিসেবে বলা যায়-

- ব্যাকরণের মাধ্যমে ভাষার বিভিন্ন উপাদানের প্রকৃতি ও স্বরূপ বিশ্লেষণ করা যায়।
- ব্যাকরণ ভাষার বিভিন্ন উপাদানের সম্পর্ক নির্ণয়ে সহায়তা করে।
- ব্যাকরণ ভাষার বিভিন্ন উপাদানের গঠন-প্রকৃতি এবং সেসবের ব্যবহার বিধি সম্পর্কে ধারণা দেয়।
- ব্যাকরণ সাহিত্যের রস আস্বাদন করতে সহায়তা করে।
- ব্যাকরণ ভাষার বিশুদ্ধ প্রয়োগের কলাকৌশল সম্পর্কে উপযুক্ত শিক্ষা দেয় এবং ভাষার ভুল-ভ্রান্তি সম্পর্কে সচেতন করে তোলে।

ব্যাকরণ শিক্ষাদান পদ্ধতি

ব্যাকরণ পাঠদানকে অর্থবহ করে তোলার জন্য শিক্ষক বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারেন। নিচে পদ্ধতিগুলোর বিশেষ দিক আলোচনা করা হলো।

পাঠ্যপুস্তক পদ্ধতি

আমাদের প্রচলিত শিক্ষাক্রম অনুযায়ী ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে পৃথক বিষয় হিসেবে ব্যাকরণ পাঠ করা হয়। শ্রেণির উপযোগী ব্যাকরণের বিষয়গুলো এতে সন্নিবেশিত হয়। পাঠ্যপুস্তকে বিষয়ের পর্যায়ক্রম অনুযায়ী পাঠ্যবস্তু উপস্থাপন করা হয়। এক্ষেত্রে পাঠপুস্তকই

ব্যাকরণ পঠন-পাঠনের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। শিক্ষার্থীরা পুস্তক নির্ভরশীল হয়ে পড়ে বলে এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের মুখস্থ করার প্রবণতা বাড়ে।

সূত্রভিত্তিক পদ্ধতি

ব্যাকরণ শিক্ষাদানের এই পদ্ধতি সুপ্রাচীন। এতে পাঠের শুরুতে শিক্ষক সূত্র উপস্থাপন করেন এবং সূত্র মুখস্থ করার ওপর জোর দেন। ফলে শিক্ষার্থীরা না বুঝে সূত্র মুখস্থ করে এবং বিভিন্ন সূত্র অনুযায়ী উদাহরণও মুখস্থ করে। ফলে ব্যাকরণের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়টি তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। তখন ব্যাকরণ পাঠ শিক্ষার্থীর কাছে একটি কঠিন ও নিরস বিষয় হিসেবে পরিগণিত হয়। এ পদ্ধতি সহজেই ব্যাকরণের প্রতি শিক্ষার্থীদের প্রতিকূল মনোভাব সৃষ্টি করে।

ভাষাভিত্তিক পদ্ধতি

এ পদ্ধতিতে শ্রেণিকক্ষে ব্যবহৃত বাংলা পাঠপুস্তক ও পঠিত বিষয় অবলম্বনে প্রশ্নোত্তর ও আলোচনার মধ্য দিয়ে ভাষার প্রায়োগিক শুদ্ধতা এবং বিশ্লেষণ করা হয়। এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা সক্রিয় থাকে। ফলে পাঠে আনন্দ ও আগ্রহ সৃষ্টি হয়। এ পদ্ধতিতে শিক্ষাদানে শিক্ষকের পূর্বপ্রস্তুতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য।

প্রসঙ্গক্রমিক পদ্ধতি

শিক্ষক উপযুক্ত প্রসঙ্গের অবতারণার মধ্য দিয়ে ব্যাকরণের বিষয়গুলোকে সুকৌশলে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করেন। শিক্ষক সুনির্দিষ্ট প্রসঙ্গ নির্বাচন করে ব্যাকরণের নিয়মগুলো শেখানোর প্রয়াস পান। প্রসঙ্গক্রমিক পদ্ধতিতে ব্যাকরণ পাঠ শিক্ষার্থীদের নিকট একটি সরস ও আকর্ষণীয় বিষয়রূপে পরিগণিত হয়। তবে ব্যাকরণের অপেক্ষাকৃত জটিল বিষয়গুলো শিক্ষাদানে যথার্থ প্রসঙ্গ খুঁজে পাওয়া শিক্ষকের জন্য কষ্টকর হয়ে পড়ে।

বিশ্লেষণ পদ্ধতি

এ পদ্ধতি অবলম্বনে শিক্ষার্থীদের সামনে কতকগুলো দৃষ্টান্ত বা উদাহরণ উপস্থাপন করা হয়। শিক্ষার্থীরা উদাহরণগুলো বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে একটি সাধারণ সূত্রে উপনীত হয়। এটি আরোহ পদ্ধতির সমতুল্য। বিশেষ থেকে সাধারণে গমনই এ পদ্ধতির উদ্দেশ্য। এ পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ব্যাকরণের নিয়ম কানুন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করে এবং ভাষা প্রয়োগে আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে ওঠে। শিক্ষার্থী পাঠে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ লাভ করে বলে পাঠটি তাদের কাছে অত্যন্ত আনন্দদায়ক হয়।

গাঠনিক পদ্ধতি

বিক্ষিপ্তভাবে ভাষা না শিখিয়ে গঠনমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে ভাষা শেখানোকে গাঠনিক পদ্ধতি বলে। ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি সনাতন পদ্ধতি বলে পরিগণিত। ভাষাজ্ঞান বিকাশের ক্ষেত্রে সযত্নে পর্যায়ক্রমে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। প্রথমে শব্দ শিখিয়ে পরে ঐ শব্দের বিভিন্ন ব্যবহার শেখানো, সরল বাক্য শিখিয়ে ধীরে ধীরে জটিল বাক্য ও যৌগিক বাক্য শেখানো এবং সব ধরনের বাক্যে ঐ শব্দের প্রয়োগ শেখানো এই পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য। এভাবে গঠনমূলক সুশৃঙ্খলাকে প্রাধান্য দিয়ে এ পদ্ধতির ব্যবহার ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে এক সময়ে যথেষ্ট কার্যকর ছিল। ভাষাকে ব্যাকরণগত, উচ্চারণগত ও মৌখিক দক্ষতার মাধ্যমে উপস্থাপনের চেষ্টা এই পদ্ধতিতে করা হয়। মৌখিকের চেয়ে লেখার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি বেশি প্রযোজ্য। ভাষার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি দীর্ঘমেয়াদি পদ্ধতি বলে অভিহিত। প্রতিটি শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে যত্ন নিয়ে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে ভাষা শেখানো সময় সাপেক্ষ বলে এই পদ্ধতির প্রচলন বর্তমানে নেই বললেই চলে।

আরোহ পদ্ধতি

উদাহরণ থেকে সূত্রে, জানা থেকে অজানায়, সহজ থেকে কঠিন বিষয়ে, বিশেষ সত্য থেকে সাধারণ সত্যে এবং মূর্ত থেকে বিমূর্ত বিষয়ে গমন এ পদ্ধতির ভিত রচনা করে। এতে প্রথমে কতকগুলো উদাহরণ তুলে ধরা হয়। শিক্ষার্থীরা উদাহরণগুলোকে বিশ্লেষণ করে একটি নির্দিষ্ট সূত্রে উপনীত হয়। অর্থাৎ এখানে শিক্ষার্থীরা নিজেই ব্যাকরণের নিয়ম গড়ে তোলার সুযোগ পেয়ে থাকে। এ পদ্ধতিতে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পরিচিত পরিবেশ থেকে উদাহরণের শব্দগুলো বাছাই করে নিয়ে পাঠে অগ্রসর হন। ফলে ব্যাকরণ একটি আনন্দদায়ক ও কার্যকর পাঠ্যবিষয় রূপে পরিগণিত হয়। এ পদ্ধতির মূলকথা হলো, উদাহরণ থেকে সূত্রে উপনীত হওয়া। ব্যাকরণের বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন উদাহরণ শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করে সেগুলো বিশ্লেষণের মাধ্যমে

সাধারণ সত্য/নিয়ম/সূত্র/সংজ্ঞা আবিষ্কার করাই হচ্ছে আরোহ পদ্ধতি। পদ্ধতিটিকে সংক্ষেপে নিম্নরূপে দেখানো যেতে পারে।

উদাহরণ উপস্থাপন - উদাহরণ বিশ্লেষণ - সূত্র গঠন

অবরোহ পদ্ধতি

অবরোহ পদ্ধতি আরোহ পদ্ধতির সম্পূর্ণ বিপরীত প্রক্রিয়া। বাংলাদেশের পাঠ্যপুস্তকে ব্যাকরণের বিষয়বস্তু দীর্ঘকাল অবরোহ পদ্ধতিতে বিন্যস্ত ছিল। বর্তমানে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আরোহ পদ্ধতির প্রয়োগে পাঠ্যপুস্তকে ব্যাকরণের বিষয়বস্তু বিন্যাসের প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। অবরোহ পদ্ধতিতে পাঠপুস্তকের বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট সংজ্ঞা/সূত্র/নিয়মটি আগে বলে দিয়ে/মুখস্থ করিয়ে পরে এই নিয়ম বা সংজ্ঞা বা সূত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত উদাহরণ উপস্থাপন করা হয় বলে শিক্ষার্থীদের কাছে মুখস্থনির্ভরতা প্রাধান্য পায়।

সংজ্ঞা - মুখস্থ করানো - উদাহরণ উপস্থাপন

দেখা যাচ্ছে, আরোহ পদ্ধতি শিক্ষণ বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি। পক্ষান্তরে অবরোহ পদ্ধতিটি মুখস্থনির্ভর পদ্ধতি। তাই পাঠ্যপুস্তক অবরোহ পদ্ধতিতে লিখিত হলেও ব্যাকরণের পাঠ হওয়া উচিত আরোহ পদ্ধতিতে। কিন্তু আরোহ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর অনুশীলনের সুযোগ না থাকায় সেটিও স্বয়ংসম্পূর্ণ পদ্ধতি হতে পারে না। এ পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাকরণ পাঠদানের ক্ষেত্রে একাধিক পদ্ধতির সমন্বয় সাধন আবশ্যক। সেক্ষেত্রে শ্রেণিতে আরোহ পদ্ধতি প্রয়োগের ধারাবাহিতায় সূত্র গঠনের পর শিক্ষার্থীদের সূত্রের আলোকে নতুন উদাহরণ নির্বাচনের সুযোগ দেওয়া যেতে পারে। তখন নতুন এই পদ্ধতির নাম হতে পারে আরোহ-অবরোহ পদ্ধতি। সত্যিকার অর্থে আরোহ ও অবরোহ পদ্ধতির সমন্বয়ে ব্যাকরণ পাঠ দেওয়াটাই সমীচীন। Wren যথার্থই বলেছেন, Teach grammar inductively and practice it deductively. অর্থাৎ ব্যাকরণ পড়াতে হবে আরোহ পদ্ধতিতে কিন্তু শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করাতে হবে অবরোহ পদ্ধতিতে। এই পদ্ধতির পর্যায়ক্রম হতে পারে নিম্নরূপ–

- উদাহরণ উপস্থাপন
- উদাহরণ বিশ্লেষণ
- সূত্র/নিয়ম/সংজ্ঞা গঠন
- সূত্র প্রয়োগ/নতুন উদাহরণ সংগ্রহ
- ফলাবর্তন

উপর্যুক্ত পর্যায়ক্রম অনুসরণ করে তথা আরোহ-অবরোহ পদ্ধতির সমন্বয়ে ব্যাকরণ পাঠ দিলে শ্রেণিপাঠ শিক্ষার্থীদের কাছে আনন্দদায়ক হয়ে উঠবে, মুখস্থনির্ভরতা কমবে, শিক্ষাদান প্রক্রিয়াটি কৃত্রিমতা ও যান্ত্রিকতা মুক্ত হবে। জানা থেকে অজানার, মূর্ত থেকে বিমূর্তে, সহজ থেকে কঠিনে, নিকট থেকে দূরের যাত্রায় ধাবিত হয়ে শিক্ষার্থী ব্যাকরণকে আর প্রভু মনে করবে না। ব্যাকরণ তার কাছে হয়ে যাবে ভৃত্য। তাই ব্যাকরণ পাঠদানের সমন্বিত এই পদ্ধতিই কার্যকর পদ্ধতি। তবে ব্যাকরণ পাঠদানে এ পদ্ধতিকে অধিকতর কার্যকর করার ক্ষেত্রে কর্মপত্রের ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। নিচে কর্মপত্রের কয়েকটি নমুনা প্রদত্ত হলো।

ব্যাকরণ পাঠদানে ব্যবহার-উপযোগী কর্মপত্র

কর্মপত্র ১: বাক্যের গঠনগত শ্রেণিবিভাগ

সরল, জটিল ও যৌগিক বাক্যের নিম্নবর্ণিত বৈশিষ্ট্যসমূহ মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ কর। এরপর নিচের ছকের ফাঁকা কলাম দুটি দলীয় চিন্তার সমন্বয়ে পূরণ কর।

সরল বাক্য	জটিল বাক্য	যৌগিক বাক্য
১. একটি উদ্দেশ্য ও একটি বিধেয় থাকে এবং এদের সম্প্রসারক থাকতে পারে। ২. একটি মাত্র সমাপিকা ক্রিয়া থাকে।	১. একটি প্রধান খণ্ডবাক্য থাকে (উদ্দেশ্য ও বিধেয়যুক্ত) ২. এক বা একাধিক আশ্রিতবাক্য থাকে। ৩. উভয়ের মধ্যে সাপেক্ষভাব বর্তমান থাকে। ৪. আশ্রিত বাক্যাংশটি বিশেষ্য, বিশেষণ বা ক্রিয়া বিশেষণধর্মী হয়। ৫. আশ্রিত অংশে সমাপিকা ক্রিয়া থাকে না; থাকলেও- যে, যেরূপ, যেমন, এমন, তেমন প্রভৃতি অব্যয় যোগে গঠিত হয়।	১. সরল-সরল/সরল-মিশ্র/মিশ্র-যৌগিক/সরল-যৌগিক বাক্য যোগে গঠিত হয়। ২. উভয়ের মধ্যে নিরপেক্ষভাব পরিলক্ষিত হয়। ৩. এবং, ও, আর, কিন্তু, বরং, তথাপি প্রভৃতি অব্যয় ব্যবহৃত হয়।

বাক্যের উদাহরণ	লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য	বাক্যের নাম
১. তিনি বাজারে যাবেন ও ছেলেকে সঙ্গে নিবেন।		
২. সে প্রতিদিন স্কুলে যায়।		
৩. মনে হয় বৃষ্টি হবে।		
৪. তুমি গেলে সে যাবে, কিন্তু সে খবর পাঠিয়েছে যে তার আসতে দেরি হবে।		
৫. তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরবেন বলে তিনি চটপট কাজ শেষ করলেন।		
৬. বৃষ্টি পড়ে।		
৭. যে খেলনাটি কাল আনা হয়েছিল; আজই তা হারিয়ে গেছে।		
৮. তার প্রতি এমন অবিচার করলে ফল ভালো হবে না।		

কর্মপত্র ২ : বাক্যের অর্থগত শ্রেণিবিভাগ

অর্থের বিচারে বাক্যকে নির্দেশাত্মক, প্রশ্নবাচক, ইচ্ছা/প্রার্থনা সূচক, আদেশমূলক, শর্তমূলক, সন্দেহমূলক ও বিস্ময়সূচক- এই সাত ভাগে ভাগ করা যায়। জোড়ায় চিন্তা করে নিচের বাক্যগুলোর ডানের কলামে সংশিষ্ট নামটি লিখ ও পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন কর।

উদাহরণ	বাক্যের নাম	পক্ষে যুক্তি
১. তোমাকে দিয়ে আর কাজটা হলো না। ২. ওঃ কী অপূর্ব দৃশ্য! ৩. হয়ত তিনি এতক্ষণে বাড়ি পৌঁছে থাকবেন। ৪. যদি সাতটার মধ্যে না আসি তবে আর আমার অপেক্ষায় থেকো না। ৫. তুমি এখনি এখান থেকে চলে যাও। ৬. তুমি সুখী হও। ৭. তুমি কী বলতে চাও? ৮. আমি আজ বাড়ি যাব।		

কর্মপত্র ৩ : সাধু ভাষারীতির বৈশিষ্ট্য

বর্ণিত অনুচ্ছেদটি মনোযোগ দিয়ে পড় এবং এর নিচে সাধু ভাষারীতির প্রতিটি দিকের দুটি করে উদাহরণ নির্বাচন করে পাশে লেখ।

'বালকদিগের সর্দার ফটিক চক্রবর্তীর মাথায় চট করিয়া একটা নতুন ভাবোদয় হইল। নদীর ধারে একটা প্রকাণ্ড শালকাষ্ঠ মাস্তুলে রূপান্তরিত হইবার প্রতীক্ষায় পড়িয়াছিল; স্থির হইল; সেইটা সকলে মিলিয়া গড়াইয়া লইয়া যাইবে। যে ব্যক্তির কাষ্ঠ, আবশ্যককালে তাহার যে কতখানি বিস্ময়, বিরক্তি এবং অসুবিধা বোধ হইবে, তাহাই উপলব্ধি করিয়া বালকেরা এই প্রস্তাবে সম্পূর্ণ অনুমোদন করিল।'

তৎসম শব্দ	-	সমাপিকা ক্রিয়া	-
সমাসবদ্ধ শব্দ	-	অসমাপিকা ক্রিয়া	-
যুক্তাক্ষরযুক্ত শব্দ	-	বিশেষণ পদ	-
সর্বনাম পদ	-	বিশেষ্য পদ	-
'ল' ধাতুজাত ক্রিয়া	-	জটিল বাক্য	-

ব্যাকরণ পাঠদানের পর্যায়ক্রম

শ্রেণিতে বাংলা ব্যাকরণ পাঠদানের ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর উপস্থাপন অংশের একটি সাধারণ পর্যায়ক্রম রয়েছে। পর্যায়ক্রমটি নিম্নরূপ–

১. উদাহরণ উপস্থাপন
২. উদাহরণ বিশ্লেষণ
৩. সূত্রগঠন
৪. শিক্ষার্থীদের অনুশীলন
৫. শিক্ষকের ফলাবর্তন

পাঠদানের ক্ষেত্রে শিক্ষক তার নিজের সুবিধা এবং বিষয়বস্তুর প্রকৃতি বিবেচনায় রেখে বিভিন্ন কলাকৌশল নির্বাচন করতে পারেন। তবে কলাকৌশল তিনি যা-ই নির্বাচন করুন না কেন; খেয়াল রাখতে হবে যেন ঐ কলাকৌশলের মধ্যদিয়ে উপস্থাপনের প্রতিটি শীর্ষে পূর্বোল্লিখিত পর্যায়ক্রমের প্রয়োগ হয়। একটি পাঠের উপস্থাপন অংশকে শিক্ষক শুরুতে কয়েকটি শীর্ষে ভাগ করে নিবেন। যেমন পাঠটি যদি সন্ধি-১ হয় তবে এর শীর্ষগুলো হতে পারে-

শীর্ষ- ক : সন্ধির সংজ্ঞা

শীর্ষ- খ : সন্ধির প্রকার

শীর্ষ- গ : স্বরসন্ধির অ/আ কার সম্পর্কিত নিয়ম

প্রতিটি শীর্ষে শিক্ষক তার সুবিধামতো কলাকৌশল প্রয়োগে সময় অনুসারে নিম্নবর্ণিত কাজগুলো করতে পারেন।

শীর্ষ- গ : স্বরসন্ধির অ/আ কার সম্পর্কিত নিয়ম ---------- ২০মি.

কাজের নাম	শিক্ষকের করণীয়	শিক্ষার্থীর করণীয়	সময়
১. উদাহরণ উপস্থাপন	শীর্ষের নামসংশ্লিষ্ট কতিপয় উদাহরণ নিজে উল্লেখ করা/ শিক্ষার্থীদের উল্লেখ করতে বলা ও বোর্ডে লেখা।	শীর্ষসংশ্লিষ্ট উদাহরণ উল্লেখ করা ও বোর্ডে লিখিত তথ্য খাতায় লেখা।	২ মি.
২. উদাহরণ বিশ্লেষণ	উপস্থাপিত উদাহরণগুলোর স্বরূপ/প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা। (বোর্ড/পোস্টার পেপার)	বিশ্লেষিত স্বরূপ/প্রকৃতি অনুধাবন করা।	৩ মি.
৩. সূত্র গঠন	বিশ্লেষিত স্বরূপ উপলব্ধি করে সংজ্ঞা/সূত্র শিক্ষার্থীদের লিখতে বলা।	সংজ্ঞা/সূত্র খাতায় লেখা।	৪ মি.
৪. শিক্ষার্থীদের অনুশীলন	গৃহীত সিদ্ধান্ত/সূত্র/সংজ্ঞার প্রয়োগমূলক কাজের নির্দেশ প্রদান।	সিদ্ধান্ত/সূত্র/সংজ্ঞা বিভিন্ন প্রকার প্রয়োগমূলক কাজ দলীয়/একক/জোড়ায় করা।	৮ মি.
৫. শিক্ষকের ফলাবর্তন	শিক্ষার্থীদের অনুশীলনমূলক কাজের ফলাবর্তন প্রদান।	শিক্ষকের ফলাবর্তনের সাথে মিলিয়ে ত্রুটি সংশোধন করে নেওয়া।	৩ মি.

ব্যাকরণ পাঠে ব্যবহৃত কৌশলসমূহ

ব্যাকরণ পাঠে অংশগ্রহণমূলক যে পদ্ধতিই শিক্ষক ব্যবহার করুন না কেন- পদ্ধতির সম্পূরক নিম্নবর্ণিত একাধিক কৌশলও তিনি শ্রেণিতে প্রয়োগ করতে পারেন-

কৌশল	শিক্ষকের করণীয়
১. শ্রেণিকরণ	• শিক্ষার্থীদের কাছে এলোমেলোভাবে মিশ্রিত একগুচ্ছ তথ্য উপস্থাপন করা। • জোড়ায়/দলে চিন্তা করে এগুলো শ্রেণিকরণ করতে বলা।
২. পাঠ্যপুস্তক বিশ্লেষণ	• বিভিন্ন প্রকার উদাহরণ আহরণের জন্য পাঠ্যপুস্তকের ভিতরে অনুসন্ধান করতে বলা।
৩. পোস্টার উপস্থাপন	• অর্জিত ধারণাসমূহের রূপরেখা পোস্টারে লিখে উপস্থাপন করতে বলা ।
৪. তুলনামূলক বৈষম্য অনুসন্ধান	• বিভিন্ন উদাহরণ শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করে তুলনা করা। • জোড়ায় চিন্তা করে দুটি উদাহরণের তুলনা করে বৈষম্যসমূহ/পার্থক্যগুলো চিহ্নিত করতে বলা ।
৫. সত্য-মিথ্যা	• পাঠসংশ্লিষ্ট বিবৃতি শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করা। • বিবৃতিগুলো সত্য না-কি মিথ্যা, মিথ্যা হলে কেন মিথ্যা তা শিক্ষার্থীদের দলে চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নিতে বলা।
৬. ত্রুটি শনাক্তকরণ	• পাঠসংশ্লিষ্ট কিছু ত্রুটিপূর্ণ বিবৃতি শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপনা করা। • শিক্ষার্থীদের ত্রুটিগুলো শনাক্ত করতে এবং সংশোধনের প্রয়োজনীয় সুপারিশ করতে বলা।

আশা করা যায়, শিক্ষক বিষয়বস্তুর সাথে মিল রেখে পাঠদানের পদ্ধতি, পাঠের পর্যায়ক্রম, কর্মপত্র ও কৌশলসমূহ নির্বাচন করে ব্যাকরণ পাঠদান করলে গতানুগতিকতা দুর হয়ে শ্রেণিতে আকর্ষণীয় ও আনন্দঘন পরিবেশের সৃষ্টি হবে; শিক্ষার্থীর শিখন হবে দীর্ঘস্থায়ী ও অর্থপূর্ণ।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. পোস্টবক্স পদ্ধতি ব্যবহারের অসুবিধা কী?
২. জিগসো পদ্ধতির প্রশ্নের ধরন কেমন হবে?
৩. নেমেসিস নাটকটির বিশেষত্ব কী?
৪. সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহকে আধুনিক নাট্যকার বলা হয় কেন?
৫. স্বাধীনতা উত্তর বাংলা নাটকে পরিলক্ষিত প্রবণতাসমূহ উল্লেখ করুন।
৬. কবিতাকে রূপময় অভিব্যক্তি বলা হয় কেন?
৭. ছন্দভেদে মাত্রা গণনার ভিন্নতা উল্লেখ করুন।
৮. শ্বাসাঘাত কাকে বলে? উদাহরণ দিন।
৯. কবিতা পাঠদানে আবৃত্তিকে অধিকতর গুরুত্ব দেওয়ার কারণ কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. নাটকের সংজ্ঞা দিন। বাংলা নাটকের বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যাখ্যা করুন। শ্রেণিতে নাটক পাঠদানের কলাকৌশলসমূহের বর্ণনা দিন।
২. বাংলা নাট্যসাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশধারার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।
৩. কবিতার সংজ্ঞা দিন। কবিতায় ব্যবহৃত শব্দ ও অর্থগত অলঙ্কারের পরিচয় দিন।
৪. বাংলা কবিতায় ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার ছন্দের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করুন।
৫. ছোটগল্পের সংজ্ঞা দিন। ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যাখ্যা করুন।
৬. বাংলা উপন্যাসের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আলোকপাত করুন। উপন্যাস পাঠদানের পদ্ধতি বর্ণনা করুন।
৭. আরোহ, অবরোহ ও গাঠনিক পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন। বাংলা ব্যাকরণের পাঠ উপস্থাপনে কোন পদ্ধতিটি কতটুকু কার্যকর? যুক্তিসহ আলোচনা করুন।

ইউনিট ৪ : বাংলা শিক্ষা উপকরণ

'One Picture is worth than ten thousand words'. একটি ছবি দশ হাজার শব্দের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ। চীন দেশের এই প্রবাদ বাক্যটি হয়তো বা অতিরঞ্জিত মনে হতে পারে। কিন্তু শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে 'ছবি' যে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে- সে কথা বিবেচনায় নিলে অতিরঞ্জিত মনে না হওয়াটাই স্বাভাবিক। শুধু ছবি নয়; অন্য যে কোনো শিক্ষা উপকরণের ক্ষেত্রেও কথাটি প্রযোজ্য হতে পারে। শ্রেণিকক্ষে আনন্দদায়ক, চিত্তাকর্ষক ও কার্যকর পাঠ উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষা উপকরণের ভূমিকা অপরিসীম। শিক্ষা উপকরণ বিমূর্ত বিষয়কে মূর্ত করে শিক্ষার্থীর ধারণার জগৎকে সমৃদ্ধ করে; পাঠের বিষয় সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞানার্জনে সহায়তা করে বলে শিখন-কার্যক্রমে শিক্ষার্থীর মনোযোগ বৃদ্ধি পায়; ফলে শিখন দীর্ঘস্থায়ী হয়।

বাংলা বিষয়ের শিখন কার্যক্রমকে ফলপ্রসূ করে তোলার জন্য শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের বিকল্প নেই। তাই এ বিষয়ের শিক্ষকের কাছে প্রত্যাশা, তিনি বিষয়সংশ্লিষ্ট উপকরণ সংগ্রহের অভ্যাস গড়ে তুলবেন, প্রয়োজনীয় উপকরণের তালিকা তৈরি করবেন, তালিকা অনুযায়ী উপকরণ সংগ্রহ করবেন, শ্রেণিকক্ষে কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করবেন ও ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য তা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করবেন। মনে রাখা আবশ্যক, শিখনের ক্ষেত্রে শিক্ষা উপকরণের কার্যকারিতা অনেকখানিই নির্ভর করে উপকরণ নির্বাচন ও তার ব্যবহারের যথার্থতার উপর। সে বিবেচনায়, এ অধ্যায়ের তিনটি পাঠে নিম্নবর্ণিত দিকসমূহ আলোকপাত করা হয়েছে।

৪.১: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষণে বিভিন্ন উপকরণের ব্যবহার

৪.২: শিক্ষা উপকরণ উন্নয়ন: বিবেচ্য দিকসমূহ

৪.৩: শিক্ষা উপকরণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার

৪.১ : বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষণে বিভিন্ন উপকরণের ব্যবহার

শিক্ষা উপকরণ

পাঠকে শিক্ষার্থীদের কাছে সহজবোধ্য, আকর্ষণীয় ও কর্মতৎপরতামূলক করার জন্য শ্রেণিতে শিক্ষক যেসব বস্তুগত সামগ্রী ব্যবহার করেন সেগুলোই শিক্ষা উপকরণ। তবে বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতার কারণে এই দ্রব্যসমূহের কোনোটিকে সহায়ক সামগ্রী (Instructional Materials) আর কোনোটিকে শিক্ষা উপকরণ (Teaching Aids) বলা হয়। যেসব বস্তুগত ও অবস্তুগত উপাদান পাঠের বিষয়বস্তুর ধারণা প্রদান বা লাভে প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীকে সহায়তা করে ও দিক-নির্দেশনা দেয় সেগুলোই সহায়ক সামগ্রী (Instructional Materials)। যেমন– পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক-নির্দেশিকা, প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, ওয়ার্ক-বুক, তথ্যপুস্তিকা, মডেল, মানচিত্র, ফিল্ম, ভিডিও, ডিজিটাল কন্টেন্ট, তথ্য-পোস্টার, তালিকা, অনুচিত্র, শিক্ষকের ফিডব্যাক সামগ্রী, তথ্যছক, ছবি, নমুনা, বাস্তব দ্রব্যাদি ইত্যাদি। অন্যদিকে যেসব বস্তুগত উপাদান পাঠদানের ক্ষেত্রে পাঠের বিষয়বস্তু অনুধাবণে প্রত্যক্ষ কোনো ভূমিকা না রাখলেও শ্রেণিতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর কাজে সহায়তা করে সেগুলোকে শিক্ষা উপকরণ (Teaching Aids) বলে। যেমন; চক, ডাস্টার, চকবোর্ড, বুলেটিন বোর্ড, মাল্টিমিডিয়া, পোস্টার পেপার, ফ্লাশ কার্ড, কম্পিউটার, ওভারহেড প্রজেক্টর প্রভৃতি।

শিক্ষা উপকরণের প্রকারভেদ

শিক্ষা উপকরণ বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। তবে ব্যবহারিক উপযোগিতার ভিত্তিতেই এই শ্রেণিভাগ করা হয়ে থাকে।

শ্রবণভিত্তিক : রেডিও, টেপরেকর্ডার, মাইক্রোফোন, মোবাইল, কম্পিউটার সাউন্ডসিস্টেম প্রভৃতি;

দর্শনভিত্তিক : বিভিন্ন প্রকার মডেল, পাঠ্যপুস্তক, কর্মপত্র, চার্ট, বোর্ড, বুলেটিন বোর্ড, অঙ্কিত চিত্র, ফ্লিপচার্ট, বাস্তববস্তু, মাল্টিমিডিয়া সিস্টেম, ম্যাপ, পোস্টার পেপার, ফটোগ্রাফ, স্লাইড প্রজেক্টর, পোস্টার, নকশা, ম্যাগাজিন, জার্নাল, ছবি, ভূগোলক, মানচিত্র, রেখাচিত্র, ধারণা মানচিত্র প্রভৃতি;

শ্রবণ-দর্শনভিত্তিক : টেলিভিশন, ভিসিপি, মনিটর, কম্পিউটার, চলচ্চিত্র, পাওয়ার পয়েন্ট সিস্টেম প্রভৃতি;

কর্মসম্পাদনমূলক : দর্শনীয় ব্যক্তি, বস্তু, স্থান, প্রতিষ্ঠান, পরিবেশ, প্রকৃতি, গ্রন্থাগার, সেমিনার, কর্মশালা, মেলা, খামার, মিউজিয়াম, প্রভৃতি;

অনুসন্ধানমূলক : বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক সামগ্রী, পরিমাপক ও পরীক্ষণ যন্ত্র প্রভৃতি;

শিক্ষা-প্রযুক্তি নির্ভর : অডিও/ভিডিও কনফারেন্স, প্রোগ্রামভিত্তিক শিক্ষণ, ই-মেইল, ইন্টারনেট, নেটওয়ার্কিং, শিক্ষক বাতায়ন, শিক্ষামূলক ওয়েবসাইড, ব্লগ, ফেসবুক, সেলফোন, ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর প্রভৃতি।

মূল্যমানের দিক থেকে শিক্ষা উপকরণকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

অধিক মূল্যের : মাল্টিমিডিয়া, ভিসিডি, চলচিত্র

স্বল্পমূল্যের : চার্ট, পোস্টার, চিত্র, মানচিত্র, মডেল, গ্লোব

বিনামূল্যের : ক্যালেন্ডারের দৃশ্য, খাদ্যশস্য, অর্থকরি ফসল

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পাঠদানের ক্ষেত্রে ব্যবহার উপযোগী বিভিন্ন উপকরণ

উপরে উল্লিখিত প্রায় সকল উপকরণই বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পাঠদানের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়। তবে উপকরণ ব্যবহার যেহেতু নির্ভর করে পাঠের বিষয়বস্তু, বিষয়বস্তুর কাঠিন্য, শিখনফল, পাঠদানের পদ্ধতি ও কৌশল, শিক্ষার্থীর বয়স ও আগ্রহ, শ্রেণিকক্ষের বাস্তবতা প্রভৃতির উপর- তাই বিষয়ভিন্নতার কারণে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য (গদ্য ও কবিতা) পাঠদানের বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যবহার উপযোগী উপকরণের তালিকাটি নিম্নরূপ হতে পারে।

পাঠ ঘোষণায়	ছবি, পাওয়ার পয়েন্ট সিস্টেম, অডিও ক্লিপ, ভিডিও ক্লিপ, অঙ্কিতচিত্র, বাস্তববস্তু, পোস্টার, চকবোর্ড/হোয়াইট বোর্ড, পাঠ্যপুস্তক
লেখক/কবি পরিচিতিতে	ছবি, পাওয়ার পয়েন্ট সিস্টেম, অডিও ক্লিপ, ভিডিও ক্লিপ, সেলফোন, তথ্যপত্র, চার্ট, ধারণা মানচিত্র, আর্ট/পোস্টারপেপার, চকবোর্ড/হোয়াইট বোর্ড, পাঠ্যপুস্তক
আদর্শ পাঠে	পাওয়ার পয়েন্ট সিস্টেম, অডিও ক্লিপ, ভিডিও ক্লিপ, সেলফোন, পাঠ্যপুস্তক
শব্দার্থ শিক্ষণে	ছবি, পাওয়ার পয়েন্ট সিস্টেম, চার্ট, তথ্যপত্র, পোস্টার, আর্ট/পোস্টারপেপার, চকবোর্ড/হোয়াইট বোর্ড, ফ্লাশকার্ড/ভিপকার্ড, বাংলা অভিধান, শব্দার্থের তালিকা, পাঠ্যপুস্তক
উচ্চারণ অনুশীলনে	পাওয়ার পয়েন্ট সিস্টেম, অডিও ক্লিপ, ভিডিও ক্লিপ, সেলফোন, পোস্টার, বানান ও উচ্চারণ অভিধান, উচ্চারণ প্রক্রিয়ার তালিকা, পাঠ্যপুস্তক
পাঠ বিশ্লেষণে	ছবি, পাওয়ার পয়েন্ট সিস্টেম, অডিও ক্লিপ, ভিডিও ক্লিপ, তথ্যপত্র, মানচিত্র, ধারণা মানচিত্র, রেখাচিত্র, ভূগোলক, চার্ট, মডেল, নকশা, অঙ্কিতচিত্র, বাস্তববস্তু, পোস্টার, আর্ট/পোস্টারপেপার, চকবোর্ড/হোয়াইট বোর্ড, ফ্লাশকার্ড/ভিপকার্ড, পাঠ্যপুস্তক
শ্রেণির কাজে	কর্মপত্র, ফলাবর্তনপত্র, আর্ট/পোস্টারপেপার, চার্ট, পাওয়ার পয়েন্ট সিস্টেম, তথ্যপত্র, চকবোর্ড/হোয়াইট বোর্ড, ফ্লাশকার্ড/ভিপকার্ড, পাঠ্যপুস্তক
পাঠ মূল্যায়নে	মূল্যায়নপত্র, প্রশ্নপত্র, পাওয়ার পয়েন্ট সিস্টেম, আর্ট/পোস্টারপেপার, চকবোর্ড/হোয়াইট বোর্ড, ফ্লাশকার্ড/ভিপকার্ড, পাঠ্যপুস্তক

শিক্ষা উপকরণের উপযোগিতা

শিক্ষা কার্যক্রমকে সক্রিয়তাভিত্তিক, সহজ, সাবলীল, বাস্তবমুখী করে তোলার জন্য শিক্ষা উপকরণের ব্যবহার অনস্বীকার্য। এর কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তু সম্পর্কে মূর্ত ধারণা লাভ করে, শিখন দীর্ঘস্থায়ী হয়, শিখনে স্বতঃস্ফূর্ততা আসে, বিষয়বস্তু আকর্ষণীয় হয়, শ্রেণির একঘেয়েমী দূর হয়। অন্যদিকে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে শিক্ষক খুব সহজে, অল্পশ্রমে, অল্পসময়ে, অল্পকথায় অনেক জটিল বিষয় শিক্ষার্থীদের সামনে অর্থপূর্ণভাবে উপস্থাপন করতে পারেন।

শিক্ষাদান পদ্ধতি আজ গতানুগতিকতার পথ পরিহার করে আধুনিক ও নতুন চিন্তাধারার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শ্রেণিপাঠে শিক্ষককেন্দ্রিকতার পরিবর্তে এসেছে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা। শিক্ষা যেহেতু ব্যক্তির অন্তর্নিহিত সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করে তাই শ্রেণিকক্ষের চার দেয়ালের মধ্যে পুস্তকসর্বস্ব শিক্ষা-ব্যবস্থা অপসৃত হয়ে শিক্ষার্থীর সক্রিয়তাভিত্তিক শিক্ষা আজ স্বীকৃত হচ্ছে। শিক্ষাকে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক করতে বিভিন্ন শিক্ষা সহায়ক উপকরণ আজ অপরিহার্য হয়ে উঠছে। তাই বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষা সহায়ক উপকরণের গুরুত্ব সর্বজনস্বীকৃত। শিক্ষা সহায়ক উপকরণ ব্যবহারে যে পাঠদান জীবন্ত হয়, ধারণা (Conception) সম্পূর্ণ (Clear) হয়, শিক্ষা আনন্দদায়ক হয় তা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর কাছেও আজ স্পষ্ট।

শিক্ষা উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার

শিক্ষা উপকরণ নির্বাচনের ক্ষেত্রে শিক্ষককে অত্যন্ত কৌশলী হতে হয়। শিক্ষার্থীর বয়স, সামর্থ্য, চিন্তা, মেধা, আগ্রহ, প্রবণতা, শিক্ষণের উদ্দেশ্য, পদ্ধতি, কলাকৌশল, সময়, ব্যবহারের প্রক্রিয়া/কৌশল, বিষয়বস্তুর সাথে সম্পৃক্ততা, ব্যবহারযোগ্যতা, শ্রেণিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা, পরবর্তী সময়ের জন্য সংরক্ষণের সুবিধা-অসুবিধা তথা উপকরণের উপযোগিতা, নির্ভরযোগ্যতা, সহজলভ্যতা প্রভৃতি দিক বিবেচনায় রেখে শিক্ষা উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার করতে হয়।

সহায়ক সামগ্রী ও শিক্ষা উপকরণের গুণগত মান উন্নয়নের জন্যও শিক্ষককে সবসময় চিন্তাশীল থাকতে হয়। শিক্ষা উপকরণ উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। ব্যবহার করতে গিয়ে যখনই কোনো সমস্যা দেখা দেয় তখন থেকেই শিক্ষককে ভাবতে হয়- কী পদক্ষেপ গ্রহণ করলে পরবর্তীতে ঐ সমস্যা এড়ানো যাবে। উপকরণ নির্বাচন ও এর ব্যবহার কৌশল উন্নয়নে শিক্ষককে প্রতিনিয়তই নিম্নলিখিত বিষয়ে চিন্তাশীল থাকা আবশ্যক-

- কী কী বিষয় নতুন সংযোজন ও বিয়োজন দরকার
- শিক্ষার্থীরা কোন দিকটিকে আনন্দের সাথে গ্রহণ করছে
- কোন দিকটি শিক্ষার্থীর কাছে বিরক্তিকর মনে হচ্ছে
- শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তু সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাচ্ছে কি না
- ব্যবহার করতে গিয়ে কী কী সমস্যা দেখা দিচ্ছে
- কী পদক্ষেপ নিলে ঐ সমস্যাসমূহ দূরীভূত হবে
- পাঠকে কীভাবে আরো সহজ ও আকর্ষণীয় করা যায়
- তথ্য-প্রযুক্তির এই যুগে কীভাবে এর উপযোগিতা আরও বাড়ানো যায়
- পরিবেশিত তথ্য কতটা যুক্তিনির্ভর, বাস্তবসম্মত ও মূর্তিমান।

শিক্ষা উপকরণ হিসেবে পাঠ্যপুস্তক

শিখন শেখানো প্রক্রিয়ার সবচেয়ে পরিচিত এবং বহুল ব্যবহৃত একটি সহায়ক সামগ্রী হচ্ছে পাঠ্যপুস্তক। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশসমূহের শ্রেণিকক্ষে যেখানে অন্যান্য শিখন-সামগ্রীর পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই, পাঠ সহায়ক উপকরণেরও যথেষ্ট অভাব রয়েছে– সেখানে পাঠ্যপুস্তকই একমাত্র ও প্রধান শিক্ষা উপকরণ হিসেবে বিবেচিত।

পাঠ্যপুস্তক লেখা হয় একটি নির্দিষ্ট শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুসরণ করে। শিক্ষার পূর্বনির্ধারিত বিষয়ভিত্তিক সাধারণ ও বিশেষ উদ্দেশ্যসমূহকে সামনে রেখে নির্বাচন করা হয় অর্জিতব্য শিখনফল। শিখনফলের নিরিখে তালিকাভুক্ত করা হয় ভাববস্তুর। ভাববস্তুর আলোকে নির্ণীত হয় বিষয়বস্তু। আর বিষয়বস্তুর সামগ্রিক চিত্র হিসেবেই লেখা হয়ে থাকে পাঠ্যপুস্তক। অর্থাৎ শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির প্রতিফলন ঘটে পাঠ্যপুস্তকে, তাই পাঠ্যপুস্তক অবলম্বন করেই শিক্ষা প্রক্রিয়া চলে। এদিক থেকেও পাঠ্যপুস্তকের গুরুত্ব অপরিসীম।

উপকরণ হিসেবে পাঠ্যপুস্তকের ব্যবহার

উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তকই যেহেতু শ্রেণিপাঠদান প্রক্রিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রী, তাই এর সফল ব্যবহারের উপরই এসকল দেশের শিক্ষার অগ্রগতি নির্ভর করে। পাঠ্যপুস্তকের সফল ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচ্য হতে পারে।

- শিক্ষককে পাঠ্যপুস্তক আদ্যোপান্ত পড়ে বিষয়বস্তু সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা নিতে হবে।
- পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতা অনুসরণ করেই পাঠ ও পাঠের ধারাবাহিক পরিকল্পনা করতে হবে।
- পাঠ্যপুস্তকের সহায়ক পুস্তক হচ্ছে শিক্ষক-নির্দেশিকা, প্রশ্ন-পুস্তিকা, বার্ষিক পাঠ-পরিকল্পনা, ওয়ার্ক বুক, শিক্ষার্থী-নির্দেশিকা প্রভৃতি। তাই নির্বাচিত পাঠের বিষয়বস্তু পাঠ করার পাশাপাশি শিক্ষককে ঐ সকল পুস্তিকার সংশ্লিষ্ট অংশ অধ্যয়ন করে নিতে হবে।

- যদি পূর্বোল্লিখিত পুস্তিকা হাতের কাছে না থাকে তবে নিজের পরিকল্পনা মতো পাঠের কার্যপ্রণালি সাজিয়ে নিতে হবে।
- পাঠের বিষয়বস্তু মনোযোগ দিয়ে পড়ে বিষয়বস্তু অনুসারী উদ্দেশ্য, শিখনফল, উপকরণ, পদ্ধতি, কলাকৌশল, পাঠের ধাপ, উপ-ধাপ, ধাপভিত্তিক শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর কাজ ও কাজের ধারাবাহিকতা নির্বাচন করতে হবে।
- শিক্ষার্থীরা শ্রেণিতে পাঠ্যপুস্তকের কোন অংশ, কখন, কীভাবে ব্যবহার করে কাজ করবে তা আগে থেকেই নির্বাচন করতে হবে।
- শিক্ষার্থীর জন্য এমনভাবে কাজ নির্বাচন করতে হবে যাতে পাঠ্যপুস্তকে উত্তর খুঁজতে গিয়ে তাকে চিন্তন ক্ষমতার অনুশীলন করতে হয়; অর্থাৎ সরাসরি উত্তর খুঁজে না পায়।
- মূলত শিক্ষার্থীরাই শ্রেণিতে পাঠ্যপুস্তক প্রত্যক্ষভাবে ব্যবহার করে থাকে। তাই শিক্ষক এমনভাবে পাঠ-পরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন যাতে এর সফল ব্যবহার নিশ্চিত হয়।
- বাংলা গদ্য ও কবিতা পাঠদানের একটি সাধারণ পর্যায়ক্রম হচ্ছে- লেখক/কবি পরিচিতি, আদর্শপাঠ, সরব পাঠ ও উচ্চারণ সংশোধন, শব্দার্থ, বিষয়বস্তুভিত্তিক সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা, বক্তৃতার আলোকে সমস্যা/কাজ প্রদান, শিক্ষার্থীদের কার্যসম্পাদন, শিক্ষার্থীদের কাজ উপস্থাপন ও শিক্ষকের ফলাবর্তন। পাঠ-পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় উপর্যুক্ত পর্যায়সমূহে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী কীভাবে পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার করবেন– তা শিক্ষক আগেই সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করে নিবেন।

পাঠ্যপুস্তক ব্যবহারের সুবিধা-অসুবিধা

সুবিধা	অসুবিধা
১. সকল শিক্ষার্থীর কাছেই পাঠ্যপুস্তক থাকে। তাই পাঠ্যপুস্তকভিত্তিক কাজ সবাইকে একক নির্দেশনার মাধ্যমেই দেওয়া যায়।	১. অংশগ্রহণমূলক পাঠদান পদ্ধতির উপযোগী করে বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের পাঠ্যপুস্তকসমূহ রচনা করা হয়নি। তাই শ্রেণি পাঠদানে এর ব্যবহারে শিক্ষককে নিজের মত করে ভেবে নিতে হয়।
২. পাঠ্যপুস্তক অনুসরণ করে পাঠ-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা শিক্ষকের জন্য একটি সহজসাধ্য কাজ।	২. পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য পাঠ্যপুস্তকে সুনির্বাচিত না থাকায় এর ব্যবহারে শিক্ষক অনেক সময় খেই হারিয়ে ফেলেন।
৩. পাঠের উদ্দেশ্য নির্বাচনের জন্য শিক্ষককে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু আগেই পড়ে নিতে হয়। ফলে তার জন্য শিক্ষাদান পরিকল্পনা সহজসাধ্য হয়ে থাকে।	৩. শিক্ষকের পরিকল্পনায় দুর্বলতা থাকলে শিক্ষার্থীরা শিখনের ক্ষেত্রে কেবল পাঠ্যপুস্তকমুখী হয়ে পড়ে। এতে শিখনের মাত্রা কমে যেতে পারে।
৪. শিক্ষার্থীর জন্য আবশ্যক তত্ত্ব ও তথ্য পাঠ্যপুস্তকেই পাওয়া যায়। তাই এটি শিক্ষার্থীর শিখনকে সহজসাধ্য করে দেয়।	৪. তত্ত্ব ও তথ্যের জন্য একমাত্র পাঠ্যপুস্তকই যথেষ্ট নয়। তাই শ্রেণিতে এর ব্যবহারে শিক্ষার্থীর অর্জন সীমিত হয়ে পড়ে।
৫. শিক্ষককে কী শেখাতে হবে এবং শিক্ষার্থীকেই বা কী শিখতে হবে এই দু'য়ের সামঞ্জস্য সাধন করে দেয় পাঠ্যপুস্তক। ফলে শিক্ষণ কাজ উভয়ের জন্যই সহজ হয়।	৫. শিক্ষার্থীরা শিখনের বিষয়বস্তু আগে থেকে জেনে যায় বিধায় শ্রেণি পাঠে তাদের আগ্রহ কমে যেতে পারে।
৬. কোনো কারণে কোনো শিক্ষার্থী ক্লাসে আসতে না পারলেও বাসায় নিজে নিজেই পাঠ্যপুস্তক পড়ে শেখার ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারে।	৬. বাসায় নিজে নিজে শেখার ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সম্ভব বলে স্কুলে আসার ব্যাপারে শিক্ষার্থীর মধ্যে উদাসীনতা দেখা দিতে পারে।
৭. পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার করেই শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতার মূল্যায়ন করা সম্ভব।	৭. নিম্নমানের পাঠ্যপুস্তক শিক্ষার্থীর জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে পারে।

শিক্ষা উপকরণ হিসেবে চকবোর্ড/হোয়াইট বোর্ড

শ্রেণিকক্ষে অধিক ব্যবহৃত শিক্ষা উপকরণটির নাম হচ্ছে চকবোর্ড/হোয়াইট বোর্ড। এটি শ্রেণিকক্ষের ভৌত ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত একটি উপাদান। এই বোর্ড বিভিন্ন ধরনের হতে পারে যেমন– স্ট্যান্ড বোর্ড, রোলার বোর্ড, দেওয়াল বোর্ড প্রভৃতি। চকবোর্ড শ্রেণির মাঝে শিক্ষার্থীদের দিকে মুখ করে স্থাপন করা হয়। শ্রেণির আয়তন অনুযায়ী চকবোর্ডের আকার নির্ধারণ করা হয় এবং দেওয়াল বা স্ট্যান্ডের সাথে এটি লাগানো থাকে।

চকবোর্ড ব্যবহারের আবশ্যকতা

প্রায় সকল দেশের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত, সবচেয়ে পরিচিত শিক্ষা উপকরণ হচ্ছে চকবোর্ড/হোয়াইট বোর্ড। শ্রেণিকক্ষে চকবোর্ড বিভিন্নমুখী উপযোগ দিয়ে থাকে। বিশেষ করে যে সকল দেশের শ্রেণিকক্ষে আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষা উপকরণ নাই সেসব দেশের শ্রেণিকক্ষের বলতে গেলে একমাত্র সহায়ক উপকরণ হচ্ছে চকবোর্ড। শ্রেণি পাঠদানে শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষণে চকবোর্ড কার্যকর ভূমিকা রাখে। শিক্ষক চকবোর্ডে পাঠের পরিচিতিমূলক সকল তথ্য লিখে থাকেন। শিক্ষার্থীদের সামনে পাঠ সংশ্লিষ্ট তথ্যসমূহ চকবোর্ডে লিখিত হলে তা তাদের দৃষ্টিগ্রাহ্য হয় এবং সহজেই বোধগম্য হয়। তথ্যকে বিশ্লেষণের জন্যও ব্যবহৃত হয় চকবোর্ড। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যে কোনো পাঠেই তথ্য বিশ্লেষণ জরুরি হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রেও চকবোর্ড প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখে।

পাঠের শেষের দিকে বাড়ির কাজ দেওয়া হয়। বাড়ির কাজ মুখে বলে দেওয়ার চেয়ে বোর্ডে লিখে দেওয়া ভালো। এতে করে কাজটি সকলের দৃষ্টিগ্রাহ্য হবে। এক্ষেত্রেও চকবোর্ড ব্যবহৃত হতে পারে। কেবল বাড়ির কাজ নয়; শিক্ষার্থীরা শ্রেণিতে যে কাজটি করবে তাও বোর্ডে লিখে দেওয়াই শিক্ষকের জন্য সহজ উপায়। এতে কর্মপত্র ছাড়াই শ্রেণিতে শিক্ষক অংশগ্রহণমূলক পাঠদান নিশ্চিত করতে পারেন।

শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের কাজ করতে দিলে ঐ কাজের দিকনির্দেশনাও সঠিকভাবে দেওয়া আবশ্যক। কারণ সঠিক দিক নির্দেশনার অভাবে শিক্ষার্থীরা কাজে খেই হারিয়ে ফেলতে পারেন এবং শ্রেণিতেও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে। এই দিক নির্দেশনার কাজটিও শিক্ষক বোর্ডের সহায়তায় করতে পারেন।

বক্তৃতা পদ্ধতির একঘেয়েমিতা দূর করতে পারে চকবোর্ডের সময়ান্তরিক ব্যবহার। শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের বক্তৃতা শ্রবণ ইন্দ্রিয় দিয়ে গ্রহণ করতে করতে প্রায়ই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তাই বক্তৃতার ফাঁকে ফাঁকে শিক্ষক যদি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ বোর্ডে লিখে লিখে অগ্রসর হন তাহলে শিক্ষার্থীদের দর্শন-ইন্দ্রিয় মাঝে মাঝে সক্রিয়া হওয়ার সুযোগ পায় বলে তাদের একঘেয়েমি, ক্লান্তি, বিরক্তি, অবসাদ প্রভৃতি দূর হয়।

বাংলাদেশের শ্রেণিকক্ষগুলোর একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শিক্ষার্থী সংখ্যার আধিক্য। এই অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীকে এক সাথে নির্দেশনা প্রদানের জন্যও চকবোর্ড সহায়তা করে থাকে। সর্বোপরি পাঠদান কার্যক্রমকে সুচারুভাবে সম্পাদনের জন্য শ্রেণিতে চকবোর্ডের কার্যকর ব্যবহার একান্ত আবশ্যক।

চকবোর্ডের কার্যকর ব্যবহার

চকবোর্ডের কার্যকর ব্যবহারের উপর শ্রেণির সাফল্য অনেকখানিই নির্ভর করে। তাই এক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়ে শিক্ষককে মনোযোগী হতে হবে।

- চকবোর্ডের লিখন হবে সুস্পষ্ট, সুন্দর এবং দৃষ্টিনন্দন। এতে শিক্ষার্থীদের কাছে বোর্ডে লিখিত তথ্য আকর্ষণীয় হয় এবং তথ্যসমূহ তাদের মনে স্থায়ী ছাপ ফেলে।
- দৃষ্টিগ্রাহ্য স্থানে দাঁড়িয়ে দৃষ্টিগ্রাহ্য আকৃতির অক্ষরে বোর্ডে লিখতে হবে যাতে বোর্ডের তথ্য দেখতে কোনো শিক্ষার্থীর কোনো সমস্যা না হয় এবং খাতায়ও তুলে নিতে পারে।
- বোর্ডের লেখা হবে সংক্ষিপ্ত এবং পয়েন্টভিত্তিক। কারণ সব কথা বোর্ডে লেখা হলে স্থানও সময়ের সংকুলান হবে না এবং বিষয়টিও দুর্বোধ্য থেকে যাবে।
- বোর্ডে কেবল অতি প্রয়োজনীয় তথ্যগুলোই লিখতে হবে। এতে পাঠ যেমন আকর্ষণীয় হবে তেমনি শিক্ষার্থীরাও বিষয়ের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারবে।

- লেখার সময় চক ও বোর্ডের ঘষায় যাতে বিচিত্র শব্দ না হয়- সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। এতে শ্রেণিশৃঙ্খলা স্বাভাবিক থাকবে এবং শিক্ষার্থীদের মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হবে না।
- বোর্ডে লেখার সময় অবশ্যই সাথে সাথে মুখেও উচ্চারণ করতে হবে। এতে শিক্ষার্থীর দর্শন ও শ্রবণ ইন্দ্রীয় একসাথে কাজ করবে এবং পাঠ সুবোধ্য হবে।
- বোর্ডের একপাশে দাঁড়িয়ে খানিকটা মোচড় ঘুরে লেখতে হবে। এতে শিক্ষার্থীরা মনে করবে যে শিক্ষক তাদের দিকেই তাকিয়ে লিখছেন, ফলে তারা সাবধান হবে।
- শিক্ষার্থীদের দিকে একটানা পিছন ফিরে বোর্ডে লেখা ঠিক নয়। এতে শিক্ষার্থীরা অনেক সময়ই পাঠের বিষয়বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।
- বোর্ডে লেখার ফাঁকে ফাঁকে প্রায়ই শিক্ষার্থীদের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে মত বিনিময় করতে হবে। এতে তারা শিক্ষকের আন্তরিকতা বুঝতে পেরে নিজেরাও পাঠে আন্তরিক হবে।
- বোর্ডের লেখা যথাসময়ে মুছে ফেলতে হবে। কারণ অপ্রয়োজনীয় কথা লেখা থাকলে শিক্ষার্থীরা খেই হারিয়ে ফেলতে পারে।
- লেখা শুরু করার পূর্বে পরিকল্পনা করে নিতে হবে– বোর্ডে কোন তথ্যটি কোন স্থানে কীভাবে লেখা হবে। এতে বোর্ডের তথ্যবিন্যাস যৌক্তিক হবে, শিক্ষার্থীদের মনেও তথ্যের যৌক্তিক বিন্যাস একটি স্থায়ী ছাপ ফেলবে এবং কার্যকর শিখন হবে।
- বোর্ডে লেখার জন্য মাঝে মাঝে শিক্ষার্থীদেরও আহ্বান জানাতে হবে। এতে তাদের ভয় দূর হবে এবং তারা পাঠে আন্তরিক হবে।
- বোর্ড পরিষ্কার আছে কিনা ক্লাসে ঢুকেই তা খেয়াল করতে হবে। শিক্ষার্থীদের মনোযোগ এতে দ্রুত পাঠের দিকে আসবে।

চকবোর্ড ব্যবহারের কৌশল

শিক্ষকের চকবোর্ড ব্যবহারের কৌশলের উপর শ্রেণিপাঠদানের সাফল্য অনেকখানিই নির্ভর করে। মাধ্যমিক স্তরের একজন শিক্ষক চকবোর্ড ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত কৌশলসমূহ ব্যবহার করতে পারেন। এতে তার পাঠদান আকর্ষণীয় হবে এবং শিক্ষার্থীদের অর্থপূর্ণ শিখন নিশ্চিত হবে।

- শ্রেণিতে ঢুকেই খেয়াল করতে হবে– চকবোর্ডটি ফাঁকা/পরিষ্কার আছে কি-না।
- শুরুতে পরিকল্পনা মোতাবেক সংক্ষিপ্তরূপে শিক্ষক তার নিজের নাম, শ্রেণি, তারিখ প্রভৃতিসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য লিখবেন।
- পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে বোর্ডে দৃষ্টিনন্দন, ছাপার অক্ষরে লিখতে হবে।
- পিছনে দাঁড়িয়ে খেয়াল করতে হবে যে- বোর্ডে লিখিত তথ্য স্পষ্ট বোঝা যায় কি না।
- শিক্ষার্থীরা বোর্ডে লিখিত তথ্য কখন খাতায় লিখবে তার নির্দেশনা যথাসময়ে সুস্পষ্টভাবে দিতে হবে।
- বোর্ডে লিখিত প্রয়োজনীয় তথ্য শিক্ষার্থীরা খাতায় উঠিয়ে নিচ্ছে কি না এবং অপ্রয়োজনীয় তথ্যসমূহ উঠিয়ে নেওয়া থেকে বিরত থাকছে কিনা তা খেয়াল রাখতে হবে।
- বোর্ডে লিখিত তথ্য খাতায় লিখে নেওয়ার সময় শ্রেণির কাজের তদারকি বাড়াতে হবে। তাদের লিখে নেওয়া শেষ হল কি না এবং তারা কোনো বানান ভুল করে লিখল কি না তাও খেয়াল করতে হবে।
- বোর্ডের তথ্য মুছে ফেলার আগে শিক্ষার্থীদের অনুমতি নিতে হবে।
- একই জাতীয় তথ্য যাতে বোর্ডের একটি নির্দিষ্ট জায়গায় সন্নিবেশিত হয় তথা বিভিন্ন প্রকারের তথ্য যাতে মিশ্রিত হয়ে না যায়- সেদিকে খেয়াল রেখে সুপরিকল্পিতভাবে বোর্ড ব্যবহার করতে হবে।
- ক্লাসের জন্য যে তথ্যগুলো বোর্ডে সব সময় লিখে রাখা জরুরি সেগুলো একদিকে এবং যে তথ্যগুলো সাময়িক সেগুলো আরেক দিকে লিখতে হবে।

সর্বোপরি চকবোর্ড শ্রেণি পাঠদানের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। কম খরচে এটি শ্রেণিতে সরবরাহ নিশ্চিত করা যায়। এটি বার বার মুছে মুছে ব্যবহার করা যায়। এটি সংরক্ষণ করাও খুব সহজ। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ভুল ত্রুটি সহজেই সংশোধন করে দেওয়া যায়। তাই বলা যায়, কার্যকর শিখনের ক্ষেত্রে চকবোর্ডের ব্যবহার একান্ত আবশ্যক।

৪.২ : শিক্ষা উপকরণ উন্নয়ন : বিবেচ্য দিকসমূহ

চোখ, কান, নাক, জিহ্বা ও ত্বক এই পাঁচটি ইন্দ্রিয় মানুষ তার প্রতিদিনের নানা কাজে ব্যবহার করে। বস্তুত এ ইন্দ্রিয়গুলো মানুষের মানবীয় সত্তাকেই প্রতিষ্ঠিত করে থাকে। এগুলোর মাধ্যমে সে তার চারপাশের জগৎ ও জীবনকে কেবল প্রত্যক্ষ করে না, তাকে গ্রহণ বা বর্জনও করে। ব্যক্তি কোনো বস্তুকে কখনও হুবহু দেখে কখনওবা নিজের চিন্তা আরোপ করে বস্তুর মধ্যে অতিরিক্ত গুণ বা ধর্ম অনুসন্ধান করে নেয়। কেবল চোখ দিয়ে দেখার ক্ষেত্রেই নয়; কান, নাক, জিহবা ও ত্বকের ব্যবহারেও মানুষ একই আচরণে লিপ্ত হয়। এভাবে পাঁচটি ইন্দ্রিয় আমাদের জীবন ও জীবনবোধকে তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলে।

শেখা ও শেখানোর কাজে ইন্দ্রিয়গুলোর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। শোনার পাশাপাশি 'দেখা' কথাকে আরও অর্থময় করে তোলে। আবার যা দেখি তাকে জানতে ও বুঝতে অন্য সব ইন্দ্রিয় তৎপর হয়ে ওঠে বলে অনুধাবনের মাত্রা অনেক বেড়ে যায়। যেমন, ভূগোলের কোনো শিক্ষক বাংলাদেশের নদ-নদী পড়াতে গিয়ে মৌখিক বর্ণনার পাশাপাশি মানচিত্রে সে নদীগুলো দেখিয়ে এগুলোর উৎপত্তি, গতিপথ ও সাগরে পতিত হওয়া ব্যাখ্যা করলে শিক্ষার্থীরা তাদের বিভিন্ন ইন্দ্রিয় ব্যবহারের মাধ্যমে যে ধারণা লাভ করে তা অনেক স্থায়ী ও কার্যকর হয়ে থাকে। অর্থাৎ 'মানচিত্র' নামক শিক্ষা উপকরণটি এখানে বিশেষ একটি কার্যকর ভূমিকা রাখছে। কেবল মানচিত্র নয় অন্য যেকোনো বস্তুও শ্রেণিতে পাঠদানের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের কাছে শিক্ষার বিষয়বস্তুকে অর্থময় ও তাৎপর্যময় করে তুলতে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে, শেখার বিষয়কে স্পষ্ট করে তুলতে পারে। যেমন ছবি, চার্ট, মডেল অথবা প্রকৃত বস্তু প্রভৃতি।

সহায়ক সামগ্রী ও শিক্ষা উপকরণ

পাঠকে শিক্ষার্থীদের কাছে সহজবোধ্য, আকর্ষণীয় ও কর্মতৎপরতামূলক করার জন্য শ্রেণিতে শিক্ষক যেসব বস্তুগত সামগ্রী ব্যবহার করেন সেগুলোই শিক্ষা উপকরণ। তবে বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতার কারণে এই দ্রব্যসমূহের কোনোটিকে সহায়ক সামগ্রী (Instructional Materials) আর কোনোটিকে শিক্ষা উপকরণ (Teaching Aids) বলা হয়। যেসব বস্তুগত ও অবস্তুগত উপাদান পাঠের বিষয়বস্তুর ধারণা প্রদান বা লাভে প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীকে সহায়তা করে ও দিক-নির্দেশনা দেয় সেগুলোই সহায়ক সামগ্রী (Instructional Materials)। যেমন– পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক-নির্দেশিকা, প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, ওয়ার্ক-বুক, তথ্যপুস্তিকা, মডেল, মানচিত্র, ফিল্ম, ভিডিও, ডিজিটাল কন্টেন্ট, তথ্য-পোস্টার, তালিকা, অনুচিত্র, শিক্ষকের ফিডব্যাক সামগ্রী, তথ্যছক, ছবি, নমুনা, বাস্তব দ্রব্যাদি ইত্যাদি। অন্যদিকে যেসব বস্তুগত উপাদান পাঠদানের ক্ষেত্রে পাঠের বিষয়বস্তু অনুধাবণে প্রত্যক্ষ কোনো ভূমিকা না রাখলেও শ্রেণিতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর কাজে সহায়তা করে সেগুলোকে শিক্ষা উপকরণ (Teaching Aids) বলে। যেমন; চক, ডাস্টার, চকবোর্ড, বুলেটিন বোর্ড, মাল্টিমিডিয়া, পোস্টার পেপার, ফ্লাশ কার্ড, কম্পিউটার, ওভারহেড প্রজেক্টর প্রভৃতি। অর্থাৎ উপকরণ প্রধানত শ্রেণি পাঠদানের ক্ষেত্রে শিক্ষককে কাজে সহায়তা করে আর সহায়ক সামগ্রী শিক্ষার্থীর কাছে পাঠের বিষয়বস্তুকে সহজবোধ্য, প্রাঞ্জল ও অর্থপূর্ণ করে তোলে। সেদিক থেকে বলা যায়, শ্রেণির কাজে সহায়ক সামগ্রীর ভূমিকা প্রত্যক্ষ আর শিক্ষা উপকরণের ভূমিকা পরোক্ষ। তবে সাধারণভাবে সহায়ক সামগ্রী ও উপকরণ উভয়কেই শিক্ষা উপকরণ বলা হয়।

শিক্ষা উপকরণের গুরুত্ব

শিক্ষা কার্যক্রমকে সক্রিয়তাভিত্তিক, সহজ, সাবলীল, বাস্তবমুখী করে তোলার জন্য শিক্ষা উপকরণের ব্যবহার অনস্বীকার্য। এর কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তু সম্পর্কে মূর্ত ধারণা লাভ করে, শিখন দীর্ঘস্থায়ী হয়, শিখনে স্বতঃস্ফূর্ততা আসে, বিষয়বস্তু আকর্ষণীয় হয়, শ্রেণির একঘেয়েমী দূর হয়। অন্যদিকে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে শিক্ষক খুব সহজে, অল্পশ্রমে, অল্পসময়ে, অল্পকথায় অনেক জটিল বিষয় শিক্ষার্থীদের সামনে অর্থপূর্ণভাবে উপস্থাপন করতে পারেন।

আধুনিক শিক্ষাদর্শন ও শিক্ষা মনোবিজ্ঞান শিক্ষাদান পদ্ধতিকে নতুন চিন্তাধারার ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছে। শিক্ষাদান আজ আর গতানুগতিকতার পথ ধরে চলে না। শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষক-কেন্দ্রিকতার যুগ আজ অতিক্রান্ত; এসেছে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা। শিক্ষা যেহেতু ব্যক্তির অন্তর্নিহিত সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করে তাই শ্রেণিকক্ষের চার দেওয়ালের মধ্যে পুস্তকসর্বস্ব শিক্ষা-ব্যবস্থা অপসৃত হয়ে শিক্ষার্থীর সক্রিয়তাভিত্তিক শিক্ষা আজ স্বীকৃত হচ্ছে। শিক্ষাকে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক করতে বিভিন্ন শিক্ষা

সহায়ক উপকরণ আজ অপরিহার্য হয়ে উঠছে। তাই বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষা সহায়ক উপকরণের গুরুত্ব সকলেই স্বীকার করছেন। সকলের কাছেই আজ স্বীকৃত যে, শিক্ষা সহায়ক উপকরণ ব্যবহারে পাঠদান জীবন্ত হয়, বিষয়বস্তুর ধারণা (Concept) স্পষ্ট (Clear) হয়, শিক্ষা আনন্দময় হয়।

বর্তমানে শিক্ষা-সহায়ক উপকরণ সকল বিষয়ের প্রচলিত পঠনপাঠনের ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রাখছে। পাঠ-সহায়ক হিসেবে শিক্ষাদানকে সম্পূর্ণ করে তোলে বলেই আধুনিক শিক্ষাদান পদ্ধতিতে শিক্ষা উপকরণকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষাদানের ক্ষেত্রেও এসব উপকরণের ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষককে তাই বিষয় উপযোগী উপকরণ সংগ্রহ ও তার ব্যবহার সম্বন্ধে যথাযথভাবে জানতে হবে। এই জানাকে সঠিকভাবে ব্যবহারের মাধ্যমেই তিনি ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষাদানকে সার্থক করে তুলতে পারবেন।

শিক্ষা উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার

বিষয় ও বিষয়বস্তুর স্বাতন্ত্র্য অনুযায়ী শিক্ষা উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহারে বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায় । সামাজিক বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান বিষয়ের ক্ষেত্রে শিক্ষা সহায়ক উপকরণের সংগ্রহ ও ব্যবহার অধিকতর সহজসাধ্য। কিন্তু ভাষা ও সাহিত্য পাঠদানের ক্ষেত্রে উপকরণ সংগ্রহ ও ব্যবহার দুইই খুব একটা সহজ ব্যাপার নয়। এক্ষেত্রে বিষয়ানুগ, প্রাসঙ্গিক ও ব্যবহারযোগ্য উপকরণ নির্বাচন, সংগ্রহ ও ব্যবহার যথেষ্ট বিচার বিবেচনার অপেক্ষা রাখে। আবার, প্রাথমিক ও নিম্নমাধ্যমিক শ্রেণিতে ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষাদানে উপকরণের সংগ্রহ ও ব্যবহার যতটা সহজ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ততটা সহজ নয়। তবে শিক্ষক যে উপকরণই নির্বাচন করেন না কেন, তার মূল্যমান, সুলভতা এবং সর্বোপরি, উপযোগিতার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে।

শিক্ষা উপকরণ নির্বাচনের ক্ষেত্রে শিক্ষককে অত্যন্ত কৌশলী হতে হয়। শিক্ষার্থীর বয়স, সামর্থ্য, চিন্তা, মেধা, আগ্রহ, প্রবণতা, শিক্ষণের উদ্দেশ্য, পদ্ধতি, কলাকৌশল, সময়, ব্যবহারের প্রক্রিয়া/কৌশল, বিষয়বস্তুর সাথে সম্পৃক্ততা, ব্যবহারযোগ্যতা, শ্রেণিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা, পরবর্তী সময়ের জন্য সংরক্ষণের সুবিধা-অসুবিধা তথা উপকরণের উপযোগিতা, নির্ভরযোগ্যতা, সহজলভ্যতা প্রভৃতি দিক বিবেচনায় রেখে শিক্ষা উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার করতে হয়।

শিক্ষা-সহায়ক উপকরণের ব্যবহার যথাযথ হওয়া প্রয়োজন। সব সময় মনে রাখতে হবে যে, উপকরণ শিক্ষা-সহায়ক হবে, সুনির্বাচিত হবে, প্রাসঙ্গিক হবে । উপকরণ শিক্ষার্থীদের শ্রেণি, বয়স, ও বুদ্ধির উপযোগী হবে। এসব বিষয় মনে না রেখে শ্রেণিতে উপকরণ দেখানোর কোনো অর্থ হয় না। আরো মনে রাখা আবশ্যক, শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের সময় এগুলোকে নাটকীয়ভাবে উপস্থাপন করতে পারলে শিক্ষার্থীদের মনে তীব্র আবেদন ও অনুভূতির সৃষ্টি হয়। তাই উপকরণ ব্যবহারের জন্য পূর্বপরিকল্পনা থাকা আবশ্যিক। একই উপকরণ বিভিন্ন শ্রেণিতে দেখানো উচিত নয়। উপকরণের সংখ্যাধিক্য যেন শিক্ষার অগ্রগতিকে ব্যাহত না করে, সেদিকেও শিক্ষককে লক্ষ রাখতে হবে। উপকরণ এমন স্পষ্ট, সুন্দর ও শিল্পমণ্ডিত হবে, যাতে শিক্ষার্থীদের বুঝতে কোনো অসুবিধা না হয়। এসব দিক বিবেচনায় শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সে অথবা কর্মকালীন বিশেষ কোনো ট্রেনিং-এর মাধ্যমে এসব উপকরণ প্রস্তুত ও প্রয়োগের কৌশল শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। তাহলে শিক্ষক ও প্রশিক্ষক উভয়ের মধ্যেই উপকরণ ব্যবহার সম্পর্কিত ইতিবাচক মনোভাব গড়ে উঠবে, সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে, শিক্ষা দান ও গ্রহণের কাজটি সহজ ও সুন্দর হবে আর নিশ্চিত হবে কার্যকর শিখন।

শিক্ষা উপকরণ উন্নয়ন

সহায়ক সামগ্রী ও শিক্ষা উপকরণের গুণগত মান উন্নয়নের জন্যও শিক্ষককে সবসময় চিন্তাশীল থাকতে হয়। শিক্ষা উপকরণ উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। ব্যবহার করতে গিয়ে যখনই কোনো সমস্যা দেখা দেয় তখন থেকেই শিক্ষককে ভাবতে হয়- কী পদক্ষেপ গ্রহণ করলে পরবর্তীতে ঐ সমস্যা এড়ানো যাবে। উপকরণ নির্বাচন ও এর ব্যবহার কৌশল উন্নয়নে শিক্ষককে প্রতিনিয়তই নিম্নলিখিত বিষয়ে চিন্তাশীল থাকা আবশ্যক-

- কী কী বিষয় নতুন সংযোজন ও বিয়োজন দরকার
- শিক্ষার্থীরা কোন দিকটিকে আনন্দের সাথে গ্রহণ করছে
- কোন দিকটি শিক্ষার্থীর কাছে বিরক্তিকর মনে হচ্ছে

- শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তু সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাচ্ছে কি না
- ব্যবহার করতে গিয়ে কী কী সমস্যা দেখা দিচ্ছে
- কী পদক্ষেপ নিলে ঐ সমস্যাসমূহ দূরীভূত হবে
- পাঠকে কীভাবে আরো সহজ ও আকর্ষণীয় করা যায়
- তথ্য-প্রযুক্তির এই যুগে কীভাবে এর উপযোগিতা আরও বাড়ানো যায়
- পরিবেশিত তথ্য কতটা যুক্তিনির্ভর, বাস্তবসম্মত ও মূর্তিত রূপায়ণের?

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পাঠে শিক্ষা উপকরণ উন্নয়ন

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন শিক্ষা-সহায়ক উপকরণ বিশেষ কার্যকর। শিক্ষাদানের সময় শিক্ষার্থীদের ভাষা ব্যবহারে শুদ্ধতা ও দক্ষতা অর্জন করতে, সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করতে ও শিল্পসৌন্দর্যচেতনা সৃষ্টি করতে সহায়ক উপকরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষকের জন্য শিক্ষাদানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করা উচিত।

ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষাদানের সময় নানাভাবে বোর্ডের ব্যবহার করা যায়। বানান-শিক্ষায়, ব্যাকরণ শিক্ষায়, হাতের লেখা শিক্ষায় বোর্ডের ব্যবহার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে বোর্ডটিকে শিক্ষক এমন জায়গায় স্থাপন করবেন যাতে শ্রেণির সকল শিক্ষার্থী এতে লিখিত তথ্য স্বস্থানে বসেই সহজে দেখতে পায়। শিক্ষক নিচু শ্রেণিতে পাঠদানের ক্ষেত্রে রঙিন চক ব্যবহার করবেন। এতে শিক্ষাদান কাজটি কোমলমতি শিক্ষার্থীর কাছে বিশেষ আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে।

ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষাদানের সময় শিক্ষক বিভিন্ন ছবি ব্যবহার করে থাকেন। পাঠসংশ্লিষ্ট এসব ছবি শিক্ষার্থীদের কাছে বিষয়বস্তুর সার্থক চিত্ররূপ তুলে ধরে। ফলে শিক্ষার্থীদের পক্ষে বিষয়বস্তুর মর্মগ্রহণ সহজ ও সার্থক হয়। অন্যদিকে ছবিটি পাঠসংশ্লিষ্ট ও আকর্ষণীয় না হলে শিক্ষার্থীদের কাছে তা কোনো আবেদন রাখে না। তাই পাঠ হয়ে যায় আনন্দহীন ও বিরক্তিকর। প্রথম পাঠে এধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব হলে শিক্ষক বিষয়টি গুরুত্বের সাথে আমলে নিবেন এবং পরবর্তীতে ব্যবহারের জন্য নিজস্ব চিন্তার সমন্বয়ে ছবিটিকে পাঠসংশ্লিষ্ট করবেন ও রঙের ব্যবহারে বাস্তবানুগ হবেন।

বাংলা বানান ও ব্যাকরণ পড়ানোর সময় বিভিন্ন ধরনের চার্ট বিশেষ কার্যকর। এক্ষেত্রে চার্টে লিখিত তথ্য বিভিন্ন রঙের হতে পারে। তবে রঙের ব্যবহারে পরিমিতিবোধও থাকা আবশ্যক। মনে রাখতে হবে বিশেষ তথ্যকে শিক্ষার্থীর চিন্তনে বিশেষভাবে সঞ্চালনের জন্যই চার্টে বিশেষ রঙের ব্যবহার করা হচ্ছে। এ দৃষ্টিকোণ বিবেচনায় নিয়ে ভাষা শিক্ষক তার ব্যবহৃত উপকরণের উন্নয়ন ঘটাতে পারেন।

ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক তথ্যসমৃদ্ধ সাহিত্যের বিষয় পড়ানোর জন্য শ্রেণিতে মানচিত্রের ব্যবহার করা যেতে পারে। মানচিত্র আবার বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। যেমন, ভৌগোলিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক প্রভৃতি। আবার বিভিন্ন ধরনের মানচিত্রের পাশাপাশি সমন্বিত মানচিত্রও পাওয়া যায়। সাহিত্য পাঠদানের ক্ষেত্রে এসব মানচিত্রের তথ্যবাহুল্য শিক্ষার্থীর কাছে বিষয় অনুধাবনে জটিলতার সৃষ্টি করে। তাই বাজার থেকে কেনা এসব মানচিত্রের বদলে শিক্ষক কেবল নির্দিষ্ট পাঠের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তথ্যভিত্তিক মানচিত্র নিজে তৈরি করে নিতে পারেন। এভাবে পাঠের প্রকৃতি অনুযায়ী নদনদী, জলবায়ু, জনসংখ্যার ঘনত্ব, পাহাড়-পর্বত, রেলপথ, নদীপথ, আকাশপথ, সড়ক-মহাসড়ক প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বিষয় প্রদর্শনের জন্য তিনি হাতে তৈরি আলাদা আলাদা মানচিত্র ব্যবহার করতে পারেন।

সর্বোপরি বিভিন্ন বিষয়ের মডেল সাহিত্য-শিক্ষাদানের পক্ষে সহায়ক। সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রসমূহ শিক্ষার্থীদের ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষাদানের পরিপূরক। এগুলো নিয়মিত পাঠ করে শিক্ষার্থীরা ভাষা ব্যবহারে দক্ষ হয়, সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী হয়। দেয়াল-পত্রিকার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সাহিত্যানুরাগ বৃদ্ধি করে সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটানো যায়। শ্রেণিতে এগুলোর কার্যকর ব্যবহার সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকলে শিক্ষক খুব সহজেই এই উপকরণগুলোকে পাঠ-সংশ্লিষ্ট করতে পারেন এবং প্রয়োজন অনুসারে এসব উপকরণের উন্নয়নও সাধন করতে পারেন।

অডিও-ভিডিও ক্লিপের সাহায্যে বিভিন্ন আবৃত্তি, অভিনয় ও গানের রেকর্ড বাজিয়ে শিক্ষার্থীদের ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষাকে সার্থক করে তোলা যায়। রেডিও টেলিভিশনের বিভিন্ন শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান (আবৃত্তি, অভিনয়, আলোচনা, গান) শিক্ষার্থীদের ভাষা-

শিক্ষায় সহায়তা করে। ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক, শিক্ষা-সহায়ক এসব উপকরণকে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে সময়োপযোগী ও শ্রেণি-উপযোগী করে ব্যবহার করতে পারেন। এ ব্যাপারে মোবাইল ফোন, সেলফোন ও টেপ রেকর্ডারও যথেষ্ট সাহায্য করতে পারে। ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক এগুলোর ব্যবহার-কৌশল জেনে শিক্ষাদানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যথাযথভাবে ব্যবহার করে শিক্ষাকে জীবন্ত ও সার্থক করে তুলতে পারেন। এভাবে ব্যবহৃত শিক্ষা উপকরণের উন্নয়নের মাধ্যমে শিক্ষক নিজের পাঠদানের উন্নয়নও ঘটাতে পারেন।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহার আজকাল বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। বিশেষ করে পাওয়ার পয়েন্টে ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরি করে তা শ্রেণিপাঠে ব্যবহার করার সুফল সকলের কাছে সুবিদিত। ডিজিটাল কন্টেন্টের একই স্লাইডে অথবা ভিন্ন ভিন্ন স্লাইডে পাঠের বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন রং, ছবি, ভিডিও, অডিও, টেক্সট, শেপ প্রভৃতি সমন্বিত করা যায়। আবার প্রতিটি অবজেক্টে ভিন্ন ভিন্ন এনিমেশন ব্যবহার করে তথ্যের পর্যায়ক্রমিক উপস্থাপনও সম্ভব। তাই শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ায় ডিজিটাল কন্টেন্ট শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের কাছেই এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। কিন্তু এর সাফল্য নির্ভর করে শিক্ষকের ব্যবহার-কৌশলের যথার্থতার উপর। ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরি ও ব্যবহার সম্পর্কিত পর্যাপ্ত জ্ঞান ও দক্ষতা শিক্ষকের থাকলেই কেবল তার পক্ষে সম্ভব এর সময়ান্তরিক উন্নয়ন সাধন। শ্রেণিতে ডিজিটাল কন্টেন্ট ব্যবহার করার সময় শিক্ষক উদ্ভূত পরিস্থিতি প্রতিনিয়ত পর্যবেক্ষণ করবেন ও সাথে সাথে নোট রাখবেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তীতে সংশোধন করবেন, ত্রুটি বা বাধাগুলো দূর করবেন এবং ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য তা সংরক্ষণ করবেন।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, শিক্ষা উপকরণ উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। সময় ও চাহিদার নিরিখে প্রতিনিয়তই শিক্ষা উপকরণের উন্নয়ন সাধন করতে হয়। তথ্য-প্রযুক্তির এই যুগে কীভাবে শিক্ষা উপকরণের উপযোগিতা আরও বাড়ানো যায়, পরিবেশিত তথ্য কীভাবে যুক্তিনির্ভর, বাস্তবসম্মত ও মূর্তিত রূপায়ণের করা যায়– সে চিন্তায় নিমগ্ন হতে হয় শিক্ষককেই। শিক্ষার্থীর বয়স, বিষয়জ্ঞান, আগ্রহ, কৌতূহল, আনন্দ, বিরক্তি, ব্যবহার-সমস্যা, পাঠসহজতা প্রভৃতি দিক বিবেচনায় নিয়ে সময় ও চাহিদার নিরিখে শিক্ষা উপকরণে নতুন বিষয়ের সংযোজন ও অপ্রয়োজনীয় অংশের বিয়োজন করে পাঠকে আকর্ষণীয় করার পদক্ষেপ গ্রহণে শিক্ষককে সদাতৎপর থাকতে হয়। তাই দেখা যায়, শিক্ষা উপকরণ উন্নয়নে শিক্ষকের ভূমিকাই মুখ্য।

৪.৩ : শিক্ষা উপকরণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার

শিখন-শেখানো কার্যক্রমকে সহজ, আকর্ষণীয়, ফলপ্রসূ ও আনন্দদায়ক করার জন্য পাঠ সংশ্লিষ্ট উপকরণ ব্যবহার আবশ্যক। শিখন বিষয়কে সাবলীল ও উপভোগ্য করার জন্য শিক্ষা উপকরণ একটি অপরিহার্য অনুষঙ্গও বটে। শিক্ষা উপকরণ শিক্ষার্থীকে উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টির পাশাপাশি আনন্দ ও আগ্রহের সাথে শিখতে সাহায্য করে। এতে করে শিখন স্থায়ী হয়। শিক্ষার্থী-শিক্ষক উভয়েরই পরিশ্রমের মাত্রা অনেক কমে যায়। নানা শ্রেণি ও নানা মাত্রার উপকরণের মাঝে শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার সবচেয়ে জনপ্রিয়তার স্থানটি দখল করে নিয়েছে। শ্রবণ, দর্শন, শ্রবণ-দর্শন, অনুসন্ধান ও কর্মসম্পাদনমূলক উপকরণের পাশাপাশি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপকরণের ব্যবহার আধুনিক শিখন-শেখানো প্রক্রিয়াকে আলাদা গতি সঞ্চার করে ভিন্নমাত্রা দিয়েছে। শিক্ষা উপকরণের ক্ষেত্রও হয়েছে আরো প্রসারিত। তাই বাংলা বিষয়ের পাঠ উপস্থাপনে অন্যান্য উপকরণের পাশাপাশি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিনির্ভর উপকরণ ব্যবহারের পরিপ্রেক্ষিত, ক্ষেত্র ও উপায় সম্পর্কে শিক্ষকের সুস্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক।

- প্রথমত সমস্ত বিষয়বস্তু থেকে মূল অংশ/শব্দগুলো (Key words) টেক্সট আকারে এনিমেশনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করতে প্রযুক্তির ব্যবহার করা যায়।
- ইন্টারনেটের বিভিন্ন সাইট থেকে ছবি/ইমেজ ডাউনলোড করে পাঠ সংশ্লিষ্ট অংশে দৃশ্যমান করে শিক্ষার্থীদের মাঝে উদ্দীপনার সৃষ্টি ও সুপ্ত সৃজনশীলতা বের করতে প্রযুক্তির ব্যবহার করা যায়।
- গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, উপন্যাস ও নাটকের পাঠ উপস্থাপনে ভিডিও ক্লিপ প্রদর্শন এখন জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে যে কোনো পাঠ সংশ্লিষ্ট ভিডিও ক্লিপ শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপন করলে বিষয়বস্তু সহজ হয়।

- কবিতার আবৃত্তি বা যে কোনো পাঠের অংশবিশেষ আর্দশ পাঠ হিসেবে শ্রেণিকক্ষে অডিও সিস্টেম ব্যবহার করা যায়।
- শিক্ষক চাইলে সম্পূর্ণ পাঠটি ডিজিটাল কন্টেন্ট আকারে নিজে তৈরি করে নিতে পারেন কিংবা শিক্ষক বাতায়নের সদস্য হয়ে সেখান থেকে কন্টেন্ট ডাউনলোড এবং আপলোড করতে পারেন।
- মুক্তপাঠের সাইট থেকে টিউটরিয়াল ডাউনলোড করেও ব্যবহার করতে পারেন।
- নেটওয়ার্কিং বা গ্রুপ তৈরি করে যে কোনো তথ্য গ্রুপের সদস্যদের সাথে আদান-প্রদান করা যায়।
- স্মার্ট ফোন/বর্তমানে যে কোনো মোবাইলে Apps ব্যবহার করে শ্রেণিপাঠনার কাজে ব্যবহার করা যায়।
- শিক্ষক বাতায়ন এখন Digital Content এর অফুরন্ত ভাণ্ডার। শিক্ষক চাইলেই এখন বাতায়ন থেকে যে কোনো Content ডাউনলোড করে তা নিজের মতো করে গুছিয়ে উপস্থাপন করতে পারেন।
- কম্পিউটারে অফলাইন সোর্স ব্যবহার করে এবং আকর্ষণীয় এনিমেশন দিয়ে শিক্ষক একটি সাধারণ পাঠকে অসাধারণ করে তুলতে পারেন।
- উল্লিখিত ক্ষেত্রগুলো ছাড়াও শিক্ষক মূল্যায়নের (ধারাবাহিক এবং চূড়ান্ত) ক্ষেত্রেও তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে কার্যকর বৈচিত্র্য আনতে পারেন।

শিক্ষা উপকরণ হিসেবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, অধিক সংখ্যক ইন্দ্রিয় সচল থাকলে শিখনফলের সর্বোচ্চ মাত্রা অর্জিত হয়। শিক্ষার্থীর শিখনযোগ্যতা অর্জনের জন্য প্রযুক্তিনির্ভর উপকরণ ব্যবহার এখন সময়ের দাবি। তদুপরি প্রযুক্তিনির্ভর উপকরণ ব্যবহারের গুরুত্ব নিচে তুলে ধরা হলো-

- বিষয়বস্তুর বিমূর্ত ধারণাগুলো মূর্ত করে তোলার জন্য প্রযুক্তির ব্যবহার অন্যতম হাতিয়ার হতে পারে।
- কঠিন বা দুর্বোধ্য পাঠকে সহজ করার ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিবিষয়ক উপকরণের ভূমিকা অতুলনীয়।
- অনেক দুর্লভ বস্তু যা বাস্তব উপকরণ হিসেবে দেখানো সম্ভব নয় তা তথ্য-প্রযুক্তির মাধ্যমে দেখানো সম্ভব।
- যে কোনো ঘটনা বা বিষয়বস্তুর ধারাবাহিক বর্ণনা Video-এর মাধ্যমে উপস্থাপন সম্ভব।
- শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষণের মাধ্যমে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির কার্যকর প্রয়োগে প্রযুক্তিনির্ভর উপকরণ বিশেষভাবে সহায়ক।
- শিক্ষকের পরিশ্রম লাঘবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিবিষয়ক উপকরণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

উন্নত বিশ্বে শিক্ষাক্ষেত্রে আইসিটি ব্যবহারের ফলে দুর্নীতি যেমন অনেক কমে গিয়েছে তেমনি জবাবদিহিতাও বেড়েছে। ঐসব দেশে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় অনলাইনে প্রশ্ন সরবরাহের মাধ্যমে। বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতেও অনলাইনে প্রশ্ন প্রেরণ ও পরীক্ষা গ্রহণসহ মূল্যায়নসংশ্লিষ্ট কাজ সম্পন্ন হলে সকল পক্ষের জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে এবং শিখন-শেখানো কাজটির পাশাপাশি শিখন-মূল্যায়নের কাজটিও আনন্দদায়ক হয়ে উঠবে। শিক্ষার্থী খেলতে খেলতে শিখবে ও মূল্যায়নে অংশ নিবে।

আনন্দের সাথে পাঠে অংশগ্রহণের অন্যতম মাধ্যম হলো আইসিটি। পাঠ উপস্থাপনে আইসিটি উপকরণ ব্যবহার করে শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়। চীনা প্রবাদে আছে One Picture is worth than ten thousand words. অর্থাৎ একটি ছবি দশ হাজার শব্দের চেয়েও উত্তম। আর এ কাজটি আইসিটিনির্ভর ডিজিটাল কন্টেন্ট এর মাধ্যমে সফলভাবে করা যায়। ডিজিটাল কন্টেন্ট ব্যবহার করে পাঠসংশ্লিষ্ট দুষ্প্রাপ্য ও দুর্লভ ছবি এবং ভিডিও তাৎক্ষণিকভাবে শিক্ষার্থীর সামনে হাজির করা সম্ভব। শ্রেণিতে এ প্রযুক্তি ব্যবহার করলে শিক্ষার্থী খুব সহজে বাস্তবতার সাথে মিলিয়ে বিষয়বস্তুর ধারণা লাভ করতে পারে।

শিক্ষা উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত আইসিটি (ICT) এর সম্প্রসারিত রূপ হলো-

I –Information (তথ্য)

C- Communication (যোগাযোগ)

T- Technology (প্রযুক্তি)

অর্থাৎ, তথ্য আদান-প্রদান বা যোগাযোগের ক্ষেত্রে যে সকল প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয় সেগুলোই হলো আইসিটি (ICT) সামগ্রী। শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যবহৃত আইসিটি সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে- কম্পিউটার, ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, CPU, মাউস, ইউপিএস, ইউএসবি কড, এইচডিএম কানেকটিং কড, পেনড্রাইভ, মডেম, সাউন্ড সিস্টেম, মাল্টিপ্লাগ, স্ক্রিন, সিডি, ডিভিডি, টেপ রেকর্ডার, টিভি, রেডিও, মোবাইল ফোন প্রভৃতি।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পাঠ উপস্থাপনে আইসিটি উপকরণ ব্যবহারে বিবেচ্য বিষয়

- প্রতিটি কন্টেন্ট পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইডের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে হবে। বিশেষ প্রয়োজনে মাইক্রোসফ্ট ওয়ার্ড এবং এক্সেল বা অন্যান্য প্রোগ্রাম ব্যবহার করা যাবে।
- স্লাইডে প্রদর্শনকৃত ইমেজ/ছবি স্পষ্ট এবং দেশীয়, শিক্ষার্থীদের পরিচিত পরিবেশের হলে ভালো।
- স্লাইডে লেখা টেক্সট এর ফন্ট সাইজ শ্রেণিতে সকল শিক্ষার্থীর দর্শন উপযোগী হতে হবে।
- স্লাইডে লেখা টেক্সট হতে হবে বুলেট পয়েন্ট আকারে।
- টেক্সট লেখার ক্ষেত্রে নিচের প্রশ্নগুলোর জন্য বিভিন্ন রংয়ের লেখা সমন্বয় করে লিখতে হবে।
- ব্যাকগ্রাউন্ড টেক্সট এর সাথে মানানসই রংয়ের হতে হবে।
- প্রদর্শিত ভিডিও যাতে বেশি সময়ের না হয় সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- ছবি, ভিডিও এবং টেক্সট পাঠসংশ্লিষ্ট হতে হবে এবং তাতে মার্জিত এনিমেশন ব্যবহার করতে হবে।
- কোনো নেতিবাচক ধারণা কিংবা অতি ভীতির সৃষ্টি করে এমন ভিডিও প্রদর্শন থেকে বিরত থাকতে হবে।
- বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে গোটা পাঠ উপস্থাপন যেন ডিজিটাল স্লাইডনির্ভর না হয়ে যায়। স্লাইড প্রদর্শনের ফাঁকে ফাঁকে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতার মাধ্যমে পাঠের বিশ্লেষণ, বোর্ড ব্যবহার অন্যান্য বাস্তব উপকরণ, অভিনয়, বিতর্ক, গল্প বলা, কৌতুক বলা প্রভৃতি থাকবে।

আইসিটি উপকরণ ব্যবহারে চ্যালেঞ্জ/প্রতিবন্ধকতা

আইসিটি বা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপকরণ শিখন-শেখানো কার্যক্রমে অতি প্রয়োজনীয় হলেও এ উপকরণ সংগ্রহ, ব্যবহার ও সংরক্ষণে অনেক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। প্রথমত, আমাদের এ উন্নয়নশীল দেশটিতে এখনো সর্বত্র বিদ্যুৎতের সংযোগ দেওয়া সম্ভব হয়নি। আবার গ্রামাঞ্চলে বা মফস্বল শহরগুলোতে বৈদ্যুতিক সংযোগ দিলেও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুতের নিশ্চয়তা দেয়া এখনো সম্ভব হচ্ছে না। এ কারণে শিক্ষকগণ ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরি করতে গিয়ে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিদ্যুতের সমস্যায় পড়ছেন। দ্বিতীয়ত, কন্টেন্ট তৈরির একটা বিশেষ স্থান দখল করে আছে ইন্টারনেট সংযোগ। আমাদের পল্লি এলাকাগুলোতে এখনও ইন্টারনেট সংযোগ পর্যাপ্ত নয়। ব্রডব্যান্ড সংযোগ প্রদানকারী কোম্পানিগুলো মফস্বল বা গ্রামীণ এলাকায় যেতে আগ্রহী নয়। আবার শিক্ষক ব্যক্তি উদ্যোগে মডেম কিনে ইন্টারনেট সংযোগ চালালেও অনেক সময় পর্যাপ্ত গতি না থাকায় ছবি বা ভিডিও ক্লিপ ডাউনলোডে অনেক সময় নষ্ট হয়। এতে শিক্ষকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে।

এত কিছুর পরও শিক্ষককে পিছপা হলে চলবে না। আইসিটি প্রশিক্ষণ গ্রহণ, নিয়মিত ইন্টারনেট সিকিউরিটি ক্রয়, মেয়াদোত্তীর্ণ উইন্ডোজ পরিবর্তন ও সময়ে সময়ে নতুন ভার্সনের বিভিন্ন সফটওয়্যার ইনস্টল করে ল্যাপটপ সচল রাখতে হবে। যৌথভাবে হলেও শক্তিশালী সংযোগসমেত মডেম ব্যবহার করতে হবে যাতে সব সময় দ্রুত গতির নিরবচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সংযোগ নিশ্চিতভাবে ব্যবহার করা যায়।

শিক্ষা উপকরণ হিসেবে আইসিটি ব্যবহারে প্রতিষ্ঠান প্রধানের ভূমিকা

শিক্ষা উপকরণ হিসেবে আইসিটি ব্যবহারের নিশ্চয়তা বিধানে প্রতিষ্ঠান প্রধানের ভূমিকা রয়েছে। সময়ে সময়ে প্রশিক্ষণে পাঠিয়ে শিক্ষকদের তিনি দক্ষ করে তুলবেন। সম্ভব হলে প্রতিষ্ঠানের সকল কক্ষে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর স্থাপন করবেন এবং এগুলোর নিয়মিত ব্যবহার নিশ্চিত করবেন। দীর্ঘ ছুটিতে ফাঁকে ফাঁকে প্রজেক্টরগুলো চালু করে কয়েক মিনিট প্রদর্শন মুডে রাখার নির্দেশ দিবেন। আইসিটি ল্যাব স্থাপন করার পদক্ষেপ নিবেন। শিক্ষকদের মধ্যে গ্রুপ তৈরি করে নির্দিষ্ট দিনে তাদের নতুন নতুন কন্টেন্ট প্রদর্শনের আয়োজন করবেন। সর্বোপরি শিক্ষকদের এ সকল কাজে উদ্বুদ্ধ করতে প্রতিষ্ঠান প্রধানকেই অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে।

ইন্টারনেট ব্যবহারে আর্থিক সংশ্লিষ্টতা যেমন রয়েছে তেমনি ল্যাপটপ বা আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় করাও একজন সীমিত আয়ের শিক্ষকের জন্য কষ্টসাধ্য। শিক্ষক অনেক কষ্ট স্বীকার করে কন্টেন্ট তৈরি করলেও বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর সচল না থাকলে কিংবা শ্রেণিকক্ষে মাল্টিমিডিয়ার ব্যবস্থা না থাকলে তিনি তা ব্যবহার করতে পারবেন না। আবার মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষ পর্যাপ্ত না থাকলে শিক্ষকদের মাঝে কে কখন প্রজেক্টর দিয়ে ক্লাস নেবেন তা নিয়ে সমস্যা তৈরি হতে পারে। অনেক সময় যত্নের অভাবে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর নষ্ট হয়ে যেতে পারে। বিশেষ করে দীর্ঘ ছুটিকালীন প্রজেক্টর ব্যবহার না করলে তার পিকচার বা লাইটিং প্যানেলে ফাংগাস জমে গিয়ে বিকৃত বা অস্বচ্ছ আলো প্রতিফলিত হতে পারে। এজন্য তখন কন্টেন্ট স্পষ্ট বোঝা যায় না। কখনও কখনও প্রজেক্টর ব্যবহারে দক্ষতার অভাবে প্রয়োজন ছাড়াও দীর্ঘক্ষণ প্রজেক্টর চালিয়ে রাখলে এর বাল্বের স্থায়িত্ব কমে যাওয়াসহ অন্যান্য সমস্যা তৈরি হতে পারে। আবার প্রজেক্টর বন্ধ করে সাথে সাথে বৈদ্যুতিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা যায় না। প্রজেক্টরে যতক্ষণ পর্যন্ত লাল আলোর সংকেত ওঠানামা করবে ততক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। ডিজিটাল কন্টেন্ট প্রদর্শনের সাথে জড়িত এবং প্রজেক্টর ও স্ক্রিন ব্যবহারের যাবতীয় দক্ষতা ব্যবহারকারী শিক্ষকের জানা না থাকলে যে কোনো সময় যে কোনো কারণে পাঠের চলমান পর্বটি থেমে যেতে পারে। তাছাড়া ছোট খাটো ট্রাবল শ্যুটিং সম্পর্কেও ধারণা না থাকলে শিক্ষক আটকে যেতে পারেন। এসব বিষয়ে প্রতিষ্ঠান প্রধানের সুস্পষ্ট ধারণা থাকলেই কেবল তার পক্ষে যথাযথভাবে শ্রেণির কর্মপরিবেশের বাস্তবতা অনুধাবন করা ও সে অনুযায়ী বিষয়শিক্ষকগণের শ্রেণিকার্যক্রম মনিটরিং ও মেন্টরিং করা এবং কার্যকর ফিডব্যাক দেওয়া সম্ভব। তাই প্রতিষ্ঠান প্রধানকে অবশ্যই শ্রেণিতে আইসিটি উপকরণ ব্যবহারে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো দক্ষতা থাকতে হবে। তার এই দক্ষতা আইসিটি ব্যবহারে সহকারী শিক্ষকগণের উদাসীনতা ও দুর্বলতা দূর করে বিদ্যালয়ে তথ্য-প্রযুক্তিনির্ভর কার্যকর শিখন-পরিবেশ সৃষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

বলা হয়ে থাকে, একটি পাঠ উপস্থাপনে Information-40%, Communication-40% এবং Technology-20% অর্থাৎ ক্লাসের ৪০% সময়ে তথ্য প্রদান করতে হবে, ৪০% সময় ধরে চলবে শিক্ষক-শিক্ষার্থী পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া এবং অবশিষ্ট ২০% সময়ে হবে প্রযুক্তির ব্যবহার। পাঠ উপস্থাপনকারী শিক্ষক এই ধারাক্রম অনুসরণ করেপাঠে অগ্রসর হলে কার্যকর শ্রেণিপাঠদান নিশ্চিত হবে। শিক্ষাবিজ্ঞান ও বিষয়বস্তুগত জ্ঞানের সাথে প্রযুক্তিকে সমন্বিত করার এজাতীয় বিভিন্ন দক্ষতা প্রতিষ্ঠান প্রধানের অবশ্যই থাকা উচিত। তাহলেই তাঁর পক্ষে শিক্ষণ কার্যক্রমে যথোপযুক্ত ভূমিকা রাখা সম্ভব।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বাংলা পঠন-পাঠনের পাঠ বিশ্লেষণ পর্যায়ে ব্যবহার উপযোগী পাঁচটি শিক্ষা উপকরণের নাম লিখুন।
২. শেখানোর কাজে শিক্ষোপকরণ কীভাবে সহায়ক ভূমিকা পালন করে?
৩. শেখার কাজে ইন্দ্রিয়ের ভূমিকা কী?
৪. সহায়ক সামগ্রী ও শিক্ষা উপকরণের মধ্যে পার্থক্য কী?
৫. শ্রেণিতে মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে কেন?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষোপকরণ কী? শিক্ষাদানে শিক্ষোপকরণের গুরুত্ব ও উপযোগিতা ব্যাখ্যা করুন।
২. শিক্ষোপকরণের নির্ভরযোগ্যতা বলতে কী বোঝায়? নির্ভরযোগ্যতার বিশেষ দিকসমূহ চিহ্নিত করুন।
৩. শ্রেণিতে চকবোর্ড ব্যবহারের আবশ্যকতা কী? চকবোর্ডের কার্যকর ব্যবহার কীভাবে নিশ্চিত করা যায়?
৪. বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পাঠদানের (গদ্য ও কবিতা) বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যবহার উপযোগী শিক্ষা উপকরণের একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।
৫. মাতৃভাষা শিক্ষার সহায়ক কয়েকটি প্রদীপণের নাম উল্লেখ করুন। এগুলোর মধ্যে কোনটি কোন ধরনের পাঠে বেশি উপযোগী বলে মনে করেন? দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

ইউনিট ৫ : ভাষাদক্ষতা

'ভাষা' মানব জীবনের অত্যাবশ্যকীয় অনুষঙ্গ। মানুষের পারস্পরিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে ভাষার ভূমিকা তাই অনস্বীকার্য। এই ধ্বনিময় জগতে মানুষের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় এক অসামান্য শক্তি নিয়ে জীবনের বিচিত্রমুখী উদ্দেশ্য সাধন করে ভাষা। মানুষের হাসি-কান্না, দুঃখ-বেদনা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, আশা-নিরাশা সবই প্রকাশিত হয় ভাষার মাধ্যমে।

পরিবারে যখন কোনো শিশু জন্মগ্রহণ করে স্বাভাবিক নিয়মেই তার ক্রমবিকাশ ঘটে। শারীরিক, মানসিক, আবেগিক, সামাজিক ও ভাষার বিকাশ এই ক্রমবিকাশের অন্তর্ভুক্ত। ভাষা বিজ্ঞানীদের ধারণা–জন্মের পর শিশু অবচেতনভাবেই ভাষা আয়ত্ত করতে শেখে। ধ্বনিময় জগতে জন্মের পর শিশু তার চারপাশ থেকে অসংখ্য শব্দ/ধ্বনি শুনতে পায়। তার মা, বাবা, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশিদের নানা ধ্বনি, শব্দ বা বাক্য তার শ্রবণ-ইন্দ্রিয়ে প্রতিনিয়ত অনুরণিত হয়। এভাবেই তার ভাষা অর্জিত হতে থাকে। একসময়ে সে তার শোনা শব্দগুলোর দু-একটি অনুকরণ করতে শেখে। তাই ভাষা শিখনের ক্ষেত্রে অনুকরণ ও অনুসরণ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অনুকরণ-অনুসরণ পর্যায়ের প্রথম দিকে দু-একটি শব্দ অতপর দু-একটি বাক্য বলতে বলতে একসময় শিশু বক্তায় পরিণত হয়।

ভাষা শিক্ষণ বা ভাষা অর্জন-আমরা যা-ই বলি না কেন এর মূল লক্ষ্য পারস্পরিক যোগাযোগ স্থাপন। পারস্পরিক এই যোগাযোগ স্থাপনের চারটি দিক রয়েছে, যেমন–শোনা/শ্রবণ, বলা/কথন, পড়া/পঠন,লেখা/লিখন। বাংলা শিক্ষণ বিষয়ের 'ভাষাদক্ষতা' শীর্ষক অধ্যায়ে ভাষাদক্ষতা অর্জনের সুস্পষ্ট জ্ঞান ও ধারণা উপস্থাপনের পাশাপাশি পাঠভিত্তিক নিম্নবর্ণিত বিষয়বস্তুসমূহের উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

৫.১: শোনা
৫.২: বলা
৫.৩: পড়া
৫.৪: লেখা

৫.১: শোনা

ভাষা দক্ষতা বিকাশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে শোনা। বলার পূর্বশর্ত শোনা। কারণ শোনা ছাড়া কেউ বলতে পারে না। শিশু যা শোনে তাই-ই সে বলতে চেষ্টা করে। শিক্ষণ ক্ষেত্রে শোনা বা শ্রবণ বলতে বুঝায় কোনো কিছু শুনে তার অর্থ বুঝতে পারা।

শোনার গুরুত্ব

ধ্বনিময় জগতে জন্মলগ্ন থেকে শিশু নানা ধরনের ধ্বনি, কল-কোলাহলের মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠতে থাকে। তার শ্রবণ ইন্দ্রিয়কে সজাগ করতে থাকে নানা ধরনের ধ্বনি। মা-বাবা শিশুকে আদর সোহাগ করতে ধ্বনি বা শব্দগুলো ব্যবহার করে। শিশু অজান্তেই তা ধারণ করতে থাকে। এজন্যই শিশুর সাথে আদর সোহাগের ক্ষেত্রেও শুদ্ধ ভাষা ব্যবহার করা শ্রেয়। শিশুর বলার ক্ষমতা নির্ভর করে সঠিকভাবে শোনার উপর। শিশু বড় হয়ে যখন শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত হবে, তার জন্য সবচেয়ে বেশি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে সঠিকভাবে শোনা। শ্রেণিপাঠে শিক্ষকের বক্তৃতা অনুধাবনের ক্ষেত্রে, কোনো বিষয়ে আলোচনায় অংশ নিতে, প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে শ্রবণ শক্তি যদি যথাযথভাবে কাজ না করে তবে তার শিক্ষণ প্রক্রিয়া ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। অথচ শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় বক্তৃতা, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, বিতর্ক প্রভৃতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শোনার প্রকারভেদ

ভাষার কাজ শুরু হয় শোনার মাধ্যমে। কোনো কিছু জানতে হলে আগে তা শুনতে হবে। সঠিকভাবে শোনা সঠিকভাবে জানার নিশ্চয়তা দেয়। শিখন শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় অনুধাবন ও হৃদয়ঙ্গম করাটা খুব জরুরি। তাই শ্রেণিপাঠনায় শিক্ষার্থীদের শ্রবণ শক্তির সঠিক ও যথার্থ ব্যবহার নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক।

উদ্দেশ্যমুখী শোনা ও নৈমিত্তিক শোনা প্রধান দুটি ভাগ হলেও এর উপ-বিভাগও করা যায়। উদ্দেশ্যমুখী শোনার ক্ষেত্রে শ্রোতা শ্রুত বিষয়ের প্রতি গভীর মনোনিবেশ করে। কারণ এর সাথে তার কোনো স্বার্থের সংযোগ থাকে। তাই শ্রোতা বিষয়বস্তুর গুরুত্বপূর্ণ অংশ বাছাই করতে পারে। তার প্রয়োজনীয় তথ্য সে সানন্দে আহরণে সক্ষম হয়। পক্ষান্তরে নৈমিত্তিক শোনায় এর কোনো বালাই থাকে না। এটা নিতান্তই নিত্য-নৈমিত্তিক কাজেরই একটি অংশ মাত্র। শ্রোতা এ ক্ষেত্রে বিষয়ের প্রতি মনোযোগী হওয়ার কোনো তাগিদ অনুভব করেনা। শ্রোতা যান্ত্রিকভাবে শোনার কাজটি করে, ফলে তার মাঝে সচেতনতা বা অনুধাবন করার প্রয়াস কাজ করে না। তাই নৈমিত্তিক শোনার বিষয়গুলো সহজেই শ্রোতা ভুলে যায়। শোনাকে নিম্নবর্ণিত উপবিভাগে বিভক্ত করা যায়।

মনোযোগ সহকারে শোনা : মূলত এটি উদ্দেশ্যমুখী শোনারই নামান্তর। শ্রোতা যতটা সম্ভব গভীর মনোযোগ দিয়ে শোনে বলে এর ফলাফল দীর্ঘস্থায়ী হয়। শ্রোতা যা শোনে দীর্ঘদিন তা মনে রাখতে পারে। শিখন শিক্ষণ কার্যক্রমে এই জাতীয় শোনা অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। শ্রেণিপাঠনায় শিক্ষার্থী যতবেশি মনোযোগী হবে, সে ততবেশি বিষয়বস্তু আয়ত্ত ও আত্মস্থ করতে সক্ষম হবে।

মনোযোগবিহীন শোনা : এই জাতীয় শোনা নৈমিত্তিক শোনারই নামান্তর। এক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর প্রতি শ্রোতার কোনো আগ্রহ বা মনোযোগ কিছুই থাকে না। গুরুত্বসহকারে শ্রোতা না শোনায় নেহায়েতই এটি যান্ত্রিকতায় রূপ নেয়।

স্বতঃস্ফূর্ত শোনা : এক্ষেত্রে বক্তার বক্তব্য শ্রোতা আনন্দচিত্তে গভীর আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করে। যেমন কোনো আনন্দানুষ্ঠান উপভোগ করা। শ্রোতা দীর্ঘদিন শ্রবণীয় বিষয় মনে রাখে। কারণ, এক্ষেত্রে শ্রোতাকে কোনো প্রকার বাধ্যবাধকতার গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকতে হয় না।

বাধ্যতামূলক শোনা : এই জাতীয় শোনার ক্ষেত্রে শ্রোতাকে শুনতে বাধ্য করা হয়। শ্রোতা শ্রুত বিষয়বস্তুর প্রতি মোটেই মনোনিবেশ করে না। হয়তো শ্রোতা অপলক নয়নে বক্তার দিকে তাকিয়ে থাকে কিন্তু বক্তব্যের প্রতি তার কোনো আকর্ষণ থাকে না। সে শারীরিকভাবে উপস্থিত থাকলেও মানসিকভাবে সে অনুপস্থিত থাকে। এই রকম শোনার ফলাফল কখনো সুখকর হয় না।

শোনা দক্ষতা অর্জনের শর্তসমূহ এবং ভাষা শিক্ষকের করণীয়

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থী কথা শোনে, আলোচনা শোনে, প্রশ্নোত্তর শোনে। শুধু তাই নয়, সব কিছুতেই তার অংশগ্রহণও করতে হয়। উপর্যুক্ত কাজগুলোতে শ্রবণের সঠিক ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত জরুরি। স্পষ্ট শোনার উপর নির্ভর করে শিক্ষার্থীর বুঝতে পারা, অনুধাবন করা, অংশগ্রহণ করা বা উত্তর দেওয়ার মান বা কার্যকারিতা। শ্রুতি দক্ষতা অর্জনে তাই শিক্ষককে নিম্নের দিকগুলোর প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ রাখতে হবে।

মনোযোগ : কথা শুনে বুঝতে পারার পূর্বশর্ত হচ্ছে মনোযোগ দিয়ে শোনা। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থী যদি মনোযোগী হয় তবে সে শিক্ষকের প্রতিটি কথা বুঝতে পারবে, বক্তব্যের বিষয়বস্তু অনুধাবন করতে পারবে, হৃদয়ে ধারণ করতে পারবে। প্রশ্ন বুঝতে তার বেগ পেতে হবে না। অতএব শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীরা মনোযোগী আছে কি না শিক্ষককে তা দেখতে হবে। শ্রেণিকক্ষে এমন পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে যেন শিক্ষার্থীরা পাঠে গভীর মনোযোগী হয়।

আগ্রহ : শেখার পূর্বশর্ত হচ্ছে আগ্রহ। শ্রেণি পাঠনার বিষয়বস্তুর প্রতি যদি শিক্ষার্থীর আগ্রহ না থাকে বা আগ্রহ অনুভব না করে তবে যথাযথ শিক্ষা গ্রহণ সম্ভব হবে না। শিক্ষার্থীদের শিক্ষা গ্রহণের প্রতি আগ্রহী করে তোলা শিক্ষকের প্রধান কাজ। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের আগ্রহী করে তোলার প্রতিবন্ধকতা যদি কিছু থাকে শিক্ষককে তা সনাক্ত করতে হবে এবং তা দূরীকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে-শ্রবণ দক্ষতাকে কাজে লাগাতে আগ্রহের কোনো বিকল্প নেই।

জিহ্বার জড়তা দূরীকরণ : শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীরা শুধু পাঠ শ্রবণ করে না বরং শিক্ষকের বক্তব্য শ্রবণের মধ্যদিয়ে তারা শ্রেণিকর্মকাণ্ড যেমন- আলোচনা, প্রশ্নোত্তর ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করে। এক্ষেত্রে তার অন্তরায় হতে পারে জিহ্বার জড়তা। কোনো শিক্ষার্থীর মাঝে এমনটি দেখা গেলে শিক্ষক নানা প্রকার অনুশীলনের মাধ্যমে তা কাটিয়ে উঠতে শিক্ষার্থীকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করবেন।

অন্যমনস্কতা দূরীকরণ : বিভিন্ন কারণেই শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে অন্যমনস্ক থাকতে পারে। হতে পারে তা ব্যক্তিগত, পারিবারিক বা সামাজিক কারণ। অন্যমনস্ক শিক্ষার্থী তার শ্রবণ-দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে পাঠ গ্রহণে সচেষ্ট হতে পারে। পঠন-পাঠন প্রক্রিয়ায় তাকে সক্রিয় করে তুলতে শিক্ষক তার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেবেন।

অভয় দান : শ্রেণিকক্ষে কিছু পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থী থাকে- যাদের শ্রুতি এবং স্মৃতিশক্তি প্রখর নয়। শিক্ষক এসব শিক্ষার্থীদের অভয় দিয়ে তাদের এগিয়ে নিতে সহায়তা করবেন। পঠন-পাঠন প্রক্রিয়ায় তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণে আগ্রহী করে তুলতে সচেষ্ট হবেন।

উপর্যুক্ত কাজগুলো সুসম্পন্ন করতে শিক্ষকের নিজস্ব কিছু গুণ থাকা আবশ্যক যেমন-

স্পষ্ট উচ্চারণ : শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক স্পষ্ট উচ্চারণে কথা বলবেন। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে দেখা যায় একটি শ্রেণিতে প্রায় শতাধিক শিক্ষার্থীকে বসে পাঠ গ্রহণ করতে হয়। পেছনে বসা বা শ্রেণির মাঝামাঝি বসা শিক্ষার্থীদের নিকট শিক্ষকের যাবার তেমন কোনো সুযোগ থাকে না। এরপর যদি শিক্ষক অস্পষ্ট উচ্চারণে কথা বলেন তবে শিক্ষার্থীরা শিক্ষককে অনুসরণ করতে পারবে না বিধায় শ্রেণিপাঠনা ফলপ্রসূ হবে না। তাই শ্রেণিকক্ষে শিক্ষককে স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ উচ্চারণে কথা বলতে হবে।

আঞ্চলিকতা পরিহার : আমাদের শিক্ষকদের একটা বড় অংশ শ্রেণিকক্ষে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করেন। যিনি শিক্ষার্থীদের ত্রুটি সংশোধন করবেন তিনি নিজেই যদি আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করেন তাহলে শিক্ষার্থীদের ত্রুটি সংশোধন হবে সুদূরপরাহত। সুতরাং শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক সর্বদা মানভাষা ব্যবহার করবেন; এতে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের বাচনিক তৎপরতায় আকৃষ্ট হয়ে ত্রুটিমুক্ত মান ভাষা ব্যবহারের সক্ষমতা অর্জন করবে।

মার্জিত পোশাক : সুন্দর বেশভূষা মানুষকে আকর্ষণীয় করে। সেই সাথে ব্যক্তিত্বের ও বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। সুন্দর মার্জিত পোশাকের শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে সহজেই শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারেন। শিক্ষকের প্রতি শিক্ষার্থীদের এই আকর্ষণবোধ ত্রুটি সংশোধনেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

রসাত্মক পাঠদান : অনেক শিক্ষক আছেন যাঁরা শ্রেণিকক্ষে গম্ভীর হয়ে পাঠদান করেন। তাঁদের নিকট শিক্ষার্থীরা সহজ হতে পারে না, তাদের সুবিধা অসুবিধাগুলো শিক্ষকের নিকট তুলে ধরতে পারে না। পক্ষান্তরে শিক্ষক যদি হাসিমুখে রসাত্মকভাবে পাঠ উপস্থাপন করেন তবে শিক্ষার্থীরা সহজেই পাঠে মনোনিবেশ করে এবং শিক্ষকের উপদেশ নির্দেশের প্রতি যত্নবান হয়।

পূর্বপ্রস্তুতি ও পরিকল্পিত পাঠদান : পাঠদান কখনো সফল হয় না যদি তা পরিকল্পিত না হয়। শিক্ষকের পরিপূর্ণ পূর্বপ্রস্তুতি পাঠদানকে রসাত্মক, আকর্ষণীয় ও হৃদয়সঞ্চারী করে তোলে। আকর্ষণীয় পাঠদান শিক্ষার্থীদের মন ও মননে দীর্ঘ প্রভাব ফেলে। শিক্ষকের প্রতি আস্থা ও শ্রদ্ধাবোধ বেড়ে যায়, পাঠে মনোনিবেশ ও মনোযোগী হতে বেগ পেতে হয় না। এমন শিক্ষকের দিক নির্দেশনা শিক্ষার্থীরা আনন্দচিত্তে গ্রহণ করে।

নাম ধরে ডাকা : শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের নাম ধরে ডাকা তাদের কাছে টানার অন্যতম একটি কৌশল। প্রশ্নকরণ বা আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য শিক্ষকের আহ্বানের ক্ষেত্রে শিক্ষক যদি শিক্ষার্থীর নাম ধরে ডাকেন শিক্ষার্থীর বুঝতে কষ্ট হয়না শিক্ষক তাকে কত আদর বা স্নেহ করেন। এই কৌশলটি শিক্ষার্থীকে উৎসাহিত করবে এবং মনোযোগী হতে সহায়তা করবে।

শোনার অনুশীলন

ভাষা দক্ষতার চারটি দিক-শোনা, বলা, পড়া ও লেখা একে অন্যের পরিপূরক। দক্ষতাগুলোর মধ্যে শোনাকে প্রথম স্থান দেওয়া হয়েছে। মানুষ সবচেয়ে বেশি শোনে। অন্য দক্ষতাগুলোকে প্রভাবিত করে শোনা দক্ষতা। তাই শোনা দক্ষতাকে অধিকতর কার্যকর ও ফলপ্রসূ করতে এর যথাযথ অনুশীলন করা আবশ্যক। শ্রুতি দক্ষতা বাড়ানোর জন্য নিম্নের কৌশলগুলো অনুসৃত হতে পারে-

শ্রুতলিপি অনুশীলন : শ্রুতি দক্ষতা বাড়ানোর কৌশল হিসেবে শ্রুতলিপি অনুশীলন অত্যন্ত কার্যকর একটি কৌশল। শিক্ষার্থীদের বয়স, মেধা ও পারগতার প্রতি লক্ষ্য রেখে শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে শ্রুতলিপি অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ও শ্রবণ দক্ষতা বাড়াতে পারেন।

পারস্পরিক আলোচনায় অংশগ্রহণ : শিক্ষার্থীদের নিজেদের মধ্যে আলোচনার সুযোগ সৃষ্টি করে তাদের শ্রুতিদক্ষতার বিকাশ সাধন করতে পারেন। অনুশীলনের উপযোগী কোনো বিষয় নির্ধারণ করে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের আলোচনা করতে দেবেন। নির্ধারিত সময় পর তিনি ফলাবর্তন নেবেন।

বক্তব্য শুনে প্রতিক্রিয়া জানানো : শ্রুতিদক্ষতার কৌশল হিসেবে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কোনো বক্তব্য শুনতে নির্দেশনা দেবেন। বক্তব্য শেষে তিনি তা আনন্দদায়ক ছিল কি না, বক্তার দেহভঙ্গী কেমন ছিল, শব্দচয়ন কেমন ছিল ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষার্থীদের প্রতিক্রিয়া শুনবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক অবশ্যই পিছিয়ে পড়া বা অনগ্রসর শিক্ষার্থীদের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখবেন।

বিতর্কে অংশগ্রহণ : শোনা দক্ষতা অনুশীলনে বিতর্কে অংশগ্রহণ একটি কার্যকরী কৌশল। বিতর্কে যুক্তি খণ্ডন ও যুক্তি প্রতিষ্ঠাকরণে তার্কিককে বিপক্ষের বক্তব্য মনোযোগ সহকারে শুনতে হয়। এতে করে বিপক্ষের যুক্তি খণ্ডন সহজ হয়ে যায়। শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে উপযুক্ত বিষয় নির্ধারণ করবেন। ফলে সকল শিক্ষার্থীর জন্য বিতর্ক উপভোগ্য হয়ে উঠবে।

নাটিকায় অভিনয় : শিক্ষক নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা করে শ্রুতি দক্ষতার অনুশীলন করাতে পারেন। নাটকের সংলাপ প্রক্ষেপণে অভিনেতা অভিনেত্রীকে সতর্ক থাকতে হয় এবং মনোযোগ দিয়ে শুনে নিজের সংলাপ বলতে হয়। এতে শোনা দক্ষতার বিকাশ সাধিত হয়।

কবিতার রসাস্বাদন : কবিতা পাঠের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে রসাস্বাদন। চমৎকার হৃদয়গ্রাহী আবৃত্তি শিক্ষার্থীদের মনোজগতে দারুণ অনুরণন সৃষ্টি করে। শিক্ষার্থীরা তন্ময় হয়ে আবৃত্তি শোনে বিধায় তাদের শ্রবণ ইন্দ্রিয়ে দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলে।

৫.২ : বলা

বলা বা কথন ভাষাদক্ষতার দ্বিতীয় স্তর বা ধাপ। শোনার দিকটাকে আমরা যেমন শ্রব্য বলি, বলার দিকটাকে উচ্চার্য হিসেবে দেখি। মূলত ভাষাদক্ষতার পূর্ণতা প্রকাশ পায় বলার মাধ্যমেই। মায়ের কাছেই মানুষের বলা দক্ষতার শুরু। আর এর প্রকাশ ঘটে সহজাত ও স্বাভাবিক নিয়মে। ছোট হোক বা বড় হোক মানুষের জীবনে প্রয়োজনের কোনো শেষ নেই। প্রথমত তার প্রয়োজনের কথা বলে বোঝাতে হয়। ভাষা শেখার প্রথম দিকে স্পষ্ট শব্দ শিশু বলতে পারে না। কিন্তু শিশুর মা-বাবা, পরিবারের অন্যান্য সদস্য, প্রতিবেশিদের প্রতিনিয়ত কথোপকথন তাকে স্পষ্ট শব্দ শেখাতে সহায়তা করে। এরপর সামাজিক পরিবেশে সে যখন মিশতে শুরু করে তার বলা দক্ষতার পরিধির বিস্তৃতি ঘটতে থাকে।

বলার প্রয়োজনীয়তা

মানুষ বেশি শোনে এবং কম বলে। অথচ মানব জীবনে বলার প্রয়োজনীয়তা অসীম। আমরা বলতে পারি বলেই অন্যকে এবং নিজেকে আবিষ্কার করতে পারি। নিম্নে বলার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

নিজেকে প্রকাশের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম : শিশুকিশোর থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত সবাই নিজেকে অন্যের কাছে প্রকাশ করতে চায়। আমিত্বকে তুলে ধরাটা মানুষের সহজাত। এই প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়েই সে নানা কুশলতায়, নানা ব্যঞ্জনায় নিজেকে উপস্থাপন করে। সফলতা বা বিফলতা বড় কথা নয়– নিজেকে মেলে ধরতে পারাটাই এখানে মুখ্য। অন্য কোনো মাধ্যমে যা সম্ভব নয় বলার মাধ্যমে তা করা সম্ভব।

ব্যক্তিত্বের প্রকাশ : মানুষের ব্যক্তিত্ব প্রকাশের অনন্য মাধ্যম হচ্ছে তার প্রকাশ ক্ষমতা। সবাই একই রকম বলতে পারে না। শব্দচয়ন, স্বর প্রক্ষেপণ মানুষকে অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে দেয়। তার প্রতি শ্রোতার আস্থার বহিঃপ্রকাশও ঘটে। তাই বলা দক্ষতা মানুষের ব্যক্তিত্বের অনন্য প্রকাশকে প্রভাবিত করে।

জীবনের সফলতার সিঁড়ি : জীবনে সফলতা চায় না এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই সফলতার পেছনে অনেক কিছুই ক্রিয়াশীল থাকতে পারে, তবে বলা দক্ষতা এর অন্যতম বাহন। যিনি ভালো বলতে পারেন- তার জন্য অনেক কঠিন কাজও সহজ হয়ে যায়। দক্ষতার সাথে বলতে পারা সবাইকে দিয়ে হয় না। যিনি পারেন সফলতার দ্বারগুলো তার কাছে সহজেই উন্মুক্ত হয়।

সম্পর্ক স্থাপন : কথা বলা একটি আর্ট বা শিল্প। বলার যাদুতে রয়েছে সম্মোহনী শক্তি। পাষাণ হৃদয়কে বিগলিত করে কথার যাদু। শত্রুকে আপন মহিমায় মৈত্রীর আসনে সমাসীন করে- 'বলে বোঝানোর' অসীম ক্ষমতা। সুতরাং সম্পর্ক স্থাপন, অন্যকে কাছে টানার ক্ষেত্রে বলা দক্ষতা অনন্য ভূমিকা পালন করে।

আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করে : আত্মশক্তি মানব জীবনের সফলতার বাহন। 'আমিও পারি' এই উপলব্ধি মানুষকে অনেক দুর্ভেদ্যকে ভেদ করতে অচলকে সচল করতে ও অজানাকে জানতে অব্যর্থ ভূমিকা পালন করে। মানুষের এই আত্মবিশ্বাসের মূলে কাজ করে– মানুষের সাথে তার সম্পর্ক স্থাপন ও সফলতার প্রবল আকাঙ্ক্ষা। বলা দক্ষতাই যে এর প্রকৃত সূচক একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা।

অন্যান্য ভাষা শিখনের সহায়ক : মাতৃভাষা মানুষের সহজাত। একটি সুস্থ সবল শিশু জন্মের পর ভাষা আয়ত্ত করে অবচেতনভাবে। অনুকরণ ও অনুশীলন শিশুর ভাষা আয়ত্তকরণের মূল উপাদান। ভাষা শিখতে এই সময় সযত্ন কোনো প্রয়াস থাকে না। কিন্তু দ্বিতীয় ভাষা আয়ত্তকরণে অবশ্যই সযত্ন প্রচেষ্টা ও সচেতনভাবে অনুকরণ অনুসরণ ও অনুশীলন করতে হয়। দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষণের ভিত হিসেবে কাজ করে সহজাত মাতৃভাষা। মাতৃভাষার ভিত যার যত মজবুত দ্বিতীয় ভাষা শিখন তার জন্য তত সহজতর হয়।

সুন্দরভাবে কথা বলার বৈশিষ্ট্য/লক্ষণ

কথাবলা মানুষের সহজাত। কিন্তু সুন্দরভাবে কথা বলা সহজ নয় বরং অনুশীলন সাপেক্ষ। সুন্দর করে কথা বলার ক্ষেত্রে নিচের বৈশিষ্ট্যসমূহ পরিলক্ষিত হয়।

স্পষ্ট করে বলা : স্পষ্ট করে কথা বলার ক্ষেত্রে মা-বাবাসহ বড়দের ভূমিকা অনস্বীকার্য। কথা বলার প্রারম্ভে শিশু অনুকরণ করে, অনুসরণ করে। সুতরাং শেখার শুরুতেই শিশুদের সাথে কথা বলার জন্য স্পষ্ট বলার চেষ্টা করা উচিত। শিশু সুন্দর কথা বলে- এর অর্থ হলো সে স্পষ্ট শব্দ ব্যবহার করে বলতে পারঙ্গম হয়ে উঠেছে।

শুদ্ধ উচ্চারণে কথা বলা : সুন্দরভাবে কথা বলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সঠিক উচ্চারণে কথা বলা। বাগযন্ত্রের সঠিক ব্যবহার এর নিশ্চয়তা প্রদান করতে পারে। শৈশবে শিশুদের বাগযন্ত্র বেশ নমনীয় থাকে। এই সময়টাকে কাজে লাগিয়ে শুদ্ধ উচ্চারণে অভ্যস্ত করলে বলার ক্ষেত্রে তা কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

যথাযথ শব্দের ব্যবহার : সুন্দর করে কথা বলার একটি বড় লক্ষণ হচ্ছে– বাক্যে যথাযথ শব্দের ব্যবহার করতে পারা। শব্দের ব্যবহার অনুশীলন সাপেক্ষ। অনুশীলনের মাধ্যমে শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধি পায়। শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ না হওয়ার কারণেই বক্তা কথা বলতে গিয়ে অনেক সময় যথাযথ শব্দটি হাতড়ে বেড়ায়। শ্রোতা তখন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। আবার অনেকের কথাই বক্তা তন্ময় হয়ে শোনে। এর পেছনে কাজ করে সমৃদ্ধ শব্দভাণ্ডার ও তার যথাযথ ব্যবহার।

শ্রোতা সচেতনতা : ভাল বক্তার অন্যতম গুণ শ্রোতা সচেতনতা। শ্রোতৃমণ্ডলীর বয়স, মেধা, রুচি, শিক্ষা প্রভৃতি জেনে তিনি কথা বলেন। শিক্ষিত মার্জিত রুচির শ্রোতার উদ্দেশ্যে ভাব-গম্ভীর ভাষা ব্যবহার করলেও সাধারণ শ্রোতার সামনে বক্তা সচেতনভাবেই সকলের বোধগম্য ভাষা ব্যবহার করেন। শ্রোতার রুচি মাফিক বক্তব্য প্রদান সচেতন মানসিকতারও বহিঃপ্রকাশ।

স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলা : বলার সময় অনেকের মাঝেই স্বতঃস্ফূর্ততার ঘাটতি লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য যিনি ভালো বলেন তিনি এই দোষে তাড়িত নন। কথার পিঠে কথা বলা বা বাক্য পরম্পরায় নিজেকে উপস্থাপনে বক্তার মাঝে কোনো দ্বিধা, সংকোচ বা জড়তা থাকে না। স্বতঃস্ফূর্ত বলার মাঝে এক ধরনের ভালোলাগাও কাজ করে। এই গুণটি ব্যক্তির 'আমিত্ব' প্রকাশেও সহায়ক।

যুক্তি প্রদান : যিনি ভাল বলেন- তিনি কথার মাঝে যুক্তি প্রদানে পারঙ্গম হন। এই পারঙ্গমতা তাকে অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে দেয়। যিনি বিচার বিশ্লেষণ করে কথা বলেন, তিনি যথাযথ যুক্তি প্রদানে সক্ষম হন। বিষয়টি তার গভীর জ্ঞানেরও পরিচায়ক।

স্বরের ওঠানামা : স্বরের ওঠানামা বলা দক্ষতার অনন্য গুণ। কথা বলার সময় স্বর যদি সমান্তরাল থাকে তবে বক্তার বক্তব্য আকর্ষণ হারিয়ে ফেলে। যে কোনো সাধারণ পাঠের ক্ষেত্রে, আবৃত্তির ক্ষেত্রে বা বলার ক্ষেত্রে স্বরের ওঠানামা বক্তার সৃজনশীলতার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়।

সংলাপ বলতে পারা : নাটক/নাটিকার সংলাপে অংশ নেয়া অভিনয়ের সাথে সম্পৃক্ত। বিষয়টি শিল্পকলার অন্তর্ভুক্ত। বলার ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জনকারী সহজেই সংলাপ বলতে পারদর্শিতা প্রদর্শন করতে পারেন। গান গাওয়া বা আবৃত্তির মতো কণ্ঠের বহুমাত্রিক ব্যবহার ও কারুকাজ শিখে সংলাপ প্রক্ষেপণে তা ব্যবহার করতে পারনে।

মান ভাষা ব্যবহার : বলা দক্ষতা অর্জনকারী অবশ্যই মান ভাষা ব্যবহার করবেন। বৈঠকী আলোচনা, কথোপকথন, মতবিনিময়, শ্রেণিকক্ষের বক্তৃতাসহ সকল ক্ষেত্রে মান ভাষাই হবে সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম। আদেশ/নির্দেশ, অনুরোধ, সৌজন্য প্রকাশ, তিরস্কার, প্রশংসা ইত্যাদি বিভিন্ন রকম ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে মান ভাষার সার্থক ব্যবহার ব্যক্তির ভাষা দক্ষতার আসল পরিচায়ক।

বলার দক্ষতা অর্জন

'বলা' বাক্‌প্রত্যঙ্গ নির্ভর। ভাষা বলে প্রকাশ করার জন্য মানুষ বাকযন্ত্র তথা ফুসফুস, স্বরযন্ত্র, কণ্ঠ, মুখ, ঠোঁট, জিহ্বা, দাঁত, নাক প্রভৃতি বাকপ্রত্যঙ্গের সাহায্য নেয়। বলার দক্ষতা অর্জন তথা ভাষার মৌখিক নৈপুণ্য অর্জনে করণীয় বিষয়গুলো নিচে আলোচনা করা হলো।

ধ্বনি ও শব্দের উচ্চারণ : শিক্ষা গ্রহণের শুরু থেকেই শিশুদের ধ্বনি, বর্ণ ও শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণের প্রতি জোর দিতে হবে। বলা নিতান্তই উচ্চার্য বলে সুষ্ঠু উচ্চারণ ও স্বরভঙ্গির যথার্থতা আবশ্যক। অনেক সময় উচ্চারণ শুদ্ধ না হলে অর্থ বোঝা যায় না, শুনতে তা শ্রুতিকটু হয়, ভাষা তার সৌন্দর্য হারিয়ে ফেলে। তাই শুরুতেই শুদ্ধ উচ্চারণের অনুশীলন করাতে হবে।

আলোচনা : মৌখিক অনুশীলনের ক্ষেত্রে আলোচনা অত্যন্ত কার্যকর। আলোচনায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর উপলব্ধির জগত প্রসারিত হয়, অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জন্মে, সম্মিলিতভাবে কাজ করার স্পৃহা জাগ্রত হয়, কর্মপন্থা নির্ধারণের সাহস জন্মে, জ্ঞানের বিস্তৃতি ঘটে, অনুসন্ধানের ইচ্ছা প্রবলতর হয় ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। সমস্যা মোকাবিলার কৌশল হিসেবে এবং সাহস বৃদ্ধিতে আলোচনা অনন্য ভূমিকা পালন করে।

বর্ণনা : বর্ণনাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন মৌখিক বর্ণনা ও লিখিত বর্ণনা। মৌখিক অনুশীলনের ক্ষেত্রে আমরা মৌখিক বর্ণনাকেই গুরুত্ব দেব। বর্ণনা বলতে কোনো বিষয় সম্পর্কে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণকে বুঝায়। এতে বর্ণিত বিষয়ের বৈশিষ্ট্য, এর ভাল দিক, দুর্বল দিক প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় আলোচনা, সমালোচনা বা পর্যালোচনার মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়।

পঠন : পঠন বা পাঠকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন– সরব পাঠ ও নীরব পাঠ। ভাষার মৌখিক অনুশীলন বলতে সরব পাঠের অনুশীলনকেই বুঝায়। সরব পাঠ অবশ্যই স্পষ্ট, শুদ্ধ হৃদয়গ্রাহী ও শ্রুতিমধুর হওয়া আবশ্যক। পঠন অনুশীলনেরউপকারিতাসমূহ নিম্নবর্ণিত–

- এতে জড়তা দূরীভূত হয়,
- দ্বিধা, সংকোচ ও ভয় কেটে যায়,
- স্বরের ওঠানামায় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়,

- ভাবের সাথে কণ্ঠের মেলবন্ধন তৈরি হয়,
- আঞ্চলিকতা ধরা পড়ে ও তা দূর করা সম্ভব হয়,
- সপ্রতিভ ও বলিষ্ঠ বাচনভঙ্গি গড়ে ওঠে।

আবৃত্তি : কবিতা পাঠের প্রধান উদ্দেশ্যই রসাস্বাদন। হৃদয়গ্রাহী আবৃত্তির মাধ্যমেই কবিতার রস পুরোপুরি আস্বাদন সম্ভব হয়ে ওঠে। তখন কবির উপলব্ধি 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো আকুল করিল মোর প্রাণ'- যথার্থ বলে মনে হয়। কবিতার ভাব, গতি, ছন্দ, আবেগ, স্বরের ওঠানামা প্রভৃতির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে আবৃত্তিকে শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত করা যায়। তবে এসবই অনুশীলনসাপেক্ষ। উপযুক্ত প্রশিক্ষকের নিকট থেকে কলাকৌশল আয়ত্ত করলে এবং নিয়মিত তা অনুশীলন করলে আবৃত্তিঅবশ্যই শিল্পমণ্ডিত হয়ে ওঠে। সুষ্ঠু আবৃত্তি শিক্ষার্থীর সুপ্ত গুণাবলির বিকাশ সাধনের পাশাপাশি নিম্নবর্ণিত ইতিবাচক ভূমিকা রাখে-

- শব্দ ভাণ্ডার বৃদ্ধি করে,
- পাঠের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করে,
- উচ্চারণের অসঙ্গতি দূরীকরণে সহায়তা করে,
- জিহ্বার জড়তা কাটাতে ভূমিকা রাখে,
- দ্বিধা-সংকোচ দূরীভূত হয়,
- কথা বলার দক্ষতা বাড়ে,
- নতুন শব্দের যথাযথ প্রয়োগে পারঙ্গম হয়,
- আত্মশক্তি বৃদ্ধি পায়,
- মন ও মননে অনুসন্ধিৎসা সৃষ্টি হয়।

বিতর্ক : যুক্তিসংগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের পক্ষে বা বিপক্ষে প্রতিপক্ষের উপস্থিতিতে যুক্তিসহ বক্তৃতা প্রদানের নামই বিতর্ক। বিতর্কের পক্ষে বা বিপক্ষে প্রয়োজনীয় যুক্তি প্রদানের কৌশল অবশ্যই অর্জন করতে হয়। এতে শুদ্ধ উচ্চারণ অপরিহার্য। প্রতিপক্ষের প্রতি কোন রূঢ় আচরণ এখানে গ্রহণযোগ্য নয়।
বিতর্কে অংশগ্রহণের ফলে শিক্ষার্থীদের-

- নেতৃত্বের গুণাবলি অর্জিত হয়,
- যুক্তিসহ কথা বলার দক্ষতা বাড়ে,
- কথায় ও আচরণে পরিমিতিবোধ জন্মে,
- অনুসন্ধান দক্ষতা বাড়ে,
- বুদ্ধি ও বিবেচনা পরিপক্ব হয়,
- শিল্পিত ভাষাভঙ্গি গড়ে ওঠে।

গল্প বলা : গল্প বলা একটি আর্ট বা শিল্প। গল্প বলার স্টাইল বা ধরনের উপর এর আকর্ষণ নির্ভর করে। শুদ্ধ ও মার্জিত উচ্চারণে গল্প বললে এবং এতে রসের সৃষ্টি করতে পারলে শ্রোতারা মুগ্ধ হয়ে শোনে। গল্প বলা অনুশীলনের মাধ্যমে বক্তা–

- স্নেহরসে বিগলিত বাচনিক দিক আয়ত্ত করতে পারে,
- গুছিয়ে কথা বলার দক্ষতা বাড়ে,
- কণ্ঠস্বরের শিল্পিত ব্যবহার করতে শেখে,
- কল্পনার জগত সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়,
- নিজের ভাব-কল্পনা অন্যের মাঝে সঞ্চার করতে পারে।

বক্তৃতা : ভাষা দক্ষতার অর্জনের অন্যতম কৌশল হচ্ছে বক্তৃতা। বক্তৃতাকে প্রধানত তিন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যেমন-

১. প্ররোচণামূলক
২. শিক্ষামূলক
৩. বিনোদনমূলক

প্ররোচণামূলক বক্তৃতা শ্রোতাকে তাৎক্ষণিকভাবে উদ্বুদ্ধ করে, কর্মে ও বিশ্বাসে অনুপ্রেরণা যোগায়। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের বক্তৃতাকে শিক্ষামূলক বক্তৃতার শ্রেণিতে ফেলা যায়। বিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে যে উপস্থিত বক্তৃতার আয়োজন করা হয় তা বিনোদনমূলক বক্তৃতা। শিক্ষার্থীদের অনুশীলনের ক্ষেত্রে বিনোদনমূলক বক্তৃতা কার্যকর ভূমিকা রাখে। বিনোদনমূলক বক্তৃতাকে আবার উপস্থিত বক্তৃতা ও নির্ধারিত বক্তৃতা এই দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এর চর্চা করা যায়, ফলে শিক্ষার্থীদের একদিকে যেমন বিনোদন হয়, অন্যদিকে চর্চার ফলে জড়তা কেটে যায়, উপস্থিত বুদ্ধির সর্বাধিক ব্যবহার হয়, চিন্তা জগতের প্রসারঘটে, মান ভাষার প্রতি আগ্রহ জন্মে ও অত্মোপলব্ধি ঘটে।

অনুষ্ঠান উপস্থাপন : মৌখিক অনুশীলনের ক্ষেত্রে অনুষ্ঠান পরিচালনা করা ও উপস্থাপন করা কার্যকর কৌশল হিসেবে বিবেচিত। প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করে উপস্থাপন করলে তা একটি শিল্পে রূপ নেয়। ভালো উপস্থাপনা যেমন অনুষ্ঠানের সফলতা আনে তেমনি উপস্থাপকের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য যেমন: ব্যক্তিত্ব, বাচনশৈলী, কণ্ঠস্বর, শারীরিক অভিব্যক্তি প্রভৃতির সমন্বয়ে শ্রোতার মনে এক ঐন্দ্রজালিক আবহ সৃষ্টি করে।

উপর্যুক্ত বিষয়গুলো ছাড়াও শিক্ষার্থীদের বলার দক্ষতা অর্জনের জন্য ধন্যবাদ জানানো, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, অনুরোধ জানানো, দুঃখ প্রকাশ, নির্দেশ ও আদেশ প্রদান, কথোপকথন, সংবাদ পাঠ, অভিনন্দনপত্র পাঠ প্রভৃতির অনুশীলন করানো যায়। বলা দক্ষতার জন্য অডিও ভিডিও যন্ত্রপাতিও কার্যকরভাবে ব্যবহার করা যায়। এসব আয়োজনের সঠিক ও কার্যকর ব্যবস্থাপনা শিক্ষার্থীর বলা দক্ষতাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়।

বলা দক্ষতা উন্নয়নে শিক্ষকের করণীয়

শিশুর কথা বলার শুরু তার পারিবারিক পরিবেশে। সুন্দর ছড়া শেখা ও বলার মধ্য দিয়ে তার প্রস্তুতিপর্ব সম্পন্ন হয়। এরপর অভিভাবক ও শিক্ষকদের সযত্নপ্রয়াস, সহানুভূতি ও সতর্কতার উপর নির্ভর করে শিশুর শুদ্ধভাবে কথা বলা, পাঠ করা, আবৃত্তি করাসহ যাবতীয় কর্মকাণ্ড। বিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষকদের অকৃত্রিম সহযোগিতা শিক্ষার্থীদের ভাষা শিক্ষায় অনন্য ভূমিকা রাখতে পারে।

বয়সভিত্তিক তৎপরতা: শিক্ষণ প্রক্রিয়া মনোবিজ্ঞানসম্মত না হলে তা শিখন স্থায়ী ও ফলপ্রসূ হয় না। তাই শেখানোর ক্ষেত্রে শিক্ষকের কাজ হবে শিক্ষার্থীদের বয়স ও পারঙ্গমতা বিবেচনায় নিয়ে তাদের অনুশীলন করানো।

শুদ্ধ উচ্চারণ : বাংলা স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির শুদ্ধ উচ্চারণ অনুশীলন সাপেক্ষ।হ্রস্বস্বর-দীর্ঘস্বর, অল্পপ্রাণ-মহাপ্রাণ, ঘোষ-অঘোষ প্রভৃতি ধ্বনি ও বর্ণগুলো শিক্ষক ভালোভাবে চর্চা করাবেন। শব্দের মাঝে ধ্বনির ব্যবহার ও উচ্চরণে যদি কোনো অস্পষ্টতা থাকে তা দূরীকরণের ব্যবস্থা করবেন।

বাক্প্রত্যঙ্গের ব্যবহার : বাংলা বর্ণমালার শুদ্ধ উচ্চারণ শিক্ষার্থীদের প্রত্যক্ষ অনুশীলনের মাধ্যমে শেখানো উচিত। এ জন্য বর্ণের উচ্চারণ স্থান ও উচ্চারণরীতিকে গুরুত্ব দিতে হবে। শিক্ষককে বাগযন্ত্রের কণ্ঠনালী, জিহ্বা, তালু, মূর্ধা, দন্ত প্রভৃতি অংশ দেখিয়ে উচ্চারণে এদের ভূমিকা ও ব্যবহার কৌশল সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের পরিষ্কার ধারণা দিতে হবে । এ ক্ষেত্রে যে কোনো অংশের বিরূপ ব্যবহার ও উচ্চারণ অস্পষ্টতা শুদ্ধ উচ্চারণের পরিপন্থি। তাই শিক্ষককে সজাগ থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

আনন্দদায়ক শিক্ষাদান : শিক্ষা গ্রহণের পূর্বশর্ত আগ্রহ। শিক্ষার্থীদের মাঝে যদি আগ্রহ সৃষ্টি করা না যায়- তাহলে তারা সানন্দে শিখবে না। কথা বলা অনুশীলনের ক্ষেত্রে শিক্ষক প্রথম থেকেই আনন্দঘন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন। এতে শিক্ষার্থীদের মনে গভীর আনন্দের সঞ্চার হবে, শিক্ষক যা কিছু শেখানোর প্রয়াস নেবেন তা সাফল্যমণ্ডিত হবে।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ : প্রতিটি মানুষ একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। প্রতিনিয়ত আমরা কাউকে উপকার করছি, আবার নানাভাবে অন্যের দ্বারা উপকৃত হচ্ছি। অনেকের মনে কৃতজ্ঞতাবোধ থাকলেও সাবলীল ও সৌজন্যের সাথে প্রকাশ করতে পারে না। এতে উপকারী ব্যক্তি অনেক সময় মনঃক্ষুণ্ন হন। তাই কাজটি হওয়া উচিত নৈপুণ্য ও সৌজন্যের সাথে। শিক্ষক অবশ্যই শিক্ষার্থীদের সৌজন্য শেখাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন। অনুরূপভাবে শিক্ষক সৌজন্যের সাথে দুঃখ প্রকাশ, সুন্দরভাবে অনুরোধ জানানো, চমৎকার ভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও আদেশ-নির্দেশ দেওয়ার অনুশীলন করাবেন।

পরিমিতিবোধ : মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে চলতে হলে প্রতিনিয়ত একের সাথে অন্যের কথোপকথন, মতবিনিময়, আলোচনা-সমালোচনা করতেই হয়। এসব করতে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে। কী বলছি, কেন বলছি, কার কাছে বলছি, এসব বিষয় ভাবতে হবে। কারণ সবার সাথে একই ভাষা ব্যবহার করা যায় না। এখানে অবশ্যই পরিমিতিবোধ থাকতে হবে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের এ ব্যাপারে সতর্ক করবেন এবং নানা উদাহরণের মাধ্যমে পরিমিতিবোধ শেখাবেন।

অনুষ্ঠান পরিচালনা : ভাষা দক্ষতার উন্নয়নে অনুষ্ঠান পরিচালনা ও উপস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উপস্থাপনের ক্ষেত্রে অবশ্যই মানভাষা ব্যবহার করতে হয়, স্পষ্ট উচ্চারণে কথা বলতে হয় এবং মার্জিত রুচিবোধের পরিচয় দিতে হয়। শিক্ষক অনুষ্ঠান পরিচালনার কলাকৌশল এবং উপযুক্ত স্ক্রিপ্ট তৈরির কৌশল শেখাবেন, অনুশীলন করাবেন ও ভুল সংশোধনের ব্যবস্থা নেবেন।

সরব পাঠ করানো : বিশেষত বাংলা বিষয়ের ক্ষেত্রে সরবপাঠ অত্যাবশ্যক। বিরাম চিহ্নের প্রতি লক্ষ্য রেখে, অর্থবোধের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখে শুদ্ধ উচ্চারণে সরব পাঠ করতে হয়। শ্রেণিতে শিক্ষক পর্যায়ক্রমিকভাবে সরব পাঠ করাবেন, শিক্ষার্থীদের দ্বারা ভুল সংশোধন করাবেন, শিক্ষার্থীদের অপারগতায় নিজে সংশোধনের ব্যবস্থা করবেন।

সংবাদ পাঠ অনুশীলন : শুদ্ধ বলা চর্চার ক্ষেত্রে পত্রিকা থেকে সংবাদ পাঠ অনুশীলন করানো যায়। সংবাদ পাঠে চলিত মানভাষা ব্যবহার করা হয় এবং আমাদের দেশে দু'একটি ব্যতিক্রম বাদে সংবাদপত্রগুলো মান ভাষায় প্রকাশিত হয়। শিক্ষক এমন পত্রিকা থেকে সংবাদ পাঠ অনুশীলন করাতে পারেন। এতে শিক্ষার্থীদের মাঝে আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসার সৃষ্টি হবে। সংবাদপত্রে দেশি বিদেশি ব্যক্তি বা স্থানের নাম থাকে। এগুলো সঠিক উচ্চারণে ও স্বরভঙ্গি ঠিক রেখে পড়া হলে শিক্ষার্থীদের নিজের প্রতি আস্থা তৈরি হয়। পাঠে জড়তা দূরীভূত হয়।

বলা দক্ষতা উন্নয়নসহযোগী দক্ষ শিক্ষক

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের নিকট হতে উপর্যুক্ত বিষয়গুলো শিখবে, অনুশীলন করবে এবং কার্যক্ষেত্রে দক্ষতার সাথে প্রয়োগ করবে। শিক্ষকের নিজের যদি উচ্চারণ ত্রুটি থাকে এবং অভিনয় দক্ষতা, সরস আবৃত্তির দক্ষতা, বাগযন্ত্রের সঠিক ব্যবহার দক্ষতা, বক্তৃতার দক্ষতা ও গল্প বলার দক্ষতা না থাকে, তবে তাঁর কাছে শিক্ষার্থীরা ওগুলো সঠিকভাবে শিখতে পারবে না। তাই শিক্ষককে উপরের গুণাবলি অবশ্যই অর্জন করতে হবে। অনুশীলন করাতে গিয়ে শিক্ষক আধুনিক শিক্ষা-উপকরণ যেমন-বাগযন্ত্রের মডেল বা ছবি/চার্ট, অডিও ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতি, গ্রামোফোন রেকর্ড, টেপ রেকর্ডার, ক্যাসেট, শব্দের চার্ট, আয়না প্রভৃতি দক্ষতা ও যত্নের সাথে ব্যবহার করবেন। এর ফলে শিক্ষার্থীরা জীবনের যে কোনো প্রয়োজনে সুষ্ঠুভাবে এর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে পারবে।

৫.৩ : পড়া

ভাষাদক্ষতার তৃতীয় স্থানে রয়েছে পড়া বা পঠন। আনুষ্ঠানিক পাঠ অনুশীলনের গুরুত্বপূর্ণ দিক 'পড়া'। শোনা ও বলার মধ্য দিয়ে শিশুর পাঠ গ্রহণের শুরু। পড়ার কাজটি এসেছে ভাষার লিখিত রূপটি গড়ে ওঠার পরে। রবার্ট লাডোর কথায়, 'To read is to grasp language patterns from their written representation. ড. মাইকেল ওয়েস্ট বলেন, 'পঠন হলো দৃশ্যত ধ্বনি উৎপাদন ও অর্থ উপলব্ধির মিলিত প্রক্রিয়া'। পড়া শেখানোর কাজে নিম্নোক্ত প্রক্রিয়াসমূহ অনুসরণ করা হয়-

- ধ্বনির লিখিত রূপের সাথে পরিচিতি
- লিখিত রূপের সাথে ভাষার সংযোগ স্থাপন
- বলা ও পড়ার সমন্বয় সাধন

- মূলভাব ও অনুধাবনের উদ্দেশ্যে পঠন
- লিখিত রূপের বৈচিত্রের সাথে পরিচয়
- পড়ার স্বাচ্ছন্দ্য অর্জন
- সাহিত্য পাঠে আনন্দানুভূতির বিকাশ সাধন।

পঠনের গুরুত্ব

আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে পঠন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের জ্ঞান আহরণের দ্বার উন্মুক্ত হয় পঠনের মাধ্যমে। দেশ বিদেশের জ্ঞান বিজ্ঞানের নানা তথ্য-উপাত্ত, বিচিত্র কাহিনী, ইতিহাস-ঐতিহ্য পঠনের মাধ্যমে জানা যায়। জ্ঞান রাজ্যের অসীম ভাণ্ডারের চাবি তাই পঠন প্রক্রিয়া। আমরা বলতে পারি–

- জ্ঞান ভাণ্ডারকে আরও স্ফীত করতে পঠনের প্রয়োজন
- শিক্ষার্থীদের মননশীলতার বিকাশে প্রয়োজন পঠনের
- বুদ্ধিবৃত্তি ও জ্ঞানের বিস্তৃতি ঘটাতে পঠন দরকার
- অবসর জীবনে পঠন আনন্দদায়ক সঙ্গী
- কবি সাহিত্যিকদের রচনারীতি সম্পর্কে জানতে পঠন আবশ্যক
- নতুন শব্দ আহরণ ও বাক্যে প্রয়োগে পঠন গুরুত্বপূর্ণ
- মার্জিত রুচিবোধ ও চিত্তের বিকাশ ঘটাতে পঠন সহযোগী
- মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠনেও পঠনের গুরুত্ব অপরিসীম।

পঠনের প্রকারভেদ

প্রকৃতি অনুসারে পঠনকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

১. সরব পাঠ
২. নীরব পাঠ

আবার উদ্দেশ্য অনুযায়ী পঠনকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন-

১. চর্বনা পাঠ (Critical Study)
২. স্বাদনা পাঠ (Appreciation Study)
৩. ধারণা পাঠ (Comprehensive Study)

সরব পাঠ

গুরুত্ব ও উপযোগিতা : যে পাঠে ধ্বনি উৎপন্ন হয় বা উচ্চারণ করে যা পাঠ করা হয় তাকে সরব পাঠ বলে। এই পাঠে বাগযন্ত্রের অনুশীলন হয়, শিশু শিক্ষার্থীরা বাগযন্ত্রকে পরিচালনা করার কৌশল আয়ত্ত করে। শিক্ষার্থীরা শুদ্ধ উচ্চারণরীতি শিখতে পারে। উচ্চারণের ত্রুটি সংশোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া যায়। সরব পাঠ মার্জিত কথনশৈলী ও চমৎকার বাচনভঙ্গি অর্জনে সহায়তা করে। আবৃত্তির ক্ষেত্রে সরব পাঠের ভূমিকা অনস্বীকার্য। কারণ সরব পাঠ ব্যতিরেকে কবিতার রসাস্বাদন মোটেই সম্ভব নয়। সর্বোপরি সার্থক সরব পাঠ শিল্প হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

সরব পাঠে সুবিধা

- সরব পাঠ কথা বলার ক্ষেত্রে জড়তা দূরীকরণে সহায়তা করে।
- শিক্ষার্থীর কথা বলায় যদি কোনো আঞ্চলিকতা থাকে তা কাটিয়ে উঠতে সহযোগিতা করা যায়।
- পঠনে বিরাম চিহ্নাদির ব্যবহারে ত্রুটি থাকলে শনাক্ত করে তা সংশোধন করা যায়।
- সরব পাঠের সময় পাঠকের কান ও মন একই সাথে কাজ করে। এর ফলে কঠিন বিষয়বস্তুর প্রতি অধিক মনোযোগ দেয়া যায়।
- পাঠে ত্রুটি ধরার সুযোগ থাকায় পাঠক পাঠের প্রতি যত্নশীল হয়।

- গোলমেলে পরিবেশেও সরব পাঠে কোনো অসুবিধা হয় না।
- শিক্ষার্থীদের শোনার দক্ষতা বাড়াতে সরব পাঠ কার্যকর ভূমিকা রাখে।
- ভাষা শিক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ সৃষ্টি হয়।
- শিক্ষার্থীদের সুকুমার বৃত্তির বিকাশ ঘটাতে সহায়তা করে।
- সরবপাঠ সাহিত্যরস উপভোগের সহায়ক ।
- সুন্দর বাচনভঙ্গি গড়ে উঠতে সরব পাঠের কার্যকর ভূমিকা থাকে।

সরব পাঠের অসুবিধা

- সরব পাঠ অধিক শ্রমসাপেক্ষ।
- তুলনামূলকভাবে সরব পাঠে সময় বেশি লাগে।
- দীর্ঘ সময় ধরে সরব পাঠ করা যায় না, এতে ক্লান্তি আসে।
- উচ্চশ্রেণির জন্য সরব পাঠ উপযোগী নয়।
- সরব পাঠে কারো কারো মুদ্রাদোষ পরিস্ফুট হয়- যা অত্যন্ত বিরক্তিকর।
- অনেকে এক সঙ্গে সরব পাঠ করলে কোলাহলের সৃষ্টি হয়।
- গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়া সরব পাঠে সম্ভব হয় না।
- অন্যের অসুবিধার কারণ হতে পারে বলে কোনো কোনো পরিবেশে সরব পাঠ মোটেই সমীচীন নয়। যেমন- লাইব্রেরি কিংবা হোস্টেলে একের সরব পাঠ অন্যের অসুবিধা সৃষ্টি করতে পারে।

নীরব পাঠ

কোনো ধ্বনি উচ্চারণ না করে অর্থাৎ বাগযন্ত্রের দৃশ্যমান ব্যবহার না করে নীরবে যে পাঠ করা হয় তাকে নীরব পাঠ বলে। এই পাঠে শুধু চোখ ও মন একসাথে কাজ করে। নীরব পঠন ধ্বনিময় না হলেও জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে এর তাৎপর্য অনেক বেশি। মনোসংযোগের ব্যাপারটি এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কোনো বিষয়ের গভীর উপলব্ধির জন্য নীরব পাঠের কোনো বিকল্প নেই। সময় কাটানোর জন্য বা অবসর যাপনের জন্য নীরব পাঠ প্রিয়সঙ্গী হতে পারে।

নীরব পাঠের সুবিধা

- নীরব পাঠ ক্লান্তিকর নয়, তাই দীর্ঘ সময় পড়া যায়।
- কোনো কঠিন বিষয় হৃদয়াঙ্গম করার জন্য নীরব পাঠ অধিক কার্যকরী।
- সমালোচক, বিশ্লেষক ও গবেষণারত ব্যক্তিদের জন্য নীরব পাঠ বেশি উপযোগী।
- একই স্থানে একই সাথে অনেকে মিলে পাঠ করা যায়।
- নীরব পাঠে শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশ বজায় থাকে।
- সরব পাঠের চেয়ে নীরব পাঠে সময় কম লাগে।
- অবসর সময় আনন্দে কাটানোর জন্য নীরব পাঠ আনন্দসঙ্গী হতে পারে।
- লাইব্রেরিতে পাঠাভ্যাসে ও হোস্টেলে অবস্থানের জন্য নীরব পাঠ বেশি উপযোগী।
- ব্যক্তিগত পত্র, গোপন দলিল পত্রাদি নীরবে পাঠ করা শ্রেয়।
- পঠনকালে কোলাহলমুক্ত পরিবেশ বজায় রাখতে নীরব পাঠই উপযোগী।

নিরব পাঠের অসুবিধা :

- নীরব পাঠে উচ্চারণত্রুটি হলে তা সংশোধনের কোনো উপায় থাকে না।
- ভাষাশিক্ষার শুরুতে বিশেষত প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য নীরব পাঠ উপযোগী নয়।
- অমনোযোগী শিক্ষার্থীরা ফাঁকি দেওয়ার সুযোগ পায়।
- কবিতা পাঠের প্রধান উদ্দেশ্য রসাস্বাদন, যা নীরব পাঠে কোনো ক্রমেই সম্ভব নয়।
- গভীর মনোযোগের ব্যত্যয় ঘটলে পাঠে পাঠকের কোনো লাভ হয় না।
- উচ্চারণ অনুশীলনের কোনো সুযোগ নীরব পাঠে থাকে না।
- নীরব পাঠকে শৈল্পিক পাঠের পর্যায়ে নেওয়া যায় না।

শিক্ষার্থীর সরব ও নীরব পাঠের দক্ষতা অর্জনে শিক্ষকের করণীয়

সরব পাঠের ক্ষেত্রে-

- পারিবারিক পরিবেশেই শিশুর ভাষা শিক্ষা বিশেষত কথা বলা শুরু হয়। বিদ্যালয় পরিবেশে তার আনুষ্ঠানিক শিক্ষার শুরু। শিক্ষক বর্ণ ও শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ শেখানোর মধ্যদিয়ে তার ভাষাদক্ষতা উন্নয়নের চেষ্টা করবেন।
- শিক্ষক বিরাম চিহ্নাদির সঠিক ব্যবহারের প্রতি শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেবেন।
- আদর্শ পাঠে ভাবাবেগ রক্ষা করে পড়তে নির্দেশ দেবেন।
- কবিতার রসাস্বাদনের প্রতি শিক্ষার্থীদের সজাগ থাকতে পরামর্শ দেবেন।
- প্রয়োজনে নিজে তাল, লয়, যতি, ছন্দ ইত্যাদির প্রতি লক্ষ রেখে কবিতা আবৃত্তি করবেন।
- শিক্ষার্থীদের কবিতা আবৃত্তিসহ গদ্য পাঠও যেন শিল্পে উন্নীত হয় সেদিকে শিক্ষক বিশেষ নজর দেবেন।
- শিক্ষক মাঝে মাঝে বিদ্যালয়ে সাহিত্য আসরের ব্যবস্থা করবেন। এখানে তিনি আবৃত্তি, গল্পবলা, বিতর্ক প্রভৃতি বিষয়ের চর্চা করাবেন।
- প্রয়োজনে তিনি শ্রেণিকক্ষে গল্প, কথিকা বা আবৃত্তির রেকর্ড বাজিয়ে শোনাবেন।

নীরব পাঠের ক্ষেত্রে-

- নীরব পাঠে শিক্ষার্থীদের ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। তাই নীরব পাঠের সময় শিক্ষকের উচিত শিক্ষার্থীদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা।
- সাধারণত মাধ্যমিক স্তর থেকে নীরব পাঠ দেয়া হয়। এই স্তরের শিক্ষার্থীরা মনন ও বুদ্ধিবৃত্তিতে কিছুটা পরিণত। চঞ্চলতা তাদের বৈশিষ্ট্য। শিক্ষক তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল আচরণ করবেন।
- নীরব পাঠ বেশ দ্রুততার সাথে করা যায়। এক্ষেত্রে শিক্ষক সতর্ক থাকবেন যাতে তারা কোনো অংশ বা বাক্য বাদ না দেয়।
- নীরব পাঠের পর শিক্ষক যদি পঠিত অংশ থেকে ফিডব্যাক নেন তা হলে ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা হ্রাস পাবে।
- স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে না থেকে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাছে যাবেন যাতে শিক্ষার্থীরা সতর্ক হয়।
- শিক্ষার্থীদের উপযোগী বইয়ের ব্যবস্থা করে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নীরব পাঠের অনুশীলন করাবেন। এতে ধীরে ধীরে তাদের পাঠের গতি বৃদ্ধি পাবে।
- সর্বোপরি নীরব পাঠের প্রতি শিক্ষকের অনুপ্রেরণা শিক্ষার্থীদের জীবনে পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগাতে পারে।

চর্বণা পাঠ, স্বাদনা পাঠ ও ধারণা পাঠ

চর্বণা পাঠ : প্রবন্ধ বা প্রবন্ধধর্মী রচনা সাধারণত যুক্তিনির্ভর, তত্ত্ব ও তথ্যে ভরপুর, বুদ্ধি ও বিচার বিশ্লেষণমূলক হয়ে থাকে। এ ধরনের লেখার গভীরে পৌঁছাতে প্রয়োজন চর্বণা পাঠ। কঠিন খাদ্য দ্রব্য যেমন চিবিয়ে চিবিয়ে খেতে হয়– তেমনি এ জাতীয় জটিল লেখার মর্ম উপলব্ধির জন্যও চর্বণা পাঠের কোনো বিকল্প নেই। ভারিক্কি চালের এই লেখা মোটেই লঘুসঞ্চারী নয় বলে গভীর মনোনিবেশে চর্বনা পাঠের মাধ্যমে এর উপলব্ধিগত ধারণা লাভ করা সম্ভব।

স্বাদনা পাঠ : কাব্যধর্মী কোনো রচনার সাহিত্যরস আস্বাদনের জন্য যে পাঠ করা হয় তাকে বলা হয় স্বাদনা পাঠ। কবিতা পাঠ মূলত স্বাদনা পাঠ। কারণ কবিতা পাঠের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য রসাস্বাদন। স্বাদনা পাঠের মাধ্যমে কবির প্রকাশভঙ্গি, গভীর অনুভূতি, হৃদয়াবেগ প্রভৃতির সাথে একাত্ম হয়ে আনন্দ লাভ করা যায়। এখানে বিষয়বস্তুর চেয়ে রসাস্বাদনই মুখ্য।

ধারণা পাঠ : কোনো প্রকার রসাস্বাদন বা বিচার বিশ্লেষণ নয়, শুধু পড়ে অর্থ বুঝতে পারা, মর্ম উপলব্ধি করা এবং সাধারণ ধারণা অর্জন করা যায় যে পাঠের মাধ্যমে, তাকেই ধারণা পাঠ বলে। বাংলা পাঠ্যপুস্তকের ভ্রমণ কাহিনী, উপন্যাস, বর্ণনামূলক রচনার পাঠ এর অন্তর্ভুক্ত। শিক্ষার্থীরা চোখ বুলিয়ে অর্থ বোঝার ক্ষমতা এই পাঠের মাধমেই লাভ করে। এই পাঠকে আত্তীকরণ পাঠও বলা হয়।

৫.৪ : লেখা

মানুষে মানুষে যোগাযোগ নিত্যদিনের। এই যোগাযোগের মাধ্যম হচ্ছে ভাষা। আমরা পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান করি ভাষার মাধ্যমে। ভাষা দক্ষতার প্রধান লক্ষণীয় দুটি দিক হচ্ছে মৌখিক ও লৈখিক। লেখা বা লিপিরূপ ভাষার নীরব প্রকাশ ছাড়া কিছু নয়। যেহেতু লেখা ভাষার প্রতিনিধিত্ব করে তাই লেখার নিত্যদিনের সঙ্গী হচ্ছে পড়া। সেই সাথে মনে রাখা দরকার মৌখিক ভাষা বলার মাধ্যমে বোঝাতে হয় আর লেখা পড়ে বুঝতে হয়।

লেখা দক্ষতা অর্জনের প্রয়োজনীয়তা

লেখা কালিক যোগসূত্র স্থাপন করে। মানব সভ্যতার ক্রমবিবর্তনে লেখার ভূমিকা অসীম। কথার মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করা যায় কিন্তু তা সংরক্ষণ সহজ নয়। আজ আমরা যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারণা ব্যবহার করছি তা অতীত কীর্তিরই ধারাবাহিকতা। এরিস্টটল, সক্রেটিসসহ বিভিন্ন মহাপণ্ডিতের চিন্তা আমাদের কাছে পৌঁছেছে তাঁদের লেখনীর মাধ্যমে। এসব জ্ঞানই পৌঁছে যাবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের পর প্রজন্মে। লিখনের মাধ্যমেই এই তিন কালের যোগসূত্র স্থাপিত হয়। লেখার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নিম্নে আলোকপাত করা হলো।

- সারাবিশ্বের সকল নাগরিকের পারস্পরিক যোগাযোগের সহজতম মাধ্যম হচ্ছে লিখন।
- লিখনের মাধ্যমে যোগাযোগ কম ব্যয়সাপেক্ষ ও নির্ভরযোগ্য।
- অফিস আদালত, ব্যবসা বাণিজ্য এমনকি রাষ্ট্রীয় জীবনেও লেখার গুরুত্ব অসীম।
- মানুষের পেশা নির্বাচনে লেখা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- ভাষা দক্ষতা অর্জন ও সৃজনশীলতার বিকাশে লিখনের ভূমিকা অনন্য।
- মানুষ পড়ে বিষয়বস্তু আয়ত্ত করে, কিন্তু তা প্রকাশ করার জন্য প্রয়োজন হয় লিখনের।
- পত্রালাপ আমাদের জীবনের অনুষঙ্গ। কখনো কখনো এই পত্র স্থান কালের সীমা অতিক্রম করে বিশ্ব সাহিত্যে জায়গা করে নেয়।
- লেখা ভাষা জ্ঞানের বিকাশকে পরিস্ফুটিত করে। মানুষের চিন্তা ভাবনাকে সুসংহত করে।
- লেখার মাধ্যমে মানুষের রুচিবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। রুচিবোধের বিকাশে তাই লেখার ভূমিকা অসামান্য।
- মনের ভাব, চিন্তা ও কল্পনা অন্যের মাঝে সঞ্চারিত করতে, অন্যের অনুভবে তার বিস্তার ঘটাতে লিখনের কোনো বিকল্প নেই।
- লিখনচর্চা ভাষায় শব্দ ব্যবহার, শব্দ প্রয়োগ ও উন্নত বাচনিক শৈলী ব্যবহারে সক্ষম করে তোলে। ফলে ব্যক্তির রুচিবোধ ও ব্যক্তিত্ব গঠনে অবদান রাখে।

লেখার ধরন/ভঙ্গি

প্রত্যেকের হাতের লেখার নিজস্ব স্টাইল বা ভঙ্গি রয়েছে। এজন্যই একজনের লেখার সাথে অন্যের লেখা সহজেই পৃথক করা যায়। কারো হাতের লেখা খাড়া, কারো বা হেলানো। কেউ বা গোটা গোটা অক্ষরে, কেউ বা টানা টানা ভাবে লেখেন। লিখতে গিয়ে কারো লাইন উপরে উঠে যায়, কারো বা নিচের দিকে, আবার কারো সোজা থাকে। সুতরাং লেখায় বহুমাত্রিক বৈচিত্র্য বিদ্যমান। সবকিছু বিবেচনায় রেখে লেখার ভঙ্গি বা স্টাইলকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়-

১. টাইপ লেখা
২. টানা লেখা

টাইপ লেখার বৈশিষ্ট্য

- টাইপ লেখা স্পষ্ট
- এ লেখা দেখতে ছাপা হরফের মতো
- সুখপাঠ্যতা এর অনন্য বৈশিষ্ট্য
- বাক্যের মধ্যে শব্দগুলো সুগঠিত
- টাইপ লেখারগতি মন্থর বলে সময় বেশি লাগে
- অক্ষর গঠনের প্রতি বেশি যত্নশীল হওয়ার কারণে দ্রুততার সাথে লেখা সম্ভব হয় না
- লেখা শেখানোর শুরুতে টাইপ লেখার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়
- পাণ্ডুলিপির ক্ষেত্রে টাইপ লেখার কদর বেশি।

টানা লেখার বৈশিষ্ট্য

- টাইপ লেখার চেয়ে টানা লেখার গতি দ্রুত হয়
- কোনো বিচ্ছিন্নতা ছাড়া একটানা লেখা যায়
- এতে হাতের মাংসপেশির সঞ্চালন দ্রুততর হয়
- স্পষ্ট টানা লেখা দৃষ্টিনন্দন ও সুখপাঠ্য হয়
- এর অনন্য দিক স্বাচ্ছন্দ্য ও গতিময়তা
- এই লেখায় ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়
- শব্দ মধ্যবর্তী টানে যদি সমতা বজায় থাকে তবে টানা লেখা মাধুর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে
- লেখার গতিশীলতার কারণে টানা বা হেলানো লেখা আজকের যুগে বেশি মাত্রায় স্বীকৃতি পাচ্ছে
- সুন্দর ও স্পষ্ট টানা লেখার স্টাইল অনুকরণ ও অনুসরণযোগ্য।

ভালো হাতের লেখার বৈশিষ্ট্য

মানুষ প্রত্যেকেই তার নিজস্ব স্টাইলে লেখে। লেখার মাঝে তার স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব প্রতিফলিত হয়। কোনোটি ভালো লেখা বা মানসম্মত লেখা তা নির্ভর করে কিছু বৈশিষ্ট্যের ওপর। ভালো হাতের লেখার বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো।

স্পষ্টতা : ভালো লেখার প্রধান গুণ স্পষ্টতা। টাইপ লেখা বা টানা লেখা যাই-ই হোক না কেন, তা যদি সহজে ও স্বচ্ছন্দে পাঠ করা যায় সেটিই হাতের লেখার স্পষ্টতাগুণ। লেখার অস্পষ্টতা পাঠকে বাধাগ্রস্ত করে। তাই দ্রুততার সাথে লিখলেও তা যেন সহজে পাঠযোগ্য হয় সেদিকে দৃষ্টি দেয়া দরকার।

নির্ভুলতা : হাতের লেখা হতে হবে নির্ভুল। লেখার বানান ভুল বা ভাষাগত তথা ব্যাকরণগত ভুল কোনোটিই কাম্য নয়। যে কোনো ভুলই পাঠের ক্ষেত্রে অত্যন্ত পীড়াদায়ক। তাই নির্ভুলভাবে লেখার প্রতি যত্নশীল হওয়া দরকার।

লেখার দ্রুততা : দ্রুততা ভালো লেখার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কাঁচা হাতের লেখা আর পরিণত লেখার মাঝে পার্থক্য তৈরি করে দ্রুততা। দ্রুত লেখার পাশাপাশি সহজ পাঠের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে।

নিজস্ব স্টাইল : হাতের লেখা ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক। লেখার চমৎকার রেখাবিন্যাস পাঠকের চোখ ও মনকে আনন্দে ভরপুর করে তোলে। লেখার ক্ষেত্রে তাই এই বৈশিষ্ট্য বা স্টাইল অর্জন করা আবশ্যক।

সৌন্দর্যের প্রকাশ : লেখা পড়ে নয়, দেখে ভালো লাগাটাই লেখার সৌন্দর্যের বহিঃপ্রকাশ। সুন্দর লেখা নান্দনিক গুণসম্পন্ন এবং তা উন্নত শিল্পের পর্যায়ে পৌঁছে যায়।

যথার্থ অনুচ্ছেদ রচনা : যথার্থ অনুচ্ছেদ রচনা ভালো লেখার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যথাযথ যতি চিহ্নের ব্যবহার যথার্থ অনুচ্ছেদ রচনায় সহায়তা করে, লেখাকে ত্রুটিমুক্ত করে এবং ক্লান্তিকর একঘেয়েমি দূর করে।

সমমাপের অক্ষর গঠন : শব্দের মাঝে অক্ষরগুলো সমমাপের হওয়া আবশ্যক। শব্দের অক্ষরগুলোর মাপের পার্থক্য লেখার সৌন্দর্য বিনাশ করে। পক্ষান্তরে সমানুপাতিক ও পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত অক্ষর কোনো প্রকার বিরক্তির উদ্রেক না করে পাঠকের হৃদয়কে আনন্দে ভরে দেয়।

সুখপাঠ্যতা : সুখপাঠ্যতা পাঠকের মানসিক বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত। যে লেখা পাঠক নির্বিঘ্নে, সহজে, স্বচ্ছন্দে পড়তে পারে, যে লেখা দৃষ্টিনন্দন, যে লেখা পাঠকের মনে সুখানুভূতির সৃষ্টি করে তাই সুখপাঠ্য লেখা।

লেখায় গতিময়তা : গতিময় লেখা সহজ ও স্বাভাবিক। এ লেখায় সুষ্ঠু ছাঁদ বজায় থাকে। লেখাকে পঠনযোগ্য করতে ধীরগামীতার কোনো প্রয়োজন নেই। দ্রুততা বজায় রেখেও এটা করা সম্ভব। লেখার কোনো একটা স্টাইল বা শৈলী আয়ত্ত করে এর অনুশীলনই লেখার গতিময়তা ও সৌন্দর্য দান করে।

লেখা দক্ষতা অর্জনের বিভিন্ন দিক

শুদ্ধতা বজায় রেখে লেখা কষ্টসাধ্য। উন্নত লিখনকৌশল আয়ত্ত করা সবার প্রয়োজন হলেও অনেকের পক্ষেই তা হয়ে ওঠে না। লেখা দক্ষতা অর্জনের সঙ্গে সুন্দর লেখার যেমন সম্পর্ক রয়েছে তেমনি লেখার ক্ষেত্রে সঠিকভাবে যতি বা বিরাম চিহ্নাদির ব্যবহারসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় দিকগুলো আয়ত্ত করাও জরুরি। লেখার দক্ষতা অর্জনের প্রয়োজনীয় দিকগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো-

শুদ্ধবানান : লিখন দক্ষতার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো শুদ্ধ বানানে লেখা। বানান হচ্ছে শব্দের ব্যবহৃত বর্ণের বিশ্লেষণ। শব্দের গঠন জানতে হলে বানান জানা অত্যাবশ্যক। অশুদ্ধ বানানের লেখা ত্রুটিপূর্ণ হয় এবং তা চোখকে পীড়া দেয়, পাঠকের মনে বিরক্তির উদ্রেক করে। পাঠের স্বচ্ছন্দ গতি বাধাগ্রস্ত করে। বানানের প্রতি সচেতনতা এই দুর্বলতা রোধ করতে পারে। তবে শুদ্ধ বানানচর্চা বা আয়ত্তকরণ অনুশীলন সাপেক্ষ।

যতিচিহ্ন বা বিরাম চিহ্নের ব্যবহার : যথাযথ স্থানে শব্দের পর শব্দ বসিয়ে তৈরি হয় বাক্য। বাক্যের ভেতরে শব্দের উচ্চারণে কোথায় কতটুকু থামতে হবে বা বিশ্রাম নিতে হবে তা নির্দিষ্ট করতে যতি বা বিরাম চিহ্নের ব্যবহার করা হয়। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে এমন কি মধ্যযুগের পুঁথি সাহিত্যের ক্ষেত্রেও আমরা দেখি এক দাঁড়ি (।) এবং দুই দাঁড়ি (।।) ব্যবহার করা হয়েছে। বর্তমান বাংলা লেখায় ইংরেজি ভাষার আদলে নিম্নের বিরামচিহ্নাদি ব্যবহার করা হয়-

- কমা (,) সবচেয়ে কম সময় বিরতির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়
- সেমিকোলন (;) কমা অপেক্ষা একটু বেশি সময় বিরতি দিতে ব্যবহার হয়
- কোলন (:) পূর্ববর্তী উক্তির বিশদীকরণে ব্যবহার হয় এবং বিরতি দিতে হয় সেমিকোলনের মতই
- কোলন-ড্যাশ (:-) পুনরাবৃত্তি বা উদ্ধৃত বাক্য ব্যবহারে এর প্রয়োগ হয়
- ড্যাশ (–) একই কথার নানা ব্যাখ্যায় ও উদাহরণের জন্য ব্যবহার হয়
- হাইফেন (-) সমাসবদ্ধকরণের ক্ষেত্রে বেশি ব্যবহার হয়
- দাড়ি (।)- পূর্ণ বিরতিতে ও বাক্যের শেষে ব্যবহৃত হয়
- প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) প্রশ্ন জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে বাক্যের শেষে বসে
- বিস্ময় চিহ্ন (!) আনন্দ, দুঃখ, ভয়, বিস্ময় প্রকাশের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়।

অধ্যায় : অধ্যায় হলো গ্রন্থের পরিচ্ছেদ বা বিভাগ। কোনো একটি বিষয়ের শুরু এবং শেষ হয় একটি অধ্যায়ে। উপন্যাসে দেখা যায় একটি অধ্যায়ে একটি খণ্ডকাহিনী। তেমনি অনেকগুলো অধ্যায়ের সমন্বয়ে সৃষ্টি হয় গদ্যগ্রন্থ। লেখার পূর্ণতা প্রাপ্তিতে এসবের ব্যবহার জানা অত্যাবশ্যক।

অনুচ্ছেদ রচনা : ইংরেজিতে এটিকে প্যারাগ্রাফ বলা হয়। প্রতিটি অনুচ্ছেদে এক একটি ভাবকে সুসংহত করা হয়। এতে কোনো ভিন্নভাব গ্রহণযোগ্য নয়। লেখার দক্ষতা ও পারদর্শিতা অর্জনে তাই শিক্ষার্থীদের প্যারাগ্রাফ রচনায় পারদর্শী করে তুলতে হবে।

শিরোনাম : ইংরেজিতে হেডিংকে বাংলায় শিরোনাম বলা হয়। এর আভিধানিক অর্থ পত্রের উপরে লিখিত নাম-ঠিকানা। আবার গল্প বা প্রবন্ধাদির নামকেও শিরোনাম বলে। কখনও কখনও শিরোনামকে উপ-শিরোনামে বিভক্ত করা হয়। লেখার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা যাতে যথাযথ শিরোনাম ব্যবহার করতে পারে সে দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।

প্যারেনথিসিস : আমরা কোনো কোনো সময় বাক্যের সঙ্গে ব্যাকরণগত সম্পর্কহীন পদ বা পদগুচ্ছ ব্যবহার করি। সাধারণত কোনো কিছুর উপর মন্তব্য করতে গিয়ে ব্যাকরণের সাথে সম্পর্কহীন যে শব্দগুচ্ছ আমরা ব্যবহার করি তাকে প্যারেনথিসিস বলে। যেমন– 'আমি সত্যি বলতে কি, তোমার কাছে এমনটি আশা করিনি।'

লেখা শেখানোর উপায় এবং শিক্ষকের করণীয়

ভাষার দক্ষতা অর্জনে লেখার গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু হাতের লেখা শেখানোর কাজটি অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। লেখা মূলত সৃষ্টিশীল রেখাবিন্যাস। বিদ্যালয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শুরুর সাথে সাথেই লেখার চর্চাও শুরু হয়ে যায়। এই চর্চায় হাতের পেশি যথাযথভাবে সঞ্চালন করতে পারা আবশ্যক। তাই শিশুর হাতের পেশি উপযোগী না হওয়া পর্যন্ত লিখতে শেখার অনুশীলন না করানোই ভালো। নিচে লেখা শেখানোর কৌশল ও শিক্ষকের করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করা হলো–

বালি বা মাটি দিয়ে খেলা : প্রকৃতিগতভাবেই শিশুরা চঞ্চল। ওরা খেলতে ভালবাসে। হাতের কাছে বালু বা মাটির ঢেলা থাকলে তা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নেয়, ঘর তৈরি করে, আবার পরক্ষণেই ভেঙ্গে ফেলে। শিশুদের এ খেলা শুধু মাত্র খেলা নয়। প্রকারান্তরে খেলার ছলে তাদের পেশিগুলো লেখার উপযোগী হয়ে ওঠে। তাই শিশুদের এতে বাঁধা না দিয়ে খেলতে দেয়া উচিত।

মুক্তহস্ত অংকন : শিশুদের হাতের কাছে চক, ইটের টুকরা, পেন্সিল, কলম যাই-ই থাকুক না কেন তারা তা দিয়ে দেয়ালে, মেঝেতে, জানালা-দরজায় বা খাতায় রেখা টানে, আঁকা আঁকি করে। এতে সাময়িক ক্ষতি হয় কিন্তু এসব করতে গিয়ে ওদের পেশি লিখন উপযোগী হতে থাকে।

বর্ণতৈরি খেলা : শিশুদের খেলার জন্য তেঁতুল বীজ বা সীম বীজ হাতে দিলে তারা খেলার ছলে বর্ণরূপের সাথে পরিচিত হবে। পরপর বীজ সাজিয়ে বর্ণ তৈরি করবে। খেলাচ্ছলে লেখা শেখার এ বিষয়গুলো যেহেতু পারিবারিক পরিবেশে সম্পন্ন হয় সেজন্য অভিভাবকদের বিষয়গুলোর প্রতি নজর রাখতে হবে।

বেঞ্চ ও ডেস্কের উচ্চতা : আমাদের বিদ্যালয়গুলোতে সাধারণত একই মাপের বেঞ্চ ও ডেস্ক তৈরি করা হয়। কিন্তু একটি শ্রেণিতে একই মাপের শিক্ষার্থী থাকে না। শিক্ষার্থীরা যাতে স্বচ্ছন্দে বসতে পারে ও লিখতে পারে সেদিকে দৃষ্টি রেখে বিজ্ঞানসম্মতভাবে বেঞ্চ ও ডেস্ক রাখতে হবে। কোন শিক্ষার্থীকে কোথায় বসালে সে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করবে তা শিক্ষক সবসময় বিবেচনায় রাখবেন।

বসার ভঙ্গি : শিক্ষার্থীরা লেখার সময় মেরুদণ্ড সোজা করে বসে লিখবে– এটিই মানসম্মত বসার ভঙ্গি হচ্ছে। বসা ঠিক না হলে লিখতে সমস্যা হয়। শিক্ষার্থীরা ঠিক মতো বসে লিখছে কি না তা শিক্ষক লক্ষ রাখবেন ।

কলম/পেন্সিল ধরার কৌশল : কলম ও পেন্সিল ধরার সঠিক নিয়ম হলো বৃদ্ধাঙ্গুল, তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুল ব্যবহার করা। এতে দু'পাশে থাকবে বৃদ্ধাঙ্গুল ও মধ্যমা এবং উপরে থাকবে তর্জনী। কলম বা পেন্সিল ধরার ব্যাপারেও শিক্ষক সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন।

চোখের দূরত্ব : ডেস্কের উপর যেখানে শিক্ষার্থীরা খাতা রাখবে তা থেকে চোখের দূরত্ব থাকবে এক ফুট।

ডেস্কের উপর খাতা রাখার কৌশলঃ ডেস্কের উপর খাতা অবশ্যই লম্বভাবে বা খাড়াভাবে রাখতে হবে। দেখা যায়, শিক্ষার্থীরা কেউ বাম দিকে কেউ ডান দিকে খাতা রেখে লেখে। শিক্ষক সতর্কতার সাথে সঠিক পদ্ধতির অনুশীলন করাবেন।

খাতার উপর হাত রাখার কৌশল : লেখার সময় শিক্ষার্থীরা কনুই থেকে আঙ্গুল পর্যন্ত একই সমতলে রাখবে। এতে লেখার কাজ সহজ ও স্বচ্ছন্দ হবে।

লেখার সামগ্রী : কাগজ, কলম, পেন্সিল প্রভৃতি উপকরণ ভালো মানের হওয়া দরকার। নিম্নমানের লিখনসামগ্রীর কারণে হাতের লেখার মানও খারাপ হতে পারে। তাই এর প্রতি নজর রাখতে হবে।

উপযুক্ত পরিবেশ : ভালো লেখার জন্য শ্রেণিকক্ষে উপযুক্ত পরিবেশ থাকা দরকার। পর্যাপ্ত আলো বাতাস থাকলে শিক্ষার্থীরা স্বাচ্ছন্দ বোধ করে যা ভালো লেখার সহায়ক।

ছাপা হরফে লেখা : লেখা শেখার শুরুতে শিক্ষার্থীদের টাইপ লেখা বা ছাপা হরফের লেখায় অভ্যস্ত করালে লেখার মান ভালো হয়। শিক্ষক এ দিকটার প্রতি খেয়াল রেখে শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা করবেন।

লাইন টানা কাগজ ব্যবহার : শুরুর দিকে শিক্ষার্থীদের লাইন টানা কাগজে লেখার ব্যবস্থা করতে হবে। এতে বর্ণের রেখাবিন্যাস যেমন সঠিক হবে তেমনি লাইনও সোজা হতে সহযোগিতা করবে।

বর্ণ-শব্দ-লাইনে সমতা : দৃষ্টিনন্দন ও মান লেখার ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে– শব্দের মধ্যে প্রতিটি বর্ণের দূরত্ব সমান হবে, প্রতিটি লাইনে শব্দ থেকে শব্দের দূরত্ব সমান হবে এবং প্রতিটি প্যারায় লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব সমান হবে।

উপর্যুক্ত বিষয়গুলো নিশ্চিত করা গেলে আমরা শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে মানসম্মত, দৃষ্টিনন্দন ও সুখকর লেখা পাব। শিক্ষক অভিভাবকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা ভালো লিখিয়ে তৈরি করতে সক্ষম হবো।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. শোনার দক্ষতা মানবজীবনে এত গুরুত্বপূর্ণ কেন?
২. নিজেকে প্রকাশ করতে 'বলা দক্ষতা' প্রয়োজন কেন?
৩. সরব পাঠের সবল দিকগুলো চিহ্নিত করুন।
৪. ভালো লেখার ৫টি বৈশিষ্ট্য লিখুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ভাষার ব্যবহারিক নৈপুণ্য অর্জনে শোনার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন। শোনা দক্ষতা উন্নয়নে ভাষা শিক্ষকের ভূমিকা নিরূপণ করুন।
২. কথা বলার দক্ষতা অর্জনে ভাষা শিক্ষক কোন কোন দিকের প্রতি দৃষ্টি রাখবেন? যুক্তিসহ বর্ণনা করুন।
৩. ব্যাখ্যাসহ পঠনের প্রকারভেদ করুন। শুদ্ধ পঠন শিক্ষাদানে শিক্ষক কী কী ব্যবস্থা নেবেন– লিখুন।
৪. মানবজীবনে লেখার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন। ভালো লেখার বৈশিষ্ট্য অর্জনে গৃহীতব্য পদক্ষেপসমূহ লিখুন।

ইউনিট ৬ : বাংলা পাঠ-পরিকল্পনা ও পাঠ উপস্থাপনা

কোনো কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য প্রয়োজন পূর্ব-পরিকল্পনা। পরিকল্পনা ছাড়া কাজের আশানুরূপ সাফল্য অর্জন সম্ভব নয়। শিক্ষা ক্ষেত্রেও কথাটি সমানভাবে প্রযোজ্য। সামাজিক চাহিদার যোগান, সামাজিক উৎকর্ষ সাধন ও সমাজমানসের কাঙ্ক্ষিত গতিপথ নির্মিত হয় দূরদৃষ্টি সম্পন্ন শিক্ষাবিদদের সুষ্ঠু পরিকল্পনায়। এই পরিকল্পনার দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপই হচ্ছে শিক্ষাক্রম। পরিকল্পিত শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই কার্যক্রমটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার অন্যতম হাতিয়ার হচ্ছে পাঠ-পরিকল্পনা। শিক্ষক বাংলা বিষয়ের পাঠটিকে আকর্ষণীয় ও কার্যকরভাবে উপস্থাপনের জন্য পরিকল্পনা করে থাকেন। কোনো একটি পাঠে শিক্ষার্থী যে সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করবে বলে ধরে নেওয়া হয় তার বিবৃত রূপই হচ্ছে শিখনফল। শিখনফল অভিমুখী পরিকল্পিত পাঠদান শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়কেই উদ্বুদ্ধ করে বলে পাঠদান সুশৃঙ্খল হয় এবং শিক্ষার্থীও সহজে পাঠের শিখনফল অর্জনে সক্ষম হয়। বাংলা বিষয়ের পাঠ-পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তকসহ বিভিন্ন উপকরণ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, বিষয়বস্তু উপযোগী পদ্ধতি ও কৌশল, শিক্ষার্থী সংখ্যা, শ্রেণিকক্ষের ভৌত সুবিধা প্রভৃতি বিভিন্ন দিক বিবেচনায় রাখা আবশ্যক। শিক্ষকের এই বিবেচনাবোধের উপর পাঠ-পরিকল্পনাটির কার্যকর-বাস্তবায়ন নির্ভর করে। পাঠ চলাকালীন শিক্ষার্থীর অগ্রগতি যাচাই করে প্রয়োজনীয় নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য যে দিকনির্দেশনা আবশ্যক হয়ে পড়ে তারও ভিত্তি হচ্ছে এই পাঠ-পরিকল্পনা। এসব দিক বিবেচনায় রেখে বাংলা পাঠ-পরিকল্পনা ও পাঠ উপস্থাপনা শীর্ষক অধ্যায়টিতে নিম্নবর্ণিত শিরোনামভিত্তিক পাঠসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৬.১: শিখনফলের ধারণা এবং পাঠ ও পাঠের ধারাবাহিক পরিকল্পনা

৬.২: পাঠ-পরিকল্পনার ধারণা ও প্রণয়ন কৌশল

৬.৩: পাঠ-পরিকল্পনায় পাঠ্যপুস্তক এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার

৬.৪: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য মূল্যায়ন কৌশল

৬.১ : শিখনফলের ধারণা, পাঠ ও পাঠের ধারাবাহিক পরিকল্পনা

শিখনফল (Learning Outcome)

কোনো একটি পাঠ শেষে শিক্ষার্থী কী জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করবে সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট প্রত্যাশা হলো শিখনফল। এ প্রত্যাশাগুলো বিবৃতিমূলক বাক্যে ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে লেখা হয়ে থাকে। শিখনফল পর্যবেক্ষণযোগ্য ও পরিমাপযোগ্য আচরণের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন প্রকাশ করে থাকে। এই পরিবর্তন মূলত মানসিক, আবেগিক এবং শারীরিক। অর্থাৎ জ্ঞানের প্রসার, অনুধাবন ক্ষমতার ব্যাপ্তি, ইতিবাচক মানসিকতার পরিবর্তন এবং শারীরিক দক্ষতার উন্নয়ন সাধনের মাত্রা শিখনফলে বিজ্ঞাপিত হয়। শিক্ষার্থীর শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা অর্জনের সক্ষমতা নির্ভর করে পাঠের নির্ধারিত শিখনফল অর্জন করতে পারার মাধ্যমে। প্রকৃতপক্ষে শিখনফল অর্জনের মাধ্যমে পাঠের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়।

একটি নির্দিষ্ট শিক্ষাস্তরের যেমন– প্রাথমিক, মাধ্যমিক বা উচ্চশিক্ষা ইত্যাদি শেষে শিক্ষার্থী যে শিখনযোগ্যতা অর্জন করবে বলে প্রত্যাশা করা হয় সেটি সেই স্তরের প্রান্তিক শিখনফল। প্রত্যেক শিক্ষাস্তরে শিখন শেখানো কার্যাবলি এমনভাবে পরিচালিত হয় যেন পাঠের জন্য নির্বাচিত শিখনফল ও প্রান্তিক শিখনফল অর্জন করানো সম্ভব হয়।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২-এ সুনির্দিষ্টভাবে প্রত্যেক স্তরের শিক্ষাক্রমে শিখনফল নির্ধারিত আছে। শিক্ষক সেই নির্ধারিত শিক্ষাক্রম থেকে পাঠ উপযোগী শিখনফল নির্বাচন করবেন এবং পাঠের জন্য বিভাজিত শিখনফল উল্লেখ করবেন। উপযুক্ততা, নির্ভরযোগ্যতা ও ব্যবহারযোগ্যতা বিবেচনা করেই শিক্ষক যে কোনো পাঠের শিখনফল নির্ধারণ করবেন।

শিখনফল নির্বাচন

শিখনফলের ওপর ভিত্তি করেই প্রতিটি শ্রেণিতে পাঠের বিষয়বস্তু নির্বাচন করা হয়ে থাকে। প্রতিটি শিক্ষাক্রমে শ্রেণিভিত্তিক পাঠ্যবইয়ে অধ্যায়ভিত্তিক শিখনফল বা সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য দেয়া আছে। শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনায় একটি পিরিয়ডে বরাদ্দকৃত সময়ে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করে যতগুলো শিখনফল অর্জন করানো সম্ভব ততোগুলোই নির্বাচন করা উচিত। তবে প্রতি পিরিয়ডে কয়টি শিখনফল অর্জন করাতে হবে তা নির্ভর করবে সময় এবং পাঠের বিষয়বস্তুর উপর। তাই কোনো পাঠে শিখনফল তিনটি হতে পারে আবার কোনো পাঠে চার বা তার অধিকও হতে পারে ।

শিক্ষার্থীর আগ্রহ, প্রবণতা, সামর্থ্য, অভিজ্ঞতা ও শিখন চাহিদার সাথে এবং সমাজ, দেশ ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে ২০১২ সালে যে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে তাতে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণির বিষয়ভিত্তিক বিভিন্ন পাঠের শিখনফল উল্লেখ আছে। যেমন– অষ্টম শ্রেণির শিক্ষাক্রমে শিখনফল দেওয়া আছে– শহিদ দিবস, স্বাধীনতা দিবস ও বিজয় দিবসের অনুষ্ঠান দেখে এর তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারবে। আর বিষয়বস্তু হচ্ছে– শহিদ মিনার, জাতীয় স্মৃতিসৌধ ও স্বাধীনতা যুদ্ধের পটভূমিতে নির্মিত বিভিন্ন স্থাপত্যের বর্ণনা ও ব্যাখ্যামূলক প্রবন্ধ। শিক্ষক পাঠ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়বস্তুর শিখনফলের সাথে যে পাঠটির মিল আছে তা নির্বাচন করে পাঠের শিখনফল লিখবেন।

শিখনফল লেখার নিয়মাবলি

শিখনফলকে কেন্দ্র করেই শ্রেণি পাঠদান/শিখন-শেখানো কার্যাবলি পরিচালিত হয়। পাঠ-পরিকল্পনায় প্রত্যেক পাঠের শিখনফল লিখতে হয়। শিখনফলটি এমনভাবে লিখতে হবে যেন সেটি হয় অর্জনযোগ্য ও পরিমাপযোগ্য। একটি বাক্যে শিখনফল লিখতে হবে। বাক্যটির দু'টি অংশ থাকবে। বিষয়বস্তু অংশ ও ক্রিয়ামূলক অংশ। যেমন– শিক্ষার্থীরা কবি মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান-এর পরিচিতি উল্লেখ করতে পারবে।

শিক্ষককে মনে রাখতে হবে যে শিক্ষার্থীর আচরণের পরিবর্তন করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। আর শিখন না হলে আচরণিক পরিবর্তন সম্ভব নয়। অর্থাৎ আচরণের পরিবর্তনের মাধ্যমেই শিখনফল অর্জিত হয়। তাই সুনির্দিষ্ট আচরণটি পরিবর্তনের লক্ষ্যে শিখনফলটিও সুস্পষ্টভাবে এবং সুনির্দিষ্ট করে লিখতে হবে। শিখনফলে একটিমাত্র আচরণিক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ থাকবে। যেমন– 'নির্বাচিত অংশটি আদর্শরূপে পাঠ/আবৃত্তি করতে পারবে।'

শিক্ষার্থীর শিখন অর্জনযোগ্য বা পরিমাপযোগ্য হলো কি-না তা নির্ণয়ের জন্যে শিখনফল সকর্মক ক্রিয়াবাচক শব্দে লিখতে হবে। এই ক্রিয়াবাচক শব্দগুলো হচ্ছে নিম্নরূপ–

বর্ণনা করা	আবৃত্তি করা	বলতে পারা	চিনতে পারা	অংকন করা
ব্যাখ্যা করা	তালিকা করা	লিখতে পারা	মিল করা	চিহ্নিত করা
তুলনা করা	সনাক্ত করা	পরিমাপ করা	সাজাতে পারা	দেখাতে পারা
বিন্যাস করা	প্রয়োগ করা	শ্রেণিভাগ করা	সমাধান করা	প্রদর্শন করা
পৃথক করা	বিশ্লেষণ করা	পরিবর্তন করা	তৈরি করা	নিরূপণ করা

উদাহরণস্বরূপ অষ্টম শ্রেণিতে পাঠ্য আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর 'একুশের গান' কবিতাটির একটি শিখনফল হতে পারে- কবি কেনো রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারিকে ভুলতে পারবেন না- তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

শিখন শেখানো কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী তার জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন ঘটায়। শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থী যে কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করবে– তার প্রতিফলন ঘটে তার আচরণ ও বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে। তাই জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনের ক্ষেত্র থেকে নির্দিষ্ট পাঠের শিখনফল চিহ্নিত করতে হবে। শুধু শ্রেণিতে পাঠশেষে পারদর্শিতা অর্জনের জন্যেই নয়; শিখনফলের অর্জন হতে হবে শিক্ষার্থীর জীবনব্যাপী। যেমন– লালন শাহ্-এর 'মানবধর্ম' কবিতায় 'সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে' চরণের মাধ্যমে ধর্ম বা সম্প্রদায়গত পরিচিতির চেয়ে মানুষ হিসেবে পরিচয়টাই যে বড়- সেটি শিক্ষার্থীর আচরণে প্রকাশ পাবে। তারা জাত-পাত বা ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি বা মিথ্যে গর্ব করা থেকে বিরত হবে। মানুষের প্রতি শিক্ষার্থীর এই দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন শুধু শ্রেণিতেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। শিক্ষার্থীর জীবনব্যাপী বিভিন্ন আচরণে, বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে এর প্রতিফলন ঘটবে। আর এক্ষেত্রে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে শিক্ষাক্রম।

পাঠ ও পাঠের ধারাবাহিক পরিকল্পনা

শ্রেণি কার্যক্রমের বার্ষিক পরিকল্পনায় পাঠ্যসূচি অনুযায়ী একটি পিরিয়ডের জন্যে নির্ধারিত যে বিষয়বস্তু তাই পাঠ। শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুসারে শ্রেণিভিত্তিক প্রায় প্রতিটি পাঠ্যপুস্তকেই অধ্যায়ভিত্তিক ৬/৭টি পাঠ নির্ধারণ করা থাকে। পাঠ্যপুস্তকে এভাবে পাঠ বিভাজন করে দেওয়া না থাকলে তখন বিষয় শিক্ষকের উচিত প্রতিটি অধ্যায়কে প্রয়োজন অনুসারে পাঠে বিভাজন করে নেওয়া। সেক্ষেত্রে বার্ষিক মোট কর্মদিবস এবং একটি পিরিয়ডের জন্যে বরাদ্দকৃত সময় বিবেচনায় রাখতে হয়। নির্দিষ্ট দিন ও তারিখভিত্তিক নির্দিষ্ট পাঠের শ্রেণি, বিষয়, অধ্যায়, পাঠ শিরোনাম, শিক্ষাক্রমবর্ণিত শিখনফল, বিভাজিত শিখনফল, শিক্ষণ পদ্ধতি, শিক্ষা উপকরণ, শিক্ষার্থী মূল্যায়ন কৌশল প্রভৃতির বর্ণনা ধারাবাহিক পরিকল্পনায় উল্লিখিত থাকে।

পাঠ ও পাঠের ধারাবাহিক পরিকল্পনার সঙ্গে দুটো বিষয়ের ধারণা ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। একটি হচ্ছে, বার্ষিক পাঠ-পরিকল্পনা ও অন্যটি ইউনিট বা একক পরিকল্পনা। সারাবছরের মোট কর্মদিবসের বিবেচনায় বিষয়ের পঠিতব্য সকল পাঠকে সাময়িক পরীক্ষা, মাস ও দিনভিত্তিক পাঠদানের পূর্ব-পরিকল্পনাই হচ্ছে বার্ষিক পাঠ-পরিকল্পনা। তাই এর সংক্ষিপ্ত পরিসরে চোখ বুলালেই বৎসরের কোন সময়ে কোনো পাঠটি পড়ানো হবে তা বোঝা যায়।

পাঠ্যপুস্তকের পাঠ্যসূচিতে পুরো বিষয়বস্তুকে সাধারণত কতকগুলো ইউনিট বা এককে বা অধ্যায়ে ভাগ করা থাকে। একটি অধ্যায় পড়ানোর জন্য আবার বেশ কয়েকটি ক্লাসের দরকার পড়ে। অধ্যায় বা ইউনিটের অন্তর্ভুক্ত সকল দিক নিয়ে একসাথে একটি পরিকল্পনা প্রণীত হলে তাকে ইউনিট বা একক পরিকল্পনা বলে। এই ইউনিট বা একক পরিকল্পনার ধারণাকাঠামোর ভিত্তিতেই 'পাঠ ও পাঠের ধারাবাহিক পরিকল্পনা' প্রসঙ্গটির অবতারণা করা হয়েছে। নিচে পাঠের ধারাবাহিক পরিকল্পনার দুটি নমুনাকাঠামো দেওয়া হলো।

পাঠের ধারাবাহিক পরিকল্পনার নমুনা (গদ্য)

শ্রেণি-৮ম, বিষয়: বাংলা ১ম পত্র, অধ্যায়/গল্প: অতিথির স্মৃতি, পাঠসংখ্যা: ২

তারিখ	পাঠ	শিখনফল	পদ্ধতি	উপকরণ	মূল্যায়ন কৌশল
২৯/০৮/২০১৭	অতিথির স্মৃতি-১: (চিকিৎসকের আদেশ... সত্যি বলছো তো?)	পশু-পাখি ও জীবজন্তুর উপর মানুষের নির্ভরশীলতা উপলব্ধি করে তাদের প্রতি যত্নবান হওয়ার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে। বিভাজিত শিখনফল: পশু-পাখি ও জীবজন্তুর প্রতি মানুষের যত্নবান হওয়ার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।	শোনা, পড়া, অংশগ্রহণমূলক আলোচনা, লেখা	প্রাকৃতিক পরিবেশের স্থিরচিত্র, ভিডিওচিত্র	'লেখকের সত্যিকার একটা ভাবনা ঘুচে গেল কেন'এপ্রশ্নের আলোকে সক্ষমতা যাচাই ও মূল্যায়ন।
৩০/০৮/২০১৭	অতিথির স্মৃতি-২: (রাত্রে চাকর এসে জানালে... শেষ পর্যন্ত)	পশু-পাখি ও জীবজন্তুর উপর মানুষের নির্ভরশীলতা উপলব্ধি করে তাদের প্রতি যত্নবান হওয়ার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে। বিভাজিত শিখনফল: পশু–পাখি ও জীবজন্তুর প্রতি যত্নবান হতে উদ্বুদ্ধ হবে।	শোনা, পড়া, অংশগ্রহণমূলক আলোচনা, লেখা	প্রাণীকে আদর করা বা কোলে নেওয়ার স্থির চিত্র, ভিডিও ক্লিপ, পোস্টার পেপার	'কুকুরটি রেলস্টেশনে এলো কেন'– এ প্রশ্নের আলোকে মূল্যায়ন/পর্যক্ষেণের মাধ্যমে সক্ষমতা যাচাই।

পাঠের ধারাবাহিক পরিকল্পনার নমুনা (ব্যাকরণ)

শ্রেণি-৮ম, বিষয়: বাংলা ২য় পত্র, অধ্যায়: দ্বিতীয় (ধ্বনিতত্ত্ব) পাঠসংখ্যা: ৪

তারিখ	পাঠ	শিখনফল	শিখন পদ্ধতি	উপকরণ	মূল্যায়ন কৌশল
০১/০৯/২০১৭	ধ্বনিতত্ত্ব-১: বাংলা ভাষার ধ্বনি ও বর্ণ প্রকরণ	বাংলা ধ্বনিসমূহের পরিচিতি (উচ্চারণের স্থান ও রীতি অনুযায়ী) বর্ণনা করতে পারবে। বিভাজিত শিখনফল: বাংলা ভাষার ধ্বনি ও বর্ণ প্রকরণের তালিকা প্রস্তুত করতে পারবে।	অংশ-গ্রহণমূলক, ব্রেইন স্টর্মিং	মাল্টিমিডিয়া টেক্সট, স্থির চিত্র) চার্ট, কর্মপত্র, পোস্টার পেপার,	তালব্য ও ওষ্ঠ্যবর্গীয় ধ্বনিগুলোর তালিকা তৈরি করানো ও সঠিকতা যাচাই)
০২/০৯/২০১৭	ধ্বনিতত্ত্ব-২: ধ্বনির উচ্চারণ বিধি	বাংলা ধ্বনিগুলোর উচ্চারণের নিয়ম বর্ণনা করতে পারবে। বিভাজিত শিখনফল: স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জন ধ্বনিসমূহের উচ্চারণবিধি বর্ণনা করতে পারবে।	অংশ-গ্রহণমূলক, আলোচনা	মাল্টিমিডিয়া টেক্সট, ভিডিও ক্লিপ) চার্ট, কর্মপত্র, পোস্টার পেপার,	সম্মুখ স্বরধ্বনি ও পশ্চাৎ স্বরধ্বনিসমূহের তালিকা প্রণয়ন।

৬.২ : পাঠ-পরিকল্পনার ধারণা ও প্রণয়ন কৌশল

কোনো কাজের আশানুরূপ সাফল্য নির্ভর করে সুষ্ঠু পরিকল্পনার উপর। সুষ্ঠুভাবে কাজ সম্পাদনের জন্যে সুষ্ঠু পরিকল্পনার প্রয়োজন। এই পরিকল্পনা সমাজে মানুষকে সুন্দরভাবে জীবন যাপনে সহায়তা করে। সমাজের চাহিদা, উৎকর্ষ এবং মূল্যায়নের নিরিখে সমাজ মানসের গতিপথ নির্দেশিত হয়। তবে এ পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করে পরিকল্পনাকারীর দূরদৃষ্টির উপর। শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে পরিকল্পিত শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করা। এই শিখন-শেখানো কার্যক্রমটি পরিচালনার অন্যতম হাতিয়ার হচ্ছে কার্যকর পাঠ-পরিকল্পনা। পাঠ-পরিকল্পনা সুষ্ঠুভাবে শ্রেণিকার্যক্রম সম্পাদনের সুচিন্তিত ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এই ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় গুরুত্ব দেওয়া হয় নির্দিষ্ট শিখনফল নির্বাচন ও তা অর্জনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর আচরণের ইতিবাচক পরিবর্তন সাধনের উপর।

বলা যায়, একটি বিশেষ পাঠ উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রস্তুতকৃত, সুচিন্তিত, পদ্ধতিগত ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার লিখিত রূপটি হলো পাঠ-পরিকল্পনা (Lesson Plan)। দৈনন্দিন পাঠে এই পরিকল্পনাটি করতে হয় বলে একে দৈনন্দিন পাঠ-পরিকল্পনাও বলা যেতে পারে। পাঠ-পরিকল্পনার মাধ্যমে শিক্ষক পাঠের প্রতিটি ধাপ মানসপটে দেখতে পান। ফলে তাঁর পাঠদান যথার্থ হয়; অর্জিত হয় শিখনফল অনুসারে শিক্ষার্থীর শিখন। এমনকি শিক্ষক তাঁর পাঠের সবল-দুর্বল দিক সম্পর্কে আত্মবিশ্লেষণের মাধ্যমে দক্ষ হয়ে ওঠেন এবং পরবর্তী পাঠে তার সফলতার পরিমাণ বাড়াতে পারেন।

Lester B. Sands-এর মতে, পাঠ-পরিকল্পনা প্রকৃতপক্ষে কাজের পরিকল্পনা। পরিকল্পনা হলো কোন কর্মসম্পাদনের ধারাবাহিক প্রস্তুতি। এন, এ বর্সিং বলেছেন- শ্রেণিকক্ষে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে, কাজের মাধ্যমে, উদ্দেশ্যে পৌঁছানোর জন্যে বিভিন্ন করণীয় বিষয়ের বিবরণই হলো পাঠ-পরিকল্পনা। শিক্ষাবিদ মনরোর (Monroe) মতে, Lesson plan is the name of a statement of the things a teacher proposes to do during the period he spends with his class. অর্থাৎ পাঠ-পরিকল্পনা হলো একটি পূর্বপরিকল্পিত বিষয়ভিত্তিক লিখিত রূপ যার মাধ্যমে শিক্ষক তাঁর শ্রেণিতে পাঠদান করেন। বলা যায়, A lesson plan is a plan for learning. Quality learning needs quality planning and produce quality results. A lesson plan is a framework and a roadmap which each teacher will creat using an individual style.

পাঠ-পরিকল্পনা প্রণয়ন : বিবেচ্য বিষয়

সুষ্ঠু ও পদ্ধতিগত পাঠ-পরিকল্পনা প্রণয়নের উপর নির্ভর করে পাঠের শিখনফল অর্জন। কী শেখাবেন, কীভাবে শেখাবেন, কাকে শেখাবেন, কেন শেখাবেন– এই প্রশ্নগুলো সামনে রেখে শিক্ষক পাঠ-পরিকল্পনা করে থাকেন। কার্যকর পাঠ-পরিকল্পনার মাধ্যমে সময়ের সঠিক ব্যবহার করে একজন শিক্ষক কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জনে সক্ষম হন।

আমরা বর্তমানে শ্রেণিকার্যক্রমে যে পাঠ-পরিকল্পনা অনুসরণ করি তা জার্মান শিক্ষাবিদ ও দার্শনিক হার্বার্টের (Johann Freidrich Herbart, 1776–1841) মতবাদভিত্তিক পাঠ-পরিকল্পনা। হার্বার্ট দার্শনিক এবং শিক্ষাবিদ ছিলেন বলেই তিনি বিশ্বাস করতেন পাঠদান ও পাঠগ্রহণে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর পারস্পরিক সম্পর্ক মানসিক পরিবেশের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। তাই পাঠ-পরিকল্পনা করার সময় শিক্ষকের অবশ্যই শ্রেণির শিক্ষার্থী সম্পর্কিত সার্বিক ধারণা থাকতে হবে। শিক্ষার্থীর মেধা, চাহিদা, বয়স, আগ্রহ, সামর্থ্য, প্রবণতা, রুচি, ঝোঁক ইত্যাদি জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণের সুযোগ থাকতে হবে পাঠ-পরিকল্পনায়। অর্থাৎ পাঠ-পরিকল্পনাটি হতে হবে সক্রিয় অংশগ্রহণমূলক। শিক্ষক পাঠের প্রতিটি পর্বে শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণের সুযোগ রাখবেন। তবে সকল বিষয়ের পাঠ-পরিকল্পনার মূল কাঠামো একই থাকবে। কিন্তু বিষয় এবং পাঠের বিষয়বস্তুর ভিন্নতার কারণে শিখন-শেখানো কার্যাবলি, শিখন অর্জন যাচাই ও উপকরণের ব্যবহার ভিন্ন হতে পারে। শিখন সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে অনুশীলন, কাজ সম্পাদন, শ্রেণির কাজ (একক, জোড়ায় বা দলগত) এবং অনুসন্ধানমূলক প্রজেক্ট শিক্ষার্থীদের দ্বারা সম্পাদনের ব্যবস্থা করতে হবে।

পাঠের উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীদের অর্জন করানোর জন্য যেহেতু পাঠ-পরিকল্পনাটি করা হয়ে থাকে তাই শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পাঠ উপস্থাপনের এই যে পরিকল্পনা তা যথাসম্ভব কর্মকেন্দ্রিক (Activity) এবং মিথষ্ক্রিয়া (Interactive) হবে। বিভিন্ন শিখনমূলক শেখানো পদ্ধতি ও কৌশলের সাহায্যে তা সম্পাদন সম্ভব। প্রশ্নোত্তর, জোড়ায় কাজ, দলগত কাজ, প্রদর্শন, মাইন্ড ম্যাপিং, ওয়াকিং ওয়াল, পোস্ট বক্স, আলোচনা, মার্কেট প্লেস, এক্সপার্ট জিগসো, হট পটেটো, ভূমিকাভিনয়, মাথা খাটানো ইত্যাদি

পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহারের মাধ্যমে পাঠ কর্মকেন্দ্রিক, মিথষ্ক্রিয়াভিত্তিক এবং আনন্দদায়ক হয়ে ওঠে। তাই শিক্ষার্থীর বয়স ও মানসিক সামর্থ্য বিবেচনা করে শিক্ষক সর্বাপেক্ষা উপযোগী পদ্ধতি ও কৌশল অনুসরণ করবেন।

পাঠকে কার্যকর, আকর্ষণীয় ও বৈচিত্র্যময় করে তোলার জন্যে পাঠ-পরিকল্পনা প্রণয়নে প্রাসঙ্গিক সহায়ক উপকরণ নির্বাচন করতে হবে। এ কাজটি শিক্ষককে অত্যন্ত সুচিন্তিতভাবে করতে হবে। পাঠের প্রয়োজন অনুযায়ী যথাসম্ভব সহজলভ্য (স্বল্প মূল্য বা বিনামূল্যের) শিক্ষা উপকরণ এবং প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের সুযোগ রাখা আবশ্যক। শিক্ষা সহায়ক উপকরণের ব্যবহার প্রাসঙ্গিক ও যথাযথ হওয়া সম্পর্কেও শিক্ষকের স্পষ্ট ধারণা রাখতে হবে।

পাঠ-পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে শিখনফল। শিক্ষার্থীদের শিখনফল অর্জন করানোই শ্রেণি পাঠদানের অন্যতম উদ্দেশ্য। আচরণের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনই শিখনফলের মূল লক্ষ্য। পাঠ-পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে বর্তমানে আচরণিক উদ্দেশ্য লেখার পরিবর্তে শিখনফল সংযোজিত হয়েছে। শিখনফলটি সকর্মক ক্রিয়ায় আচরণিক ভাষায় লিখতে হবে। শিক্ষাক্রম বা পাঠ্যপুস্তকে উল্লিখিত শিখনফল প্রয়োজনে বিভাজন করে পাঠ-পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। একটি পাঠে একাধিক শিখনফল থাকতে পারে। তবে প্রতিটি শিখনফলের জন্য শিখন-শেখানো কার্যাবলি, পাঠ উপস্থাপন, শিখন অর্জন যাচাই, শিক্ষা উপকরণ ইত্যাদি আলাদা হতে পারে।

শিক্ষক পাঠ-পরিকল্পনা প্রণয়নে শিখন-শেখানো কার্যক্রমের বিভিন্ন ধাপের (প্রস্তুতি, উপস্থাপন, মূল্যায়ন) সময় উল্লেখ করবেন এবং পাঠের জন্যে (প্রতি পিরিয়ড) বরাদ্দকৃত পঞ্চাশ মিনিট সময় প্রয়োজন অনুসারে বিভাজন করবেন। প্রতিটি পাঠ-পরিকল্পনায় কমপক্ষে একটি চিন্তনমূলক (Thought provoking) এবং সৃজনশীল প্রশ্ন বা কাজ থাকতে হবে। বাড়ির কাজটিও পাঠ-পরিকল্পনায় উল্লেখ করতে হবে।

পাঠ-পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্য

সমর্থ করে তোলা : পাঠ-পরিকল্পনা শিক্ষক এমনভাবে করবেন যেন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী পাঠের শিখনফল অর্জনে শিক্ষার্থীকে সমর্থ করে তোলা যায়। পাঠের লক্ষ্যই হচ্ছে শিখনফল অর্জন। শিক্ষক শিখনফল অর্জনের উদ্দেশ্যকে মাথায় রেখে পাঠ-পরিকল্পনাটি সুচিন্তিতভাবে তৈরি করবেন। কারণ পাঠের প্রতিটি উদ্দেশ্য কার্যকরভাবে অর্জনের মাধ্যমেই শিক্ষার্থী সমর্থ হয়ে ওঠে।

নিয়ন্ত্রিত ও সংগঠিত করা : পাঠ কার্যক্রমকে নিয়ন্ত্রিত ও সংগঠিত করা পাঠ-পরিকল্পনার একটি অন্যতম উদ্দেশ্য। পাঠের বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহারের মাধ্যমে পাঠকে নিয়ন্ত্রিত ও সংগঠিত করা যায়। পাঠটি নিয়ন্ত্রিত ও সংগঠিত হলে শিক্ষার্থীরা সহজেই পাঠের উদ্দেশ্য অর্জনে সক্ষম হবে।

আকর্ষণীয় করা : বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহার করে এবং উদাহরণের মাধ্যমে শিক্ষক শিখন-শেখানো কার্যক্রমকে আকর্ষণীয় করে তুলতে পারেন। পাঠদান আর্কষণীয় হলে শিক্ষার্থীরা পাঠে আনন্দ পাবে এবং শিখনফল অর্জন অনেক বেশি কার্যকর ও স্থায়ী হবে।তাই এই দিকটি বিবেচনায় রেখে শিক্ষক পাঠ-পরিকল্পনাটি তৈরি করবেন।

ধারাবাহিকতা রক্ষা করা : পাঠ-পরিকল্পনাটি এমনভাবে করতে হবে যেনো পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পাঠের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়। পাঠদান কার্যক্রমে ধারাবাহিকতা না থাকলে শিখন উদ্দেশ্যের যথার্থতা ব্যাহত হবে। শিক্ষক পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পাঠের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে পাঠ-পরিকল্পনাটি করবেন। তাহলে পাঠের পুনরাবৃত্তি ঘটবে না।

কাজ সুনির্দিষ্ট করা : অংশগ্রহণমূলক শিখনে শ্রেণি কার্যক্রমে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর কাজ সুনির্দিষ্ট থাকতে হবে। পাঠের শিখনফল অর্জনে এটি অত্যন্ত জরুরি। তাই পাঠ-পরিকল্পনা তৈরির সময় এই বিষয়টি খেয়াল করতে হবে।

ত্রুটি-বিচ্যুতি চিহ্নিত ও দূরীকরণ : শিখনফল অর্জনে সক্ষম করে তুলতে হলে শিক্ষককে পাঠের ত্রুটি বিচ্যুতি চিহ্নিত করে তা দূর করার ব্যবস্থা করতে হবে। এটি যেন সম্ভব হয় পাঠ-পরিকল্পনায় তার সুযোগ থাকতে হবে।

সময় নির্ধারণ : পাঠ-পরিকল্পনায় প্রতিটি ধাপ, উপধাপ ও কাজের জন্যে ব্যয়িত সময়ের উল্লেখ থাকতে হবে। কাজের ব্যাপ্তি অনুযায়ী শিক্ষক সময় নির্ধারণ করবেন এবং নির্ধারিত সময়ে শিক্ষার্থী যেন কাজটি শেষ করতে পারে তা খেয়াল রেখে পাঠ-পরিকল্পনাটি রচনা করবেন।

উপকরণ ব্যবহার : উপকরণ বিমূর্ত বিষয়কে মূর্ত করে তোলে। পাঠকে আকর্ষণীয় ও অধিক কার্যকর করে। তাই শ্রেণি কার্যক্রমে উপকরণের সঠিক ব্যবহার বাঞ্ছনীয়। পাঠ-পরিকল্পনায় বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট অধিকতর কার্যকর উপকরণের উল্লেখ থাকতে হবে এবং এর সঠিক ব্যবহারও নিশ্চিত করতে হবে।

অগ্রগতি মূল্যায়ন : শ্রেণি পাঠের গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যই হচ্ছে শিক্ষার্থীর অগ্রগতি মূল্যায়ন করা। পাঠটিতে শিক্ষার্থীর অগ্রগতি কতটুকু হয়েছে তা যাচাইয়ের ব্যবস্থা থাকতে হবে। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন, কুইজ বা ছবি দেখিয়ে শিক্ষক এটি করতে পারেন। তবে যেভাবে তিনি কাজটি করবেন তা পাঠ-পরিকল্পনায় উল্লেখ থাকতে হবে।

সময় সচেতনতা : শ্রেণিতে প্রতি ক্লাসের জন্যে পঞ্চাশ মিনিট করে সময় নির্দিষ্ট করা আছে। এই নির্দিষ্ট সময়ে পাঠটি শেষ করা পাঠ-পরিকল্পনার একটি অন্যতম উদ্দেশ্য। নির্দিষ্ট সময়ে পাঠটি শেষ করতে না পারলে অন্য ক্লাসের জন্য বরাদ্দকৃত সময় কমে যাবে এবং সেই শিক্ষকের পক্ষে সেদিনের নির্দিষ্ট করা পাঠটি শেষ করা কষ্টকর হয়ে পড়বে। ফলে পাঠ্যক্রম অনুযায়ী পাঠ্যসূচি শেষ করার কার্যক্রম ব্যাহত হবে। তাই পাঠ-পরিকল্পনা তৈরিতে শিক্ষক সময় সচেতন থাকবেন।

শিখন বান্ধব : পাঠ পরিকল্পনাটি হতে হবে শিখন বান্ধব। শ্রেণিতে শিখন বান্ধব পরিবেশ তৈরি করাও পাঠ-পরিকল্পনার আরেকটি উদ্দেশ্য।

কাঙ্ক্ষিত মানের শিখন : শিক্ষাক্রমের অন্যতম উদ্দেশ্যই হচ্ছে শিক্ষার মানোন্নয়ন। অর্থাৎ শিখন কাঙ্ক্ষিত মানে নিয়ে আসা। পাঠ-পরিকল্পনার উদ্দেশ্যও কাঙ্ক্ষিত শিখনফল অর্জন। তাই পাঠ-পরিকল্পনার উদ্দেশ্য কাঙ্ক্ষিত মানের শিখন নিশ্চিত করা।

শিখনের স্থায়িত্ব : শিখন যতো সহজ, আকর্ষণীয় ও আনন্দদায়ক হবে ততো তা ফলপ্রসূ এবং স্থায়ীরূপ পাবে। তাই শিখনকে সহজ ও স্থায়ী করা পাঠ-পরিকল্পনার উদ্দেশ্য।

আত্মপ্রতিফলন : আত্মপ্রতিফলনের (Self Reflection) মাধ্যমে পাঠের ঘাটতিসমূহ চিহ্নিত করে পরবর্তীতে পাঠের মান বৃদ্ধি করা যায়। এতে শিক্ষক নিজে যেমন সমৃদ্ধ হন তেমনি আশানুরূপ, মানসম্মত পাঠদান সম্ভব হয়।

আত্মবিশ্বাস : আত্মবিশ্বাস থাকা শিক্ষকের জন্যে অবশ্যই প্রয়োজন। নতুন-পুরাতন দুধরনের শিক্ষকের আত্মবিশ্বাস তৈরিতে পাঠ-পরিকল্পনা সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই শিক্ষকের আত্মবিশ্বাস তৈরি ও উন্নয়ন করা পাঠ-পরিকল্পনার একটি উদ্দেশ্য।

কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য অর্জন : নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়তা করে থাকে পাঠ-পরিকল্পনা।

পাঠের নির্দেশক : শ্রেণি কার্যক্রমে পাঠটি কীভাবে পরিচালিত হবে, নিয়ন্ত্রিত হবে, কোন কাজটি কখন করতে হবে– এর সার্বিক দিক নির্দেশনা থাকে পাঠ-পরিকল্পনায়। পাঠের নির্দেশক হিসেবে পাঠ-পরিকল্পনাটি সহায়তা করে। তাই বলা যায়, পাঠের নির্দেশক হিসেবে কাজ করাও পাঠ-পরিকল্পনার একটি উদ্দেশ্য।

পাঠ-পরিকল্পনার সোপান বা ধাপ

পাঠ-পরিকল্পনার উদ্ভাবক জার্মান শিক্ষাবিদ ও দার্শনিক জন ফ্রেডারিক হার্বার্ট। হার্বার্ট পাঠ-পরিকল্পনার পাঁচটি সোপানের কথা বলেন– যা হার্বার্টের পঞ্চসোপান নামে পরিচিত। এই পঞ্চসোপানের উপর ভিত্তি করে পাঠ-পরিকল্পনা করা হয়। সোপানগুলো নিম্নরূপ –

১. প্রস্তুতি (Preparation)
২. উপস্থাপন (Presentation)
৩. তুলনাকরণ (Comparison)/ অনুষঙ্গ স্থাপন (Association)
৪. সূত্রগঠন /সামান্যীকরণ (Generalisation)
৫. প্রয়োগ/ অভিযোজন (Application)

বর্তমানে হার্বার্টের পঞ্চসোপানকে সংক্ষিপ্ত করে তিনটি সোপানে রূপ দেওয়া হয়েছে, যা হার্বার্টের ত্রিসোপান নামে পরিচিত। এই ত্রিসোপানকে ভিত্তি করে পাঠ-পরিকল্পনা তৈরি করা হয়। সোপান তিনটি হচ্ছে–

১. প্রস্তুতি (Preparation)
২. উপস্থাপন (Presentation)
৩. মূল্যায়ন (Evaluation)

প্রস্তুতি ও উপস্থাপন ধাপের বিভিন্ন উপধাপ রয়েছে। যেমন প্রস্তুতির উপধাপগুলো হতে পারে– শুভেচ্ছা বিনিময়, শ্রেণিবিন্যাস, মানসিক পরিবেশ গঠন/মনোযোগ আকর্ষণ ও পাঠ ঘোষণা। আর উপস্থাপনের (গদ্য/কবিতার ক্ষেত্রে) উপধাপগুলো নিম্নরূপ হতে পারে–

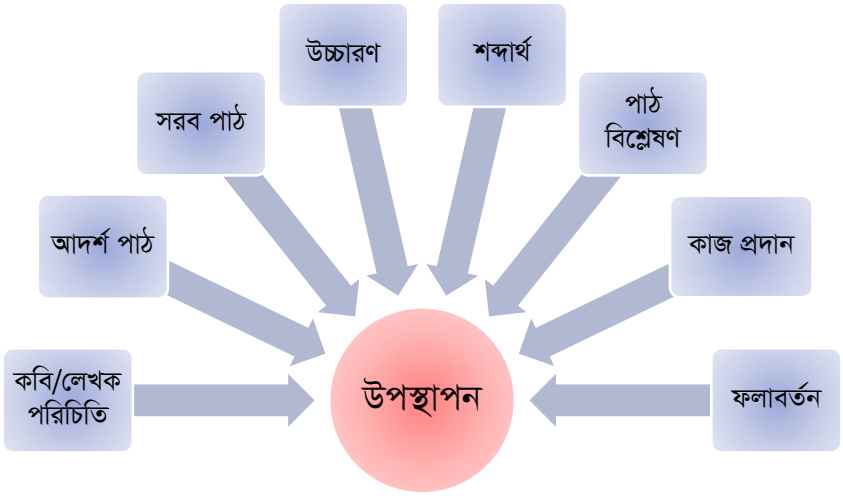

গদ্য/কবিতার পাঠ-পরিকল্পনার ধারাবাহিক কার্যপ্রণালি

শিখন-শেখানো কার্যক্রমে শিক্ষক শ্রেণিতে পাঠ-পরিকল্পনার ধাপ ও উপধাপের কাজগুলো যে প্রক্রিয়ায় করবেন তাই কার্যপ্রণালি। প্রত্যেকটি ধাপের উপধাপগুলো শিক্ষক বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশলের আলোকে নির্বাচন করেন।

প্রস্তুতি ধাপে শিক্ষক শ্রেণিতে প্রবেশ করে কুশল বা শুভেচ্ছা বিনিময় করে থাকেন। প্রয়োজনবোধে শ্রেণিবিন্যাস করবেন। পাঠে মনোযোগ আকর্ষণের জন্যে এবং আজকের পাঠের উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীর মানসিক পরিবেশ তৈরি করে পাঠটি ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডের উপর দিকে মাঝখানে পাঠের শিরোনাম (কবি/লেখকের নামসহ) লিখবেন। পাঠ ঘোষণায় বিভিন্ন প্রশ্ন, ছবি, গান বা ভিডিও দেখাতে পারেন।

কবি/লেখক পরিচিতি

উপস্থাপনের প্রথম উপধাপ এটি। এই উপধাপে শিক্ষার্থী সক্রিয় থাকার সুযোগ পাবে। কবি/লেখকের পরিচিতিমূলক যে অনুচ্ছেদটি শিক্ষার্থীদের পাঠ্য বইয়ে আছে তা নীরবে মনোযোগ দিয়ে পড়তে বলবেন। শিক্ষক বোর্ডে নিম্নরূপ ধারণা মানচিত্রের মাধ্যমে উক্ত কবি/লেখক সম্পর্কে তথ্যগুলো শিক্ষার্থীকে দিয়ে লেখাবেন।

শিক্ষার্থীদের কাজ শেষ হলে শিক্ষক নিজের তৈরি করা তথ্যছকটি মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে প্রদর্শন করবেন এবং বোর্ডে লেখার সাথে মেলাতে বলবেন। এভাবে দেখে শেখায় শিক্ষার্থীর ভুলতথ্য সংশোধন হওয়ার সুযোগ থাকছে বিধায় শিখন স্থায়ী হবে।

আদর্শ পাঠ

শিক্ষক শ্রেণিতে নির্ধারিত যে বিষয়বস্তু পাঠ করবেন সেটিই আদর্শ পাঠ। আদর্শ পাঠে শিক্ষকের ভূমিকাই প্রধান। এই অংশে শিক্ষার্থীদের বই অনুসরণ করে শিক্ষক তার আদর্শ পাঠটি মনোযোগ দিয়ে শুনতে বলবেন। পাঠের নির্দিষ্ট অংশটি শ্রেণির সামনে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে উচ্চারণ, গতি, কণ্ঠস্বর ইত্যাদির সঠিক মান বজায় রেখে পাঠ করবেন। মাঝে মাঝে শিক্ষার্থীদের দিকেও দৃষ্টি দেবেন যেন শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের আদর্শ পাঠটি সঠিকভাবে অনুসরণ করতে পারে।

সরব পাঠ

নির্ধারিত পাঠ্যাংশটি শিক্ষার্থী কর্তৃক পাঠ করানোই সরব পাঠ। এক্ষেত্রে তিন চারজন শিক্ষার্থীকে দিয়ে শিক্ষক পাঠটি করাবেন। উচ্চারণ, কণ্ঠস্বর, গতি সঠিক মানের হচ্ছে কি না শিক্ষক তা খেয়াল করবেন। ভুল উচ্চারণ করলে বোর্ডে লিখবেন এবং সরব পাঠ শেষ হলে ভুল উচ্চারিত শব্দগুলোর শুদ্ধ উচ্চারণ করাবেন ও যারা ভুল করেছে তাদের সংশোধন করাবেন।

শব্দার্থ

শিক্ষার্থীদের নির্বাচিত অংশের নতুন বা অর্থ-না-জানা শব্দগুলো শিক্ষক উল্লেখ করতে বলবেন এবং বোর্ডে লিখবেন। জোড়ায় চিন্তা করে শব্দসমূহের অর্থ খাতায় লিখতে বলবেন। পরে শিক্ষক বোর্ডে শব্দের অর্থ লিখে দেবেন, মুখে বলবেন এবং শিক্ষার্থীদের বোর্ড দেখে মিলিয়ে নিতে বলবেন।

পাঠ বিশ্লেষণ

শিক্ষক সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় বা প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বা আলোচনা করে বা মাল্টিমিডিয়ার সাহায্যে পাওয়ার পয়েন্টে নির্ধারিত অংশের মূলভাব স্লাইডের মাধ্যমে ছবি দেখিয়ে বা ভিডিও দেখিয়ে বিশ্লেষণ করবেন। প্রয়োজনে পোস্টার পেপারেও বিভিন্ন তথ্য বা চার্ট দেখাতে পারেন। বোর্ড ব্যবহার করতে পারেন। প্রয়োজনে নির্ধারিত পাঠ্যাংশটি শিক্ষার্থীদের নীরবে পড়তে বলতে পারেন।

দলগত কাজ

শিক্ষক শ্রেণির আকার অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের এককভাবে বা দলে বিভক্ত করে উচ্চতর চিন্তন স্তরের একটি বা দুটি প্রশ্ন/কর্মপত্র কাজ হিসেবে দেবেন। কাজ চলাকালে তিনি ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা করবেন। কাজ শেষে উপস্থাপন করাবেন। দলের কাজ উপস্থাপন শেষে ফলাবর্তন হিসেবে নিজের উত্তরটির সাথে শিক্ষার্থীদের উত্তর মিলিয়ে নিতে বলবেন। শিক্ষক খেয়াল রাখবেন দলগত কাজে যেনো শিক্ষার্থীর ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটে। একক কাজ হিসেবে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের একটি চিন্তামূলক কাজও দিতে পারেন।

মূল্যায়ন ও বাড়ির কাজ

উল্লিখিত শিখনফল অনুসারে ছোট ছোট প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন। মূল্যায়নের প্রশ্ন জ্ঞান বা অনুধাবনমূলক হওয়া বাঞ্ছনীয়। মূল্যায়ন শেষে প্রয়োগধর্মী বাড়ির কাজ দিবেন। শিক্ষক কাজটি বোর্ডে, পোস্টারে বা স্লাইডে লিখতে পারেন। পাঠের শেষে শিক্ষক শিখন কার্যক্রম পরিচালনার ত্রুটি বিচ্যুতি দূর করে পরের পাঠের মানবৃদ্ধির জন্য চিন্তা করবেন।

নমুনা পাঠ-পরিকল্পনা : ১ (গদ্য/কবিতা)

বিদ্যালয় : শিক্ষক : রোল :	শ্রেণি : ৯ম, বিষয়: বাংলা কবিতা পাঠ : শহীদ স্মরণে (১ম তিন স্তবক) তারিখ : ১৫/০৯/১৮ সময়: ৫০মি.

শিখনফল	কার্যপ্রণালি (শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর কাজ), পদ্ধতি ও কৌশল	উপকরণ/সহায়ক সামগ্রী
	মনোযোগ আকর্ষণ ও পাঠ ঘোষণা (৩মি.): প্রদর্শন, প্রশ্নোত্তর মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ছবি/ভিডিও দেখিয়ে ছবির বিষয়বস্তুভিত্তিক প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পাঠ ঘোষণা করব ও বোর্ডে শিরোনাম লিখে দিয়ে শিক্ষার্থীদের খাতায় লিখে নিতে বলব। প্রশ্ন : মুক্তিযুদ্ধ কখন হয়েছিল? কেন হয়েছিল? এই যুদ্ধে কারা অংশগ্রহণ করেছিল? কেন করেছিল?	প্রজেক্টর/মুক্তিযুদ্ধের ছবি/ভিডিও চকবোর্ড
(১) কবি মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের পরিচিতি উল্লেখ করতে পারবে।	কবি পরিচিতি (৫ মি.): সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা, মাইন্ড ম্যাপিং ● প্রজেক্টরে/পোস্টারে কবির ছবি দেখিয়ে কবি সম্পর্কে ১ মিনিট বক্তৃতার পর শিক্ষার্থীদের বই থেকে কবি পরিচিতি মনোযোগ দিয়ে পড়ে একটি করে তথ্য উল্লেখ করতে বলব (দ্বিরুক্তি না করে)। ● তাদের উল্লিখিত তথ্য আন্তঃসম্পর্ক বিবেচনায় রেখে Mind map আকারে সাথে সাথে বোর্ডে লিখব বা লেখাবো ও শিক্ষার্থীদের খাতায় লিখে নিতে বলব। ● কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য অনুল্লিখিত থাকলে তা উল্লেখ করে বোর্ডে লিখে দিব/তথ্যপত্রে বা প্রজেক্টরে দেখাবো। শিক্ষার্থীরা খাতায় লিখে নিবে। (সম্ভাব্য তথ্য : যশোর, খড়কি, ১৯৩৬, অধ্যাপক- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঋজু বক্তব্য, ছন্দ সচেতনতা, গীতিময়তা, বাংলা একাডেমি পুরস্কার ১৯৭২, একুশে পদক ১৯৮৭, কাব্য: দুর্লভ দিন, শঙ্কিত আলোকে, বিপন্ন বিষাদ, প্রতনু প্রত্যাশা, মৃত্যু ২০০৮)	প্রজেক্টর, কবির ছবি, চকবোর্ড, তথ্যপত্র
(২) কবিতার নির্বাচিত অংশ আদর্শরূপে আবৃত্তি করতে পারবে।	আদর্শ পাঠ (৩মি.) : আবৃত্তি ● কবিতার নির্বাচিত অংশ প্রজেক্টরে/পোস্টারে দেখিয়ে এক স্থানে দাঁড়িয়ে সুন্দর করে (গতিভঙ্গি, উচ্চারণ, তাল, লয় ঠিক রেখে) আবৃত্তি করব/অডিও বা ভিডিওর মাধ্যমে আবৃত্তি শোনাবো। শিক্ষার্থীরা দেখে ও শুনে আদর্শপাঠ অনুসরণ করবে ।	প্রজেক্টর/ পোস্টার পেপার, অডিও, ভিডিও
	সরব পাঠ ও উচ্চারণ সংশোধন (৪মি.) : আবৃত্তি/ড্রিল ● নির্বাচিত ৩/৪ জন শিক্ষার্থীকে পর্যায়ক্রমে (একটি স্তবক একজন শিক্ষার্থী) পুরো পাঠ একবার সরবে পড়তে বলব। শিক্ষার্থীরা পাঠক শিক্ষার্থীকে অনুসরণ করবে। ● শিক্ষার্থীদের পাঠের ত্রুটিগুলো খেয়াল রেখে তা সংশোধন করে দিব। প্রয়োজনে পুনরায় আদর্শ পাঠ দিব/ অডিও বা ভিডিওর মাধ্যমে আবৃত্তি শোনাবো। (সম্ভাব্য উচ্চারণত্রুটি: ব্যঞ্জনা, রঞ্জিত, বজ্রবর্ষী, আর্ত-হাহাকার, অভিসম্পাত)	প্রজেক্টর/ সেলফোন
(৩) হানাদার, ব্যঞ্জনা, বিমর্ষ, শোণিত, দুর্মর, রঞ্জিত প্রভৃতি শব্দের অর্থ বলতে পারবে।	শব্দার্থ (৪মি.): ত্রুটি সনাক্তকরণ ● কে, কোন শব্দের অর্থ জানে না- তা শিক্ষার্থীদের উল্লেখ করতে বলব এবং বোর্ডের বাম পাশে নিচে নিচে লিখব। ● পর্যায়ক্রমে লিখিত শব্দগুলোর অর্থ সকলকে জিজ্ঞেস করব এবং তাদের উল্লিখিত অর্থ শুদ্ধ করে বোর্ডে নির্দিষ্ট শব্দের পাশে লিখে দিব/ফ্লাশকার্ডে বা প্রজেক্টরে ছবিসহ দেখাবো। (সম্ভাব্য শব্দ : হানাদার, ব্যঞ্জনা, বিমর্ষ, শোণিত, দুর্মর, রঞ্জিত)	প্রজেক্টর, চকবোর্ড, ফ্লাশকার্ড

<table>
<tr>
<td>(৪) ‘কবিতায় আর কী লিখব’- কবির এই দ্বিধান্বিত প্রশ্নের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবে।</td>
<td>
পাঠ বিশ্লেষণ-১ (১২মি.) : বক্তৃতা, অনুচ্ছেদ তৈরি
● সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা (৩মি.) : পাঠের ৪নং উদ্দেশ্য ও এর বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় উপকরণ (প্রজেক্টর, চার্ট, ছবি) ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের সামনে ২/৩ মিনিটের সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দিব।
● একক/জোড়ায় কাজ- (৫মি.) : শিক্ষার্থীদের পাঠের নির্বাচিত অংশ মনোযোগ দিয়ে পড়ে একক/জোড়ায় নিম্নরূপ কর্মপত্র অনুযায়ী খাতায় কাজ করার নির্দেশ দিব। (বিষয়বস্তু অনুযায়ী বিভিন্ন রকম কর্মপত্র ব্যবহৃত হবে : ৩য় ইউনিটের সংশ্লিষ্ট পাঠ দ্রষ্টব্য)

কর্মপত্র/কাজ-১ : শূন্যস্থানে শব্দ বসিয়ে অনুচ্ছেদ তৈরি-
<table>
<tr><th>অনুচ্ছেদ</th><th>শব্দসমূহ</th></tr>
<tr><td>আসাদের রক্তে -------শ্যামল মাটি------- হয়েছিল। বাংলাদেশের ----- যেন আসাদের ----রঞ্জিত। পশুরূপী -------- প্রহারের চিহ্ন এখনও -------শরীরে বিদ্যমান। কবির বৃদ্ধা মায়ের কণ্ঠে ------ নেই। তিনি কাউকে ----দেন না কিন্তু ---- করেন। ----- বদলে তার দু’চোখে রয়েছে কেবল------ আর শত্রুকে হত্যা করার ----- । কবিতাই .....।</td><td>ঘৃণা, অভিশাপও, পতাকাও, হাহাকার, কবির বৃদ্ধ পিতার, রঞ্জিত, মনিরামপুরের, ইচ্ছা অশ্রুর, সেই রক্তে, পাক হানাদারের, আগুনের জ্বালা, দ্বিধান্বিত</td></tr>
</table>
● শিক্ষার্থীদের কাজ পর্যবেক্ষণ করবো, শ্রেণিতে তাদের কাজ উপস্থাপন (২মি.) করাবো ও প্রয়োজনে সংশোধন করে দিব (২মি.)
</td>
<td>প্রজেক্টর, ছবি, চার্ট

সমস্যা-চার্ট, কর্মপত্র

পোস্টার পেপার, খাতা</td>
</tr>
<tr>
<td>(৫) কবিতাংশে বর্ণিত ছোট ভাই আসাদ, মা এবং বাবা সম্পর্কিত কবির উপলব্ধি বর্ণনা করতে পারবে।</td>
<td>
পাঠ বিশ্লেষণ-২ (১৫মি.) সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা, ব্রেইন স্টর্মিং
● সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা (৩মি.) : পাঠের ৫নং উদ্দেশ্য, সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু ও উদ্দীপক/কর্মপত্রের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় উপকরণ (প্রজেক্টর, চার্ট, ছবি) ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের সামনে ২/৩মিনিটের সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দিব।
● জোড়ায়/দলে কাজ (৭মি.): শিক্ষার্থীদের পাঠের নির্বাচিত অংশ মনোযোগ দিয়ে পড়ে জোড়ায়/দলে নিম্নরূপ কর্মপত্র অনুযায়ী খাতায় কাজ করার নির্দেশ দিব।
(বিষয়বস্তু অনুযায়ী বিভিন্ন রকম কর্মপত্র ব্যবহৃত হবে: ৩য় ইউনিটের সংশ্লিষ্ট পাঠ দ্রষ্টব্য)
<u>কর্মপত্র/কাজ- ২ :</u> সৃজনশীল/চিন্তনমূলক প্রশ্ন-
‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি’
পংক্তিটির সঙ্গে আলোচ্য কবিতার পঠিত অংশের সাদৃশ্য ও স্বাতন্ত্র্য (জোড়ায়/দলে) নির্ণয়।
● কাজ পর্যবেক্ষণ : শ্রেণির কাজ পর্যবেক্ষণ করবো ও প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা করব।
● শিক্ষার্থীর উপস্থাপন (৩মি.) : পর্যায়ক্রমে শিক্ষার্থীদের দিয়ে কাজ উপস্থাপন করাবো এবং উপস্থাপিত তথ্যের ভিত্তিতে অন্যদের মন্তব্য বোর্ডে লিখব।
● সংশোধন (২মি.): পূর্ণাঙ্গ উত্তর পুনরায় সুন্দর করে মৌখিকভাবে বা পোস্টার পেপারে বা প্রজেক্টরের সাহায্যে উপস্থাপন করব।
</td>
<td>প্রজেক্টর ছবি, চার্ট

কর্মপত্র

পোস্টার পেপার, খাতা</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
মূল্যায়ন : (৪মি) প্রশ্নোত্তর
শিক্ষার্থীদের অর্জন যাচাইয়ের জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন করব (মুখেমুখে/প্রজেক্টরে)
ক. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান কোন ধরনের কবি, কেন?
খ. আসাদের মৃত্যুতে কবি অশ্রুহীন কেন?
গ. কবি তার মাকে কোনো সান্ত্বনা বাক্য শোনাননি কেন?

বাড়ির কাজ/অর্পিত কাজ : একজন মুক্তিযোদ্ধা ও যুদ্ধে নিহত একজন মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী বা সন্তানের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা এবং কবিতার বিষয়বস্তুর সাথে তুলনা করে একটি নিবন্ধ রচনা করা। (সময় ৭দিন)
</td>
<td>প্রজেক্টর</td>
</tr>
</table>

নমুনা পাঠ-পরিকল্পনা-২ (ব্যাকরণ)

বিদ্যালয় : শিক্ষক : তারিখ :	শ্রেণি : ৯ম বিষয় : বাংলা ব্যাকরণ পাঠ : ণত্ব ও ষত্ব বিধি তারিখ : ১৫/০৯/১৮ সময়: ৫০ মি.

	কার্যপ্রণালি (শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর কাজ), পদ্ধতি ও কৌশল	উপকরণ/ সহায়ক সামগ্রী
শিখনফল	মনোযোগ আকর্ষণ ও পাঠ ঘোষণা ———————— ৫মি. (প্রশ্নোত্তর) ● শ, ষ, স, ণ, ন এই ৫টি বর্ণদিয়ে ৫টি শব্দ চকবোর্ডে লিখবো /শব্দ ও ছবি প্রজেক্টরে দেখাবো । ● শব্দগুলোর বানানে শ/ষ/স অথবা ন/ণ এদের যে কোনোটি ব্যবহার করা যায় না কেন- তা জিজ্ঞেস করবো। এভাবে প্রসঙ্গের অবতারণার মাধ্যমে পাঠ ঘোষণা করবো ও শিরোনাম বোর্ডে লিখে দিবো।	প্রজেক্টর,চকবোর্ড
(১) ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধানের সংজ্ঞা বলতে পারবে।	শীর্ষ ক : ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধানের সংজ্ঞা ———— ১০মি. (ব্রেইন স্টর্মিং) ● বর্ষা এবং কারণ তৎসম শব্দ দু'টি বোর্ডে লিখে কেন শব্দ দু'টির বানানে 'ষ' এবং 'ণ' বসেছে তা শিক্ষার্থীদের জোড়ায় চিন্তা করতে বলব। ● শিক্ষার্থীদের চিন্তার সূত্র ধরে শব্দ দু'টির বানানের স্বরূপ ব্যাখ্যা করবো। ● দলে চিন্তা করে ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধানের সংজ্ঞা লিখতে বলব ও পরে শুদ্ধ উত্তর বলে দিব/প্রজেক্টরে দেখাবো।	প্রজেক্টর, চকবোর্ড
(২) বানানে 'ণ'ব্যবহারের ৩টি নিয়ম ব্যাখ্যা করতে পারবে।	শীর্ষ খ : ণ-ত্ব বিধানের নিয়ম —— ১৫মি. (আরোহী, প্রশ্নোত্তর, ছকপূরণ) ● ঘণ্টা, কারণ, কাণ্ড, লণ্ঠন, অর্পণ, ঋণ, বিভীষণ, হরিণ, কৃপণ প্রভৃতি তৎসম শব্দ ও শব্দসংশ্লিষ্ট ছবি শিক্ষার্থীদেরকে প্রজেক্টরের সাহায্যে/বোর্ডে লিখে দেখিয়ে প্রশ্নোত্তর ও আলোচনার মাধ্যমে শব্দগুলোর বানানরীতি বিশ্লেষণ করবো। ● জোড়ায়/দলে চিন্তা করে কর্মপত্র-১-এ পরিবেশিত উদাহরণ সংশ্লিষ্ট ণ-ত্ব বিধানের নিয়ম লিখতে বলব, সমজাতীয় নতুন উদাহরণ নির্বাচন করতে বলবো ও পরে পোস্টার পেপারে/বোর্ডে/ প্রজেক্টরে দেখিয়ে সংশোধন করে দিবো। কর্মপত্র-১ নিম্নবর্ণিত উদাহরণগুলো পর্যবেক্ষণ করে উদাহরণ সংশ্লিষ্ট নিয়মটি লিখ ও সমজাতীয় নতুন উদাহরণ নির্বাচন কর। উদাহরণ | নিয়ম/সূত্র | নতুন উদাহরণ ঘণ্টা, কাণ্ড, লণ্ঠন | | ঋণ, কারণ, বিভীষণ | | হরিণ, অর্পণ, কৃপণ | |	প্রজেক্টর, কর্মপত্র-১, চার্ট পোস্টার পেপার, খাতা
(৩) বানানে 'ষ' ব্যবহারের ৩টি নিয়মসংশ্লিষ্ট উদাহরণ শনাক্ত করতে পারবে।	শীর্ষক গ : ষ-ত্ব বিধানের নিয়ম ------ ১৫মি. (অবরোহী, ছকপূরণ) - ঋ-কার ও র এর পর 'ষ' হয় (বর্ষা) - ট, ঠ এর সঙ্গে 'ষ' হয় (ওষ্ঠ) - ই, উ কারান্ত উপসর্গের পরে 'ষ' হয় (বিষম) ● প্রজেক্টর/বোর্ড/পোস্টার পেপার ব্যবহার করে উপরের সংজ্ঞা ও সংজ্ঞাসংশ্লিষ্ট উদাহরণসমূহের স্বরূপ বিশ্লেষণ করব। এই তৎসম শব্দগুলোর বানানে 'ষ' ব্যবহারের কারণ ব্যাখ্যা করব।	প্রজেক্টর, কর্মপত্র-২, বোর্ড, পোস্টার পেপার, খাতা

<table>
<tr>
<td></td>
<td>
• এবার প্রশিক্ষণার্থীদের জোড়ায়/দলে চিন্তা করে কর্মপত্র-২ এ পরিবেশিত উদাহরণগুলো ষ-ত্ব বিধানের নিয়মের পাশে লিখতে বলব।
• পরে পোস্টার পেপার/বোর্ড/প্রজেক্টরের মাধ্যমে ফলাবর্তন দিব ও সংশোধন করে নিতে বলব।

<u>কর্মপত্র-২</u>
তৎসম শব্দের নিম্নবর্ণিত উদাহরণগুলো সংশ্লিষ্ট নিয়মের পাশে লিখ।
অভিষেক, নষ্ট, ঋষি, প্রতিষ্ঠান, বৃষ্টি, বর্ষা, কষ্ট, সুষমা, স্পষ্ট,
<table>
<tr><th>নিয়ম/সূত্র</th><th>উদাহরণ</th></tr>
<tr><td>ঋ-কার ও র এর পর ‘ষ’</td><td></td></tr>
<tr><td>ট, ঠ এর পরে ‘ষ’</td><td></td></tr>
<tr><td>ই, উ কারান্ত উপসর্গের পরে ‘ষ’</td><td></td></tr>
</table>
</td>
<td>প্রজেক্টর, পোস্টার পেপার, খাতা, বোর্ড</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
মূল্যায়ন (৫মি.) : শিক্ষার্থীদের অর্জন যাচাইয়ের জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন করব-------- (প্রশ্নোত্তর)
১. ণ-ত্ববিধান কাকে বলে? এ বিধান জানা আবশ্যক কেন?
২. ষ-ত্ব বিধানের সংজ্ঞা বল।
৩. বর্ষা শব্দটিতে কোন নিয়মে ‘ষ’ হয়েছে?
৪. বানানে ‘ণ’ ব্যবহারের ১টি নিয়ম উল্লেখ কর।
বাড়ির কাজ : তৎসম শব্দের বানানে ‘ণ’ ও ‘ষ’ ব্যবহারের (৫+৫) টি নিয়মের তালিকা তৈরি করা।
</td>
<td></td>
</tr>
</table>

উল্লেখ্য: কর্মপত্র পোস্টার পেপারে/আলাদা কাগজে/পাওয়ার পয়েন্টে তৈরি করতে হবে। বিষয়বস্তুর প্রকৃতি অনুযায়ী কর্মপত্র ও পাঠদান কৌশল বিভিন্ন রকমের হবে। তবে উপস্থাপনের প্রতিটি শীর্ষে নিম্নবর্ণিত ক্রম অনুসৃত হবে-
উদাহরণ উপস্থাপন- উদাহরণ বিশ্লেষণ- সূত্র/নিয়ম গঠন- সূত্র প্রয়োগ (নতুন উদাহরণ নির্বাচন)।

সুষ্ঠু ও কার্যকর পাঠ-পরিকল্পনার মাধ্যমেই পাঠের সুনির্দিষ্ট শিখনফল অর্জন করানো সম্ভব। শিক্ষক প্রতিদিন তার পরবর্তী দিনের পাঠের পরিকল্পনা করবেন। উপরে উল্লিখিত নমুনা পাঠ-পরিকল্পনার ছক অনুসরণ করে পরিকল্পনাটির একটি কাঠামোগত রূপ দিবেন। এবং তৈরিকৃত পাঠ-পরিকল্পনা অনুসারে শিখন-শেখানো কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন।

৬.৩ : পাঠ-পরিকল্পনায় পাঠ্যপুস্তক এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার

শিখন-শেখানো কার্যক্রমে সর্বাধিক ব্যবহৃত শিক্ষা উপকরণ হচ্ছে পাঠ্যপুস্তক। একটি নির্দিষ্ট শিক্ষাক্রমের আলোকে বিশেষ কিছু নীতিমালা অনুসরণ করে পাঠ্যপুস্তক লেখা হয়। অর্থাৎ শিক্ষাক্রমের প্রতিফলন ঘটে পাঠ্যপুস্তকে। তাই উদ্দেশ্যমুখী এই শিক্ষাক্রমের আলোকে রচিত বই বা পুস্তককেই পাঠ্যপুস্তক বলা হয়। শিক্ষার্থীর চাহিদা, বয়স, সামর্থ্য, প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিবেচনা করে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু নির্বাচন করা হয়। এর সুদূরপ্রসারি লক্ষ্য থাকে শিক্ষার্থীদের মানবতাবাদী, দেশপ্রেমিক, প্রকৃতিপ্রেমিক, বিজ্ঞানমনস্ক সর্বোপরি মানব সম্পদ হিসেবে তৈরি করা। বলা যায়– A textbook is a book designed for classroom use, carefully prepared by experts in the field and equipped with the usual teaching devices. উল্লেখ্য, জাতীয় শিক্ষক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ (এনসিটিবি) পাঠ্যপুস্তক রচনার দায়িত্ব পালন করে।

পাঠ-পরিকল্পনা তৈরির একটি অপরিহার্য উপাদান হচ্ছে পাঠ্যপুস্তক। পাঠ্যপুস্তক ছাড়া পাঠ-পরিকল্পনা করা সম্ভব নয়। শিক্ষক পাঠ্যপুস্তকে নির্বাচিত বিভিন্ন অধ্যায়, পাঠ বা বিষয়বস্তু শ্রেণিতে কার্যকরভাবে পাঠদানের জন্যে পাঠ-পরিকল্পনা করে থাকেন। এই পরিকল্পনার সাফল্য তথা শিক্ষার্থীদের শিখনফল অর্জন অনেকখানিই নির্ভর করে পাঠ্যপুস্তকটির যথাযথ ব্যবহারের উপর।

পাঠ-পরিকল্পনায় পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজনীয়তা

শিক্ষক পাঠ্যপুস্তক অনুসরণ করেই মূলত শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করে থাকেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠ্যপুস্তকের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। পাঠ্যপুস্তক ব্যতীত শিক্ষা ব্যবস্থা অকল্পনীয়। আমাদের দেশে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েই পাঠ্যপুস্তকের উপর নির্ভরশীল। পাঠ্যপুস্তককে কেন্দ্র করেই শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালিত হয়। তাই পাঠ-পরিকল্পনায় পাঠ্যপুস্তকের গুরুত্ব অপরিসীম। যে কোনো শ্রেণিরই হোক না কেন, শিক্ষক পাঠ-পরিকল্পনাটি তৈরি করেন পাঠ্যপুস্তকটি সামনে রেখে। পাঠ-পরিকল্পনায় শিখনফল একটি অপরিহার্য অংশ। আর নির্দিষ্ট পাঠের এই শিখনফল নির্বাচন করার জন্যে পাঠ্যপুস্তক প্রয়োজন।

পাঠ-পরিকল্পনার উপস্থাপন ধাপের প্রথমেই কবি/লেখক পরিচিতি থাকে। পাঠ্যপুস্তকেও প্রতিটি গল্প/কবিতায় কবি/লেখক পরিচিতির নির্দিষ্ট অংশ থাকে। কবি বা লেখকের পরিচিতি সম্পর্কে জানার জন্যে এ অংশে পাঠ্যপুস্তকটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। গল্প ও কবিতার নির্বাচিত অংশের মর্ম উপলব্ধির জন্যে পাঠ-পরিকল্পনার উপস্থাপন পর্বে শিক্ষক আদর্শরূপে আবৃত্তি বা পাঠ করে থাকেন। প্রমিত উচ্চারণে পঠিত শিক্ষকের আদর্শ পাঠ অনুসরণ করে শিক্ষার্থী সরব পাঠে অংশগ্রহণ করে থাকে। এই দুটো ধাপে শিক্ষকের পাঠ অনুসরণে শিক্ষার্থী পাঠ্য বিষয়বস্তুর বাক্য গঠনরীতি ও ভাষার রূপ-নির্মিতি অনুধাবন করে থাকে। কবিতার ভাব, আবেগ ও ছন্দ অনুসরণ করে আবৃত্তির দক্ষতা রপ্ত করে। তাই আদর্শ পাঠ ও সরব পাঠে পাঠ্যপুস্তক গুরুত্বপূর্ণ ভমিকা পালন করে।

শিক্ষক পাঠ্যপুস্তকের নির্বাচিত পাঠ্যাংশ পাঠ করার সময় শিক্ষার্থী পাঠ্যপুস্তকের সহায়তায় তাঁকে অনুসরণ করে বলে শিক্ষার্থীর পক্ষে পরবর্তীতে শুদ্ধরূপে, স্পষ্ট উচ্চারণে পাঠ করা সম্ভব হয়। কারো উচ্চারণে জড়তা, অস্পষ্টতা থাকলে শিক্ষক তা ঠিক করে দেন। শিক্ষার্থী শব্দের অল্পপ্রাণ, মহাপ্রাণ ধ্বনি ও নাসিক্য ধ্বনির যথার্থতা বজায় রেখে জড়তামুক্ত উচ্চারণের মাধ্যমে উচ্চারণবিকৃতি পরিহার করতে পারে। পাঠ-পরিকল্পনায় উল্লিখিত উচ্চারণ শেখানোর এ কাজটিতেও পাঠ্যপুস্তকের ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ।

পাঠ-পরিকল্পনার উপস্থাপন ধাপের একটি উপধাপ শব্দার্থ শিক্ষণ। শিক্ষার্থীরা পাঠ্যপুস্তক ব্যবহারের মাধ্যমে শব্দের অর্থ সম্পর্কে একটি ধারণা অনুমান করে নেয়। শব্দের অর্থ অনুধাবনের মাধ্যমে বাক্যের গঠন প্রণালি সফলভাবে আয়ত্ত করতে পারে। শব্দের অর্থ জানা, বাক্য গঠন করা, বানান শুদ্ধভাবে লেখা ইত্যাদি ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তক প্রয়োজন। পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু অবলম্বনে শিক্ষার্থীরা শুদ্ধ বানান, যুক্তাক্ষর সংবলিত বানানের সাথে পরিচিত হয়।

নির্বাচিত বিষয়বস্তুর মূল বক্তব্য বিশ্লেষণের জন্যে শিক্ষক পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার করে থাকেন। শিক্ষার্থীরাও পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার করে বিষয়ের মর্ম উপলব্ধি ও রস আহরণ করতে পারে। কবিতার ক্ষেত্রে কবিতার মর্মার্থ অনুধাবন করে কবিতার তাৎপর্য, রস ও কবির অনুভূতিকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। বিষয়ের বিভিন্ন তত্ত্ব ও তথ্য সম্পর্কে জানতে হলেও পাঠ্যপুস্তক প্রয়োজন। শিক্ষক কী শেখাবেন আর শিক্ষার্থীরাই বা কী শিখবে তা পাঠ্যপুস্তকই নির্ধারণ করে দেয়। মোটকথা শোনা, বলা, পড়া ও লেখা– এ চারটি ভাষাদক্ষতা যথাযথভাবে অর্জিত হয় পাঠ্যপুস্তক ব্যবহারের মাধ্যমে।

বর্তমান সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর লেখার কৌশল রপ্তকরণে পাঠ্যপুস্তকের কোনো বিকল্প নেই। পাঠ-পরিকল্পনাতেও তাই পাঠ্যপুস্তক ব্যবহারের ওপর অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীর ভাষাদক্ষতা উন্নয়ন, শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধি, মানসিক উৎকর্ষসাধন, মৌলিক চিন্তার উৎসারণ, বিশ্লেষণী ক্ষমতা বৃদ্ধি, কল্পনাশক্তির প্রসার ও সর্বোপরি পাঠের বিষয়বস্তু যথার্থভাবে উপলব্ধির জন্যে পাঠ-পরিকল্পনায় উল্লিখিত উপায়ে পাঠ্যপুস্তক ব্যবহারের সুফল সুবিদিত।

পাঠ-পরিকল্পনায় পাঠ্যপুস্তকের সফল ব্যবহার

শিক্ষককে পাঠ্যপুস্তকের অনুচ্ছেদ বা বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতা বজায় রেখে পাঠ-পরিকল্পনাটি করতে হয়। তাই তিনি পাঠ-পরিকল্পনা প্রণয়নের পূর্বে পাঠ্যপুস্তকের নির্ধারিত বিয়য়বস্তু বা পাঠটি ভালো করে পড়বেন। এরপর পাঠটিকে ৪৫ বা ৫০ মিনিটের ক্লাসে পড়ানোর উপযোগী একাধিক খণ্ডে ভাগ করবেন। খণ্ড ভাগ করার সময় পাঠের বর্ণনা বা ঘটনাপ্রবাহ বিবেচনায় রাখতে হবে। যেমন– অষ্টম শ্রেণিতে পাঠ্য কামরুল হাসানের 'আমাদের লোকশিল্প' প্রবন্ধটির দুটি পাঠ-পরিকল্পনা করতে গেলে প্রথম পাঠটি পাঠ্যপুস্তকের প্রথম অনুচ্ছেদ থেকে পঞ্চম অনুচ্ছেদ পর্যন্ত (খাদ্যশস্যের পরেই বাংলাদেশ....ঐতিহ্য অনুযায়ী হয়) আর দ্বিতীয়টি হতে পারে ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ থেকে (বাংলাদেশে গ্রামে গ্রামে....সাহায্য করতে পারে) শেষ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত। কারণ এখানে প্রথম পাঁচটি অনুচ্ছেদে একটি বক্তব্যবিষয়ের পূর্ণতা এসেছে।

শিক্ষক পাঠের ভাববস্তু, বিভিন্ন তথ্য ও বিষয়বস্তুর সুস্পষ্টরূপ উপস্থাপনে পাঠ-পরিকল্পনায় পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার করবেন। উপকরণ নির্বাচনে বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্য রাখার জন্যে নির্দিষ্ট পাঠটি মনোযোগ দিয়ে পড়বেন। পাঠ-পরিকল্পনার বিভিন্ন ধাপের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার করবেন।

শিখন-শেখানো কার্যক্রমে পাঠের শিখনফল অর্জনের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশলের ব্যবহার অপরিহার্য। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নির্বাচিত পাঠ্যাংশটির বোধগম্যতা অর্জন করাতে কোন পদ্ধতি ও কৌশলের ব্যবহার কখন, কীভাবে করবেন- সেবিষয়ক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তকের বর্ণিত বিষয়বস্তুর স্বরূপই তাঁকে সঠিক পথ দেখায়। পাঠের শিখনফল নির্বাচন থেকে শুরু করে মূল্যায়ন ও বাড়ির কাজ নির্ধারণ পর্যন্ত সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তকই হচ্ছে শিক্ষকের প্রকৃত পথপ্রদর্শক।

পাঠ-পরিকল্পনায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার

উপাত্ত বা ডাটার (Data) সাথে সুনির্দিষ্টতা বা প্রেক্ষাপট যুক্ত হলেই উপাত্তটি হয়ে যায় তথ্য। অর্থাৎ উপাত্ত আর প্রেক্ষাপট সংশ্লিষ্ট হয়ে যে নতুন মাত্রা আসে তা-ই তথ্য বা ইনফরমেশান (Information)। উপাত্তের সাথে কোনো ঘটনা, প্রেক্ষাপট বা পরিস্থিতির সম্পর্ক থাকে। এই সম্পর্ক উপাত্তকে বুঝতে ও ব্যবহার করতে সহায়তা করে। উপাত্তের এই নতুন রূপায়ণই হচ্ছে তথ্য।

যোগাযোগ হচ্ছে সংযোগ (Communication) আর প্রযুক্তি হচ্ছে যোগাযোগের একটি মাধ্যম। বিজ্ঞানের এই যুগে আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে আছে নানা প্রযুক্তি। তাই বিভিন্ন তথ্য আদান-প্রদানের জন্য আমরা কোনো না কোনো প্রযুক্তি ব্যবহার করে থাকি। এই তথ্য আদান-প্রদানের জন্য আমরা যে প্রযুক্তি ব্যবহার করি তা-ই তথ্যপ্রযুক্তি। বিভিন্ন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মধ্যে যে প্রযুক্তিটি মানুষকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করছে সেটি হচ্ছে ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স। বলা যায়, পৃথিবী এর মাধ্যমে একেবারে হাতের মুঠোয় চলে এসেছে। মানুষ হাতের লেখা চিঠি উপেক্ষা করে এখন সেকেন্ডের মধ্যেই পাঠাচ্ছে ই-মেইল। পৃথিবীর যে কোনো স্থানেই থাকুক না কেনো মুহূর্তেই ভিডিও ক্যামেরার সাহায্যে দেখতে পারছে আপনজনকে। ব্রডব্যান্ড, বিভিন্ন মডেম, ওয়াইফাই ইত্যাদি ইন্টারনেট কানেকশানের মাধ্যমে মানুষ যোগাযোগ করতে পারছে যখন খুশি তখন। পুরো পৃথিবীটাই যেন একটা বৃহৎ গ্রাম। সেটা বোঝানোর জন্য নতুন একটা শব্দ আবিষ্কার হয়েছে যা গ্লোবাল ভিলেজ (Global Village) বা বৈশ্বিক গ্রাম নামে পরিচিত। পাশাপাশি না থেকেও কার্যত (Virtually) আমরা সবাই পাশাপাশি, যেন এক আত্মিক সম্পর্ক। এটি সম্ভব হয়েছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির জন্যেই। বলা যায়, তথ্য দেওয়া নেওয়া, বাঁচিয়ে রাখা বা সংরক্ষণ করা, আবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা, বিশ্লেষণ করা এবং নিজের কাজে ব্যবহার করার প্রযুক্তিই হচ্ছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি।

বর্তমান সময় তথ্য ও প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীল। শিক্ষার সার্বিক গুণগত মানোন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার আজ সময়ের দাবি। মানুষের জীবনধারণের পদ্ধতিকে বদলে দিয়ে জীবনকে সহজ ও আনন্দময় করেছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি। এটি শিক্ষাক্ষেত্রেও যোগ করেছে এক নতুন মাত্রা। শিখন-শেখানো কার্যক্রমকে করে তুলেছে সহজ, আনন্দদায়ক ও অধিকতর কার্যকর। শ্রেণিকক্ষে পঠিতব্য বিষয়ের পঠনপরিকল্পনায় ও পরিকল্পনার ফলপ্রসূ বাস্তবায়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার শিক্ষককে যেমন সহায়তা করছে তেমনি শিক্ষার্থীর কাছে বিমূর্ত বিষয়টি মূর্তকরণ ও আনন্দদায়ক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে কার্যকর শিখন নিশ্চিত করছে ।

শ্রেণিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সফল ব্যবহার

শ্রেণিকক্ষে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হলে শিক্ষকের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সফল ব্যবহারে শ্রেণি পাঠটি হয়ে ওঠে বৈচিত্র্যময়, আকর্ষণীয়, অধিক গ্রহণযোগ্য এবং ফলপ্রসূ। প্রযুক্তি শিখন শেখানো প্রক্রিয়ায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে এবং শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়ক হয়।

শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রমের মূল চালিকাশক্তি হচ্ছেন শিক্ষক। তাই শিক্ষককে নির্বাচিত প্রযুক্তি সফলভাবে ব্যবহার করতে হবে। পাঠ-পরিকল্পনায় শিক্ষক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার এমনভাবে করবেন যেন প্রযুক্তি শিক্ষকের বিকল্প না হয়ে হয় পরিপূরক।

পাঠের শিখনফল অর্জনে শ্রেণিতে প্রযুক্তির ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রযুক্তি একটি ইলেকট্রনিক উপকরণ। এর সফল ব্যবহারের মাধ্যমে পাঠদান প্রক্রিয়া সহজরূপ লাভ করেছে। ল্যাপটপ, ডেস্কটপ, ভিডিও ক্যামেরা, ক্যামেরা, মোবাইল, অডিও সাউন্ড সিস্টেম, স্পিকার ইত্যাদি প্রযুক্তি ব্যবহার করে শিক্ষক শ্রেণি পাঠদান কার্যক্রমটি সম্পাদন করতে পারেন। শিক্ষক বিষয়সংশ্লিষ্ট অডিও মোবাইলে শুনিয়ে বা প্রজেক্টরে ভিডিও দেখিয়ে পাঠটি শুরু করতে পারেন। যেমন-ভাষা অন্দোলন বিষয়ক পাঠে 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' অথবা ভাষা আন্দোলন বিষয়ক অন্য কোনো গান বা স্থিরচিত্র প্রদর্শন করে পাঠটি শুরু করা যেতে পারে। পাঠের বিষয়বস্তু উপস্থাপনেও প্রয়োজনে ভিডিও দেখানো যায়।

শিক্ষক বাংলা গদ্য বা কবিতা পাঠদানের ক্ষেত্রে লেখক/কবির বিভিন্ন তথ্য সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা লাভ করানোর জন্যে ডিজিটাল কন্টেন্ট ব্যবহার করতে পারেন। পাওয়ার পয়েন্ট প্রোগ্রামে স্মার্ট আর্ট বা এনিমেশনের সাহায্যে লেখক/কবির বিভিন্ন তথ্য কার্যকরভাবে তুলে ধরতে পারেন। প্রয়োজনে ভিডিও প্রদর্শন করেও কবির জীবন ও শিল্প সম্পর্কে ধারণা দিতে পারেন।

শ্রেণিতে পাঠ বিশ্লেষণে বিষয়টি অধিক মূর্ত করার ক্ষেত্রে শিক্ষক চিত্র বা ভিডিও ব্যবহার করবেন। যেমন পাঠের বিষয়বস্তু মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গল্প বা কবিতা হলে মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন ভিডিও, স্থিরচিত্র প্রদর্শন করে পাঠটি ব্যাখ্যা করবেন। এতে তৎকালীন অবস্থা সম্পর্কে শিক্ষার্থীর ধারণা স্পষ্ট ও দীর্ঘস্থায়ী হবে। শিক্ষার্থীর কাছে পাঠটিও আকর্ষণীয় ও গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠবে।

শিক্ষক মোবাইল ব্যবহার করেও নির্দিষ্ট কবিতাটির আবৃত্তি বা পাঠ শুনাবেন। প্রয়োজনে আবৃত্তিটির ভিডিও দেখাবেন। এতে শিক্ষার্থীর উচ্চারণ-দুর্বলতা কাটবে ও কবিতাটির মূল বক্তব্য সহজেই অনুধাবন করতে পারবে। অর্থাৎ বিমূর্ত বিষয়গুলো শিক্ষার্থীর কাছে মূর্ত হয়ে উঠবে। শিক্ষক পাঠের বিষয়বস্তুর অজানা শব্দগুলো অর্থসহ প্রজেক্টরের সাহায্যে চিত্রে প্রদর্শন করবেন। ছবিসহ দেখলে শিক্ষার্থীরা অজানা শব্দগুলো সহজেই চিনতে এবং মনে রাখতে পারবে। ফলে শিখন দীর্ঘস্থায়ী হবে।

I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand. (Lao Tsu, Chinese Philosopher, 6th century B.C)- চাইনিজ দার্শনিকের এই উক্তিটি কার্যকর করে তোলা সম্ভব শ্রেণিতে ডিজিটাল কন্টেন্ট ব্যবহারের মাধ্যমে। শিক্ষক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সাহায্যে ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরি করে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করলে বিমূর্ত বিষয়গুলো শিক্ষার্থীর কাছে মূর্ত হয়ে উঠবে। শিক্ষার্থী দেখবে, মনে রাখবে এবং একক কাজ/জোড়ায় কাজ/দলীয় কাজের মাধ্যমে পাঠের বিষয়বস্তু অনুধাবনে সক্ষম হবে। এতে শিখন সহজ ও দীর্ঘস্থায়ী হবে। শিক্ষার্থীরা পাঠের শিখনফল অর্জনে সক্ষম হবে।

শিক্ষক মাঝে মাঝে শিক্ষার্থীদের ধারাবাহিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন ছবি/ভিডিও দেখিয়ে কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে পারেন এবং তাদের মেধা মূল্যায়নের মাধ্যমে অগ্রগতিও যাচাই করতে পারেন। এ লক্ষ্যে শ্রেণি পাঠের মূল্যায়নেও শিক্ষক বিভিন্ন প্রশ্ন/চিত্র/ভিডিও দেখিয়ে শিক্ষার্থীর পাঠের অগ্রগতি যাচাই করবেন। অগ্রগতি সন্তোষজনক না হলে ডিজিটাল কন্টেন্টটি পরের দিন আরও কার্যকর করে তৈরি করবেন। তিনি বাড়ির কাজ প্রদানেও প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারেন। পাওয়ার পয়েন্টের স্লাইডে ভিডিও দেখিয়ে বা চিত্র প্রদর্শন করে বা প্রশ্নমালা তৈরি করে শিক্ষার্থীদের বাড়ির কাজ দেওয়া যেতে পারে।

মোটকথা, শিক্ষক পাঠ-পরিকল্পনা করার সময় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ রেখে এমনভাবে পাঠ-পরিকল্পনাটি করবেন যেন শ্রেণিতে শিখনফল অর্জন সম্ভব হয়। কারণ পাঠ-পরিকল্পনা ও পাঠদান প্রক্রিয়ায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সফল ব্যবহার শিক্ষার অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখে এবং শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে সহায়ক হয়।

৬.৪ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য মূল্যায়ন কৌশল

মূল্যায়নের ইংরেজি প্রতিশব্দ Evaluation. ব্যাপক অর্থে Evaluation is the act of planing value of something. মূল্যায়ন শব্দের সাধারণ অর্থ মূল্য আরোপ বা মূল্য বিচার। কোনো গুণ বা বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় বা তাদের অর্থপূর্ণ মূল্যমান নির্ধারণ পদ্ধতি হলো মূল্যায়ন। মূল্যায়ন বলতে বোঝায় শিক্ষার্থীর কৃতিত্বের গুণগত ও পরিমাণগত মাত্রা নিরূপণ। শিক্ষাবিশেষজ্ঞগণ মূল্যায়নকে বিভিন্নরূপে সংজ্ঞায়িত করেন-

Gronland & Limn-এর মতে, শিক্ষা উদ্দেশ্যের কতটুকু শিক্ষার্থীরা অর্জন করতে পেরেছে তা নির্ণয়ের সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার ধারাবাহিক প্রক্রিয়া হলো মূল্যায়ন। R.N.Patel বলেন- যে ধারাবাহিক অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পূর্বে শনাক্তকৃত ও বর্ণিত শিক্ষার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলো কতটুকু অর্জিত হয়েছে, শ্রেণিকক্ষে প্রদত্ত শিখন অভিজ্ঞতা বা পাঠদান কতটুকু কার্যকর হয়েছে এবং শিক্ষার লক্ষ্য কত উত্তমভাবে অর্জিত হয়েছে তা নির্ণয় করার পন্থাকেই মূল্যায়ন বলে। শিক্ষা মনোবিজ্ঞানীদের মতে- Evaluation is the systematic process of determining the extent to which educational objectives are achieved by the learners. অর্থাৎ মূল্যায়ন বলতে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীরা শিক্ষার লক্ষ্যের পথে কতটুকু অগ্রসর হয়েছে তাকে বোঝায়। অধ্যাপক মনোরো মূল্যায়ন সম্পর্কে একটি ধারণা প্রদান করেন। তিনি বলেন, মূল্যায়ন দ্বারা কোনো ব্যক্তির/শিক্ষার্থীর শুধু বিষয়বস্তুর ওজনের পরিমাপ বোঝায় না, শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের ক্রমবিকাশ এবং শিক্ষার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী পরিমাণে অর্জিত হয়েছে সে পরিমাপও বোঝায়। শিক্ষার্থী মূল্যায়ন দুই ধরনের-

১. ধারাবাহিক মূল্যায়ন/গঠনকালীন মূল্যায়ন (Formative Assessment)
২. চূড়ান্ত মূল্যায়ন/সামষ্টিক মূল্যায়ন (Summative Assessment)

ধারাবাহিক বা গঠনকালীন মূল্যায়ন

পাঠ চলাকালীন শিক্ষার্থীর অগ্রগতি যাচাই করে প্রয়োজনীয় নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য যে মূল্যায়ন তাই ধারাবাহিক মূল্যায়ন। পাঠ চলাকালীন শ্রেণিকক্ষে এই মূল্যায়ন হয়ে থাকে এবং চূড়ান্ত মূল্যায়নের পূর্ব পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে এই মূল্যায়ন চলতে থাকে। এই মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সবলতা ও দুর্বলতা চিহ্নিত করে ফিডব্যাক প্রদানের মাধ্যমে তাদের চূড়ান্ত মূল্যায়নের জন্যে উপযুক্ত করে গঠন করা হয়। এ মূল্যায়নের উদ্দেশ্য হলো ভবিষ্যৎ শিখনকে আরো বেশি কার্যকর করা। এ ধরনের মূল্যায়নকে শিখনের জন্য মূল্যায়ন বা Assessment for Learning বলা হয়। এ মূল্যায়ন শ্রেণিকক্ষে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক হতে পারে।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন বা সামষ্টিক মূল্যায়ন

নির্দিষ্ট সময় বা পর্যায় সমাপ্তিতে শিক্ষার্থীর অগ্রগতি যাচাই করা হলো চূড়ান্ত মূল্যায়ন বা সামষ্টিক মূল্যায়ন। এ মূল্যায়ন দ্বারা শিক্ষার্থীদের পাস বা ফেল নির্ধারণ করা হয়ে থাকে এবং তাদের সাফল্যের তুলনামূলক অবস্থা নির্ণয় করে গ্রেড বা সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। এ মূল্যায়ন শেষে শিক্ষার্থীদের ভুল-ত্রুটি সংশোধন করে শিখন সহায়তা দেওয়ার কোনো সুযোগ থাকে না। তাই এ মূল্যায়নকে শিখনের মূল্যায়ন বা Assessment of Learning বলা হয়।

ভাষা শেখায় মূল্যায়ন একটি ধারাবাহিক ও অবিরত প্রক্রিয়া। ধারাবাহিক ও চূড়ান্ত উভয় প্রকার মূল্যায়নই ভাষা শেখায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং শিখন অগ্রগতি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে। তাই সামষ্টিকভাবে বলা যায়, মূল্যায়ন-

- শিক্ষার্থীর গঠনকালীন অগ্রগতি যাচাই করে,
- নির্দিষ্ট সময় শেষে শিক্ষার্থীর অগ্রগতি যাচাই করে,
- গঠনকালে প্রয়োজনীয় নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়ক,
- সবল ও দুর্বল শিক্ষার্থী চিহ্নিতকরণে সহায়ক,
- শিক্ষকের মানসম্মত পাঠদান নিশ্চিতকরণে কার্যকর,
- পরবর্তী ধাপের জন্য পথপ্রদর্শক,
- শিখনফল অর্জনের উপায়,
- মেধার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের গ্রেড নির্ধারণের উপায়।

মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা

ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার ক্ষেত্রে মূল্যায়নের প্রয়োজন আছে। কতকগুলো নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে ভাষা ও সাহিত্য শেখানো হয়। সেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ কতটুকু অর্জিত হয়েছে তা পরিমাপ করা হয় মূল্যায়নের মাধ্যমে। ভাষা ব্যবহারে দক্ষতা অর্জন, সাহিত্যের রসানুভূতির আস্বাদন, বিষয়বস্তুর ভাব উপলব্ধিতে সক্ষমতা অর্জন, শিক্ষার্থীদের চিন্তন, মনন, লিখন, কথন ইত্যাদি বিষয়ে উন্নতি সাধনই হচ্ছে ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য। শিক্ষার্থীর ভাষাজ্ঞান ও সাহিত্য চেতনার উৎকর্ষ সাধন মূল্যায়ন দ্বারাই সম্ভব। শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি, সফলতা ও ব্যর্থতা যাচাই করা হয় মূল্যায়নের দ্বারা। এটি একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে ভাষার বিভিন্ন দিক ও দক্ষতাগুলো শিক্ষার্থীরা কতটুকু অর্জন করেছে- তা নির্ণয় করা যায়। কোনো শিক্ষণীয় বিষয়ে শিক্ষার্থীর অগ্রগতি, সাফল্য ও দুর্বলতা জেনে তা প্রতিবিধান বা নিরাময়ের জন্য তাকে পরামর্শ প্রদান করা মূল্যায়নের উদ্দেশ্য। এছাড়া-

- মূল্যায়নের মাধ্যমে বিভিন্ন শিক্ষার্থীর বিশেষ ধরনের সামর্থ্য ও দক্ষতা আবিষ্কার করা যায় এবং কোন ধরনের শিক্ষা বা কাজ তার জন্যে উপযোগী তা নির্ধারণ করা যায়।
- মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর আগ্রহ, প্রবণতা, ইচ্ছা, রুচি, চিন্তাধারা, অভ্যাস ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত হয়ে প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক দেওয়া সম্ভব।
- শ্রেণি অনুযায়ী শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির উপযোগিতা যাচাই করে ভবিষৎ কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা যায়।
- উপযুক্ত মূল্যযাচাই পদ্ধতির সাহায্যে শিক্ষার্থীর মানসিক শক্তির পরিমাপ করা যায় এবং বেশি উপযোগী শিক্ষা সম্পর্কে তাকে নির্দেশনা দেওয়া সম্ভব হয়।
- শিক্ষার্থী সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে মূল্যায়ন সহায়তা করে।
- শিক্ষার্থীর দৈহিক, মানসিক, আবেগিক ও ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যগুলো পরিমাপ করা যায় মূল্যায়নের মাধ্যমে।
- মূল্যায়ন কোনো বিষয়ের তুলনামূলক ব্যাখ্যা করে।
- কোনো সমস্যার বিজ্ঞানসম্মত সমাধান দেয় মূল্যায়ন।

ভাষা শিক্ষায় মূল্যায়ন কৌশল

শিক্ষার্থীর অগ্রগতি যাচাই করার জন্যে শ্রেণিকক্ষে মূল্যায়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একজন শিক্ষার্থীর উপযুক্ত ভাষাজ্ঞান তৈরিতে মূল্যায়নের বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করা হয়। ভাষা শিক্ষায় মূল্যায়নের মৌখিক ও লিখিত এ দুই ধরনের কৌশল অবলম্বন করা হয়। মৌখিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে উপস্থাপনা, আবৃত্তি, গল্পবলা, বক্তৃতা, বিতর্ক, বর্ণনা, অভিনয়, আলোচনা, আদর্শ পাঠ ইত্যাদি আয়োজনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মৌখিক ভাষাদক্ষতা মূল্যায়ন করা হয়। এ ক্ষেত্রে শিক্ষককে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখতে হয়-

- শুদ্ধ উচ্চারণ ও গতিভঙ্গি রক্ষা করে নির্বাচিত পাঠ্যাংশ পাঠ
- পাঠ্যাংশের শব্দ ও বাক্যের সঠিক উচ্চারণ ও অর্থ অনুধাবন
- পাঠে কণ্ঠস্বরের বৈচিত্র্য এবং স্বরতরঙ্গ বজায় রাখা
- পাঠ্যাংশের বক্তব্য অনুধাবন
- অধিক পাঠের জন্যে আগ্রহ ও উৎসাহ প্রদান
- পঠনকালে উচ্চারণ ও স্বরভঙ্গির সামঞ্জস্য বিধান।

লিখিত মূল্যায়নের ক্ষেত্রে রচনামূলক প্রশ্নোত্তর, সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন, বিভিন্ন ধরনের নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। ধারাবাহিক লিখিত মূল্যায়নে শ্রেণির কাজ, বাড়ির কাজ, শ্রেণি অভীক্ষা ইত্যাদির মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হয়। ভাষাশিক্ষার মূল্যায়নে বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করে শিক্ষার্থীর দুর্বলতা চিহ্নিত করে নির্দেশনা দেওয়া যায় এবং প্রয়োজনে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

সাময়িক পরীক্ষা ও পাবলিক পরীক্ষা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ এর নির্দেশনা অনুসারে প্রতি শিক্ষাবর্ষকে দুটি সাময়িকে ভাগ করা হয়। সাময়িক এবং পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন এবং উত্তরপত্র মূল্যায়ন সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতির নির্দেশনা অনুসারে হয়। শিক্ষাক্রমে প্রদত্ত অধ্যায়সমূহকে বিদ্যালয়ের মোট কার্যদিবসের উপর ভিত্তি করে দুটি সাময়িকের জন্য ভাগ করে নেওয়া হয়। সাধারণত প্রথম সাময়িকে মূল্যায়নকৃত অধ্যায়সমূহকে দ্বিতীয় সাময়িকে মূল্যায়নের জন্যে ব্যবহার করা হয় না। সাময়িক শেষে অনুষ্ঠেয় পরীক্ষা শিক্ষাক্রমে বর্ণিত বিষয় এবং পত্রের জন্যে বরাদ্দকৃত পূর্ণ নম্বরে হয়ে থাকে।

ধারাবাহিক মূল্যায়ন ও শ্রেণির কাজ

শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষার্থী কর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কাজ শ্রেণির কাজ হিসেবে বিবেচিত। বিষয়বস্তুভেদে শ্রেণির কাজের ধরনে তারতম্য থাকতে পারে। যেমন– প্রশ্নের উত্তর বলা বা লেখা, চিত্র আঁকা, আলোচনা ও বিতর্কে অংশগ্রহণ, চরিত্রাভিনয় ইত্যাদি। ভাষার দক্ষতাসমূহ (শোনা, বলা, পড়া, লেখা) অর্জনের মাত্রা নিরূপণের জন্য শ্রেণির কাজ কার্যকর ভূমিকা রাখে।

বাড়ির কাজ

শিক্ষার্থী বাড়িতে শিক্ষাক্রমভিত্তিক যে কাজগুলো সম্পন্ন করে তাই বাড়ির কাজ। বাড়ির কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর চিন্তন দক্ষতা এবং ব্যক্তিক আচরণ ও মূল্যবোধ মূল্যায়ন করা যায়। এক্ষেত্রে শিক্ষক নিশ্চিত হবেন যে, শিক্ষার্থী কাজটি একাই করেছে। বাড়ির কাজ মূল্যায়ন করে প্রয়োজনে শিক্ষক শিখন সহায়তা দেবেন। শিক্ষাক্রমের শিখনফলের উপর ভিত্তি করে বাড়ির কাজ দেবেন। বাড়ির কাজটি এমন হবে যেন শিক্ষার্থীর চিন্তন দক্ষতার বিকাশ এবং সৃজনশীলতা প্রকাশের সুযোগ থাকে। এবং শ্রেণিকক্ষে অর্জিত ধারণাসমূহ চিন্তা ও কাজে প্রয়োগ করার সুযোগ থাকে। বাড়ির কাজের পরিসর এমন হবে যা শিক্ষার্থী ৩০–৩৫ মিনিটের মধ্যে সম্পাদন করতে পারে।

শ্রেণি অভীক্ষা

প্রতিটি অধ্যায় শেষে শ্রেণি অভীক্ষা নেওয়া হবে। শ্রেণি অভীক্ষা লিখিত বা ব্যবহারিক হবে। শ্রেণি অভীক্ষা একটি পিরিয়ডের অতিরিক্ত সময় ধরে নেওয়া যাবে না। শ্রেণি অভীক্ষার দিন শ্রেণির অন্যান্য পিরিয়ডের স্বাভাবিক কাজকর্ম যথারীতি চলবে।

ভাষার শোনা দক্ষতার মূল্যায়ন

মূল্যায়ন শিক্ষাব্যবস্থার এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। শোনা দক্ষতার উপর ভাষা বিকাশের অন্য দক্ষতাগুলো নির্ভরশীল। শোনা একটি গ্রাহী দক্ষতা (Receptive Skill)। অর্থাৎ শোনা গ্রহণধর্মী। বক্তার কণ্ঠস্বর, উচ্চারণ, স্বর প্রক্ষেপণ সর্বোপরি বক্তব্য বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা এক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ফলে শোনা দক্ষতা বিচারে সরবে পড়া বিশেষ বিবেচনা লাভ করে। শোনার প্রধান ক্ষেত্র বা দিকগুলো হচ্ছে- গল্প শুনে অনুধাবন, কথোপকথন (দুই বা ততোধিক ব্যক্তির পারস্পরিক কথোপকথন), বর্ণনা (ছবি বা বাস্তব দৃশ্য, বস্তু ইত্যাদি দেখে), সংলাপ (নির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক), শ্রুতলিপি ইত্যাদি। শোনা দক্ষতা মূল্যায়নে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের আলোচনা ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে অংশগ্রহণ করাবেন। এছাড়া শিক্ষার্থী প্রশ্ন শুনে প্রশ্নের সঠিক উত্তর প্রদান করতে পারছে কি না, শিক্ষকের সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা শুনে অনুধাবন করতে পারেছে কি না এবং শুনে সঠিক বানানে লিখতে (শ্রুতলিপি) পারছে কি না তার ভিত্তিতে নম্বর প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষক শোনা দক্ষতা বিকাশের অগ্রগতি ও পারদর্শিতা মূল্যায়ন করবেন।

বলা দক্ষতার মূল্যায়ন

বলার প্রধান ক্ষেত্রগুলো শোনার সঙ্গে একান্তভাবে সম্পৃক্ত হলেও সৌজন্য প্রকাশ, অভিনয়, বক্তৃতা, বির্তক, ঘোষণা ও নির্দেশনা, আবৃত্তি ইত্যাদি বলার ক্ষেত্র হিসেবে বিশেষ বিবেচনা লাভ করে। বলা দক্ষতা অর্জন করানো ও অর্জনের মাত্রা নিরূপণের জন্য শিক্ষক নিম্নবর্ণিত দিকসমূহে গুরুত্ব দিবেন।

- বলা দক্ষতা মূল্যায়নে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের স্বাধীনভাবে বলার সুযোগ করে দেবেন। জোড়ায় কথা বলতে দেবেন। সবাই কথা বলছে কি না, গল্প করছে কি না শিক্ষক তা লক্ষ করবেন । শিক্ষার্থী নিজের কথা, গল্পকথা একজন অন্য জনকে বলবে ও শুনবে। স্বাধীনভাবে বলার ক্ষমতা কে কতটা অর্জন করছে শিক্ষক সেটা পর্যবেক্ষণ করবেন।

- যে কোনো ছড়া/কবিতা পড়তে দিয়ে উচ্চারণ শুদ্ধ হচ্ছে কি-না লক্ষ করবেন।
- শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের আদর্শ পাঠ শিক্ষার্থীরা অনুসরণ করতে পারছে কি না এবং সরব পাঠে তার প্রতিফলন হচ্ছে কি না শিক্ষক তা যাচাই করবেন।
- শিক্ষার্থীদের আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্বে মানভাষা ব্যবহৃত হচ্ছে কি-না শিক্ষক তা খেয়াল করবেন।
- শ্রেণিকক্ষে আবৃত্তি, বিতর্ক ও উপস্থিত বক্তৃতার ব্যবস্থা করে শিক্ষক বলার দক্ষতা যাচাই করবেন।
- শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত বিষয়ে আলোচনা, আলোচনায় বলার ধরন বা স্টাইলে পরিচ্ছন্ন ও অর্থপূর্ণ বাক্য প্রয়োগ হচ্ছে কি না শিক্ষক তা যাচাই করবেন।
- গল্প শুনে ও বক্তৃতা শুনে উত্তর প্রদান করতে পারছে কি-না তা লক্ষ করবেন।

পড়া দক্ষতার মূল্যায়ন

ভাষার চারটি মৌলিক দক্ষতার মধ্যে পড়া অন্যতম। কোনো পাঠ্য বিষয় সম্পর্কে ধারণা লাভে পঠন গুরুত্বপূর্ণ। পঠন বলতে বোঝায় কোনো লেখা দেখে তা পড়তে পারা, বলতে পারা, বুঝতে পারা ও চিহ্নিত করতে পারা। প্রমিত বা বিশুদ্ধ উচ্চারণ, স্বাভাবিক স্বরতরঙ্গ, অর্থবোধ, বিষয়বস্তু অনুধাবন প্রভৃতি পঠনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। পড়া বা পঠন দক্ষতা মূল্যায়নের বিশেষ দিকসমূহ নিম্নরূপ-

- শব্দের সঠিক ব্যবহার করে সরবে পড়া। যেমন ঘোষণা, বিজ্ঞপ্তি, নির্দেশনা, আবৃত্তি ইত্যাদি।
- সাহিত্য পাঠে যুক্তি/কারণ ব্যাখ্যা, প্রাসঙ্গিকতা বিচার ও উপসংহারে উপনীত হওয়া।
- শব্দার্থ, শব্দের ব্যবহার ও বাক্য গঠনে সাধারণ অর্থ, বিশেষ অর্থ, প্রায়োগিক অর্থ, সার্থকতা, বাক্যের দৈর্ঘ্য, প্রকার ও প্রসঙ্গ বিচার।
- অভীক্ষার ব্যবহারে বহুনির্বাচনী, সৃজনশীল, রচনামূলক, সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক, ব্যাখ্যামূলক, বিবৃতিমূলক ও বিশ্লেষণমূলক প্রশ্নের প্রয়োগ এবং তুল্যতা বিচার।
- মূলভাব/সারাংশ উপস্থাপন।

শিক্ষার্থী একটি বিষয় পড়ে বিষয়টি সম্পর্কে নিজের ভাষায় বলতে পারে কি না তার মাধ্যমে তার পড়া দক্ষতা যাচাই করা যায় এবং পড়া দক্ষতা অর্জনে উন্নয়নমূলক পদক্ষেপও নেওয়া যায়। তাই ভাষাকলার এই পঠন দক্ষতা উৎকর্ষ সাধনে মূল্যায়ন গুরুত্বপূর্ণ ।

লেখা দক্ষতার মূল্যায়ন

ভাষা শেখার শেষ এবং গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতাটি হচ্ছে লেখা। লেখা দক্ষতা মূল্যায়নের মূল বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে অক্ষরের গঠন, শব্দের দূরত্ব, পঠনযোগ্যতা, গতিময়তা, নির্ভুলতা, শব্দচয়ন, বাক্যগঠন, বানান ইত্যাদি। বিভিন্নভাবে লেখা দক্ষতা যাচাই করা যায়। যেমন-

- অনুচ্ছেদ লিখতে দিয়ে শিক্ষার্থীর শব্দ ব্যবহারের সঠিকতা বিচার করে,
- রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর লিখতে দিয়ে যতিচিহ্নের ব্যবহার দেখে,
- পঠিত অংশের সারাংশ লিখতে দিয়ে বানান, উপমা, অলংকার, বাগধারার যথার্থ প্রয়োগ ও চলিত ভাষারীতি ব্যবহারের রূপ দেখে,
- শ্রুতলিপি লিখতে দিয়ে ও লেখার ও নির্ভুলতার মাত্রা দেখে।

শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের ফলাফল থেকে ফিডব্যাক পেয়ে তার দুর্বলতার প্রতিবিধান করা সম্ভব হয়। তাই বাংলা ভাষায় দক্ষতা অর্জনে মূল্যায়ন বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. শিখনফল কী ?
২. শিখনফল লেখার নিয়মাবলি উল্লেখ করুন।
৩. শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনায় শিক্ষক কেন পাঠ-পরিকল্পনা করবেন?
৪. শ্রেণিকক্ষে পাঠ্যপুস্তকের ব্যবহার আবশ্যক কেন?
৫. শিক্ষা ব্যবস্থায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রয়োজন কেন?
৬. মূল্যায়ন কী? মূল্যায়ন কত প্রকার ও কী কী?
৭. ভাষা শেখায় মূল্যায়ন প্রয়োজন কেন?
৮. ভাষাদক্ষতা মূল্যায়নে কী কী কৌশল অবলম্বন করা হয়?
৯. শোনা দক্ষতা মূল্যায়নে শিক্ষক কোন কোন দিকের উপর গুরুত্ব দেবেন?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. পাঠ-পরিকল্পনা প্রণয়নে একজন শিক্ষক কী কী বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখবেন ?
২. বাংলা বিষয়ের একটি নমুনা পাঠ-পরিকল্পনা প্রণয়ন করুন।
৩. 'বিমূর্ত বিষয়কে মূর্ত করার কাজটি করে থাকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি'- উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ করুন।

ইউনিট ৭ : শ্রেণিকক্ষ পরিচালনা ও শিক্ষকের আত্মোন্নয়ন

শ্রেণি কার্যক্রমকে সঠিক ও কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্যে শিক্ষকের শ্রেণিকক্ষ পরিচালনা ও আত্মোন্নয়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিদ্যালয়ের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজন শ্রেণিকক্ষ। শিক্ষা গবেষকগণের মতে, শিক্ষা ব্যবস্থায় ইতিবাচক পরিবর্তন প্রতিফলনের একমাত্র স্থান হচ্ছে শ্রেণিকক্ষ। অর্থাৎ শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের জন্যে শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার সকল কর্মসূচি বাস্তবায়নের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে শ্রেণিকক্ষ। শ্রেণিকক্ষের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা শিক্ষককে আত্মোন্নয়নে উদ্বুদ্ধ করে ও অধিক শিক্ষার্থী সংবলিত বাংলা শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনায় সহায়তা করে। বিদ্যালয়ে কোনো শিক্ষার্থী সঙ্গতি সাধনে বা পাঠ কার্যক্রমে অংশগ্রহণে কঠিন সমস্যায় পড়লে শিক্ষক বিষয়ী অনুধ্যানের মাধ্যমে তাকে সহায়তা করতে পারেন। পাঠের অভ্যাসই শিক্ষার্থীকে জ্ঞানের প্রতি এবং ভাষার রূপ, সৌন্দর্য ও প্রয়োগরীতির বিষয়ে কৌতূহলী করে। শিক্ষাদানের অন্যতম উদ্দেশ্যই হলো পাঠে দক্ষতা ও পাঠের অভ্যাস গড়ে তোলা। শ্রেণিপাঠকে ঘিরে সুপাঠাভ্যাস গঠনের মাধ্যমে শিক্ষক নিজেকে সমৃদ্ধ করেন এবং শিক্ষার্থীর সুন্দর মনন গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করেন। তাই 'শ্রেণিকক্ষ পরিচালনা ও শিক্ষকের আত্মোন্নয়ন' শীর্ষক এই অধ্যায়টিতে নিম্নবর্ণিত বিষয়বস্তুসমূহ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

৭.১ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা

৭.২ অধিক শিক্ষার্থী সংবলিত বাংলা শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা

৭.৩ শিক্ষকের আত্মোন্নয়ন কৌশল : শ্রেণিকক্ষের অভিজ্ঞতা, বিষয়ী অনুধ্যান ও পাঠাভ্যাস

৭.১ : বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা

শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র হচ্ছেন শিক্ষক। কেননা, শ্রেণিতে শিখন-শেখানো কাজটির সুচারুসম্পাদনের মূল দায়িত্ব পালন করেন তিনি। এ ক্ষেত্রে মূলত শিক্ষককেন্দ্রিক বা শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক প্রক্রিয়ায় তিনি কাজটি সম্পাদন করে থাকেন। শিক্ষককেন্দ্রিক শিক্ষায় শিক্ষকের ভূমিকাই মুখ্য থাকে। আর শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীর ভূমিকাই প্রধান। অর্থাৎ শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণই প্রাধান্য পায়। শ্রেণিকক্ষে অর্থপূর্ণ শিখনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণকেই প্রধান বিবেচ্য মনে করা হয়। কারণ, শিক্ষার্থীরা সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে পাঠদানের বিষয়বস্তু সহজে অনুধাবন করতে পারে; বিষয়বস্তুর প্রতিটি অংশের সাথে সংযোগ স্থাপনে সক্ষম হয়; নির্ধারিত সময়ের সঠিক ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত হয়। অংশগ্রহণমূলক শিক্ষা শিক্ষার্থীর মত প্রকাশের অনুভূতিতে নাড়া দেয়। মুখস্থ করার প্রবণতা দূর করে অনুধাবন ও পরিস্থিতি বিশ্লেষণের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম করে তোলে। তবে পাঠের বিষয়বস্তু এবং শিক্ষার্থীর জানার আগ্রহ, আবেগ ও অনুভূতির সাথে গভীর যোগসূত্র সৃষ্টির লক্ষ্যে শিক্ষককেও অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় মনোযোগী হতে হবে।

শ্রেণিকক্ষ ও তার পরিবেশ

শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের ক্ষেত্রে শ্রেণিকক্ষের গুরুত্ব অপরিসীম। শ্রেণিকক্ষ ব্যতীত আনুষ্ঠানিক পাঠদান প্রক্রিয়া পরিচালনা অসম্ভব। শিক্ষাগবেষকদের মতে, শিক্ষা ব্যবস্থায় ইতিবাচক পরিবর্তন হলে তা প্রতিফলনের একমাত্র স্থান হচ্ছে শ্রেণিকক্ষ। অর্থাৎ শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের জন্যে শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার সকল সংস্কারকর্মসূচি বাস্তবায়নের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে শ্রেণিকক্ষ। শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণ নিয়ে তৈরি হয় শ্রেণিকক্ষের প্রতিবেশ (Ecology of Classroom)। ব্যাপক অর্থে- শিক্ষাব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ, শিক্ষানীতি, সম্পদ, প্রশাসন ও নেতৃত্ব, আইন ও সামাজিক মূল্যবোধ, কর্মসূচি ও পেশাগত উন্নয়ন, শিক্ষাক্রম ও মূল্যায়নসংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রম যেখানে সংগঠিত হয় তা-ই শ্রেণিকক্ষ।

শিক্ষাবিজ্ঞানী Cohen & Loton (1997)-এর মতে, একটি সফল শ্রেণিকক্ষ বিনির্মাণের অন্যতম বিবেচ্য হচ্ছে- শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক সম্পর্ক জ্ঞানভিত্তিক করা; সে আলোকে শিক্ষাক্রম ও প্রয়োজনীয় উপকরণ নিশ্চিত করা এবং শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। এ দিকগুলোর সফল বাস্তবায়নে প্রকৃতপক্ষে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ ও মিথস্ক্রিয়া সুষম হয় এবং পাঠের শিখনফল অর্জনও যথাযথ হয়।

শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ সুন্দর রাখার উপায়

শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ অংশগ্রহণমূলক এবং সুন্দর হওয়া শিক্ষক-শিক্ষার্থী উভয়ের উপর নির্ভর করে। বাংলা পাঠদানকে কার্যকর করে তুলতে হলে প্রয়োজনীয় উপাদানসমৃদ্ধ একটি উপযুক্ত শ্রেণিকক্ষের প্রয়োজন। আনুষ্ঠানিক পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনার জন্যে শ্রেণিকক্ষ এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যেন তা আকর্ষণীয় ও আনন্দদায়ক হয়। কারণ শিক্ষার্থীরা তাদের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান সময় ব্যয় করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, প্রকারান্তরে শ্রেণিকক্ষে। শ্রেণিকক্ষের যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনার দায়িত্বে থাকেন একজন শিক্ষক। তাই এর পরিবেশ পরিপাটি ও পরিচ্ছন্ন রাখতে শিক্ষক সহায়ক ভূমিকা রাখবেন। তবে পরিষ্কারকরণ কাজে শিক্ষক-শিক্ষার্থী উভয়েরই অংশগ্রহণ থাকবে। যথাযথ স্থানে শ্রেণির জিনিস গুছিয়ে রাখতে হবে। মেঝেতে কিছু ফেলে নোংরা করা যাবে না, দেয়াল অপরিচ্ছন্ন দেখায় এমন কিছু লেখা বা আঁকাআঁকি করা যাবে না। শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ দৃষ্টিনন্দন করতে বিভিন্ন নান্দনিক ছবি দেয়ালে লাগানো যেতে পারে। চকবোর্ড/হোয়াইট বোর্ড, টেবিল, বেঞ্চ ইত্যাদি সঠিকভাবে স্থাপিত হবে। বিভিন্ন কর্ণারে শিক্ষার্থীদের তৈরি মডেল, ছবি, চার্ট, মানচিত্র, বিভিন্ন জিনিসের নমুনা, ফুলদানি ইত্যাদি রাখা যেতে পারে। পোস্টার, বুলেটিন বোর্ডও থাকতে পারে। শ্রেণিকক্ষে বিভিন্ন সাহিত্যিকদের গুরুত্বপূর্ণ রচনা, জীবনীগ্রন্থ, অভিধান, পাঠ্যপুস্তক, সাহিত্য ম্যাগাজিন, সাহিত্য সাময়িকী সংবলিত একটি সেলফ থাকবে। শিক্ষার্থীরা পরিচ্ছন্ন ড্রেস পরে শ্রেণিকক্ষে আসবে। তাদের হাত, পা, দাঁত পরিষ্কার কি না শিক্ষক তা খেয়াল রাখবেন। ক্লাস শেষে শিক্ষক বোর্ড পরিষ্কার করবেন। তিনি সবসময় মনে রাখবেন, সুন্দর পরিবেশে শিখন-শেখানোর কাজটি সম্পাদিত হলে শিক্ষার্থীদের চিন্তা-চেতনাও সুন্দর হয় এবং তারা সুস্থ মানসিকতার নাগরিক হয়ে গড়ে ওঠে।

অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষ পরিকল্পনা

শ্রেণিকক্ষের অবস্থা, শিক্ষাদান প্রক্রিয়া, বিভিন্ন সুবিধাদি ও এর সামগ্রিক পরিবেশ ও পরিচালনা শিক্ষার্থীর মানসিক ও শারীরিক বিকাশের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। তাই একজন শিক্ষকের জন্যে শ্রেণিকক্ষের বিন্যাস, অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষ পরিকল্পনা এবং শ্রেণি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা থাকা অপরিহার্য। একজন শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বা যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের নিয়ে পাঠ পরিচালনার কাজটি করে থাকেন। যেমন–

- সাধারণ যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষার্থী
- বিশেষ সহায়তাপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী
- অসাধারণ যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষার্থী

শিক্ষার্থীরা শ্রেণিতে শিক্ষকের সহায়তায় তাদের পূর্বঅভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে সক্রিয়ভাবে শিখনকাজ সম্পন্ন করে। এ সময় তারা শিক্ষক, সতীর্থ, কম ও বেশিযোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষার্থী, সম ও অসম সংস্কৃতির শিক্ষার্থী, বিভিন্ন মেধা ও দক্ষতাসম্পন্ন শিক্ষার্থী, বিভিন্ন সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন শিক্ষার্থী তথা বিভিন্ন ধরনের বৈপরীত্যের মাঝে পাঠগ্রহণ প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত হয়ে শিখনফল অর্জনে সচেষ্ট হয়। তাই একজন শিক্ষককে অবশ্যই এ বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখে শ্রেণিকার্যক্রমের পরিকল্পনা করা আবশ্যক। এক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত দিকসমূহে সজাগ দৃষ্টি রাখা উচিত।

পাঠদানের প্রস্তুতিমূলক পরিকল্পনা : শ্রেণিকার্যক্রম শুরুর পূর্বেই শ্রেণিকক্ষের ভেতর ও বাইরে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই বিষয়টি খেয়াল রাখবেন। শ্রেণি শিক্ষকও ক্লাস শুরুর পর শিক্ষার্থীরা কাগজপত্র, ভাঙা কলম বা পেন্সিল, খাবার, পানি ইত্যাদি ফেলে যেন নোংরা না করে সে বিষয়টি খেয়াল রাখবেন। শিক্ষক প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার রাখার পরামর্শ দিবেন। আলো বাতাস চলাচলের জন্যে দরজা-জানালা খোলা রাখবেন। চকবোর্ড/হোয়াইট বোর্ড ঠিক জায়গায় আছে কিনা তা দেখবেন। চক, ডাস্টার ও হোয়াইট বোর্ড মার্কার যথাস্থানে রাখার ব্যবস্থা করবেন। পাঠের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ নির্দিষ্ট স্থানে গুছিয়ে রাখবেন। শিক্ষার্থীদের বসার ব্যবস্থা নিশ্চিত করবেন। শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণমূলক কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের বিষয়টি মাথায় রেখে শিক্ষার্থীদের আসন বিন্যাস করবেন।

শ্রেণিতে শিখন-বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির পরিকল্পনা : শিক্ষককে সবসময় প্রাণবন্ত ও হাসিখুশি থাকতে হয়। শিক্ষার্থীদের সমস্যা সহানুভূতির সাথে সমাধানের চেষ্টা করতে হয়। সকল শিক্ষার্থীর প্রতি সমভাবে স্নেহ, ভালোবাসা ও আন্তরিকতা দেখাতে হয়। শারীরিক ও মানসিক শাস্তি পরিহার করতে হয়। এসব দিক গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় রাখতেও শিক্ষক বিবিধ পূর্ব-পরিকল্পনা করবেন।

কার্যকর পাঠদানের পরিকল্পনা : শিক্ষক পাঠদান কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করবেন। শিক্ষাক্রম অনুযায়ী নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর ভিত্তি করে পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। পাঠ-পরিকল্পনায় ধারাবাহিকতা বজায় রাখবেন। শ্রেণি কার্যক্রমে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করবেন। শ্রেণিতে অন্যবিধ উপকরণের যথোপযুক্ত ব্যবহার করবেন। বিষয়বস্তুর উপর যথেষ্ট জ্ঞান রেখে পাঠদান করবেন। পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের প্রতি বিশেষ নজর রাখবেন এবং যত্নবান হবেন। আকর্ষণীয় পাঠদান পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহার করবেন। এসব দিকের আলোকে শিক্ষকের পরিকল্পনা দরকার। তাছাড়া পাঠের শুরুতে, পাঠ চলাকালে ও পাঠের সমাপ্তিতে শ্রেণিকক্ষের প্রচলিত কাজগুলোর সুচারু সম্পাদনের জন্যও শিক্ষকের পূর্ব-পরিকল্পনা দরকার।

১. **পাঠের শুরুতে :** শিক্ষক শ্রেণিতে প্রবেশ করে প্রথমেই কুশল বিনিময় করবেন। উপস্থিত শিক্ষার্থীর সংখ্যা গণনা করে বোর্ডের উপর দিকে ডানপাশে লিখবেন। শ্রেণিতে শিক্ষার্থীর আসন ব্যবস্থা ঠিক আছে কিনা তা দেখবেন। প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের আসন বিন্যাস করবেন। পাঠের উপকরণ যথাস্থানে রাখবেন। শিক্ষার্থীর জিনিসপত্র সঠিক জায়গায় রাখার ব্যবস্থা করবেন।

২. **পাঠ চলাকালীন :** শিক্ষক পাঠে শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষণের জন্যে বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করবেন। আকর্ষণীয় ও কার্যকর শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করে পাঠটি পরিচালনা করবেন। প্রশ্নোত্তর পর্বে শিক্ষার্থীদের সাড়া জাগাবেন। এমনভাবে প্রশ্ন করবেন যেনো শিক্ষার্থীরা প্রশ্নের উত্তর দিতে আগ্রহী হয়। বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কর্মতৎপর ও সক্রিয় রাখবেন। সর্বোপরি শ্রেণিতে শিখন-বান্ধব পরিবেশ বজায় রাখবেন।

৩. **পাঠ সমাপ্তিতে :** পাঠ কার্যক্রম সম্পাদন করে নির্দিষ্ট সময় শেষে বোর্ডটি পরিষ্কার করবেন। শিখন সামগ্রী গুছিয়ে রাখবেন। শিক্ষার্থীদের বিদায়ী শুভেচ্ছা জানিয়ে বা ধন্যবাদ দিয়ে শ্রেণিকক্ষ ত্যাগ করবেন।

উপর্যুক্ত তিনটি দিকের বিবেচনায় শিক্ষক পূর্বেই নিজস্ব পরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন। মনে রাখা আবশ্যক, এক্ষেত্রে শিক্ষক মাইক্রোটিচিং-এর কোন দক্ষতাটি কখন, কীভাবে ব্যবহার করবেন, করতে গিয়ে আনুষঙ্গিক বস্তুগত ও অবস্তুগত উপাদানের প্রাপ্যতা কীভাবে নিশ্চিত হবে- এসব বিষয়ের পূর্বপরিকল্পনার উপরই তার পাঠদানের সফলতা নির্ভর করে।

অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা

ব্যবস্থাপনা একটি প্রক্রিয়া যা কোনো কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। Geroge R.Terry-র মতে ব্যবস্থাপনা হচ্ছে একটি বিশেষ প্রক্রিয়া যাতে মানুষ অন্যান্য সম্পদসমূহ ব্যবহারের মাধ্যমে উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে তা অর্জনের জন্য পরিকল্পনা, সংগঠন, প্রবৃত্তকরণ, নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি সম্পাদন করা হয়।

শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর আলোকে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার জন্যে শিক্ষককে যেসব দিকের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয় সেগুলোর সামষ্টিক রূপই হচ্ছে শ্রেণি ব্যবস্থাপনা। অর্থাৎ শ্রেণিকক্ষে সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে শিখন-শেখানো কার্যক্রমকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্যে এবং শিক্ষার্থীর কাছে শিখনকে আকর্ষণীয়, আনন্দদায়ক, স্থায়ী ও ফলপ্রসূ করার জন্যে শিক্ষক যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তাই শ্রেণি ব্যবস্থাপনা। শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনার মূল লক্ষ্য হচ্ছে শিখনের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর স্বকীয়তার আলোকে কার্যকর ও দক্ষতার সাথে শিখন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা।

অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনার উপাদান

বিদ্যালয় পরিচালনায় শ্রেণি ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শ্রেণি ব্যবস্থাপনার সাফল্যের উপর শিক্ষাদানের সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করে। শ্রেণি ব্যবস্থাপনার প্রধান উপাদান দুটি-

- ভৌত ব্যবস্থাপনা
- মানবীয় ব্যবস্থাপনা

ভৌত ব্যবস্থাপনা : শ্রেণিকক্ষের অবকাঠামোগত অবস্থা, আসবাবপত্র ইত্যাদি ভৌত ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত। একটি শ্রেণিকক্ষ স্থাপনের শুরুতেই প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। শ্রেণিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী আসন ব্যবস্থা থাকতে হবে। চকবোর্ড, হোয়াইট বোর্ড এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যেন শ্রেণির সকল শিক্ষার্থী নিজ নিজ আসন থেকে পরিষ্কারভাবে বোর্ডের কাজ দেখতে পায়। প্রয়োজন অনুযায়ী চক, মার্কার ও ডাস্টারের ব্যবস্থা থাকতে হবে। শ্রেণিকক্ষের এ জাতীয় ভৌত ব্যবস্থাপনা শিক্ষার্থীদের পাঠ গ্রহণে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে।

মানবীয় ব্যবস্থাপনা : শিক্ষার্থীকে কেন্দ্র করেই শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন। তাই শিক্ষার্থীদের আসন ব্যবস্থা থেকে শুরু করে শিক্ষা কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণের প্রতিটি স্তরেই যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। মানবীয় ব্যবস্থাপনা যথাযথ শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া অনুশীলনের মাধ্যমে শ্রেণিশৃঙ্খলা বজায়ে সহায়তা করে। সুন্দর ও উপযোগী ভৌত পরিবেশের আবশ্যকতা অবশ্যই স্বীকার্য, তবে ফলপ্রসূ শিখন শিক্ষক ও শিক্ষার্থী এ দুটো মানবিক পক্ষের সক্রিয়তার উপর অধিকতর নির্ভরশীল।

অংশগ্রহণমূলক শ্রেণি ব্যবস্থাপনার বিবেচ্য বিষয়

শ্রেণিকক্ষের আয়তন ও শিক্ষার্থীর অনুপাত : বাংলা শ্রেণিকক্ষটি শিক্ষার্থীদের জন্যে অংশগ্রহণমূলক পাঠদানের উপযোগী করে করতে হবে। শিক্ষক তাই শ্রেণিকক্ষের আয়তন ও শিক্ষার্থীর অনুপাত যেন ঠিক থাকে সে বিষয়টি খেয়াল করবেন এবং প্রয়োজনে ব্যবস্থা নিবেন।

প্রয়োজনীয় আলো বাতাসের ব্যবস্থা : শিক্ষক শিখন বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে শ্রেণিতে প্রয়োজনীয় আলো বাতাসের ব্যবস্থা করবেন। জানালা বন্ধ থাকলে খুলে দিবেন, প্রয়োজনে ইলেকট্রিসিটির মাধ্যমে বৈদ্যুতিক আলো, বৈদ্যুতিক পাখার ব্যবস্থা বরবেন।

শ্রেণিকক্ষের আকার ও অবস্থান : শিক্ষার্থীর সংখ্যা বিবেচনায় শ্রেণিকক্ষের আকৃতি ছোট বড় হবে। শ্রেণিকক্ষ সাধারণত আয়তাকার হলে ভালো হয়। একটি শ্রেণিকক্ষের আওয়াজ অন্য শ্রেণিতে যেন না শোনা যায় এমনভাবে শ্রেণিকক্ষের মধ্যকার দেয়ালটি হবে। শ্রেণিকক্ষের অবস্থান হবে কোলাহলমুক্ত নিরিবিলি পরিবেশে। শিক্ষক শ্রেণিকক্ষের আকার ও অবস্থান অনুযায়ী শ্রেণিতে আসবাবপত্র স্থাপন করবেন।

শ্রেণি শৃঙ্খলা : শ্রেণিতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েই শৃঙ্খলা বজায় রাখবেন। আসন বিন্যাসে শিক্ষার্থীর আকৃতি অনুসারে ছোটদের সামনে ও বড়দের পেছনে বসাবেন। এছাড়া যাদের দূর থেকে দেখতে অসুবিধা হয় এবং কানে কম শোনে তাদের পেছনে না বসিয়ে সামনের দিকে বসাবেন। অংশগ্রহণমূলক পাঠদান বিবেচনায় রেখে শ্রেণিবিন্যাস করবেন। তাতে শ্রেণিশৃঙ্খলা বজায় থাকবে।

সময়ের সুষ্ঠু ব্যবহার : শ্রেণি ব্যবস্থাপনায় সময়ের সুষ্ঠু ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি পিরিয়ডের জন্য পঞ্চাশ মিনিট সময় শিক্ষক সঠিকভাবে ব্যবহার করবেন। শ্রেণিকার্যক্রমের প্রতিটি কাজে সময় নির্ধারণ করে দিবেন। শিক্ষক শ্রেণিকার্যক্রম নির্দিষ্ট সময়ে সম্পাদন করবেন ও নির্দিষ্ট সময় শেষে শ্রেণিকক্ষ ত্যাগ করবেন।

শিক্ষার্থীর আবেগ কার্যকরভাবে ব্যবহার : শিক্ষক শ্রেণিতে শিক্ষার্থীর অভিব্যক্তিকে গুরুত্ব দিবেন। সতীর্থদের সাথে মিথস্ক্রিয়া সৃষ্টিতে সহায়তা করবেন। শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক সুসম্পর্ক সৃষ্টির ক্ষেত্রে শিক্ষক পদক্ষেপ নিবেন। শিক্ষার্থীদের ইতিবাচক আবেগকে শ্রেণি কার্যক্রমে কাজে লাগাবেন। লিঙ্গ, ধর্ম, শারীরিক ও মানসিক সামর্থ্য ইত্যাদি নির্বিশেষে সকলের জন্য শিখন সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।

শিখন উপকরণ ব্যবহার : শিক্ষার্থীরা অনেক সময় পাঠে মনোনিবেশ করতে পারে না। তখন শিখন উপকরণ ব্যবহার করলে তারা কৌতূহলী হয় এবং পাঠে মনোযোগী হয়। তাছাড়া শিক্ষক বিষয়বস্তুটিকে সহজ, মূর্ত ও আকর্ষণীয় করার জন্যে বিভিন্ন শিখন সামগ্রী ব্যবহার করেন। শিখন সামগ্রী ব্যবহারে শ্রেণিশৃঙ্খলা বজায় থাকে।

শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে মানবিক দিকের সক্রিয়তা : শিক্ষক শ্রেণিকার্যক্রমে মানবিক হবেন। শিক্ষার্থীর প্রতি ক্ষিপ্ত বা ক্ষুব্ধ না হয়ে যথাসম্ভব সহানুভূতিশীল থাকবেন। শিক্ষার্থীর সমস্যা সমাধানে আন্তরিকতাপূর্ণ আচরণ করবেন। কোনোভাবেই শিক্ষার্থীকে অপদস্ত করবেন না। শারীরিক বা মানসিক শাস্তি দিবেন না। এতে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে মানবিক দিকের সক্রিয়তা বৃদ্ধি পাবে ও ইতিবাচক শিখন পরিবেশ তৈরি হবে।

শিক্ষার্থীদের শিখন প্রক্রিয়ায় আগ্রহী ও অর্থবহভাবে সম্পৃক্ত করা : শ্রেণি ব্যবস্থাপনার একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো শিখন প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীদের আগ্রহী করে তোলা এবং তাদের শ্রেণিকার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা। শ্রেণিতে বিভিন্ন কাজে যুক্ত থাকলে অনর্থক হৈচৈ বা গণ্ডগোল করার সুযোগ থাকবে না। শিক্ষকের শিখন শেখানো প্রক্রিয়া আকর্ষণীয় হলে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বাড়বে। তাই শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শিখন প্রক্রিয়ায় আগ্রহী ও অর্থবহভাবে সম্পৃক্ত করবেন।

অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনার কৌশল

শ্রেণিকক্ষ সাজানোর কৌশল : শিক্ষক বাংলা শ্রেণিকক্ষটি এমনভাবে সাজাবেন যেন শ্রেণিতে পর্যাপ্ত আলো বাতাস থাকে। তিনি শ্রেণিকক্ষের আয়তন অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের বসার উপযোগী আসন ব্যবস্থা করবেন। শিক্ষার্থীদের আসন ব্যবস্থার সামনের দেয়ালে চকবোর্ডটি স্থাপন করবেন। শ্রেণিকক্ষে আলোর অনুকূলে চকবোর্ডটি রাখবেন। চকবোর্ডের অবস্থান এমন জায়গায় হবে যেন পেছনের শিক্ষার্থীও বোর্ডের কাজ দেখতে পায়। শ্রেণিকক্ষের একপাশে উপকরণ গুছিয়ে রাখবেন। শ্রেণিকক্ষের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর রাখবেন। শ্রেণিতে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ বিরাজ করছে কি না এবং শিক্ষার্থীদের উপযোগী করে শ্রেণিকক্ষটি সাজানো হয়েছে কি না তা খেয়াল করবেন।

প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার কৌশল : শিক্ষক প্রতিদিন শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি রেকর্ড করবেন। ক্লাস শুরুর পূর্বে, চলাকালীন এবং পাঠের শেষে শিক্ষার্থীদের আচরণ পর্যবেক্ষণ করবেন। অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ নিয়ন্ত্রণ করবেন। একক, জোড়া ও দলগত কাজে শিক্ষার্থীদের সঠিক নির্দেশ দিবেন।

সহায়ক শিখন সামগ্রী ব্যবস্থাপনার কৌশল : শিক্ষক পাঠসংশ্লিষ্ট শিখন সামগ্রী প্রস্তুত করবেন। পাঠসংশ্লিষ্ট শিখন সামগ্রী সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ করবেন। শিখন সংক্রান্ত সকল সম্পদের ব্যবহার নিশ্চিত করবেন।

শিখন শেখানো ব্যবস্থাপনা কৌশল : শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে বসে না থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী চলাফেরা করে শিক্ষার্থীদের কাজকর্ম তদারক ও দেখাশোনা করবেন। শিক্ষার্থীদের পাঠ গ্রহণের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করবেন। শিক্ষক এমন জায়গায় অবস্থান করবেন যাতে শিক্ষার্থীর সকল কার্যক্রম দৃষ্টিগোচর হয়। শিক্ষক শুধু বক্তৃতা না দিয়ে শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের একক, জোড়ায় ও দলগত কাজের মাধ্যমে সক্রিয় রাখবেন ও শ্রেণিকক্ষে আনন্দদায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করবেন। পাঠ পরিচালনায় পাঠ উপযোগী পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করবেন। পাঠের প্রতি শিক্ষার্থীদের ভীতি দূর করে শিখনে আগ্রহ সৃষ্টি করবেন। সকল শিক্ষার্থীর প্রতি তিনি সমান মনোযোগ দিবেন। শ্রেণিকার্যক্রমের সকল কাজে শিক্ষার্থীদের সবসময় কর্মতৎপর রাখবেন। শিক্ষক শ্রেণিতে পাঠ-সংশ্লিষ্ট উপকরণ ব্যবহার করবেন। শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করার জন্যে প্রশ্নকরণে সঠিক কৌশল অনুসরণ করবেন। তার চকবোর্ড ব্যবহার অবশ্যই কার্যকর হবে। শিক্ষার্থীদের উৎসাহ দিয়ে, প্রেরণা দিয়ে পাঠকে সহজভাবে উপস্থাপন করে পাঠের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করে শিক্ষার্থীদের তিনি আত্মবিশ্বাসী করে তুলবেন।

সর্বোপরি, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষ পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনার জন্যে শিক্ষক তাঁর শ্রেণিতে শিক্ষার্থী সংখ্যাও গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবেন। কারণ বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে অধিক শিক্ষার্থী সংবলিত শ্রেণিকক্ষ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা যথাযথ হলে তবেই শ্রেণিতে পাঠদানের আধুনিক পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করা সহজ হবে। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের শিখন প্রক্রিয়াকে সফলভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিখনফল অর্জন করানো সম্ভব হবে।

৭.২ : অধিক শিক্ষার্থী সংবলিত বাংলা শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা

শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করার ক্ষেত্রে শিক্ষককে যে সকল দিকের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয় সেগুলোর সামষ্টিক রূপই হচ্ছে শ্রেণি ব্যবস্থাপনা। এছাড়াও শ্রেণিকক্ষের উপযুক্ততা, শিক্ষার্থীদের আসন ব্যবস্থা, শিক্ষকের অবস্থান, অংশগ্রহণমূলক পাঠদান পদ্ধতি অনুসরণ, শিক্ষার্থীদের কর্মতৎপর ও সক্রিয় রাখা, সুকৌশলে প্রশ্নকরণ, উপকরণ ব্যবহার, শ্রেণির কাজ পর্যবেক্ষণ, পাঠে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও মনোযোগ বৃদ্ধিতে প্রেষণা সৃষ্টি ইত্যাদি শ্রেণি ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত। বাংলা শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনায় শিক্ষকের ভূমিকা অপরিসীম। একজন শিক্ষক শ্রেণিতে ব্যবস্থাপক, সংগঠক, পরিচালক, সঞ্চালক, উদ্বুদ্ধকারী, পরামর্শদানকারী, স্বপ্নদ্রষ্টা সর্বোপরি 'রোলমডেল' হিসেবে ভূমিকা রাখেন। শ্রেণিকার্যক্রম পরিচালনায় অধিকসংখ্যক শিক্ষার্থী নিয়ে কাজ করা শিক্ষকের জন্যে একটি বড় চ্যালেঞ্জ। শ্রেণিকার্যক্রমে অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী থাকলে শিখনফল অর্জন করানো কষ্টসাধ্য। ফলে শিক্ষার গুণগত মান কাঙ্ক্ষিত সফলতায় পৌঁছানো অনেক সময় সম্ভব হয় না। সাধারণত ৪০ জনের বেশি শিক্ষার্থী হলেই সেই শ্রেণিকে একটি বৃহৎ শ্রেণি বা অধিক শিক্ষার্থী সংবলিত শ্রেণি বলা হয়। আমাদের দেশে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রতি শ্রেণিতে যদিও শিক্ষক-শিক্ষার্থী আদর্শ অনুপাত ১ : ৪০ কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই অনুপাত ১:৭০ বা তারও বেশি। ফলে শ্রেণিকক্ষের ভৌত সুযোগ-সুবিধা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না।

শিক্ষাদান প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত শ্রেণিকক্ষের বিভিন্ন উপাদান

'অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী' বিষয়টি শিক্ষাদান প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত শ্রেণিকক্ষের সকল উপাদানকেই কম বেশি প্রভাবিত করে। শিক্ষাদান প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত এ সকল উপাদান নিম্নরূপ-

- পাঠদান পদ্ধতি নির্বাচন
- শিক্ষার্থীদের পাঠে অংশগ্রহণ
- অংশগ্রহণমূলক শিখন
- নিয়মানুবর্তিতা
- শ্রেণি শৃঙ্খলা
- শিক্ষকের কণ্ঠস্বর
- শিক্ষকের নির্দেশনা
- উপকরণ ব্যবহার
- সময় ব্যবস্থাপনা
- বোর্ড ব্যবহার
- শিক্ষকের আচরণ
- শিক্ষার্থীর মানসিক অবস্থা
- শিক্ষার্থী মূল্যায়ন

শ্রেণিতে অধিক শিক্ষার্থীর প্রভাব

শ্রেণিতে অধিক শিক্ষার্থী থাকলে পাঠদানের বিভিন্ন পদ্ধতি নির্বাচন করা ও প্রয়োগ করতে অসুবিধা হয়। শিক্ষক তাই সৃষ্টিশীল চিন্তা না করেই সহজ উপায় হিসেবে বক্তৃতা পদ্ধতি বেছে নেন। এতে শিক্ষককে উচ্চস্বরে কথা বলতে হয়, ফলে ক্লান্তি আসে। শিক্ষকের পরিবেশিত বিভিন্ন তথ্য পেছনে বসা শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারে না। তারা পাঠ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ফলে পাঠে সকলের অংশগ্রহণ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। দলগত কাজে সমস্যা দেখা দেয়, অংশগ্রহণমূলক শিখনে জটিলতার সৃষ্টি হয়। শ্রেণিতে নিয়মানুবর্তিতা অনুসরণ করা যায় না। শ্রেণি শৃঙ্খলা বজায় থাকে না এবং নির্দিষ্ট সময়ে পাঠও শেষ করা যায় না। শিক্ষকের নির্দেশনাও অনেক সময় বোঝা যায় না। আর উপকরণের আকার ছোট হলে পেছনের শিক্ষার্থীদের দেখতে সমস্যা হয়। বোর্ডে শিক্ষককে অনেক বড় করে লিখতে হয়। সেক্ষেত্রে বোর্ডটি যদি ছোট হয় তাহলে আরো সমস্যার সৃষ্টি হয়। অধিক শিক্ষার্থীর ক্লাসে শিক্ষক সবার প্রতি সমান দৃষ্টি দিতে পারেন না বলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাঠ গ্রহণের প্রেষণাও জাগে না। শিক্ষার্থীরা অল্প সময়েই ক্লান্তিবোধ করে এবং পাঠে অমনোযোগী হয়ে পড়ে। শিক্ষার্থীর ইচ্ছা ও আবেগকেও শিক্ষক গুরুত্ব দিতে পারেন না। এমনকি শিক্ষার্থীর অর্জন যাচাইয়েও সমস্যা হয়।

অধিক শিক্ষার্থী সংবলিত বাংলা শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনার বাধা

শ্রেণিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা অধিক হলে পাঠদান কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা ব্যাহত হয়ে থাকে। অধিক শিক্ষার্থী সংবলিত বাংলা শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনায় সাধারণত নিম্নরূপ সমস্যা দেখা যায়।

- ছোট আকৃতির উপকরণ, চার্ট, মডেল শ্রেণিকক্ষে ব্যবহার করা যায় না।
- শ্রেণিকক্ষে কোলাহলপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি হয় এবং শ্রেণিশৃঙ্খলা বজায় রাখা সম্ভব হয় না।
- পাঠে সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে।
- পিছনে বসা শিক্ষার্থীরা ঠিকমতো শুনতে পায় না; ফলে অমনোযোগী হয়ে পড়ে।
- শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীর প্রতি সমান নজর দিতে পারেন না।
- শ্রেণিকক্ষের নিয়মানুবর্তিতা ঠিকমতো অনুসরণ করা যায় না।
- দলীয়ভাবে কোনো কাজ করতে দেওয়া যায় না।

অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত বাংলা শ্রেণিকক্ষের বাধাসমূহ উত্তরণের উপায়

অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনার প্রধান বাধা। তবে বিশেষ কৌশল অবলম্বনে এই বাধাসমূহ দূর করা যেতে পারে। যেমন-

- এককভাবে ও জোড়ায় অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করা- যেমন ব্রেইনস্টর্মিং, মাইন্ড ম্যাপিং, ভিজ্যুয়ালাইজেশন, সম্মতি-অসম্মতি, কেইস স্টাডি, অনুক্রমে সাজানো, তুলনাকরণ, সুবিধা-অসুবিধা নিরূপণ, তালিকা প্রস্তুতকরণ ও ব্লাকবোর্ডে সার-সংক্ষেপ প্রস্তুতকরণ প্রভৃতি।
- দলগত কাজ দেবার ক্ষেত্রে প্রতি দুই সারির পর ফাঁকা জায়গা রাখা এবং ঐ দুই সারির শিক্ষার্থীদের মুখোমুখি বসানো। এতে শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাছে যাবার সুযোগ পাবেন এবং শ্রেণির কাজ পর্যবেক্ষণ সুবিধাজনক হবে।
- শ্রেণিতে দীর্ঘ বক্তৃতা না রেখে মাঝে মাঝে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা রাখা যেতে পারে। শিক্ষার্থীদের প্রতিটি কাজ প্রদানের পূর্বে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতার মাধ্যমে ঐ কাজের মূলকথা তুলে ধরা যেতে পারে এবং পাশাপাশি প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া যেতে পারে।
- একটি নির্দিষ্ট পাঠের যেসকল উদ্দেশ্য শ্রেণিতে পুরোপুরি অর্জিত হয় নি বলে মনে হয়- সে উদ্দেশ্যসমূহের ভিত্তিতে নির্দেশিত পাঠ (শ্রেণির বাইরের কাজ) নির্বাচন করে দেওয়া যেতে পারে।

অধিকসংখ্যক শিক্ষার্থী সংবলিত শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনার কৌশলসমূহ

অধিকসংখ্যক শিক্ষার্থী সংবলিত শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনায় শিক্ষককে বিভিন্ন সমস্যা মোকাবিলা করতে হয়। শিক্ষক ধৈর্য সহকারে কিছু কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষের সুষ্ঠুব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে পারেন। অধিকসংখ্যক শিক্ষার্থী সংবলিত শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনায় একজন শিক্ষক নিম্নলিখিত কৌশলসমূহ অবলম্বন করে শ্রেণিকার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

- ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরি করে শ্রেণিকার্যক্রম পরিচালনা করা
- পরিবর্তন না করেও জোড়ায় ও দলে কাজ করানো যায়- এমন আসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
- স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট করে কাজের নির্দেশনা প্রদান করা।
- দুই বেঞ্চের শিক্ষার্থীদের মুখোমুখি বসিয়ে দল গঠন করা।
- সবসময়েই দৃষ্টিকে পুরো শ্রেণিতে বিন্যস্ত রাখা।
- শ্রেণিতে একটানা দীর্ঘ বক্তৃতার পরিবর্তে মাঝে মাঝে দুই বা তিন মিনিটের সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দেওয়া।
- দলগত কাজের উপস্থাপনায় পর্যায়ক্রমে সকল শিক্ষার্থীকে সুযোগ দেওয়া।
- বোর্ডে/পোস্টার পেপারে বড় করে লেখা।
- গ্রাউণ্ডরোল সুনির্দিষ্ট করে পোস্টার পেপারে লিখে শ্রেণিকক্ষের চারপাশে টাঙিয়ে রাখা।
- পাঠসংশ্লিষ্ট ভিডিও,অডিও প্রদর্শন করা।
- বোর্ডে বিভিন্ন রঙের চক ব্যবহার করে লেখা।

অধিক শিক্ষার্থীর ক্লাসে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবস্থাপনা

শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিখনের ক্ষেত্রে একজন বাংলা শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে সুকৌশলে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি ও কৌশলসমূহ ব্যবহার করতে পারেন। উল্লেখ্য, অধিক শিক্ষার্থীর ক্লাসেও এ কৌশলসমূহ ব্যবহার করা যেতে পারে।

১. সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা	• সর্বোচ্চ ১০ মিনিটের বক্তৃতা প্রদান • শিক্ষার্থীদের সাড়া আহ্বান অথবা জোড়ায়/ছোট দলে আলোচনা করতে বলা।
২. ব্রেইন স্টর্মিং	• পাঠের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে তুলে ধরা/পাঠের উপ-শিরোনামসমূহ উল্লেখ করা। • গভীর চিন্তাশ্রয়ী এমন সমস্যা উত্থাপন করা, যার উত্তর/সমাধান পাঠ্যপুস্তকে সরাসরি নেই • শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমস্যার সমাধান করতে বলা। • তাদের উল্লিখিত সকল তথ্য গ্রহণ করা ও বোর্ডে লেখা।
৩. তালিকা প্রস্তুতকরণ	• পাঠ সংশিষ্ট ৮/১০টি উদাহরণের/তথ্যের তালিকা তৈরি করতে বলা। • উদাহরণগুলো এক এক করে উল্লেখ করতে বলা (দ্বিরুক্ত না করে) • বোর্ডে একটি সমন্বিত তালিকা প্রস্তুত করা।
৪. মাইন্ড ম্যাপিং	• মাইন্ড ম্যাপিং-এর শিরোনাম অবহিত করা। • একক/জোড়ায়/দলগতভাবে চিন্তা করতে বলা। • পৃষ্ঠার মাঝখানে শিরোনামের মূলকথাটি লিখে তার চারপাশে এ সম্পর্কিত উপ ধারণাগুলো সম্পর্ক বজায় রেখে সুবিন্যস্ত আকারে লেখা।
৫. ভিজ্যুয়ালাইজেশন	• চোখ বন্ধ করতে বলা। • ক্লান্ত, ধীর-স্থিরভাবে শিক্ষার্থীদের সমস্যাসংশ্লিষ্ট কিছু দৃশ্য স্মরণ/কল্পনা করতে বলা। • পরিমিত বাচনভঙ্গিতে/মোলায়েম স্বরে কিছু অতিরিক্ত অনুপ্রেরণা যোগানো। • প্রতিটি ধারণা গঠনের জন্য অল্প কিছু সময় বরাদ্দ করা এবং পরে অন্য বিষয়ে যাওয়া। • এভাবে শিক্ষার্থীরা তৈরি হয়ে গেলে তাদের চোখ খুলতে বলা। • সঙ্গীর সাথে ধারণা সম্পর্কে মতবিনিময় করতে বলা।
৬. ওয়াকিং ওয়াল	• পাঠের শিরোনামের উপর ৬/৭টি প্রশ্ন পোস্টারে লিখে কক্ষের চার পাশের দেওয়ালে সেঁটে দেওয়া। • শিক্ষার্থীদের দলে/জোড়ায় এক প্রশ্ন থেকে আরেক প্রশ্নের কাছে গিয়ে আলোচনা করে পোস্টারের নির্ধারিত স্থানে তথ্য লিখতে বলা।
৭. কেস স্টাডি	• পাঠ সংশিষ্ট ৩/৪টি 'গল্পকথা' Case Studies (যা মানবীয় দিক সম্পৃক্ত) উপস্থাপন। (যেমন- অধিক শিক্ষার্থীদের শ্রেণিতে পাঠদানে সমস্যাগ্রস্ত একজন শিক্ষক, বাংলা শিক্ষাদানের সমস্যা, পদ্ধতি ইত্যাদি) • শিক্ষার্থীদের গল্পটি পড়তে বলা। • দলে আলোচনা করে সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করতে বলা।
৮. সমস্যা সমাধান	• শিক্ষার্থীদের সামনে একটি সমস্যা তুলে ধরা। • এ পরিপ্রেক্ষিতে সমাধানের লক্ষ্যে তারা কী করতে পারে- তা আলোচনা করে বের করতে বলা।

৯. অনুক্রমে সাজানো	• শিক্ষণ সম্পর্কিত কোনো তথ্য, প্রক্রিয়া অথবা পরীক্ষণের ধাপসমূহ তালিকাবদ্ধ করা। • ধাপগুলো এলোমেলোভাবে শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপন করা। • দলে/জোড়ায় চিন্তা করে প্রক্রিয়াটিকে অনুক্রমে সাজাতে বলা।
১০. গুরুত্বের অনুক্রমে সাজানো	• পাঠের বিভিন্ন দিক সমন্বিত করে তথ্যের একটি তালিকা (এলোমেলো) উপস্থাপন করা। • শিক্ষার্থীদের জোড়ায় চিন্তা করে তালিকার তথ্য গুরুত্বের অনুক্রমে সাজাতে বলা। • অন্য জোড়ার তৈরিকৃত তালিকার সাথে মিলাতে বলা।
১১. তুলনামূলক বৈষম্য অনুসন্ধান	• যে কোনো একটি শিক্ষাদান পদ্ধতির/বিষয়ের দু'টি পরস্পর বিরোধী উদাহরণ (একটি ভালো, একটি মন্দ; যেমন সুশৃঙ্খল/বিশৃঙ্খলভাবে ব্লাকবোর্ড পরিকল্পনা) শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করা। • শিক্ষার্থীদের জোড়ায় চিন্তা করে উদাহরণ দুটোর তুলনা করে বৈষম্যসমূহ/পার্থক্যগুলো চিহ্নিত করতে বলা। একাজে তারা তাদের বক্তব্যের পক্ষে পছন্দের কারণ ব্যাখ্যা করে পার্থক্য চিহ্নিত করবে।
১২. সুবিধা অসুবিধা	• একটি শিক্ষাদান পদ্ধতি/কৌশলের সুবিধা বা অসুবিধাসমূহ শিক্ষার্থীদের জোড়ায় বা দলে আলোচনা করতে বলা। • তারা সুবিধাসমূহের একটি তালিকা এবং অসুবিধাসমূহের একটি তালিকা তৈরি করে ক্লাসে উপস্থাপনের মাধ্যমে ফলাবর্তন দিবে।
১৩. সত্য-মিথ্যা	• বিষয় সংশ্লিষ্ট কিছু সংখ্যক বিবৃতি শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করা। • বিবৃতিগুলো সত্য না-কি মিথ্যা তা শিক্ষার্থীদের দলে/জোড়ায় চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নিতে বলা।
১৪. ত্রুটি শনাক্তকরণ	• ভুল তথ্য সন্নিবেশনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাছে কোনো অনুচ্ছেদ অথবা কোনো প্রদর্শনী অথবা কোনো উপস্থাপনা তুলে ধরা। • শিক্ষার্থীদের ত্রুটিগুলো সনাক্ত করতে এবং সংশোধনের প্রয়োজনীয় সুপারিশ করতে বলা।
১৫. শ্রেণীকরণ	• শিক্ষার্থীদের কাছে এলোমেলোভাবে মিশ্রিত একগুচ্ছ তথ্য উপস্থাপন করা। • জোড়ায়/দলে চিন্তা করে এগুলোকে শ্রেণীকরণ করতে বলা।
১৬. ওয়ার্ডসফ্লাশ	• পাঠের ৮/১০ টি মূল শব্দ চিহ্নিত করে বোর্ডের বাম পাশে নিচে নিচে লেখা। • শব্দগুলো দিয়ে শিক্ষার্থীদের পাঠের বিষয়বস্তু অনুযায়ী বাক্য তৈরি করতে দেওয়া।
১৭. ব্লাকবোর্ডে সার-সংক্ষেপ প্রস্তুত	• একটি নির্দিষ্ট কার্যক্রমে/সমস্যায় (activity) নিজের মতো করে উত্তর/সমাধানগুলো বিবেচনা করতে বলা। • এই উত্তরগুলো কীভাবে বোর্ডে সংগৃহিত হবে তার পরিকল্পনা করা। • উত্তরগুলো লিখিত হলে বোর্ডটি কীরকম দেখাবে তারও একটি পরিকল্পনা মাথায় রাখা। • শ্রেণিতে দলের কাছ থেকে উত্তরগুলো গ্রহণ করা ও পরিকল্পনা অনুসারে বোর্ডে লেখা।

.

৭.৩ : বাংলা শিক্ষকের আত্মোন্নয়ন কৌশল : শ্রেণিকক্ষের অভিজ্ঞতা, বিষয়ী অনুধ্যান ও পাঠাভ্যাস গঠন

শিক্ষাদান প্রক্রিয়ায় একজন শিক্ষকের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কার্যকর পাঠদানের জন্যে প্রয়োজন শিক্ষকের পেশাগত দক্ষতা ও আন্তরিকতাপূর্ণ মনোভাব। শিক্ষকের পেশাগত দক্ষতার সাথে শিক্ষার কার্যকর উন্নয়ন ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। উন্নত পেশাগত দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী আদর্শ শিক্ষক নিজের দক্ষতা দিয়ে শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশে সাহায্য করতে পারেন। তাই শিক্ষকের আত্মোন্নয়ন বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পেশাগত জীবনে প্রয়োজনীয় বিষয়জ্ঞান, দক্ষতা ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয় ঘটিয়ে শিক্ষক তাঁর দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হন এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তাঁর বিষয়জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং শিক্ষাদান কৌশল প্রয়োগ করেন। এভাবেই তিনি যোগ্য শিক্ষক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। শিক্ষকের পাঠের প্রতি অনুরাগ, জ্ঞান জগতের নতুন ধারণা লাভের প্রতি আসক্তি, 'শিক্ষার্থীর শিখন' প্রক্রিয়ার প্রতি অনুসন্ধানী দৃষ্টি ও শ্রেণিকক্ষের বিভিন্ন অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোর মধ্য দিয়েই একজন শিক্ষক তাঁর পেশাগত দক্ষতার উন্নয়ন ঘটাতে পারেন।

আত্মোন্নয়নে শ্রেণিকক্ষের অভিজ্ঞতা

কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শ্রেণিকার্যক্রম পরিচালনার জন্য উপযুক্ত শ্রেণিকক্ষ থাকা আবশ্যক। শিক্ষাবিদগণের মতে- শ্রেণিকক্ষের অবস্থা, শিক্ষাদান প্রক্রিয়া, বিভিন্ন সুবিধাদি ও এর সামগ্রিক পরিবেশ ও পরিচালনা শিক্ষার্থীর শারীরিক ও মানসিক বিকাশের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। একই শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর বুদ্ধি, আবেগ ও সামাজিক অবস্থা একরকম নয়। একজন অভিজ্ঞ শিক্ষককে শিক্ষার্থী সম্পর্কিত এ বিষয়টি মনে রেখেই শিক্ষাদান পদ্ধতি নির্বাচন করতে হবে। শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন যোগ্যতা ও ধারণক্ষমতা বিচার বিশ্লেষণ করেই উপযুক্ত শিখন পদ্ধতির ব্যবহার এবং প্রয়োজনে পরিবর্তন করতে হবে। শিক্ষককে তাই শ্রেণিকক্ষের অভিজ্ঞতাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

একজন শিক্ষক সাধারণত শ্রেণিকক্ষে বিভিন্নমুখী অবস্থার সম্মুখীন হন। সেগুলোই তাঁর শ্রেণিকক্ষের অভিজ্ঞতা। শ্রেণিকক্ষের অভিজ্ঞতা দু'ধরনের হতে পারে। ইতিবাচক ও নেতিবাচক। পাঠদান প্রক্রিয়া সম্পাদনে একজন শিক্ষককে কখনো অনুকূল পরিবেশ সহায়তা করে আবার অনেক সময় প্রতিকূল পরিস্থিতি কাজে বিঘ্ন ঘটায়। এই দুই ধরনের অভিজ্ঞতাই শিক্ষককে পরবর্তীতে নতুন ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের পথনির্দেশ করে। শ্রেণিকক্ষের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষক আত্মপ্রতিফলনের মাধ্যমে নিজের উন্নয়ন ঘটাতে পারেন। শিক্ষকের উপস্থাপন প্রক্রিয়ায় দুর্বলতা থাকলে শিক্ষক তা চিহ্নিত করতে পারেন। এবং পরবর্তীতে সঠিকভাবে উপস্থাপনের মাধ্যমে নিজের উন্নয়ন ঘটাতে পারেন। শ্রেণি পাঠদানে পদ্ধতি ও কৌশল নির্বাচন এবং প্রয়োগে কোনো সমস্যা পরিলক্ষিত হলে শিক্ষক তা চিহ্নিত করে রাখতে পারেন। শ্রেণিকার্যক্রম পরিচালনায় কোন পাঠের জন্যে, কোন পরিবেশে, কোন পদ্ধতি ও কৌশল উপযোগী তা শ্রেণিকক্ষের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই তিনি নির্ধারণ করতে পারেন। পাঠদানের যে সকল আধুনিক পদ্ধতি ও কৌশল রয়েছে, সেগুলো সম্পর্কে ধারণা নিয়ে শিক্ষক আত্ম-উন্নয়ন সাধন করতে পারেন। শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারে দক্ষতার অভাবে পাঠের উদ্দেশ্য অর্জন ব্যাহত হলে তা থেকে শিক্ষা নিয়ে শিক্ষক উপকরণ ব্যবহারের সঠিক কৌশল রপ্ত করেও নিজের পেশাগত উন্নয়ন ঘটাতে পারেন ।

শ্রেণি পাঠদান প্রক্রিয়া সম্পাদনের পর মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর অগ্রগতি যাচাই করা হয়। পাঠ-পরিকল্পনায় উল্লিখিত শিখনফল অর্জনে আশানুরূপ সাফল্য পরিলক্ষিত না হলে শিক্ষক আত্মপ্রতিফলনের মাধ্যমে মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায়ও পরিবর্তন আনতে পারেন; মূল্যায়নের সঙ্গে পাঠদান প্রক্রিয়ার সামঞ্জস্য বিধানের মাধ্যমে আত্মোন্নয়ন ঘটাতে পারেন। মোটকথা, শ্রেণিকক্ষকে কেন্দ্র করেই যেহেতু পাঠদান কার্যক্রম পরিচালিত হয়, তাই শ্রেণিকক্ষের এসকল ইতিবাচক ও নেতিবাচক অভিজ্ঞতা থেকে একজন শিক্ষক শ্রেণিপাঠদানের অংশগ্রহণমূলক, আনন্দদায়ক ও শিখনফল অর্জন উপযোগী কার্যকর পরিবেশ তৈরি করতে পারেন। তবে এক্ষেত্রে শিক্ষকের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতাই মূল বিবেচ্য।

আত্মোন্নয়নে বিষয়ী অনুধ্যান (Case study)

কোনো ব্যক্তি বা বিশেষ দল বা কোনো প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে এক বা একাধিক বিষয়ে গভীরভাবে অনুসন্ধান করে তা বিশ্লেষণপূর্বক সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণকে বিষয়ী অনুধ্যান বা Case study বলা হয়। অর্থাৎ কোনো সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি বা বিষয়ী সম্পর্কে গভীর ও বিশ্লেষণধর্মী সমীক্ষা পরিচালনা করাই বিষয়ী অনুধ্যান। ড. অরুণ ঘোষের মতে- 'ব্যক্তির জীবনের টুকরো টুকরো ঘটনার বিবরণ বিভিন্ন স্থান থেকে সংগ্রহ ও তার ক্রমবিকাশের মোটামুটি ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার পদ্ধতিকেই বিষয়ী অনুধ্যান বলে।' অধ্যাপক সুশীল রায় বলেন- 'জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতি হতে ব্যক্তি সম্পর্কে সকল তথ্য সংগ্রহ করে ব্যক্তিজীবনের যে একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্রায়ন করা হয় তাকেই বিষয়ী অনুধ্যান বলে।'

Frederica Leply (1806–1882) পারিবারিক বাজেট সম্পর্কে জানতে গিয়ে সর্বপ্রথম সামাজিক বিজ্ঞানে বিষয়ী অনুধ্যানমূলক গবেষণা প্রয়োগ করেন। পরবর্তীতে সামাজিক সমস্যার উন্মেষ ও বিকাশ জানার জন্যে সামাজিক বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান ও আচরণ বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর ব্যবহার বিস্তার লাভ করে। বর্তমানে বিষয়ী অনুধ্যান শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যাষ্টিক বিশ্লেষণ (Micro Analysis) হিসেবে পরিচিত। Thomas Znanieck-এর বিষয়ী অনুধ্যান বিষয়ক বিখ্যাত গবেষণা 'The polish peasant in Europe and America'শিক্ষা সংক্রান্ত গবেষণার একটি মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

বিষয়ী অনুধ্যান শিক্ষা গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হিসেবে বিবেচিত। এটি গুণগত বিশ্লেষণের জনপ্রিয় পদ্ধতি। শিক্ষার বিভিন্ন বিভাগ যেমন– সমাজকর্ম, সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, পৌরনীতি, লোক প্রশাসন, অর্থনীতি, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা এবং শিক্ষার মৌলিক বিষয়সমূহের ব্যবহারে বিষয়ী অনুধ্যান উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। শিক্ষক মূলত কাজ করেন শিক্ষার্থীদের নিয়ে। শিক্ষার্থীদের যেকোনো সমস্যা একজন শিক্ষক নিজের বলেই ভাবেন। এই ভাবনা থেকেই তিনি ব্যাপৃত হন শিক্ষার্থীর পাঠসংশ্লিষ্ট সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করতে। দক্ষতার সাথে এই কাজটি করার মাধ্যমে প্রকারান্তরে একজন শিক্ষক প্রকৃত পক্ষে আত্মোন্নয়নই ঘটিয়ে থাকেন।

বিষয়ী অনুধ্যানের জন্য ব্যক্তির অতীত ক্রমবিকাশের ইতিহাস বা ব্যক্তি সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন। সংগৃহীত তথ্যের বিশ্লেষণ, সমস্যার প্রকৃতি ও সমাধান নির্ধারণ এবং ফলাফল অর্জন পর্যন্ত বিষয়ী অনুধ্যানের এই কাজ চলে। এক্ষেত্রে ব্যক্তির ইতিহাস বিশ্লেষণ করে সমস্যার উৎপত্তি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া হয়। যেমন- সপ্তম শ্রেণির অনীক বরাবরই বাংলা ব্যাকরণে খুব খারাপ করে। কেন সে খারাপ করে, এই খারাপ করাটা কখন থেকে শুরু হয়েছে, এর সাথে আর কী কী ঘটনা জড়িত আছে, কীভাবে গণিতের প্রতি তার উদাসীনতা দূর করা যায়– প্রভৃতি সত্য উদঘাটন করে সমস্যা সমাধানে তাকে যে দিক-নির্দেশনা দেওয়া হয় সেই প্রক্রিয়া বা গবেষণাই হচ্ছে বিষয়ী অনুধ্যান। শিক্ষার্থীকে নিয়ে শিক্ষকের এই যে গভীর অনুধ্যান, এর মাধ্যমে শিক্ষকের আত্মোন্নয়নের প্রসঙ্গটিও জড়িত। কারণ একজন শিক্ষার্থীর অনুধ্যান থেকে প্রাপ্ত ধারণা পরবর্তীতে তিনি অসংখ্য শিক্ষার্থীর উপর প্রয়োগ করতে পারেন এবং কাজটি করতে গিয়ে গবেষণাকর্ম পরিচালনার যে দক্ষতা তিনি অর্জন করেন– তা তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থাকে সহজ ও সাবলিল করে তোলে।

বিষয়ী অনুধ্যানের ধাপসমূহ

বিষয়ী অনুধ্যানের সুনির্দিষ্ট নিয়ম আছে। George A. Lardburg (1939) বলেছেন- 'The case study method is not in itself a scientific method at all but merely a first step in scientific procedure. অর্থাৎ বিষয়ী অনুধ্যান পদ্ধতি আদৌও কোনো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নয় বরং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির একটি প্রাথমিক ধাপ মাত্র। এ পদ্ধতিতে যেসব উপধাপ অনুসরণ করা হয় তা নিম্নরূপ-

১. একক নির্বাচন (Unit Selection) : বিষয়ী অনুধ্যান পদ্ধতির শুরু হয় কোনো সমস্যা বা একক নির্বাচনের মাধ্যমে। ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, পরিবার, সংঘ বা ঘটনাকে একক হিসেবে নির্বাচন করা হয়।

২. অনুধ্যান বা পাঠের লক্ষ্য (Goal of study) : সঠিক তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এমন কিছু অনুমান গঠন করে কাজ করা- যা সম্পূর্ণ সাময়িক এবং গবেষকের প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখতে সহায়ক। এটি পরিচালনার জন্য লক্ষ্য স্থির করা হয়।

৩. উৎস নির্বাচন (Selection of sources) : গবেষণার তথ্যের জন্য উৎস নির্বাচন করতে হয়। তথ্যের উৎস প্রধানত দুটি। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ। প্রত্যক্ষ উৎস যেমন এককের বক্তব্য শোনা, এককের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা আর পরোক্ষ উৎস হতে পারে ডকুমেন্ট রেকর্ড, ব্যক্তিগত লেখা ইত্যাদি।

৪. তথ্য সংগ্রহ (Data collection) : এ পর্যায়ে নির্বাচিত উৎস থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়। একাধিক সামাজিক একক থেকেও তথ্য সংগ্রহ করা যায়।

৫. তথ্য বিন্যাস (Arrangement) : সংগৃহীত তথ্যকে বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা বা বিন্যস্ত করা হয়।

৬. তথ্য বিশ্লেষণ (Data Analysis) : প্রাপ্ত তথ্যকে বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে গবেষণাকে এগিয়ে নেওয়া হয়। অর্থাৎ সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়। মাঠ পর্যায় হতে সংগৃহীত তথ্য বর্ণনামূলক বা পরিসংখ্যানগতভাবে বিশ্লেষণ করে গবেষকের উদ্দেশ্য অনুযায়ী উপস্থাপন করা হয়।

৭. সমাধান (Solving) : গবেষক তথ্য বিশ্লেষণের ভিত্তিতে সমাধানের চেষ্টা করেন। এ স্তরে গবেষণার তথ্যসমূহের কার্যকারিতা নির্ধারণ করা হয়।

৮. ফলো আপ (Follow-up) : গবেষক এ স্তরে পুনরায় বিষয়সমূহ পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখেন।

৯. সিদ্ধান্ত গ্রহণ (Decision making) : শেষে বিষয়টি সম্পর্কে গবেষক সিদ্ধান্তে উপনীত হন ।

বিষয়ী সম্পর্কে যে সব তথ্য সংগ্রহ করা হয়

- সাধারণ তথ্য : নাম, বয়স, জন্মস্থান, পিতামাতার নাম, পেশা
- সমস্যার বিবরণ : লক্ষণ, প্রকৃতি ও অবস্থা
- পারিবারিক ইতিহাস : মা,বাবা, ভাই, বোন ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের পরিচয় ও পারস্পরিক সম্পর্ক
- শিক্ষা : পরিবারের শিক্ষার মান, ব্যক্তির সাথে পরিবারের আদর্শগত দ্বন্দ্ব ইত্যাদি
- স্বাস্থ্য, শারীরিক বৈশিষ্ট্য ও দেহগত অন্যান্য তথ্য
- বুদ্ধির মান ও বিকাশ সম্পর্কিত তথ্য
- আবেগিক অবস্থা সম্পর্কিত তথ্য
- সামাজিক ও আচরণমূলক বিকাশ সম্পর্কিত তথ্য
- বৃত্তি ও আর্থিক সঙ্গতি সম্পর্কিত তথ্য
- অভ্যাসগত বৈশিষ্ট্য, বিশেষ আগ্রহ, শখ ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য।

তথ্য সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করার পদ্ধতি হবে ত্রুটিমুক্ত । যে সব তথ্য বাস্তবে প্রয়োগ সম্ভব সেগুলোই সংগ্রহ করতে হবে। বাস্তব ও সত্য ঘটনাই লিপিবদ্ধ করতে হবে। বিষয়ীর ক্ষতি হয় এমন কিছু করা যাবে না। বিষয়ী সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। সম্ভাব্য সকল উপায়ে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। শ্রেণিকক্ষে ও শ্রেণিকক্ষের বাইরেও বিষয়ী যা বলে বা চিন্তা করে সে সবও অন্তর্ভুক্ত হবে। শিক্ষার্থীর শিক্ষাধারা নির্ধারণ ও পেশা নির্বাচনে তার শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতা, পিতামাতার পেশা, আর্থিক অবস্থা ইত্যাদি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বলে বিবেচনা করতে হবে।

বিষয়ী অনুধ্যান পদ্ধতির সুবিধা

এই পদ্ধতিতে বিষয়ীকে স্পষ্টভাবে জানার এবং ঘটনাবলি নির্ভুলভাবে উপলব্ধি করার সুযোগ আছে। এতে একক সম্পর্কে গভীর ধারণা হয়। এটি শিক্ষার্থীর সমস্যা লাঘবে সহায়ক। এর মাধ্যমে সমস্যার উৎপত্তি, স্বরূপ, বৈশিষ্ট্য ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে জানা যায়। সমস্যার বিশালতা, গভীরতা ও জটিলতা সম্পর্কে ধারণা লাভ হয়। ফলে প্রাসঙ্গিক অনুমান গঠনে ও সাধারণীকৃত জ্ঞান উন্নয়নে সহায়ক হয়। উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব হয়। বিষয়ী অনুধ্যান ঘটনার

পরিবেশ, পারিপার্শ্বিকতা ও সমস্যার ধরন সম্পর্কে জানতে সাহায্য করে। জরিপের জন্য তৈরিকৃত প্রশ্নমালা সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হয়। এই গবেষণা গবেষকের অভিজ্ঞতাকে প্রসারিত এবং বিশ্লেষণী ক্ষমতাকে উন্নত করে। সর্বোপরি, এর মাধ্যমে একটি যুক্তিসিদ্ধ সমাধানে উপনীত হওয়া যায়- যা শিক্ষার্থীকে স্কুল, সমাজ ও পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে সাহায্য করে।

সীমাবদ্ধতা

অনুধ্যানের পদ্ধতি সময় সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল। এতে নমুনায়ন সম্ভব নয়। অপ্রাসঙ্গিক ও পক্ষপাতদুষ্ট তথ্য সংগৃহীত হওয়ার সুযোগ থাকে এবং ব্যাপক উদ্দেশ্যের পরিবর্তে সীমিত উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। অনুমানের উপর নির্ভরশীল বলে অনেক ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত যথার্থ নাও হতে পারে। এই পদ্ধতিতে তুলনাকরণের সুযোগ নেই। নৈর্ব্যক্তিকতার পরিবর্তে অনেক সময় গবেষক ব্যক্তিনিষ্ঠও হয়ে গিয়ে পক্ষপাতদুষ্ট হতে পারেন। গবেষক অনেক সময় মনে করেন নির্বাচিত একক সব বিষয় সম্পর্কে উত্তর দিতে সক্ষম কিন্তু বাস্তবে তা নাও হতে পারে।

শিক্ষাক্ষেত্রে সাধারণত শিক্ষার্থীর সমস্যা সনাক্তকরণ ও সঠিক সমাধান নির্ণয় করতে বিষয়ী অনুধ্যানের সাহায্য নেওয়া হয়। বিদ্যালয়ে কোনো শিক্ষার্থী সঙ্গতি সাধনে বা পাঠ-কার্যক্রমে অংশগ্রহণে কঠিন সমস্যায় পড়লে শিক্ষক বিষয়ী অনুধ্যানের মাধ্যমে তাকে সহায়তা করতে পারেন। এমনকি শিক্ষক নিজেও বিষয়ী অনুধ্যান পদ্ধতির সাহায্যে আত্মোন্নয়ন করতে পারেন। তাঁর ব্যক্তিগত আচরণে বা শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনায় কোনো সমস্যা দেখা দিলে বিষয়ী অনুধ্যানের সাহায্য নিতে পারেন। বিষয়ী অনুধ্যানের মাধ্যমে শিক্ষক নিজের বিশেষ দিকটির পরিবর্তন বা বিকাশ সাধনে সঠিক ও যথার্থ প্রক্রিয়ায় তথ্য বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন। বিষয়ী অনুধ্যান একটি গুণগত বিশ্লেষণের পদ্ধতি। শিক্ষক তাঁর শিক্ষা কার্যক্রমের গুণগত মান বৃদ্ধির জন্যে এ পদ্ধতির সাহায্য নিতে পারেন। এখানে শিক্ষক নিজেই হবেন বিষয়ী এবং নিজেই গবেষক। গবেষক হিসেবে সমস্যার ব্যাপকতা ও গভীরতা সম্পর্কে তিনি নিজেই অবহিত থাকবেন। তাহলে শিক্ষকের সমস্যা সমাধানে অপ্রাসঙ্গিক তথ্য ও অনুমানের উপর নির্ভর করতে হবে না। Geore J.Mouly-র মতে- বিষয়ী অনুধ্যান পদ্ধতি প্রাথমিকভাবে প্রতিষেধক হিসেবে এবং দ্বিতীয়ত: গবেষণা কৌশল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। শিক্ষকের সমস্যার প্রতিষেধক হিসেবে বিষয়ী অনুধ্যান কাজ করবে ও তাঁর বিশ্লেষণের ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করবে। এখানে তদন্তকারী শিক্ষক নিজেই কোনো এককের পূর্ণ অধিকারী এবং সকল বিষয় সম্পর্কে উত্তর দিতে সক্ষম। তাই বিষয়ী অনুধ্যান পদ্ধতিকে নিজের উন্নয়নে গবেষণা কৌশল হিসেবে ব্যবহার করে একজন শিক্ষক তাঁর আত্মোন্নয়ন ঘটাতে পারেন।

পাঠাভ্যাস গঠন

কবি সুনির্মল বসু যথার্থই বলেছেন-

বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোর সবার আমি ছাত্র
নানানভাবে নতুন জিনিস শিখছি দিবারাত্র।

প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা একটি অবিরত, অবিচ্ছিন্ন ও জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বা দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত এর ব্যাপকতা। শিক্ষা গ্রহণের জন্যে প্রয়োজন পাঠের অভ্যাস গঠন। শুধু পাঠ্যক্রম নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক নয়, বরং জ্ঞান আহরণ ও সম্প্রসারণের জন্য বিভিন্ন রেফারেন্স বই, উপন্যাস, নাটক, রম্যরচনা, প্রবন্ধ, ছোটগল্প, অভিধান, সংবাদপত্র, সাময়িকী, জীবনীগ্রন্থ ইত্যাদি মনের আনন্দ ও আগ্রহে পাঠ করাই পাঠাভ্যাসের আওতাভুক্ত। জ্ঞানার্জনে পাঠের কোনো বিকল্প নেই। বিশুদ্ধ আনন্দ লাভ যদি কোনো কিছুতে পাওয়া যায় তা পাঠাভ্যাসের মাধ্যমেই। বস্তুনির্ভর আনন্দ-উল্লাস, আমোদ-প্রমোদকে ম্লান করে দেয় বিশুদ্ধ পাঠাভ্যাস। জ্ঞান বিজ্ঞানের যে কোনো দিকেই এগিয়ে যেতে হলে পাঠের অভ্যাস গঠন করা উচিত।

একটি ভালো বই জীবনকে বহুমাত্রিকতা দান করে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মনোজগতকে সুস্থভাবে গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে একটি ভালো বই। একটি ভালো কবিতা চিন্তা জগতের দ্বার উন্মোচিত করে হৃদয়ে প্রশান্তি আনে। জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত করে একটি ভ্রমণকাহিনী। তথ্যভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয় একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ পাঠে। অর্থাৎ পাঠের অভ্যাসই শিক্ষার্থীকে জ্ঞানের প্রতি এবং ভাষার রূপ, সৌন্দর্য ও প্রয়োগ বিষয়ে কৌতূহলী করে। শিক্ষাদানের অন্যতম উদ্দেশ্যই হলো পাঠে দক্ষতা ও পাঠের

অভ্যাস গড়ে তোলা। পঠনের নিয়মিত অভ্যাস শিক্ষককে পাঠের প্রতি অনুরাগী করে তোলে। পঠনের মাধ্যমেই শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়, কল্পনাশক্তি প্রসারিত হয়, উপস্থাপন ও প্রয়োগ ক্ষমতা অর্জিত হয়, বানান ও উচ্চারণের অসঙ্গতি দূর হয়, শিক্ষণীয় বিষয় আকর্ষণীয়, উপভোগ্য ও আনন্দদায়ক হয়ে ওঠে- যার আবেদন হয় দীর্ঘস্থায়ী। মাতৃভাষায় দক্ষতা অর্জনে পঠনের কোনো বিকল্প নেই। পাঠাভ্যাস প্রত্যেককে সুন্দর মনের মানুষে পরিণত করে।

পাঠাভ্যাস গঠনের উপায়সমূহ

- বয়স ও শ্রেণি উপযোগী বই নির্বাচন করতে হবে।
- পাঠকের প্রবণতা অনুযায়ী বিষয় নির্বাচন করতে হবে।
- নিয়মিত পড়ার অভ্যাস গঠন করতে হবে।
- বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর উপযোগী বিচিত্র ধরনের বই সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে হবে।
- বিনোদনের অন্যান্য মাধ্যমের মতো বই পড়াকেও একটি মাধ্যমের মর্যাদা দিতে হবে।

পাঠাভ্যাস গঠনে গৃহ ও বিদ্যালয়ের ভূমিকা অপরিসীম। গৃহে ভালো পাঠাভ্যাসের পরিবেশ শিক্ষার্থীর ভবিষ্যত জীবন গঠনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। তাই-

- বিষয়ের প্রতি ঝোঁক বুঝে বই নির্বাচন করতে হবে
- উপযোগী বই নির্বাচন করতে হবে
- নিয়মিত পড়তে হবে
- পড়ার সময় নির্দিষ্ট করতে হবে

পাঠাভ্যাস গঠনে বিদ্যালয়ে শিক্ষকের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। তিনি শিক্ষার্থীদের পাঠাভ্যাস গঠনে নিম্নের কাজগুলো করতে পারেন।

- শ্রেণিতে সরব পাঠ আদায়ের মাধ্যমে পাঠাভ্যাস গঠন করা
- শিক্ষার্থীদের সাথে পাঠ্যবই বহির্ভূত পাঠ নিয়ে অলোচনা করা
- শিক্ষার্থীর আগ্রহের বিষয় জেনে নেওয়া
- মাঝে মাঝে পাঠচক্রের আয়োজন করা
- শিক্ষার্থীর উপযোগী বই নির্বাচন করে দেওয়া
- অধিক পাঠের জন্য উৎসাহ দেওয়া।

পাঠের অভ্যাস গঠনের জন্যে প্রতিটি বিদ্যালয়ে সুনির্বাচিত গ্রন্থের একটি সুসজ্জিত লাইব্রেরি একান্ত অপরিহার্য। একজন শিক্ষার্থী শিক্ষাজীবনে যে পাঠাভ্যাস গড়ে তুলবে তার কর্মজীবনে তথা সমগ্র জীবনে সেই অভ্যাস তাকে উন্নত জীবন পরিচর্যায় সাহায্য করবে। বিদ্যালয়ে একটি সমৃদ্ধ পাঠাগার থাকলে বই পড়ার ব্যবস্থা চালু করে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠাভ্যাস গড়ে তুলতে পারেন। অন্যদিকে শিক্ষককেও পাঠাভ্যাস গড়ে নিতে হবে। পাঠদানের জন্য শুধু পাঠ্যক্রমের নির্ধারিত বিষয়াদির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। তাকে জ্ঞানের বিশাল রাজ্যে প্রবেশ করতে হবে। পাঠ জ্ঞানের পরিধি বাড়াতে সাহায্য করে বলে পাঠাভ্যাসের মাধ্যমে শিক্ষকের চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার ঘটে। পাঠের মাধ্যমেই শিক্ষক উচ্চারণ ও বানানের ত্রুটি দূর করেন। পাঠাভ্যাস শিক্ষকের ভাষাদক্ষতার উন্নয়ন ঘটায়। ফলে মুখের ভাষা আকর্ষণীয় ও আবেদনময় হয়ে ওঠে। এভাবে পাঠাভ্যাস একজন শিক্ষককে শুধু জ্ঞানের দরজা খুলে দেয় না, জ্ঞানের গভীরে যাবার পথ নির্দেশ করে।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী সংবলিত শ্রেণিকক্ষ কী?
২. বিষয়ী অনুধ্যান কী ?
৩. বিষয়ী অনুধ্যানের শ্রেণিবিভাগ উল্লেখ করুন।
৪. বিষয়ীর তথ্য সংগ্রহে কোন দিকটিতে বেশি খেয়াল রাখতে হয়?
৫. পাঠাভ্যাস কী ?
৬. পাঠাভ্যাসের সুফল কী?
৭. শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনার উপাদানগুলো উল্লেখ করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা কী? বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ সুন্দর রাখার প্রয়োজন কেন?

২. বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষ পরিকল্পনায় একজন শিক্ষককে যেসব বিষয়ের উপর অধিক গুরুত্ব দিতে হবে- সেগুলো ব্যাখ্যা করুন।

৩. কী কী কৌশল অবলম্বন করলে অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী সংবলিত শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা সম্ভব-বর্ণনা দিন।

গ্রন্থপঞ্জি

ক. সহায়ক গ্রন্থ

১. আবুল ফজল, ব্যবহারিক বাংলা, দুরন্ত পাবলিকেশন্স, ঢাকা, পঞ্চম সংস্করণ, ২০১২

২. ইকবাল খোরশেদ, বাংলা উচ্চারণের নিয়মকানুন, রেডিয়েন্ট প্রিন্টিং, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৫

৩. ইশরাত জাহান, বাংলা শিক্ষণ, প্রভাতী লাইব্রেরি, ঢাকা, সপ্তম সংস্করণ-২০১৬

৪. গোলাম মুর্শিদ, আঠারো শতকের গদ্য, একুশের বইমেলা, প্রথম প্রকাশ, ২০০৯

৫. ড. শোয়াইব জিবরান ও অন্যান্য, বাংলা শিক্ষণ, টিকিউআই-সেপ, মাউশি, ঢাকা, প্রথম মুদ্রণ, আগস্ট ২০০৮

৬. ড. সুবোধ চৌধুরী, সাহিত্য-শিল্প ও নন্দনতত্ত্ব, জয়দুর্গা লাইব্রেরি, কলকাতা- ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি, ১৯৯৯

৭. ড. হায়াৎ মামুদ, ভাষা শিক্ষা, দি এটলাস পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা, চতুর্দশ সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০১২

৮. দীপ্তি ত্রিপাঠী, আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ, ১৯৯২

৯. নরেন বিশ্বাস, বাংলা একাডেমি উচ্চারণ অভিধান, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ১৯৯০

১০. বিশ্বজিৎ ঘোষ, বাংলাদেশের সাহিত্য, আজকাল প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ, বইমেলা ২০০৯

১১. মঞ্জুশ্রী চৌধুরী, বাংলা শিক্ষণ পদ্ধতি, চারুলিপি প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৩

১২. মামুনুর রশিদ ও শেখ মোঃ রেজাউল করিম, মৌলিক কম্পিউটার দক্ষতা, টিকিউআই-সেপ, মাউশি, ঢাকা, প্রথম মুদ্রণ, ২০০৮

১৩. মাহফুজা বেগম ও মোঃ জসীম উদ্দিন, ভাষা শিক্ষা-বাংলা, প্রভাতী লাইব্রেরি, ২০০৪

১৪. মাহবুবুল আলম, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানি, ঢাকা, দ্বাদশ সংস্করণ, জুলাই ২০০৪

১৫. মুনীর চৌধুরী ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা, অষ্টম সংস্করণ ২০১৬

১৬. মুহম্মদ আবদুল হাই, ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব, মল্লিক ব্রাদার্স, ঢাকা, সপ্তম মুদ্রণ, জুলাই ২০০০

১৭. মুহম্মদ শামসুল কবীর ও অন্যান্য, বাংলা শিক্ষণ, মাশিউপ্র, মাউশি, ঢাকা, ২০০০

১৮. মোঃ মুজিবুর রহমান, শ্রেণি পাঠদানের আধুনিক পদ্ধতি ও কৌশল এবং শ্রেণি ব্যবস্থাপনা, প্রভাতী লাইব্রেরি, ঢাকা, ৩য় সংস্করণ, ২০১৭

১৯. রফিকউল্লাহ খান ও অন্যান্য (স), মাধ্যমিক বাংলা সহপাঠ, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা, পঞ্চম প্রকাশ ২০১৬

২০. রফিকউল্লাহ খান, বাংলাদেশের কবিতা সমবায়ী স্বতন্ত্রস্বর, একুশে পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০২

২১. রফিকুল ইসলাম ও পবিত্র সরকার, বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, বাংলা একাডেমি, দ্বিতীয় সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০১২

২২. শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, সংসদ বাঙ্গালা অভিধান, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৯৯১

২৩. শ্রী পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, ভাষাবিদ্যা পরিচয়, জয়দুর্গা লাইব্রেরি, কলকাতা, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৯৮৯

২৪. শ্রী মণীন্দ্রকুমার ঘোষ, বাংলা বানান, কথারূপ লাইব্রেরি, ঢাকা, সংস্করণ, আগস্ট ২০০২
২৫. শ্রীশচন্দ্র দাশ, সাহিত্য-সন্দর্শন, বর্ণ বিচিত্রা, ঢাকা, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৯২
২৬. সত্যগোপাল মিশ্র, বাংলা পড়ানোর রীতি ও পদ্ধতি, সোমা বুক এজেন্সি, কলকাতা, ৮ম সংস্করণ, ১৯৯৮
২৭. হুমায়ুন আজাদ, লাল নীল দীপাবলি, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম পেপারব্যাক সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, মার্চ ২০১০
২৮. হুমায়ুন আজাদ, কতো নদী সরোবর, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ, নবম মুদ্রণ, জুলাই ২০১৬
২৯. হোস্নে আরা বেগম, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পাঠদান রীতি ও পদ্ধতি, মিতা ট্রেডার্স, ঢাকা, ৫ম সংস্করণ, ২০০৪
৩০. মোঃ নুরুল ইসলাম ও অন্যান্য, বাংলা শিক্ষণ, মিতা ট্রেডার্স, ঢাকা, চতুর্থ প্রকাশ-২০১৩

খ. সহায়ক প্রবন্ধ, পত্রপত্রিকা, ম্যানুয়াল, web address ও অন্যান্য

১. জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ (বাংলা), এনসিটিবি, ঢাকা, ডিসেম্বর ২০১২
২. জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ বিস্তরণ শিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল (বাংলা), কারিকুলাম ডেভেলপমেন্ট ইউনিট, এনসিটিবি, ঢাকা, ডিসেম্বর ২০১২
৩. ড. মাহবুবুল হক ও অন্যান্য, শিক্ষক শিক্ষাক্রম নির্দেশিকা, এনসিটিবি, ঢাকা, ২০১৭,
৪. প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল- বাংলা, ফিমেল সেকেন্ডারি স্কুল এসিসট্যান্স প্রজেক্ট: ২য় পর্যায়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা, অক্টোবর-২০০৪
৫. প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল- পেডাগজি, ফিমেল সেকেন্ডারি স্কুল এসিসট্যান্স প্রজেক্ট: ২য় পর্যায়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা, অক্টোবর-২০০৪
৬. সিপিডি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল- বাংলা (একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি), টিকিউআই-২, মাউশি, ঢাকা, জুন ২০১৬
৭. শিক্ষক শিক্ষাক্রম নির্দেশিকা (৮ম শ্রেণি), এনসিটিবি, ঢাকা, ২০১৭
৮. বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম, পরিমার্জিত সংস্করণ ২০১২
৯. বাংলা সাহিত্য, নবম-দশম শ্রেণি, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ
১০. Wadi D. **Haddad** and Alexandra **Draxler,** Jigsaw (teaching technique) - Wikipedia, *https://en.wikipedia.org/wiki/Jigsaw_(teaching_technique)*
১১. http://www.preservearticles.com/2012010920309/essay-on-the-structural-approach-of-teaching-english.html
১২. https://en.wikipedia.org/wiki/Structural_approach